হেজাযের কাফেলা

নসীম হিজাযী



হেজাযের কাফেলা

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

আবদুল হক

সম্পাদনা

আসাদ বিন হাফিজ



প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

এক.

বসন্ত কাল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সবুজের সমারোহ। ডান দিকে দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত সবুজ ক্ষেত খামার। বাতাসে নাচছে গমের শীষ। বায়ে ফোরাতের পারে লতাগুল্ম ঘেরা গভীর অরণ্য। হাসান প্রবেশ করল এ এলাকায়। দিগন্ত জুড়ে গোধূলির সোনালী আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। বৃক্ষের ছায়ারা দ্রুত সরে যাচ্ছে পূর্ব দিকে। নীড়ে ফিরছে পাখীর ঝাঁক। কৃষক আর রাখালদের বস্তি থেকে ধোঁয়ার হালকা ছায়া এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এলাকায় পা দিতেই অনেক স্মৃতি ও আবেগ এসে ভীড় করল হাসানের মনে। এ মাটির ছায়াঘেরা বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়েই ও একদিন শুনতো পাখীদের গান। হতাশার পরিবর্তে তার চেহারায় থাকতো আশা ও আনন্দের অনাবিল হাসি। সেসব স্মৃতি মনে পড়তেই কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেল ও।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল হাসান। বয়স পঁচিশের কোঠায়। পরনে পুরোনো মলিন পোশাক। তবে চেহারায় তার কোন ছাপ নেই, বরং সেখানে খেলা করছে এমন এক কমনীয়তা ও গাম্ভীর্য, হাজার মানুষের ভিড়েও যা চোখে পড়ার মত। সুগঠিত শরীর। বুঝতে কষ্ট হয় না এ হাতে এক টুকরো কাঠ তলোয়ারের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কোন পরাজিত ফৌজের সালার কিংবা ডুবে যাওয়া নৌকার মাঝি অথবা এমন রাখাল, নেকড়েরা যার পশুগুলো খেয়ে ফেলেছে।

অনেক পথ হেঁটে ফসলের ক্ষেত আর বাগান পেরিয়ে গাঁয়ের বস্তি ছাড়িয়ে কেল্লার মত এক বাড়ীর কাছে পৌছল ও। ডুবে যাচ্ছিল সূর্য। বাইরের মাঠে খেলা করছিল বালকেরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে ও এগিয়ে গেল ফটকের কাছে। ভেতর থেকে ভেসে এল কুকুরের ঘেউ ঘেউ। কিছুক্ষণ এক ধরনের ভীতি, বিষন্নতা আর অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর দরজার কড়া নেড়ে ডাকলঃ 'কেউ আছেন?'

আরো জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরগুলো। ফটকে কোন দারোয়ান নেই, আশ্চর্য হল ও। ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় এক বুড়ো গোলাম দরজায় মাথা গলিয়ে প্রশ্ন করলঃ 'কে তুমি?'

ঃ 'আমি হাসান। কোব্বাদের সাথে দেখা করতে চাই।'

তার সারা অঙ্গে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বলল বুড়োঃ 'কি বললে! কার সাথে দেখা করতে চাও?'

ঃ 'কোব্বাদের সাথে। কেন, এ বাড়ী কি তার নয়?'

ঃ 'অনেক দূর থেকেই এ বাড়ী দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি মুসাফিরের সাথে

আলিঙ্গন করার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মালিকের জন্য জরুরী নয়। তিনি ছাড়া আমিই কি তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারি না!'

কোন রকমে রাগ সামলে নিয়ে হাসান বললঃ 'আগন্তুকদের দরজা থেকে দূরে রাখার জন্য তোমাদের কুকুরগুলোই যথেষ্ট, তোমার মত বুড়ো হাবড়ার দরকার নেই। শোন, অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। আজও দু মঞ্জিল পথ অতিক্রম করেছি। আরো যেতে হবে কয়েক ক্রোশ। তোমার মুনীব কারো সাথে দেখা না করতে চাইলে মিয়ানদাদকে ডেকে দাও।'

ঃ 'মিয়ানদাদ বাড়ী নেই।'

ঃ 'তুমি আমার সময় নষ্ট করছ। তোমার মুনীবের কাছে গিয়ে বল এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি আমি।'

হাসানের দৃষ্টি আর কণ্ঠের দৃঢ়তায় প্রভাবিত হল গোলাম। মুসাফিরের মলিন লেবাস দেখে ভুল করেছে, এই প্রথম অনুভব করল সে। কিছু বলতে চাইল গোলাম। কিন্তু হাসানের মেজাজ দেখে সাহস হল না। কি করা যায় ভাবছিল সে, এমন সময় দরজার আড়াল থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠঃ 'কাউস, কি করছ ওখানে? কুকুর চীৎকার করছে কেন?'

ঃ 'মুনীবের সাথে দেখা করতে চাইছে এক মুসাফির।'

ঃ 'তুমি জান, সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হন না আব্বাজান!'

ঃ 'জ্বী, তাকে আমি বুঝাচ্ছিলাম। কিন্তু ....'

ঃ 'বেশী কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ না কেন?'

পিছনে সরে এল গোলাম। তাকে দরজা বন্ধ করার সুযোগ দিল না হাসান। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে তরুণীকে লক্ষ্য করে বললঃ 'মাফ করুন, হাতে সময় নেই। আপনি যদি মাহবানু হয়ে থাকেন, আপনার পিতার সংগে আমি এখুনি দেখা করতে চাই।'

অপরিচিতের মুখে নিজের নাম শুনে রাঙা হয়ে ওঠল যুবতীর চেহারা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললঃ 'তুমি দেখছি ঘরের লোকদের নামও জানো? কিন্তু কোন বাড়ীর লোকদের নাম জানলেই অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে এমনটি ভাবলে কেন? বসো, একটু পরই খানা পেয়ে যাবে। কাউস, একে মুসাফির খানায় নিয়ে যাও।'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল যুবতী। প্রায় একশো কদম দূরে এক আলীশান মহল। ওদিকেই পা বাড়াল ও।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হাসানের দিকে তাকিয়ে কাউস বললঃ 'তুমি পাগল না হলেও বেকুব। তোমার ভাগ্য ভাল, এ বেলা আর কোন গোলাম এখানে নেই। নয়তো এ দুঃসাহসের খেসারত তোমাকে দিতে হতো।'

হাসান তার দিকে ফিরেও চাইল না। দ্রুত এগিয়ে বললঃ 'দাঁড়ান।'

দাঁড়াল যুবতী। কয়েক কদম দূরে বাঁধা কুকুরগুলো চীৎকার জুড়ে দিল আরো বিকটভাবে। দৌড়ে এসে হাসানকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল কাউস। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল ও। যুবতীর ক্রোধ উৎকণ্ঠায় পরিণত হল। আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল হাসান। বললঃ 'অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। ভিক্ষুক নই, জাহাদাদকে কথা দিয়েছিলাম আসবো। কিন্তু এ ঘরের মালিক আর চাকররা যে সবাইকে ভিক্ষুক মনে করে জানতাম না।'

তরুণীর সব অনুভূতি এসে জমা হল চোখে। সহসা ওর মনে হল, শুধু পোশাক পাল্টালেই ফকীর থেকে আমীরের আসনে বসানো যায় এ যুবককে। কম্পিত কণ্ঠে ও বললঃ 'জাহাদাদ কোথায়? বাড়ী আসেনি কেন? তার সাথে কোথায় তোমার দেখা হয়েছে? তুমি নীরব কেন? আমি মাহবানু, তার বোন। তার পথ চেয়ে আছি সকাল সন্ধ্যা। গোলাম কোন গোস্তাখী করে থাকলে আমি মাফ চাইছি।'

আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। আঁখীতে উছলে এল অশ্রুর বন্যা। নিজের রূঢ় ব্যবহারে লজ্জিত হল হাসান। গম্ভীর কণ্ঠে বললঃ 'বোনের অনাবিল হাসির কথা সব সময়ই বলত জাহাদাদ। আমার দুর্ভাগ্য, আমি কোন খুশীর খবর নিয়ে আসিনি।'

স্তম্ভিত হয়ে হাসানের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাহবানু।

ঃ 'তুমি কি বলতে এসেছ আর কোনদিন ফিরে আসবে না জাহাদাদ?'

মাথা নত করে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল হাসানঃ 'হায়, আমার কোন তদবীর যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতো!'

ঃ 'তুমি যদি বল, রোমানদের কয়েদখানায় সে বন্দী, অশ্রুর বদলে আমি তোমাকে হাসি মুখেই অভ্যর্থনা জানাবো।'

ঃ 'আফসোস! যদি তা বলতে পারতাম!'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত তিনি .... তিনি চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে গেছেন?'

ঃ 'অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তার সাথেই ছিলাম।'

ঃ 'কাউস' মাহবানু বলল, 'একে আব্বাজানের কাছে নিয়ে এসো।' বলে ধীর পায়ে অশ্রু মুছতে মুছতে ও অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল।

হাসানের হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে কাউস বললঃ 'আমি জানতাম না জাহাদাদের সংবাদ নিয়ে আপনি এসেছেন। আপনার মনে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমাকে মাফ করে দিন।'

কথার চেয়ে কাউসের অশ্রুতে বেশী প্রভাবিত হল হাসান। বললঃ 'তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার।'

ঃ 'আসুন।' অশ্রু মুছতে মুছতে বলল কাউস। তাকে অনুসরণ করল হাসান।

শানদার জমিদার বাড়ী। প্রশস্ত আঙ্গিনা। তিন দিকে গোলাম ও সিপাইদের থাকার ঘর। অন্য দিকে পশুর জন্য লম্বা ছাপরা। বেশীর ভাগ কামরা এবং ছাপড়াই

শূন্য। ডানদিকে বিরাট আস্তাবল। প্রায় পঞ্চাশটা ঘোড়ার স্থান হতে পারে, সেখানে মাত্র চারটে ঘোড়া বাঁধা। একজন চাকরকে দেখলো বিচালী দিচ্ছে ওদের।

কাউসের সাথে আঙ্গিনা পেরোল হাসান। মজবুত শান বাঁধানো সিঁড়িতে পা রাখলো ওরা। প্রায় ছ'সাত ফিট উঁচুতে আরেকটি বিশাল চত্বর। বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে সামনে মহলে প্রবেশ করার মূল ফটক। ওখানে সশস্ত্র পাহারাদার দাঁড়িয়ে ছিল। ফটক পেরোল ওরা। সামনের ক্ষুদ্র আঙ্গিনা পেরোলে মহলের বারান্দা। ভেতরে মহলের দরবার কক্ষ।

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে বাড়ীর নিচের অংশ। সামনের সিঁড়ি দেখিয়ে কাউস বললঃ 'মুনীব ওপরে।'

সিঁড়ি ভেঙ্গে মহলের বিশাল এক কামরায় প্রবেশ করল ওরা। কার্পেটের ওপর ফরাশ বিছানো।

ঃ 'আপনি তশরীফ রাখুন।'

তাজিমের সাথে তাকে বসতে বলে বেরিয়ে গেল কাউস।

ফরাশে বসল হাসান। সামনের কামরা থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠের করুণ বিলাপ ধ্বনি। কোন পুরুষ তাকে শান্ত্বনা দিচ্ছে দরদ মাখা কণ্ঠে। বহির্মুখী খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘন লতাগুল্ম আর বৃক্ষরাজি শোভিত অরণ্যে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি। দু'মাইল দূরে ফোরাতের কুলে ঠেকেছে এ বনভূমি। বনের ভেতর এক পড়োবাড়ীর ভাঙা প্রাচীরে আটকে রইল তার দৃষ্টি।

অতীতের কত ঘটনা হারিয়ে গেছে মন থেকে। জীবন চলার পথের কত নিশানা মিশে গেছে সময়ের বালুচরে। কিন্তু ঐ ভাংগা বাড়ীর এক আবছা ছবি এখনো ভাসছে তার চোখে। এখানেই প্রথম জাহাদাদকে নিকট থেকে দেখেছিল ও। এরপর এক হয়ে মিশে গিয়েছিল এক আরব কৃষক আর এক ইরানী রইসের জিন্দেগীর পথ।

প্রায় এগার বছর আগে এক আহত হরিণীর পেছনে ধাওয়া করে অরণ্যে প্রবেশ করেছিল ও। অরণ্যের কাছে এসে থেমে গেল সংগীরা। ও জানত, নিজেদের অরণ্যে আরব কৃষকদেরকে শিকারের অনুমতি দেয় না ইরানী জমিদাররা। তবু আহত হরিণীকে শিয়াল আর নেকড়ের জন্য ছেড়ে দিতে মন চাইল না ওর।

একটু পর শিকার ঘোড়ায় তুলে ও বেরোচ্ছিল জংগল থেকে, ভেসে এল জমিদারের পাহারাদারদের আওয়াজ। নিজের ধারনায় কোন অপরাধ ও করেনি। ঘোড়া থামাল সে। ডানে বায়ে এবং সামনে মানুষের হৈহুল্লোড়ের সাথে শোনা গেল ঘোড়ার আওয়াজ। ধরা পড়লে সাফাই পেশ করার মওকা না দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাবে জমিদারের পাহারাদাররা, এ আশংকা জাগাল ওর মনে। বাগ ঘুরিয়ে হাকিয়ে দিল ঘোড়া। ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু ঘন অরণ্যে দিকভ্রান্ত হল হাসান। বেরোবার জন্য কোন দিকটা নিরাপদ ঠিক করতে পারল

না আর। হঠাৎ এক আলীশান মহলের পেছন দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর। ভাবল, তাহলে চলে এসেছি কোববাদের মহলের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার খোঁজে বেরিয়ে আসবে অসংখ্য লোক, তাদের পরিমাণ কত জানা নেই ওর। ওরা বেশী না হলেও শ্রান্ত ঘোড়া নিয়ে নিরাপদে যে আর বেরুনো সহজ হবে না, বুঝতে কষ্ট হল না ওর।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে প্রায়। ও ভাবল, কিছুক্ষণ এদের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারলে রাতের অন্ধকারে ওরা তাকে খুঁজে পাবে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে মহলের কাছে ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল ও। হরিণ ছুড়ে মারল দেয়ালের ভেতরে। ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম খুলে ফেলে দিল এক দিকে। ভাগিয়ে দিল ঘোড়া। ঘোড়া কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একখন্ড পাথর ছুড়ে মারল হাসান। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ঘোড়া। এখনো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেনি, আবার শোনা গেল লোকদের ডাক চিৎকার। ঝোঁপের আড়ালে বসে পড়ল ও। এবার মানুষের আওয়াজের সাথে শামিল হল কুকুরের চিৎকার। কেউ উচ্চস্বরে সাথীদের বললঃ 'ঘোড়া থেকে পড়ে ঘাড় না ভাঙলে নিশ্চয়ই কোন ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তোমরা ভালভাবে খুঁজে দেখ।'

হাসান ভাবল, আমার ঘোড়া দেখে ফেলেছে ওরা। শিকারী কুকুর পেয়েছে আমার গন্ধ। এখানে পৌঁছতে দেরী হবে না ওদের। নিজকে কুকুরের সামনে ভেবে শিউরে উঠল ও। লুকানোর চেষ্টা করল বৃক্ষে চড়ে। কি ভেবে পড়োবাড়ীর পাঁচিলের উপর শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দেয়াল যথেষ্ট চওড়া। গাছের ডালপালা ছড়িয়ে আছে ওপরে। ডালগুলো লতায় পাতায় ঘেরা। দেহটাকে ওখানেই লুকিয়ে রাখল হাসান।

যথেষ্ট সাহসী হওয়া সত্ত্বেও বুক কাঁপছিল তার। বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করল শিকারী কুকুর। টুটে পড়লো পড়ে থাকা হরিণটার ওপর। একটু পরে কয়েকজন লোকও পৌঁছল সেখানে। কুকুরগুলোকে পিটিয়ে সরিয়ে দিল ওরা। একটা কুকুর প্রাচীরের দিকে এগিয়ে ওপরে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে বাকী কুকুরগুলোও জমা হল সেখানে। লাফ দিয়ে দিয়ে প্রাচীরে ওঠার চেষ্টা করছিল কুকুরগুলো। কিন্তু হাসান ছিল তাদের নাগালের বাইরে। বাড়ীর আরেকটা দেয়ালে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি চীৎকার দিয়ে বললঃ 'সে ওখানে! সে ওখানে।'

এক অশ্বারোহী এগিয়ে আসতে আসতে বললোঃ 'কুকুর সামলাও। ও এখন আর পালিয়ে যেতে পারবে না।'

এই ব্যক্তি জাহাদাদ। কুকুরের গলায় রশি লাগিয়ে একদিকে সরে গেল পাহারাদাররা। জাহাদাদ উপর দিকে তাকিয়ে বললোঃ 'এবার নেমে আসতে পারো। একজন হরিণ চোরের এতটা ভীতু হওয়া উচিত নয়।'

মাথা তুলে হাসান চাইল তার দিকে। নিচে নেমে নির্ভয়ে এগিয়ে বললঃ 'আমি চোর নই। হরিণটা আহত হয়েছিল কয়েক ক্রোশ দূরে। বনে প্রবেশ করা থেকে তাকে ফিরাতে পারিনি এই শুধু আমার অপরাধ।'

মৃদু হেসে জাহাদাদ বললোঃ 'এ অরণ্য আমাদের আর এতে আশ্রয় গ্রহণকারী জানোয়ারও আমাদের।'

ঃ 'এটা আপনারা নিতে পারেন। আমি শুধু চাইছিলাম, আহত জানোয়ারটা যেন কোন হিংস্র খাদকের খোরাক না হয়।'

ঃ 'কিন্তু তুমি পালালে কেন?'

ঃ 'হরিণ শিকারে এসে আমি নিজেই শিকার হয়ে যেতে চাইনি। ভেবেছিলাম পালিয়ে যেতে পারবো।'

ঃ 'কিন্তু এখন?'

ঃ 'এখন আর পালানোর দরকার নেই আমার।'

হাসি চেপে জাহাদাদ বললঃ 'তোমায় যদি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়?'

ঃ 'আমার জীবন এত মূল্যবান নয়, যার জন্য গোটা খান্দানকে বিপদে ফেলব। আমি জানি আপনি কোব্বাদের ছেলে আর আমরা তার কৃষক প্রজা। নয়তো আমার তূণীর শূন্য ছিল না।'

ঃ 'তাহলে তুমি বলতে চাও প্রজা না হলে এত লোকের মোকাবিলা করতে?'

ঃ 'হ্যাঁ আমার কোন তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না।'

ঃ 'বেকুব! সাবধানে কথা বল।' বলল এক পাহারাদার।

জাহাদাদ ধমক লাগালো পাহারাদারকেঃ 'খামোশ!' তারপর হাসানের দিকে ফিরে বললঃ 'ঘোড়া দেখে ভেবেছিলাম তুমি পড়ে গেছ।'

ঃ 'আমি ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, লুকিয়ে থেকে রাতের আঁধারে পালিয়ে যাবো।'

ঃ 'তোমার ঘোড়া ঘরে পৌছে থাকলে ওরা ভাববে তুমি বিপদে পড়েছ। এখন আমার ঘোড়া নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ঘরে পৌছার চেষ্টা করো। ঘোড়া ভোরে পাঠিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, শিকারও নিয়ে যাও। এখানে যথেষ্ট হরিণ রয়েছে। শিকারের শখ হলেই আমার কাছে চলে এসো। আমি আরো বিশদিন এখানে আছি। তারপর ফিরে যাবো।'

ঃ 'আপনি এখানে থাকেন না?'

ঃ 'না, আমাদের লশকর মাদায়েনে রয়েছে।'

ঃ 'আমি আপনার কাছে আসব। শিকারে আমার দারুণ নেশা। কিন্তু যে অরণ্য এত লোকে পাহারা দেয়, হরিণের মত জানোয়ার সেখানে বেশী দিন থাকে না।'

জাহাদাদ হেসে জবাব দিলঃ 'এরা বনের হিফাজতে নয় বরং আমার সাথে শিকার করতে এসেছে।'

বাড়ীর চৌহদ্দি থেকে ওরা বেরিয়ে এল। জাহাদাদের ইশারায় এক পাহারাদার তার ঘোড়া পেশ করল হাসানকে।

পরদিন। ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে হাজির হল হাসান। জাহাদাদ তাকে নিয়ে গেল পিতার কাছে। এ ছিল এক ইরানী আমীরজাদা আর আরবী কৃষক পুত্রের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। এরপর প্রায় প্রতিদিনই জাহাদাদের কাছে আসত ও। কোব্বাদের আলীশান বাড়ীর সর্বত্র অবাধ বিচরণের অনুমতি ছিল তার। অথচ তার মত যারা, তারা শুধু বাইরে থেকেই দেখতে পেতো সে প্রাসাদ।

হাসান তখন চৌদ্দ বছরের কিশোর। জাহাদাদ ওর তিন বছরের বড়। জাহাদাদের ছোট ভাই মিয়ানদাদ তার আট বছরের ছোট। তার অল্প বয়সী বোন মাহবানু। গাঁয়ের লোকেরা তাকে বলতো পরী। মিয়ানদাদের চেয়ে আড়াই বছরের ছোট ছিল ও।

তখন ইরানী ইতিহাসের সেই অধ্যায়, যখন খসরু পারভেজের বিজয় সয়লাব কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরে আঘাত হানছিল। আপন মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে বসফরাসের পূর্ব উপকূলে ইরানী ফৌজের তাবু দেখছিল রোমের কাইজার।

ঃ 'আমার দোস্ত কোব্বাদের বেটা, ইরানী লশকরের এক বাহাদুর সালার'– এই বলে গর্ব করত হাসান। ও বলতঃ 'খুব শীঘ্রই আমি ইরানী সেনাবাহিনীতে যোগ দেবো। বস্তির বালকেরা ঈর্ষার চোখে দেখত ওকে। বড়রা করত ঠাট্টা।

হঠাৎ করেই শুরু হলো রোম-ইরান সংঘর্ষের নতুন অধ্যায়। অতীত পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পাল্টা আক্রমণ করল হিরাক্লিয়াস। এ অযাচিত হামলা রুখতে নতুন ফৌজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল পারভেজ। ইরানী সামন্ত প্রভু এবং জমিদাররা অধীনস্থ রাখাল আর কৃষক কুলের জন্য খুলে দিল ফৌজে শামিল হওয়ার দুয়ার।

ফৌজে ভর্তি হল হাসান। সীমান্তবর্তী সেনা ছাউনীতে তিনমাস প্রশিক্ষণ নিল। তারপর এক অশ্বারোহী দলের সাথে চলে গেল উত্তর ইরানের এক চৌকিতে। সেখানে পূর্ণ হলো তার জীবনের এক রংগীন স্বপ্ন। এ চৌকির প্রধান ছিলেন জাহাদাদ। এরপর সৈনিক জীবনের পরীক্ষা, যুদ্ধের কষ্ট আর বন্দী জীবনের দুঃখ মুসীবতে দুই বন্ধু ছিল পরস্পর সংগী।

আজ প্রায় ন' বছর পর জাহাদাদের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে তার ঘরে ও এসেছে। এ বিষাদময় দায়িত্ব শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য তার মন ছটফট করছিল। রাত নেমে এসেছে, আরো চার ক্রোশ এগিয়ে যেতে হবে তাকে, এ চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলছিল।

প্রদীপ হাতে কামরায় এল এক গোলাম।

ঃ 'আপনি তাশরীফ রাখুন। মুনীব এক্ষুণি আসছেন।'

গালিচায় বসল হাসান। প্রদীপ রেখে বেরিয়ে গেল গোলাম। একটু পর কোব্বাদ আর মাহবানু প্রবেশ করল কামরায়। কোব্বাদের এক হাতে লাঠি, আরেক হাত ছিল মাহবানুর কাঁধে। তিনি ছিলেন এতই দুর্বল, সাথে মাহবানু না থাকলে অথবা হাসান তাকে বাড়ীর বাইরে দেখলে তার বিশ্বাসই হতো না, ইনিই জাহাদাদের পিতা।

সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালো হাসান। কোব্বাদের হাতের ইশারায় বসে পড়লো আবার। তার সামনে বসতে বসতে কোববাদ বললেনঃ 'জাহাদাদের মত সন্তানের মৃত্যু এক পিতার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর। কতদিন হলো লড়াই খতম হয়েছে, এ সময়ে ওর পরিচিত যেসব অফিসার এবং সিপাইদের সাথে আমার দেখা হয়েছে কেউ তার মৃত্যুর সঠিক খবর দিতে পারেনি। তাদের অনেকেই বলেছে, আরমিয়ায় আমাদের লশকরের পরাজয়ের পর সে নিখোঁজ হয়ে গেছে। কেউ আবার বলেছে, সে আহত হওয়ার পর এক অশ্বারোহী তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে পালিয়ে গেছে। তুমি তার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এলে আমার প্রথম প্রশ্ন, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?'

ঃ 'রোমানদের কয়েদখানায় ছিলাম। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জাহাদাদ ছিল আমার সাথে। আফসোস! কোন ভাল খবর নিয়ে আসিনি আমি। আরমিয়ার যুদ্ধে তিনি আহত হলে নিজের ঘোড়ায় করে ময়দান থেকে বের করে নিয়েছিলাম তাকে। সারারাত সফর করে আশ্রয় নিলাম এক রাখালের ঘরে। দশদিন পর জাহাদাদ সফরের উপযুক্ত হলো। চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। এসময় হঠাৎ রোমানদের একটা দল রাখালের ঘরে আক্রমণ করে বন্দী করল আমাদের। পরে বুঝলাম, বস্তির আরেক রাখাল আমাদের বিক্রি করে দিয়েছিল ওদের কাছে। আমাদের সহৃদয় মেজবান রোমানদের দেখেই পালিয়ে গেল। আমরা জানি না তার কি পরিণতি হয়েছে।

ওরা আমাদের নিয়ে গেল তরবজন। সেখানে খালাসীদের দলে শামিল করা হল আমাদের। জাহাজের কাপ্তান মানুষ নয়, আমাদের কাজ করার যন্ত্র বা জানোয়ার মনে করত। জাহাজের খোলেই সীমাবদ্ধ ছিল আমাদের দুনিয়া। জাহাজ নোঙ্গর করছে কি চলছে, শুধু এদ্দুরই জানতাম আমরা। প্রায় বছর খানেক এ নিকৃষ্টতর সাজা আমরা ভোগ করলাম। ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগল জাহাদাদের অবস্থা। একদিন আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। জাহাজ থেকে মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু আমি জানি না তখন আমরা কোন সাগরে ছিলাম।

এরপর জীবনের প্রতি সব রকম আকর্ষণ আমার নিঃশেষ হয়ে গেল। পরের মাসে জাহাজ কোথায় ছিল, আমরা তখন কোন দেশের সমুদ্র উপকূলে ভ্রমণ করছি, জানতাম না। জাহাজের খালাসীরা সপ্তাহ, মাস অথবা বছর নয় সকাল সন্ধ্যা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরনো সাথীদের অধিকাংশই মরে গেল, তাদের স্থানে এল নতুন গোলাম।

বন্দী জীবনের প্রথম দিকে সব নবাগতদের মত আমিও মুক্তির উপায় খুঁজতাম।

কিন্তু এক সময় সব আশা হারিয়ে গেল জীবন থেকে। ভাবতে বাধ্য হলাম, জাহাদাদের মত আমার শক্তিও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমার হাত থেকে ফসকে যাবে জাহাজের দাঁড়। আর আমার লাশ নিক্ষিপ্ত হবে এক অজানা সমুদ্রে। কিন্তু জাহাজের এক কাপ্তান খুলে দিল আমার বেড়ি। আমি অন্তর্ভুক্ত হলাম সেসব গোলামদের মধ্যে, বন্দর থেকে রসদ বোঝাই করতে যারা মাল্লাদের সাহায্য করত। মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলাম আমি। দিনের সূর্য আর রাতের আকাশে তারাদের দেখার সৌভাগ্য হল আমার। মৃত্যুর পূর্বে জাহাদাদ আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল মুক্তি পেলেই আমি ঘরে ফিরে যাব। তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, যদি কোনদিন পালিয়ে যেতে পারতাম......

আমার শেষ সফর শুরু হল ইস্কান্দারিয়া থেকে। গমে বোঝাই ছিল জাহাজ। এক ঝড়ের রাতে সিরিয়ার উপকূলে নোঙ্গর ফেলল জাহাজ। সুযোগ পেয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম সাগর বক্ষে। প্রায় মাঝ রাতে অর্ধ বেহুশ অবস্থায় পৌছলাম সমুদ্রের পারে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে উঠলাম। পার্বত্য এলাকা ধরে সফর করলাম ভোর পর্যন্ত। জীবন অথবা মৃত্যু কবুল করে ঝাঁপ দিয়েছিলাম সমুদ্রে। কিন্তু তীরে পৌছার কয়েকদিন পর প্রতিটি কদম ছিল মৃত্যুর কাছাকাছি। গ্রাম অথবা শহরে না গিয়ে গরীব কৃষক আর রাখালদের দু'একটা ঝুপড়িতে ধরা দিতে লাগলাম। এক বিপন্ন ব্যক্তিকে রুটি-পানি দিতে খুব একটা প্রশ্ন করতো না ওরা। আমার দেহে ছিল নীল পোশাক। এক আরব কৃষক তার অতিরিক্ত কিছু পোশাক দিয়ে দিল আমাকে। ফোরাতের শস্য শ্যামল প্রান্তরে প্রবেশ করে বিপদমুক্ত হলাম। আরব কবিলাগুলোর গ্রামগুলোতে আমার জন্য ছিল যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা।'

থামল হাসান।

ঃ 'তোমার বাড়ী কোথায়?' কোব্বাদ প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আমরা আপনারই প্রজা, ওতবা আমার পিতা। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে আপনার জমিদারীর শেষ গ্রামটাই আমাদের।'

কোব্বাদ আর মাহবানু পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তাদের দু'জনেরই দৃষ্টি আটকে রইল হাসানের চেহারায়।

ঃ 'তুমি কি সরাসরি আমার কাছেই এসেছ?' আবারো প্রশ্ন করলেন কোব্বাদ।

ঃ 'জ্বি। এখন যাবার জন্য আপনার অনুমতি চাই। একটা ঘোড়া পেলে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছে যেতে পারতাম। আগামীকাল ঘোড়া ফিরিয়ে দেব।'

ঃ 'তুমি পরিশ্রান্ত। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর, সকালেই ঘোড়া পেয়ে যাবে। তোমার পিতাকে আমি জানি। ভয় হচ্ছে বাড়ী পৌছে তোমার........' একথা বলেই থেমে গেলেন কোব্বাদ। মেয়ের দিকে ফিরে বললেনঃ 'বেটি, মেহমানের খানার ব্যবস্থা করো।'

চলে গেল মাহবানু। উৎকণ্ঠা নিয়ে হাসান প্রশ্ন করলঃ 'বাড়ীর ব্যাপারে কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন?'

ঃ 'না, বলছিলাম, পরাজিত লশকরের সেপাইরা ফিরে এলে কখনো কখনো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও, যখনই কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে তোমার দোস্তের দরজা মাড়াতে লজ্জাবোধ করবে না। রাত বেড়ে যাচ্ছে। চেহারা বলছে তোমার আরাম করা জরুরী, হয়তো ভোর থেকে খানাও খাওনি।'

ঃ 'আজ কোথাও থামতে চাইনি। ভেবেছিলাম আপনাকে দেখে আজই গাঁয়ের পথ ধরব।'

ঃ 'না বেটা, রাতে বিশ্রাম কর, সকালে চলে যেও। তোমার সাথে আমার আরো অনেক কথা আছে।'

ঃ 'মিয়ানদাদ কোথায়?'

ঃ 'মাদায়েন গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। তুমি খেয়ে নাও, পরে নিশ্চিন্তে আলাপ করা যাবে।'

ঃ 'কয়েক দিনের মধ্যে আপনার কোন কর্মচারী আমাদের গাঁয়ে গিয়ে থাকলে একটু ডেকে দিন। আমি সেখানকার অবস্থা জানতে চাই।'

পেরেশান হয়ে কোববাদ চাইলেন মেয়ের দিকে। হাসানের দিকে ফিরে বললেনঃ 'বেটা! ফসল ভাগাভাগির সময় আমার লোকেরা সেখানে যায়, কিন্তু এখনো ফসল তোলার সময় আসেনি।'

ঃ 'এর মধ্যে আপনি কি আমার পিতা অথবা ভাইদের কাউকে দেখেছেন?'

ঃ 'অনেকদিন থেকেই আমি অসুস্থ। কিন্তু তোমার পেরেশানীর কারণ নেই।'

খানিক পর। খানা খাচ্ছে হাসান, কোব্বাদ আর মাহবানু বসে আছে সামনে। ওরা হাসানকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। লড়াই, বন্দী জীবন এবং মুক্তির কাহিনী তাদের শোনাচ্ছে হাসান। খাওয়া শেষে চোখ বুঁজে আসছিল তার। উঠতে উঠতে কোব্বাদ বললেনঃ 'বেটা, এখানেই তুমি শুয়ে পড়ো।'

কোব্বাদ আর মাহবানু বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। একটু পর কম্বল হাতে আবার কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। হাসান তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। আলগোছে তার গায়ে কম্বল চাপিয়ে সন্তর্পণে সামনের কামরায় চলে গেল মাহবানু। কোব্বাদ শুয়ে আছেন বিছানায়।

ঃ 'আব্বাজান! ও কি সেই ওতবার ছেলে!' বলল মাহবানু।

ঃ 'হ্যাঁ, চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ঃ 'আপনি তাকে সবকিছু খুলে বলেননি কেন?'

ঃ 'না বেটি, সে ছিল পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় কাতর। তার প্রয়োজন ছিল বিশ্রামের। কিছু বলার সাহস আমার হলো না।'

ঃ 'আব্বাজান, ও জাহাদাদের দোস্ত, বিদায়ের পূর্বে ওকে সবকিছু বলে দেয়া

আমাদের কর্তব্য।'

ঃ 'হ্যাঁ বেটি! ওকে বলে দেয়া জরুরী। কিন্তু ভোরেও ওকে কিছু বলার সাহস আমার হবে না।'

ঃ 'আব্বাজান! আপনার অনুমতি হলে আমিই বলে দেব।'

ঃ 'তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, বিদায়ের আগে সব বিষয় ওকে বুঝিয়ে বলো।'

ঃ 'আব্বাজান! এ অবস্থায় বাড়ী গিয়ে কি করবে ও। ওর জীবন রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরজ। আমরা কি তাকে আটকাতে পারি না?'

ঃ 'না, যারা বিপদ দেখলে পালিয়ে যায়, ওকে মনে হয় তাদের চেয়ে ভিন্ন। বাড়ী যাওয়া থেকে বিরত রাখলেও ওর কোন সাহায্য আমরা করতে পারব না, আজ আমরা তারচেয়ে বেশী অসহায়।'

ঃ 'আব্বাজান, আমার বিশ্বাস ছোট ভাইয়া মাদায়েন থেকে ভাল সংবাদ নিয়ে আসবে, আর আমরা এ জালেমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।'

ঃ 'বেটি! আমি ততটা আশাবাদী নই। মাদায়েনে আমার পরিচিতদের অনেকেই মরে গেছে। যারা বেঁচে আছে নতুন শাসক আর তার চাটুকারেরা ওদেরকে আমাদের মতই সহায়হীন করে রেখেছে। দু'একজন এমনও টিকে আছে, যারা নিজেদের ইজ্জত নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের জন্য কেউ হরমুজের সাথে বাড়াবাড়ি করবে এমনটি আশা করা যায় না।

তুরজ আরেক জঘন্য চরিত্রের মানুষ। হরমুজের সহানুভূতি না থাকলে আমার এক সাধারণ কৃষকের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সাহসও তার হতো না। আমৃত্যু আমার বিবেক আমায় দংশন করবে এই জন্য যে, একজন ফরিয়াদী হয়ে হরমুজের কাছে আমি গিয়েছিলাম। যখন কওম আর সুলতানদের পতন ঘনিয়ে আসে, তখন শাহী দরবারের কর্মচারীরাই উজির এবং সিপাহসালারের ভাগ্যের ফয়সালা করে থাকে। মিয়ানদাদ যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসতে পারে- এখন আমাদের শুধু এই দোয়াই করা উচিত। এরপর মাদায়েন অথবা দূরের এমন কোন শহরে চলে যাওয়া হবে আমাদের জন্য কল্যাণকর, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। সেখানে বসে সেই সময়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, কোন নতুন বিপ্লব যেদিন হরমুজের ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেবে।'

ঃ 'আব্বাজান আমার বিশ্বাস, ভাইজান কোন বড় পদে অধিষ্ঠিত হবেন। তখন শুধু তুরজই নয় বরং হরমুজের উপরও প্রতিশোধ নিতে পারবেন।'

ঃ 'বেটি! মিয়ানদাদ ইরানী ফৌজে বড় পদ পেলেও হরমুজের মত দূরদর্শী লোকের সাথে সংঘর্ষে যেতে পারবে না। এজন্য ভাল পথ হচ্ছে এই লশকরেই সে শামিল হয়ে যাবে। ততোদিন পর্যন্ত দুশমনদের ভুলে থাকবে যতদিন না ওমরার দল শাহানশার দরবারে যাওয়ার পূর্বেই ওকে সালাম করা জরুরী মনে করবে। জাহাদাদ

ফিরে এলে তাকেও এ পরামর্শই দিতাম।'

ঃ 'কিন্তু আপনিতো বলতেন, বড় ভাইজান ফিরে এলে মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি ছাড়া করবেন না। ইরানী সিপাহসালারের পরিবর্তে এক মামুলী কৃষক হিসেবেই পসন্দ করবেন তাকে।'

ঃ 'তখনই এ কথাগুলো আমি বলতাম, যখন আমার ঘরে সন্তানদের জন্য জীবনযাপনের সব রকমের সামগ্রী মজুদ ছিল। এখন এ বাড়ী আর কয়েক খন্ড জমি ছাড়া আমার সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। মাদায়েনের দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পৌছেছে আমি আরব কৃষকদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপাচ্ছি। তুরজ কোন মজলুম কৃষকদের হাতে নিহত হলেও, আমার বাড়ী কব্জা করার বাহানা পেয়ে যাবে হরমুজ। আমি তাকে বলেছি, তোমার পতন ঘনিয়ে এলে তুরজের চেয়ে বেরহম লোকের সম্মুখীন হবে। দুশমনকে একা পেলে দ্বিতীয়বার প্রস্তুতির মওকা দেয়ার মত ব্যক্তি হরমুজ নয়।'

কাঁদ কাঁদ হয়ে মাহবানু বললঃ 'হরমুজের কি ক্ষতি আপনি করেছেন!'

ঃ 'জুলুম করে যারা আনন্দ পায় ওরা দেখে না, অত্যাচারিতের কি অপরাধ। ওদের বড় খাহেশ হচ্ছে মজলুমের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া। হরমুজ অনুভব করেছে, আরব কৃষকদের প্রতি আমি সহানুভূতিশীল। ওদের কাছ থেকে আমি শুধু আমার প্রাপ্য আদায় করি, লুন্ঠন করি না। আমার এ ব্যবহারের ফলে অন্যান্য ইরানী জমিদারদের অধীনস্থ কৃষকদের মনে জুলুমের অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। ওদের এ অনুভূতি নিঃশেষ করার জন্যে আমাকে সরিয়ে দেয়াটা জরুরী ভাবছে ওরা।'

ধরা গলায় বলল মাহবানুঃ 'আব্বাজান, হায়! যদি হরমুজের গলা টিপে দেয়ার মত মজবুত হত আমার হাত।'

শান্তনার সুরে কোববাদ বললেনঃ 'বেটি! সব জালেমেরই শেষ পরিণতি আছে, কুদরত যখন দুর্বল আর অসহায়দের প্রতিশোধের সুযোগ দেন, একান্ত কমজোর মানুষের হাতও জালেমের শাহরগ পর্যন্ত পৌছে যায়। খসরু পারভেজ, তার পিতা এবং সন্তানের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি আমি দেখেছি। আমার বিশ্বাস, সব অত্যাচারীই নিজের হাতে নিজের ধ্বংসের পথ খুলে দেয়। এসব কথা এখন থাক। অনেক রাত হয়েছে, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠল হাসান। বিছানা থেকে নেমে জানালার পাশে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল সেই প্রাসাদ, ঘন অরণ্যে যেখানে জাহাদাদের সাথে প্রথম ওর দেখা হয়েছিল। কামরায় ঢুকল কাউস। মূল্যবান পোশাক ছাড়াও একজোড়া ঢাল তলোয়ার ওর সামনে রেখে বললঃ 'এগুলো জাহাদাদের চিহ্ন। মুনীবের ইচ্ছে, এগুলো আপনি কবুল করবেন। আমি নাস্তা নিয়ে আসছি, ততোক্ষণে আপনার জন্য ঘোড়া তৈরী

হয়ে যাবে।'

ঃ 'কিন্তু এত মূল্যবান পোশাকের কোন দরকার ছিল না আমার।'

ঃ 'দেখুন! আপনি আপত্তি করলে উনি মনে খুব ব্যথা পাবেন। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন শোয়ার পূর্বেই ওগুলো আপনাকে পৌছে দিতে। তার শরীর ভাল নেই, শোয়ার পূর্বে আমাকে এ তাগিদও করেছেন, এ উপঢৌকন গ্রহণ করতে জাহাদাদের দোস্তের আপত্তি হলে আমায় জাগিয়ে দিও। তিনি আরো বলেছেন, ঘোড়া ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই। আপনি জামা পাল্টে নিন, আমি এক্ষুণি আসছি। নাস্তা প্রস্তুত, আমি শুধু আপনার জেগে উঠার প্রতীক্ষা করছিলাম।'

বেরিয়ে গেল কাউস। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পোশাক পাল্টাতে লাগল হাসান। নাস্তা শেষ করে উঠতে যাবে এ সময় কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। বললঃ 'আব্বাজান অনেক দেরীতে শুয়েছেন, তাই তাকে জাগানো ঠিক মনে করিনি।'

ঃ 'তাকে জাগানোর কোন দরকার নেই। অচিরেই তার খেদমতে হাজির হওয়ার চেষ্টা করব আমি। এ ধরনের সংবাদ বাহককে কেউ উপঢৌকন দেয় না। বাড়ী যেতে আমার এত দামী পোশাকের কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বার বার মনে পড়ছে, হায়! এ মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমার স্থানে যদি জাহাদাদ থাকতো! অশ্রুর পরিবর্তে আপনার ঠোঁটে থাকত অনাবিল হাসির ফোয়ারা।'

ঃ 'নিজের বাড়ী না গিয়ে প্রথমেই আপনি আমাদের এখানে এসেছেন এতে করে আমার ভাই যে আপনার কত প্রিয় ছিল একথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। প্রতি বছর আববাজান ভাইজানের জন্য নতুন পোশাক তৈরী করাতেন। তার মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর এতটুকু শান্তনা পাবেন, জাহাদাদের পোশাক তার এক দোস্তের কাজে লেগেছে।'

ব্যথাভরা আওয়াজে হাসান বললঃ 'আমার কাছে জাহাদাদ ছিল ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়। বন্দী জীবনে তার সান্বিধ্য ছিল আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয়।'

দরজায় দেখা দিল কাউস। বললঃ 'ঘোড়া প্রস্তুত।'

হাসান অনুমতি প্রার্থনার দৃষ্টিতে চাইল মাহবানুর দিকে। মাহবানু কাউসকে লক্ষ্য করে বললঃ 'ইনি এখনই আসছেন, তুমি যাও।'

কাউস ফিরে গেল। মাহবানু অনেকটা বিমূঢ়ের মত বললঃ 'দীর্ঘদিন পর আপনি বাড়ী যাচ্ছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে এখানে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন, অযাচিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, কোন বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অবশ্যই আববাজানের কাছে আসবেন। আজ থেকে এ ঘরে আপনাকে বহিরাগত মনে করা হবে না।'

চঞ্চল হয়ে হাসান বললঃ 'দেখুন, আপনার পিতা কৃষকদের সম্পর্কে জানেন না এমন নয়। তিনি আমার খান্দান সম্পর্কে কোন খারাপ খবর শুনে থাকলে আপনি আমায়

তা বলতে পারেন।'

ঃ 'এ গাঁয়ের আশপাশের কয়েক খন্ড জমিতেই এখন আমাদের জমিদারী সীমাবদ্ধ। কোনদিন এটুকুও হয়তো ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমাদের কাছে এ প্রাসাদও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে হয়। সব সময় হাবেলীতে পনর-বিশজন গোলাম এবং ষাটজন সশস্ত্র সিপাই মজুদ থাকতো। এখন মাত্র পাঁচজন বিশ্বস্ত গোলাম রয়েছে আমাদের। এলাকার গভর্নর আমাদের জমি কেড়ে নিয়ে নতুন জমিদারকে দিয়ে দিয়েছে। কোনদিন হয়তো এখান থেকেও চলে যেতে আমাদের বাধ্য করা হবে।'

ঃ 'নতুন জমিদার! কে সে?'

ঃ 'তার নাম তুরজ। হরমুজের আত্মীয়।'

ঃ 'কিন্তু আপনাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে হরমুজ অন্য কারো হাওলা করে দেবে এ কি করে হতে পারে?'

ঃ 'যখন ফৌজ পরাজিত হয়, আর দেশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পাল্টে যায়, তখন সবই সম্ভব। ভাইজান যখন যুদ্ধে গেলেন, এ এলাকা ছিল বিশাল ইরান সালতানাতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এখন এ এলাকা হল হরমুজের শিকার খেলার স্থল। সরকারকে অতিরিক্ত কর দেয়ার বিনিময়ে এলাকায় জমিদারকে লুটপাটের আজাদী দিয়ে রেখেছে সরকার। আরব কৃষকের এক প্রতিনিধি দল কিছু সংখ্যক জালেম জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিল হরমুজের দরবারে। কিন্তু তিনি তাদের ধাক্কিয়ে বের করে দিলেন। ফিরে এসে ওরা বিদ্রোহ করলে জমিদাররা ওদের বস্তিগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বঞ্চিত কৃষকদের আশ্রয় দিলেন আব্বাজান। সব ইরানী জমিদার এক হয়ে প্রথমে হরমুজ এবং পরে মাদায়েনের দরবারে আব্বার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল আমরা নাকি বিদ্রোহী আরবদের সাহস যোগাচ্ছি। জুলুমের কোন বাহানা ছেড়ে দিতে হরমুজ রাজী নয়। আমাদের জমি কেড়ে নিয়ে দেয়া হলো তুরজকে। জায়গীরের প্রতিটি বস্তিতে চলেছে অবাধ লুটপাট। প্রথম বার আমাদের কৃষকরা তুরজের কর্মচারীদের পিটিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে হরমুজের ফৌজি সাহায্য নিয়ে পরাজিত করল কৃষকদের।'

বেদনামাখা কণ্ঠে হাসান বললঃ 'আমাদের বস্তির কোন খবর আপনারা জানেন?'

কিছুক্ষণের জন্য অশ্রুভেজা দৃষ্টি ছাড়া আর কোন জবাব জোগাল না মাহবানুর মুখে। ধরা গলায় সে বললঃ 'এখন বাইরের কোন ফরিয়াদী আমাদের ঘরের রোখ করে না, এরপরও আব্বাজানের সন্দেহ, অন্যসব বস্তির মত আপনাদের বস্তিও তুরজের অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারেনি। তিনি আপনাকে এ নসীহত কতে চাইছিলেন, কোন ব্যাপারে নতুন জমিদারের সাথে যেন বাড়াবাড়ি না করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ এলাকায় আরব কৃষকদের ধৈর্য আর সাহসের প্রয়োজন।'

ঃ 'আপনার আব্বাজানের যদি পরামর্শ হয়, রোমানদের কয়েদ থেকে মুক্তি পেয়ে

তুরজের অত্যাচার সওয়ায় অভ্যস্থ হবো, তবে তাকে আমি নিরাশ করব না। আমরা জানি, জুলুমের মোকাবিলার জন্য নয় বরং জুলুম বরদাশত করার জন্যেই আমাদের জন্ম। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছেন আপনি।'

ঃ 'আমি শুধু আপনাকে বলতে চাই, আমরা অসহায়। তুরজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে আমরা আপনার কোন সাহায্য করতে পারব না।'

ঃ 'এক মুহূর্তেও আমি আপনাদের পেরেশান করব না। এবার আমাকে অনুমতি দিন।' একথা বলেই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল হাসান।

এক দুঃসহ অন্তর্জ্বালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাহবানু। সে ছুটে গিয়ে ওকে থামাতে চাইছিল, বলতে চাইছিল কিছু, কিন্তু সাহস হল না। একটু পর শয়ন কক্ষের ছাদ থেকে ও দেখছিল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাসান। অসহ্য বেদনায় মথিত হচ্ছিল তার হৃদয়। ফিরে ছুটে এসে পিতার কামরায় ঢুকল ও। দেখল, কোব্বাদ তখনো বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঃ 'আব্বাজান।' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ডাকল মাহবানু।

ঘুম থেকে জেগে উঠলেন কোব্বাদ। মাহবানু বললঃ 'আমি সবকিছুই তাকে বলতে চাইছিলাম, কিন্তু তার চেহারা দেখে সাহস হল না। আমার মনে হল সঠিক সংবাদ পেলে নিজের ঘরে না গিয়ে একাই সোজা তুরজের ঘরে হামলা করতে কুণ্ঠিত হবে না ও। বস্তির অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তার আশার পরিপন্থী ইশারায় ওকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। আব্বাজান! বড় ভাইজানের পোশাক ও সন্তুষ্ট চিত্তেই পরেছে। আমার মনে হচ্ছিল ভাইজান নতুন রূপ নিয়ে ফিরে এসেছেন। তার সারল্যে আমার করুণা হচ্ছিল। হায়! যদি তাকে ফিরাতে পারতাম!'

ঃ 'বেটি! যদি বুঝতাম ও বিপদ দেখলে ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াবে তবে রাতেই বলতাম তুমি ঘরে যেতে পারবে না।'

ঃ 'কিন্তু এখন কি হবে?'

ঃ 'ও যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে সব মানুষের পথই গ্রহণ করবে যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করে। আর না হয় শুনবো এক বিপ্লবী নওজোয়ান মৃদু তরঙ্গ তুলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে হয়ে গেছে।'

দুই

গ্রামের চারণ ভূমি, ক্ষেত আর বাগান পেরিয়ে কয়েকজন কৃষক আর রাখালের দেখা পেল হাসান। ওরা তাকে ইরানী রইস ভেবে হাতের ইশারায় সালাম করে পথের এক পাশে সরে যাচ্ছিল। মাহবানুর বিদায়ী কথাগুলো তখনো স্মরণে ছিল তার। পথে

কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে না থেমে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিত সে।

গ্রামে ঢুকে এক ঘরের সামনে থামল ও। ঘর বলতে শুধু একটা শূন্য ভিটে। ঘরের ছাদটি মিশে গেছে মাটির সাথে। আঙ্গিনার এক কোণে কয়েকটা গবাদিপশু একটা ছাপরার নিচে বাঁধা। এক ব্যক্তি বিচালি দিচ্ছে ওদের সামনে। হাসান কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিধ্বস্ত বাড়ীটার দিকে। গাঁয়ের লোকেরা এসে জমা হল তার চারপাশে। কিন্তু আশপাশের কোন খেয়াল ছিল না তার। এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললোঃ 'আরে, এ যে ওতবার বেটা!'

ততোক্ষণে চারদিক থেকে সবাইঃ 'হাসান, হাসান' বলে ঘিরে ধরেছে তাকে।

একজন ঘোড়ার লাগাম ধরে বললঃ 'হাসান, আমি নাসের। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?'

জবাব না দিয়ে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল হাসানঃ 'আমার মা, বাবা, ভাই আর বোন কোথায়? কি, সবাই চুপ করে রইলে কেন তোমরা?'

কিন্তু এর কোন জবাব এল না। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে হাসান ঝাঁকুনি দিতে লাগল নাসেরকে। নাসেরের চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু। ও জড়িয়ে ধরল তাকে। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'হাসান, ওরা কেউ নেই। তোমার পিতা ও বড় ভাই নিহত হয়েছেন। সোহেলকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে ওরা। তুরজ তাকে গ্রেফতার করেছে।'

ঃ 'আমার বোন?' ধরা আওয়াজে বলল হাসান।

ঃ 'আম্মারা তার জীবনের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। নতুন জমিদার ওকে পাকড়াও করে হরমুজের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কয়েকদিন পর আমরা খবর পেলাম হরমুজের মহলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে আম্মারা। আশপাশের গ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি হরমুজের কাছে আম্মারা আর সোহেলকে ছেড়ে দিলে এলাকার শান্তি কায়েমের জিম্মা নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই আত্মহত্যা করে বসল আম্মারা। তাদেরকে লাশ দেখিয়ে হরমুজ বললঃ 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সেপাইদের তলোয়ারই যথেষ্ট। ওতবার পরিণতিতে শিক্ষা নেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ। ভবিষ্যতে কোন ইরানী জমিদারকে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দেবে না।' ওরা সোহেলের মুক্তির কথা বললে তিনি বললেনঃ 'সে বিপজ্জনক বালক আমাদের দু'জন সিপাইকে আহত করেছে। তার কপাল ভাল, মৃত্যুদন্ড না দিয়ে তুরজ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

ঃ 'সোহেল কি ইরানী সিপাইদের আহত করেছে?'

ঃ হ্যাঁ, তুরজের সাথে প্রথম লড়াইয়ে ওদের দু'জনকে নিহত এবং পাঁচজনকে আহত করে সে। এরপর ওরা পালিয়ে যায়। চারদিন পর পঞ্চাশজন সিপাই নিয়ে খুব ভোরে হামলা করল তুরজ। নিহত হলেন আপনার পিতা এবং ভাই। বাইরে খেজুর গাছে লুকানোর চেষ্টা করেছিল সোহেল। ফিরতি পথে ইরানীরা দেখে ফেলল ওকে।'

ভগ্ন হৃদয় হাসান মাটিতে বসে পড়ে জানতে চাইলঃ 'লড়াই কিভাবে শুরু হয়েছিল?'

ঃ 'ইরানী জমিদারকে হরমুজ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাদের টাকার প্রয়োজন। কৃষকদের কাছ থেকে তোমরা বেশী করে উসুল করবে। জমিদার যখন লুটপাট শুরু করল, বাঁধা দিল কৃষকরা। কোন কোন স্থান থেকে এল বিদ্রোহের খবর। কৃষকদের প্রতি কঠোর হওয়ার পক্ষে ছিলেন না কোব্বাদ। তার দয়ায় এ এলাকার সকল গ্রাম ছিল নিরাপদ। চার দিকের মজলুম কৃষক আশ্রয় নিতে লাগল ওখানে। অন্যসব জমিদাররা হরমুজের কাছে অভিযোগ করল, তিনি নাকি গোপনে আরব কৃষকদের সাহস যোগাচ্ছেন। কোব্বাদের অনেক জায়গীর ছিনিয়ে হরমুজ তার আত্মীয় তুরজের হাওলা করে দিলেন। এরপর নিজের গ্রামেই নতুন জমিদারের কর্মচারীদের জুলুমের সম্মুখীন হলাম আমরা। গেল বছর গরমের সময় আপনার পিতার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পৌছলো কোব্বাদের কাছে। কিন্তু তিনি বললেনঃ 'আমাকে শক্তি ও সহায়হীন করে দেয়া হয়েছে। আমার কথা শুনতে পর্যন্ত হরমুজ প্রস্তুত নয়। তোমরা নিজেরাই তার কাছে যাও। তারা সেখানে গেলেন। ফিরলেন নিরাশ হয়ে। এ সংবাদ জানতে পেরে একদল সিপাই এখানে পাঠিয়ে দিল তুরজ। আপনার পিতা ফসলের বেশীর ভাগই জমা না দিয়ে লুকিয়ে রাখেন এ বাহানায় ঘর তল্লাশী করতে চাইল ওরা। সামনের ফসল তোলার মওসুম পর্যন্ত চলার মত খাদ্য ছিল আপনাদের ঘরে। কিন্তু তাও ছিনিয়ে নিল ওরা। আপনার পিতা আর ভাইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। লড়াই হল। এবারও পালাল ইরানীরা। এরপর তুরজ গেল হরমুজের কাছে। তিনি একদল অশ্বারোহী সৈনিক তার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। ওরা কোন বাঁধা ছাড়াই আপনার পিতা আর ভাইকে হত্যা করল। গাঁয়ের যে সব লোক আপনাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল ইরানীদের হাতে তাদের পাঁচজন নিহত হলো।'

ঃ 'তোমরা কি নিশ্চিত, সোহেল এখনো তুরজের ঘরে আছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের অনেকেই তাকে সেখানে দেখেছে।'

আচানক ঘোড়ায় চড়ে বসল হাসান।

ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' এক সাথে প্রশ্ন করল কয়েকজন।

ঃ 'আজ সন্ধ্যার পূর্বেই তুরজকে এক হাত দেখে নেব।' এই বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও।

এক বৃদ্ধ দ্রুত এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন ওর ঘোড়ার লাগাম। বললেনঃ 'থামো হাসান! এখন একা তুমি তার কিছুই করতে পারবে না। তুরজের কাছে সব সময় পঞ্চাশ ষাটজন সশস্ত্র লোক থাকে। তার ওপর হরমুজ তার সহযোগী। তার নির্দেশে একদিনের মধ্যেই আমাদের হাজারো গ্রাম ধূলিস্মাৎ হয়ে যেতে পারে। আমরা এখন অসহায়. প্রতিশোধের সময় এলে আমরা থাকব তোমার সঙ্গে।'

গর্জে উঠল হাসানঃ 'না, ঘোড়ার বলগা ছেড়ে দিন। কারো সাহায্যের দরকার নেই আমার।'

ভয় পেয়ে পিছনে সরে গেলেন তিনি। ঘোড়া হাকিয়ে দিল হাসান। পেছন থেকে ভেসে এল নারী ও পুরুষের সম্মিলিত চিৎকারঃ 'হাসান থামো, কথা শোন হাসান।'

কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও পিছন ফিরে দেখার প্রয়োজন অনুভব করল না ও।

দুপুর। তুরজের বাড়ী ডাইনে রেখে প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গেল হাসান। অশ্বের শ্লথ গতিতে বোঝা যাচ্ছিল, ও শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত। সামনে নদী। নদীতে পানির ঝিকিমিকি দেখেই গতি বেড়ে গেল ঘোড়ার। হাসান ওকে নিজের মর্জির ওপর ছেড়ে দিল। গ্রাম থেকে বেরুনোর সময় প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল ওর হৃদয়ে, তা কমে এল ধীরে ধীরে। দিনের আলোয় তুরজের ঘরে চড়াও হয়ে তাকে খুন করার যত ফন্দি আসছিল তার সবই অসম্ভব মনে হল ওর কাছে। শুধু নিজের ব্যাপার হলে কথা ছিল না, নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়তে পারতো তুরজের ঘরে। তখন ক্ষত বিক্ষত হয়েও 'আমি ওতবার বেটা, সোহেল আর আম্মারের ভাই, তাদের হত্যাকারীকে আমি হত্যা করেছি' ঘোষণা করে প্রশান্তি অনুভব করতে পারতো। কিন্তু যখনি ও অল্প বয়সী ভাই সোহেলের কথা ভাবতো, সিপাহীসুলভ দূরদর্শিতা আবেগের ওপর চেপে বসতো তখন– যা সে শিখেছিল যুদ্ধের কঠিন ময়দান আর বন্দী জীবনের অসহনীয় যাতনার মধ্য দিয়ে। তুরজের ঘর থেকে বের করে কোন নিরাপদ স্থানে সোহেলকে পৌছানোর চিন্তা তার মনে সাবধানী পাহারা বসাল। তাই তুরজের ঘর ছেড়ে পিপাসার্ত ঘোড়া যখন নদীর পথ ধরল, ও বাঁধা দিল না।

খানিক পর ঘোড়াকে পানি পান করিয়ে নিয়ে নিজেও তৃষ্ণা মেটাল নদীর পানিতে। লাগাম খুলে ঘোড়াকে সবুজ ঘাসে ছেড়ে দিল ও। ঘন বৃক্ষের ছায়ায় বসে নিজে অপেক্ষা করতে লাগল সূর্য ডোবার। বন্দী জীবনের যাতনাক্লিষ্ট দিনগুলোর চেয়ে ওর কাছে বেশী দীর্ঘ আর ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা মনে হলো এ সময়টুকু।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এক ইরানী আর আরব বালকের কুস্তি দেখছে গাঁয়ের লোকেরা। চৌদ্দ বছরের বালক সোহেল হাবেলী থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু দেউড়ির দরজায় পাহারাদারকে দেখে এগোনোর সাহস হলো না ওর।

পাহারাদার ফিরে চাইল তার দিকে। মুখে হাসি টেনে বললঃ 'তুমি বাইরে যেতে চাও?'

ঃ 'না।' নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল সোহেল।

ঃ 'কুস্তি দেখার ইচ্ছে নেই তোমার?'

ঃ 'না।'

ওর কাঁধে হাত রেখে পাহারাদার বললঃ 'গাঁয়ের বালকদের সাথে তুমি কুস্তি লড়েছ কখনো?'

জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল ও।

ঃ 'দেখো সোহেল, তোমাকে আমি খারাপ কিছু বলিনি। তোমার পিতা আর ভাই নিহত হয়ে থাকলে এতে আমার কোন দোষ নেই। বিদ্রোহ করার পূর্বে ওদের ভাবা উচিত ছিল, এক পর্বতের সাথে টক্কর দিতে যাচ্ছে। কোন দুর্বল ব্যক্তি যখন কোন শক্তিমানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এমনই হয় তাদের ভাগ্য। দেখ, জামশেদ গাঁয়ের দুই ছেলেকে কাবু করেছে। কেউ এখন তার সামনে আসার সাহস করছে না।'

সোহেল জবাব দিলঃ 'জামশেদের কাছে পরাজিত বালকগুলো তোমাদের মতই এমন কৃষকের সন্তান যারা প্রতিটি ইরানীকে মুনীবের মত ভাবে। ওরা জানে জামশেদ তুরজের ভাতিজা। জামশেদকে পরাজিত করলে তুরজের গোলাম আর সিপাইরা ওদের গলা টিপে হত্যা করবে। তোমাদের মত আরবরা ইরানীদের সহযোগী না হলে পালোয়ান হওয়ার শখ হতো না জামশেদের।'

ক্ষেপে গেল পাহারাদার। সোহেলের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল রিং এর কাছে।

ঃ 'জামশেদ! জামশেদ!' উচ্চস্বরে বলল সে, 'এ বেকুব তোমার সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে চায়। এর মাথাটা একটু ঠান্ডা করে দাও তো?'

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত জামশেদ চাইল সোহেলের দিকে। কিন্তু তার দিকে সোহেলকে অমনোযোগী দেখে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে 'রিং'-এর দিকে ঠেলে দিল পাহারাদার। উপুড় হয়ে পড়ে গেল সোহেল। হাসতে হাসতে ওর গর্দানে পা রাখল জামশেদ। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

এক বৃদ্ধ ইরানী বললেনঃ 'ওকে উঠতে দাও জামশেদ। আমরা তোমাদের কুস্তি দেখতে চাই।'

সোহেলের গর্দান থেকে পা সরিয়ে নিল জামশেদ। সোহেল উঠে কাপড়ে লেগে থাকা ধূলোমাটি ঝাড়তে লাগল। আচানক ওর গর্দান ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল জামশেদ। কিন্তু পড়তে পড়তে নিজকে সামলে নিল সোহেল। জামশেদ এগিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল ওর সিনায়। কিন্তু এর পরও কুস্তি লড়তে রাজি হলো না সোহেল।

ঃ 'তোমরা এই বুজদীলের হাড় ভাঙতে চাইছ কেন?' বলেই জামশেদ থাপ্পড় মারল সোহেলের মুখে।

গাল মলতে মলতে পিছু হটল সোহেল। আহত বাঘের মত ও তাকিয়ে রইল জামশেদের দিকে। গোস্বায় ফুঁসতে ফুঁসতে দ্বিতীয়বার হাত তুলল জামশেদ। অকস্মাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহেল। মুখ, গর্দান আর সিনায় এলোপাথাড়ি ঘুষি মেরে

তাকে জাপটে ধরল। চোখের পলকে জামশেদকে পাজা কোলা করে ওপরে তুলে আছাড় দিয়ে বুকে উঠে বসল। ক্ষণিকের জন্য নির্বাক হয়ে গেল দর্শকরা। ওঠার চেষ্টা করল জামশেদ। কিন্তু সোহেল এক হাতে তার গর্দান চেপে ধরে অন্য হাতে অনবরত ঘুষি মারতে লাগল জামশেদের মুখে। দর্শকরা চিৎকার জুড়ে দিল এবার। ক্ষেপে গিয়ে এক ইরানী এগিয়ে এলো। সোহেলের চুলের মুঠি ধরে আলাদা করে দিল জামশেদ থেকে। জামশেদ উঠে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব, তাকে গলা টিপে হত্যা করব।'

জামশেদ এগিয়ে এসে সোহেলের কলার চেপে ধরে জামার সামনের অংশ এক টানে ছিঁড়ে ফেলল।। তখনও ইরানী নওজোয়ানের হাত থেকে চুল ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল সোহেল। কিন্তু জামেশদ ওকে মারার জন্য হাত তুলতেই ইরানীর গর্দান জড়িয়ে ধরল সোহেল। তার গলায় ঝুলে সমগ্র শক্তি দিয়ে দু'পায়ে লাথি মারল জামশেদের পেটে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল জামশেদ। ইরানী যুবক শক্ত করে ওর হাত আঁকড়ে ধরে দর্শকদের লক্ষ্য করে বললঃ 'কি দেখছ তোমরা, এই ছেলে পাগল হয়ে গেছে, নিয়ে যাও ওকে।'

কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়ল জামশেদ। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ছুটে গেল পাহারাদারের কাছে। চেষ্টা করল তার হাত থেকে নেযা ছিনিয়ে নেয়ার।

ঃ 'না, না তোমায় আমি নেযা দেব না।' চিৎকার দিয়ে বলল পাহারাদার। 'মুনিব আমার চামড়া তুলে নেবে।'

খানিক চেষ্টা করে নেযা ছেড়ে দিল জামশেদ। এক কৃষকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল লাঠি। কিন্তু যখনই ও সোহেলের দিকে এগুলো, এক বয়স্ক আরব তার পথ রোধ করে বললেনঃ 'দেখো জামশেদ! অসহায়কে এভাবে আঘাত করা বাহাদুরী নয়।'

ক্ষেপে গিয়ে বৃদ্ধের ওপর আঘাত করল জামশেদ। টলতে টলতে পিছনে সরে গেলেন তিনি। আহত মাথা দু'হাতে চেপে ধরে বসে পড়লেন। এ সময় ইরানী যুবকের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল সোহেল। কিন্তু পারল না। যখন বৃদ্ধ আরবকে আহত করে জামশেদ ফিরল ওর দিকে, অসহায়ত্বের অনুভূতি শেষবার চেষ্টা করতে বাধ্য করল সোহেলকে। হঠাৎ ইরানীর একটা আঙ্গুল চলে এল ওর মুখে। দর্শকরা ইরানীর কান ফাটা চিৎকার শুনতে পেল, মুহূর্তে মুক্ত হল সোহেল।

লাঠি দিয়ে আঘাত করল জামশেদ। একদিকে সরে নিজেকে বাঁচাল সোহেল। দারুণ ক্ষোভে দ্বিতীয় আঘাত করল জামশেদ। অন্যদিকে সরে এল ও, ছুটে রিং থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ইরানী বালকেরা ওর পথ আগলে দাঁড়ালো। এক ব্যক্তি তাকে ধরে ঠেলে দিল রিংয়ের দিকে। এবার জামশেদ এলোপাথাড়ি লাঠির ঘা মারতে লাগল। অসহায়ভাবে রিংয়ের ভেতর এদিকে ওদিক ছুটে বাঁচার চেষ্টা করছিল সোহেল। দর্শকদের মধ্যে আরবদের সহানুভূতি ছিল সোহেলের পক্ষে, কিন্তু ওদের

কারো মুখ খোলার সাহস হলোনা। অপরদিকে ইরানী বালকেরা জামশেদের পক্ষে সোল্লাসে শ্লোগান তুলছিল। শোরগোল শুনে তুরজের কয়েকজন কর্মচারী এবং গ্রামের আরো অনেকেই ওখানে জমা হল। সোহেলের মাথা থেকে বইছিল রক্তের ধারা। ওর হাত, পা এবং পিঠেও দারুণ চোট লেগেছিল। তখনো আঘাতগুলো আহত হাতে ঠেকানোর চেষ্টা করছিল ও।

আচানক এগিয়ে এলো এক অশ্বারোহী। ঘোড়া থামাল রিংয়ের নিকটে এসে। লেবাসে পোশাকে আরবীর পরিবর্তে এক ইরানী আমীরজাদা মনে হচ্ছিল তাকে। ওর পোশাক আশাক লোকদের প্রভাবিত করার জন্য ছিল যথেষ্ট। আদবের সাথে ওরা সরে গেল এদিক ওদিক।

ঃ 'কি হচ্ছে এখানে?' প্রশ্ন করল হাসান। 'এ ছেলেটা কে? আর এর অপরাধই বা কি?'

ঃ 'কিছুই না জনাব।' জবাব দিল পাহারাদার। 'এ বেকুবের শক্তি পরীক্ষার শখ হয়েছে।'

ঃ 'এক জানোয়ারের হাতে ডান্ডা দিয়ে এ জন্যে ওকে মোকাবেলার জন্য নিয়ে এসেছ! এক বাচ্চার সাথে এমন জালিমের মত কাজ করতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ।'

যে ইরানী যুবকের হাত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল সেই জবাব দিলঃ 'জনাব, এ বালক বয়স্ক আরবদের চেয়েও বিপদজনক। আমাদের দু'জন সিপাইকে ও আহত করেছে। এই দেখুন কামড়ে দিয়েছে আমার আঙ্গুলটাও।'

ঃ 'কি নাম এর?'

ঃ 'সোহেল, ও এক বিদ্রোহীর সন্তান।'

ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল হাসানের। মজলুম ভাইয়ের মহব্বত তলোয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেল ওর হাত। কিন্তু সিপাহীসুলভ দূরদর্শিতা তাড়াহুড়া করার অনুমতি দিল না ওকে। অনেক কষ্টে সংযত হয়ে রইল ও।

হাসানের আগমনে জামশেদের রাগ অনেকটা শীতল হয়ে এল। নইলে প্রতিযোগীকে না হারিয়ে দমবার জন্য ও তৈরী ছিল না।

শেষ বারের মত এলোপাথাড়ি কয়েকটা আঘাত করল ও। আচানক সোহেল এক হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা। হাতের লাঠি ছিনিয়ে নিল আরেক হাতে।

দর্শকদের মনে হলো ঘৃণা, গোস্বা আর প্রতিশোধের ভূত এ অল্প বয়সী বালকের গোটা অস্তিত্ব জাপটে ধরেছে। দু' একটা আঘাত খেয়েই পালাতে চাইল জামশেদ। কিন্তু তার পিছু ছাড়ল না সোহেল। চিৎকার দিয়ে রিং থেকে বেরিয়ে তুরজের ঘরের দিকে ছুটল জামশেদ। কিন্তু পথে বাঁধার সৃষ্টি করল সোহেল। অন্য দিকে ছুটল জামশেদ। সোহেলের দ্রুত গতিতে তাও সম্ভব হলো না। লাঠির প্রতিটি আঘাতে ওর চিৎকার

বেড়েই যাচ্ছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জামশেদ। কয়েকজন এগিয়ে এল তার সাহায্যে।

ঃ 'থামো!' গর্জে উঠল হাসান। 'তোমাদের কেউ এতে হস্তক্ষেপ করলে গর্দান উড়িয়ে দেব।'

থেমে গেল ওরা।

ঃ 'জনাব জামশেদ তুরজের প্রিয়।' বলল এক ইরানী। 'এক আরব গোলামের হাতে স্বীয় খান্দানের এ অপমান তিনি সইবেন না।'

ঃ 'আমি ছাড়াচ্ছি তাকে। তোমরা তুরজকে ডেকে দাও। হরমুজের কাছ থেকে এসেছি আমি।' একথা বলেই সোহেলের নিকটে পৌঁছে ও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল।

উপুড় হয়ে মাটিতে পড়েছিল জামশেদ। ওকে না মেরে সোহেল কাপড় ঝাড়ছিল তার। ওর হাত ধরে হাসান বললঃ 'তোমার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। মনযোগ দিয়ে এখন আমার কথা শোন। যদি তুমি হাসানের ভাই হও, তোমাকে আমি মুক্ত করতে পারি। বাগানের ঐ কোণার দিকে আমার ঘোড়া নিয়ে যাও। ওখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

ঃ 'কোন ইরানীকে আমি বিশ্বাস করি না।' একরোখাভাবে জবাব দিল সোহেল।

হাসান ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললঃ 'বেকুব! আমি হাসান। খবরদার, এখন আর কোন কথা নয়। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ওদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলে এখান থেকে বেরিয়ে বাগানের কোণায় পৌছার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

ঘোড়ার লাগাম সোহেলের হাতে দিয়ে দিল হাসান। জামশেদকে তুলল এরপর। দর্শকরা পেরেশান হয়ে কয়েক কদম দূরেই দাঁড়িয়েছিল বিমূঢ়ের মত। ওর চারপাশে জমা হল সবাই। গোঙাতে গোঙাতে চোখ খুলল জামশেদ। কয়েকজন বসে পড়ল তার পাশে। এক ব্যক্তি হাতের ওপর ভর রেখে সিনার সাথে লাগাল জামশেদের মাথা। নিজকে মুক্ত ভেবে প্রশান্তিতে চোখ মুদল ও।

ঃ 'জনাব, আপনার ঘোড়া ঐ পাগল ছেলেটার হাওলা করে দিলেন?' হাসানকে লক্ষ্য করে বলল এক ব্যক্তি। 'যদি ও পালিয়ে যায়?'

নিশ্চিন্তে জবাব দিল হাসানঃ 'তোমরা আমার ঘোড়ার চিন্তা করো না। আমি ছাড়া কেউ ওতে সওয়ারী করতে পারবে না। আরবদের পরাভূত করার পদ্ধতি এই নয় যে, তোমরা ওদের বাচ্চাদের ওপর জুলুম করবে। তোমাদের এ বোকামীর কারণে ইরাকের সবগুলো কবিলা ইরানীদের দুশমনে পরিণত হয়েছে। আমি হয়রান হচ্ছি, তুরজের ঘরের সামনেই এ লজ্জাজনক খেলা হচ্ছে, অথচ তিনি দরজা থেকে খানিক ঝুঁকে দেখারও প্রয়োজনবোধ করলেন না। এ ব্যাপারটা হরমুজের কান পর্যন্ত পৌছাব।'

দর্শকদের প্রভাবিত করার জন্য হাসানের এ শব্দগুলোই ছিল যথেষ্ট।

ঃ 'জনাব ,আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' একটু সাহস করে প্রশ্ন করল তুরজের এক গোলাম।

ঃ 'আমি মাদায়েন থেকে এসেছি। আরব প্রজাদের অস্থিরতার কারণ জানাই আমার উদ্দেশ্য।'

লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি রাগে কাঁপতে কাঁপতে দেউড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ঃ 'কোথায় সে।' গর্জে বলল দীর্ঘদেহী। 'আমি তাকে জিন্দা জমিনে পুঁতে ফেলব। আর তোমরা যারা ওকে প্ররোচিত করে এ তামাশা দেখেছ কেউ রেহাই পাবে না।'

লোকটির রেশমী জুব্বা আর নকশা করা টুপী দেখে হাসানের বুঝতে কষ্ট হলো না কে সে। চুপচাপ নিজের স্থানেই দাঁড়িয়ে রইল ও। হঠাৎ রক্ত টগবগিয়ে উঠল ওর। ঘৃণা আর প্রতিশোধের বেগবান স্রোত যা এতক্ষণ সাবধানী চাদর দিয়ে চেপে রেখেছিল, প্রচন্ড গতিতে উৎসারিত হল। অসহনীয় যাতনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর। সমগ্র শক্তি দিয়ে ও চিৎকার দিতে চাইল। কিন্তু কম্পিত ঠোঁট দুটো ছিল আওয়াজ শূন্য।

সাঁঝের আবছা আলোয় তুরজের দৃষ্টি আটকে রইল ওর প্রতি। সহসা প্রশ্ন করল সেঃ 'কে তুমি?'

অতি কষ্টে জবাব দিল হাসানঃ 'আপনি আমাকে চেনন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। আপনি তুরজ নন?'

ঃ 'তুমি কিছু বলতে এসেছ আমাকে?'

ঃ 'হ্যাঁ! আমি এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি।' এদিক ওদিক তাকিয়ে জবাব দিল ও। 'হরমুজের পক্ষ থেকে আমি এসেছি।'

ঃ 'তোমাকে তো কখনো আমি হরমুজের কাছে দেখিনি।'

ঃ 'আমার বাড়ী মাদায়েন। হরমুজের ওখান হয়েই আমি এখানে এসেছি।'

ঃ 'তাহলে তুমি বাইরে থেমেছিলে কেন? আমার বাড়ীর ফটক তো খোলাই ছিল।'

ঃ 'বাচ্চাদের লড়াই দেখার জন্য থেমেছিলাম আমি। নইলে এতক্ষণে আমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। কালক্ষেপণ না করেই আমি মাদায়েন পৌছতে চাই।'

ঃ 'এতো জলদি!'

ঃ হ্যাঁ, অবিলম্বে মাদায়েন পৌছতে হবে আমাকে। লোকদের শাস্তি কিছু সময়ের জন্য মুলতবী করলে, একান্তে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, এসো।'

ঃ 'না, এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলব। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।' একথা বলেই হাঁটা দিল হাসান।

পেরেশান হয়ে বিমূঢ়ের মত ওকে অনুসরণ করল তুরজ। পনর বিশ কদম দূরে

গিয়ে থামল ওরা। মুখোমুখী হল পরস্পর।

ঃ 'তুমি জান কি আমি বলতে চাইছি?'

ঃ 'আমি জোতিষ নই।' একরোখাভাবে জবাব দিল তুরজ। বাগানের কোণের দিকে ইশারা করে হাসান বললঃ 'যে বালক আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে তার দিকে তাকাও। তুমি জান সে কে?'

ঃ 'আমার দৃষ্টির পরীক্ষা নিতে চাইলে বলব, মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। আর আমি পেঁচক নই।' তুরজের কণ্ঠে ক্ষোভ।

ঃ 'কোন গণক যদি বলে তুমি এখন ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। খানিক পরই তোমার স্ত্রী দেখবে তোমার লাশ, বিশ্বাস করবে?'

আচানক তরবারী বের করল হাসান। সচেতন হওয়ার পূর্বেই তুরজের শাহরগ স্পর্শ করল সে তরবারী।

ঃ 'কে তুমি? কি চাও?' ধরা আওয়াজে বলল তুরজ।

ঃ 'আস্তে বলো। তোমার গোলামরা এখন তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না।' তরবারীর সূচাগ্র কিঞ্চিৎ সেধিয়ে বলল হাসান।

আশায় বুক বেঁধে তুরজ বললঃ 'আমি জানি না কে তুমি! তোমার কোন ক্ষতি করে থাকলে তা পূরণ করতে আমি প্রস্তুত।'

ঃ 'অসম্ভব, সেই বেগুনা লোকগুলোকে কখনোই আর দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তুমিই যাদের হত্যা করিয়েছ। আফসোস! আমি তোমায় শুধু একবারই খুন করতে পারব। কিন্তু শতবার জীবন দান করতে পারলে পূর্বের তুলনায় বেশী যন্ত্রণা দিয়ে তোমায় শতবার আমি হত্যা করতাম। অপরাধের শাস্তি ভোগ শেষ হয়েছে এ শান্ত্বনা তবুও পেতাম না আমি।'

ঃ 'কিন্তু আমাকে খুন করে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। হরমুজ তোমার পশ্চাদ্ধাবন করলে দিনের রোশনীতে কেন রাতের আঁধারেও কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। এখন আমি শূন্য হাত। আমার হত্যার পর কিসরা সালতানাতের সব সশস্ত্র ব্যক্তিদের দেখবে তোমার তালাশে ফিরছে।'

ঃ আমার তলোয়ারের প্রথম আঘাতেই চিরদিনের জন্য তুমি খামোশ হয়ে যাবে। চিৎকার দেয়ার মওকা তোমাকে দিতে চাই। একথাও বলতে চাই, ইরানী নই আমি এক আরবী। আমি ওতবার ছেলে। আমার পিতা, আমার ভাই তোমার হাতে নিহত হয়েছে। আমার বোন জীবন দিয়েছে তোমার কারণে। আর ঐ বালক যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর চেয়ে মর্মন্তুদ করে রেখেছো, ও আমার ভাই! ঐ দেখ ঘোড়ার নিকট দাঁড়িয়ে তোমার চিৎকার শোনার প্রতীক্ষা করছে সে।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুরজ। সে আশা করছে গোলামদের কেউ হাসানের তরবারী দেখে চিৎকার জুড়ে দেবে। কিন্তু ওরা তখন আলাপ করছে নিশ্চিন্তে। বাড়ীর

কাছের খোলা মাঠের চেয়ে বৃক্ষের নিচে আঁধার ছিল গাঢ়। কয়েক কদম দূরে কি হচ্ছে দর্শকদের পক্ষে এ অন্ধকারে তা জানা সম্ভব ছিল না। ইরানী লেবাস পরা হাসানকে দেখে এ সন্দেহ কেউ করেনি, এ ব্যক্তিই এলাকার অহংকারী আর খুনী জমিদারের জমদূত।

তুরজের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল করুণ মিনতিঃ 'আমি চিৎকার করব না। যদি আমাকে ছেড়ে দাও, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার লোকেরা তোমার পিছু ধাওয়া করবে না। তোমার ভাইকেও সাথে নিয়ে যেতে পার। জরদস্তের কসম করে বলছি, তোমাদের জমিন ফিরিয়ে দেব। আমার এলাকার সব আরবদের সরদার করবো তোমাকে। আমার ঘরের সবগুলো স্বর্ণ রৌপ্য তোমায় দিতে আমি প্রস্তুত। তোমাকে আর তোমার ভাইকে আমার আস্তাবলের উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলো দেব। তোমাদের খান্দানের উপর যে জুলুম হয়েছে হরমুজ তার জন্যে দায়ী। আমার অপরাধ, ওদের জুলুম করা থেকে বিরত রাখতে পারিনি। তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও উৎকৃষ্ট জমিগুলো তোমায় দেয়া হবে। এই গাঁয়ের মানুষ আর গোলামদের সামনে তোমার পায়ে পড়তে আমি তৈরী। আমায় ক্ষমা করে দাও তুমি।' ধরে এল তার স্বর।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল হাসান। বললঃ 'নিজের অজান্তেই তুমি আরব বস্তিতে হামলা করে ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করেছ! কিন্তু এমনটি আমি করব না।'

ঃ 'ওতবার বেটা! আমার ওপর রহম কর, ক্ষমা কর আমায়। আমার সব সম্পত্তি তোমায় দেব। এ এলাকা থেকেই চলে যাব আমি।' তুরজ জড়িয়ে ধরতে গেল ওর পা। ধমকে পিছু হটল হাসান। উর্ধে উঠল ওর তরবারী।

চিৎকার দিল তুরজঃ 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও.....।'

চোখের পলকে তার লাশটা তড়পাচ্ছিল।

ছুটে সোহেলের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল হাসান। লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ভয় পেয়ে লাফ মারল ঘোড়াটা। সমগ্র শক্তি দিয়ে লাগাম ধরে সোহেলকে বসাল নিজের পিছনে।

চিৎকার শুনে গ্রামের লোকজন এগিয়ে এল। কেউ নিক্ষেপ করল নেযা। রানে ব্যথা অনুভব করল হাসান, কিন্তু যখম ততো গভীর নয়। রানে গেঁথে থাকা নেযা ঘোড়ার ঝাঁকুনিতেই পড়ে গেল নিচে। একটা তীর এসে লাগল সোহেলের পিঠে। আরেকটা ছুটে গেল হাসানের কান ছুঁয়ে। এর পরই গ্রামের বাইরে ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করল ওরা।

ঃ 'আমায় মজবুতভাবে জড়িয়ে ধরো।' বলল হাসান।

ধরা গলায় সোহেল জবাব দিলঃ 'এখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। এখনই তুরজের লোকজন চারদিক ঘিরে ফেলবে। নদীর পারের পথই এ মুহূর্তে আমাদের জন্য নিরাপদ। ওখানে ঘন অরণ্যে লুকিয়ে থাকা যাবে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হাসান। তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল ঘোড়া। একটু পরেই অরণ্যে প্রবেশ করল ওরা। হঠাৎ হাসান অনুভব করল ওর কোমরে সোহেলের হাতের বাঁধন ঢিলা হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রাস্তা থেকে খানিক সরে বনের আড়ালে ঘোড়া থামাল হাসান।

ঃ 'ভাইজান! থামলেন কেন?' ধীর কণ্ঠে বলল সোহেল।

ঃ 'সোহেল, ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। ওদের তাজাদম ঘোড়াগুলো বেশী দূরে যেতে দেবে না আমাদের। এ এলাকায় কোব্বাদের গাঁয়েই তুমি আশ্রয় পাবে শুধু। গত রাতে আমি ছিলাম তার মেহমান। এ ঘোড়াও তিনিই আমায় দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, কোব্বাদ তোমার হিফাজত করবেন। তুরজের লোকেরা তোমায় ধাওয়া করলেও তিনি তোমায় কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে পারবেন।'

ব্যথাভরা কণ্ঠে সোহেল বললঃ 'ভাইজান! এর মানে আপনি আমার সাথে যাবেন না?'

ঃ 'না! আমাদের ঘোড়া পরিশ্রান্ত। শুধু তোমাকেই ও বহন করতে পারবে। অরণ্যে যদি পথ ভুলে যাও ঘোড়ার লাগাম ঢিলা করে দিলেই ও তোমায় সোজা কোব্বাদের ঘরে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখানে তোমাকে শুধু বলতে হবে, 'আমি হাসানের ভাই'। আমার তূনীর তীরে ভরা। রাতের বেলা তুরজের লোকদের বনেই রুখতে পারব। ওদের কারো তাজাদম ঘোড়া যদি ছিনিয়ে নিতে পারি তোমার কাছে পৌছতে আমার দেরী হবে না।'

হাসান ঘোড়া থামিয়ে নামতে চাইল ঘোড়া থেকে। কিন্তু সোহেল ওর কোমর জড়িয়ে রেখে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'না, ভাইজান। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না। আপনাকে ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে আপনার সাথে মরে যাওয়াও ভাল।'

ঃ 'সোহেল, বোকামী করোনা। ওরা আসছে। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনছি আমি।'

কান্নার গমকে বলল সোহেলঃ 'ভাইজান, আপনি এখানেই আমায় ছেড়ে দিন। আপনার তীর আর তূনীর দিন আমায়। ওদেরকে আমি আপনার পিছু ধাওয়া করতে দেব না। আমাকে ধরে নিয়ে গেলেও এ সান্ত্বনা থাকবে, আমার সাহায্যে কোনদিন হয়ত আপনি পৌছবেন। কিন্তু আপনি ধরা পড়লে এক মুহূর্তের জন্যও আপনাকে জীবিত রাখবে না ওরা। ভাইজান, আপনি তুরজকে খুন করেছেন। তুরজ হরমুজের আত্মীয়। এলাকা ছেড়ে যতদূর আপনি চলে যাবেন ততই আপনার মঙ্গল।'

পেরেশান হয়ে ওর দু'হাত পেছনে ছুড়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল হাসান। ঘোড়ার লাগাম সোহেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললঃ 'সোহেল! আমার কথা শোন, সময় নষ্ট করো না।'

কিন্তু ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল সোহেল। মাটিতে বসে পড়ে বললঃ 'ভাইজান,

আপনাকে ছাড়া আমি যাব না। আমি আহত, আমার মাথা ঘুরছে।'

সোহাগ ভরে ওর মাথায় হাত রেখে হাসান বললঃ 'তোমার যখম থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। দাঁড়াও আমি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ঘাড়ের দিকে নিয়ে গেল সোহেল। ভারাক্রান্ত হয়ে গেল হাসানের হৃদয়। ক্ষণিকের জন্য ওর বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে এল। দরদভরা কণ্ঠে হাসান প্রশ্ন করলঃ 'সোহেল, কখন তোমার এ তীর লেগেছে? তখনি আমায় বলনি কেন?'

জবাব না দিয়ে সোহেল গর্দান ঝুকাল। নিজের জামার একটি অংশ ছিঁড়ে ফেলল হাসান। আঙ্গুল দিয়ে যখমটার গভীরতা আন্দাজ করে খানিক নিশ্চিন্ত হল ও। এক হাতে ওর বাযু ধরে অপর হাতে তীর খুলে একদিকে ছুঁড়ে মারল।

এক হালকা চিৎকার অল্প বয়সী এ বালকের ঠোঁট পর্যন্ত এসেই থেমে গেল। জামার ছেঁড়া অংশ দিয়ে যখমে ব্যান্ডেজ করছে হাসান। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর অশ্বারোহীদের চিৎকার ধ্বনি ভেসে এল ওদের কানে। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই ওদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল অশ্বারোহীরা। এরপর এই প্রথম নিজের যখমের খেয়াল হল ওর। জামা থেকে আরেকটা টুকরো ছিঁড়ে ফেলল ও। নিজের রানে ব্যান্ডেজ করে চকিতে চাইল চারদিকে। সোহেলকে তুলে ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে বললঃ 'সোহেল! তোমার সাথেই আমি চলব। কিন্তু শর্ত হল, যদি আমরা দুশমনের বেষ্টনীতে এসে যাই, আমার সাথে থাকতে জেদ করবে না।'

ঃ 'কিন্তু ভাইজান, আহত তো আপনিও।'

ঃ 'আমার যখম একটা আঁচড়ের বেশী নয়।'

ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল হাসান। এবার নিশ্চিন্তে অরণ্য পাড়ি দিচ্ছে ওরা। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছিল তুরজের লোকদের আওয়াজ। খানিক পর ও অনুভব করল নদী তীর ছেড়ে বনে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। ঘন ঝোপের আড়ালে থামল হাসান।

ঃ 'ওরা এদিকে আসছে।' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল সোহেল।

ঃ 'জানি, তুমি কথা বলো না।' বলেই ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিল সোহেলের হাতে।

খানিক পর ঝোপঝাড় আর ঘন বনের পেছন থেকে ভেসে এল অশ্বারোহীদের আওয়াজ। এক অশ্বারোহী সাথীকে বলছেঃ 'ফিরে চল ভাই, আমার মনে হয় ওরা এদিকে আসেনি। তুরুজকে যে তারই ঘরের সামনে খুন করেছে সে মামুলী ব্যক্তি নয়।'

ঃ 'ভাই, যদি সে এ বনে আত্মগোপন করে থাকে আমাদেরও দোয়া করা উচিৎ, হঠাৎ আমরা যেন ওর তীরের আওতায় না এসে পড়ি।' বলল আরেকজন। 'রাতের বেলা দু'চার জনকে হত্যা না করে সেও ঘায়েল হবে না।'

ঃ 'কিন্তু কে-ও!' তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠ।

ঃ 'কোন শাহজাদা না হলেও, নিশ্চয়ই কোন উঁচু খান্দানের। লেবাসে পোশাকে ওকে এক রইস বলেই মনে হয়।' ভেসে এল আরেকজনের স্বর।

ঃ 'হায়! যদি আমরা জানতাম কে- ও। তুরজ মরে গেছে, কিন্তু আমরা ফেঁসে গেছি মুসিবতে। আমার ভয় হয়, ওকে গ্রেফতার করতে না পারলে হরমুজ আমাদের চামড়া তুলে নেবে।'

ঃ 'আমাদের সাথে লড়াই করে ও যদি নিহত হয় আর পরে জানা যায় ও কোন বড়ো খান্দানের লোক, তাহলে হরমুজের সিপাইরাই আবার বালবাচ্চাসহ আমাদের শেষ করে দেবে।'

ঃ 'আমার মনে হয় ও কোব্বাদের কোন দোস্ত অথবা আত্মীয় হবে। কোব্বাদের সাথে যে ব্যবহার তুরজ করেছে, এ হচ্ছে তারই ফল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এক আরব বালকের সাথে তার কিসের হৃদ্যতা থাকতে পারে।' বলল অন্যজন।

জবাব দিল অপর ব্যক্তিঃ 'তুরজকে খুন করার জন্য কোন বাহানা ওর দরকার ছিল। কোব্বাদ অথবা তার ছেলে হয়ত ইরানের দরবারে তুরজের জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ওখান থেকেই কোন বড়ো ব্যক্তিকে পাঠান হয়েছে যাঁচাই করার জন্য। তোমরা জান না, কোব্বাদের বড় ছেলের মত সোহেলের ভাইও ইরানী ফৌজে চাকরী করত। যুদ্ধ শেষে দু'জনের কেউই ফিরে আসেনি।'

ঃ 'আমি জানি। শুনেছি আরমিরিয়ার যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে। নিশ্চয়ই কোব্বাদ সম্রাটের দরবারে এ অভিযোগ করেছে যে, ইরানের এক ওফাদার সিপাইয়ের খান্দানের ওপর জুলুম করেছে তুরজ। আমার তো ভয় হচ্ছে, হরমুজের আক্রোশ না এদিকেই এসে পড়ে ভাই! আমার পরামর্শ হচ্ছে, এখান থেকে বেরিয়ে দরিয়ার পারে গিয়ে বাকী রাতটা সেখানেই কাটাবো। যদি হরমুজ জবাব তলব করেন, আমরা বলতে পারব বনের প্রতিটি প্রান্তে আমরা খুঁজেছি। আমাদের অন্য সাথীরা কোথায় গেছে জানি না।'

জবাব দিল অন্যজনঃ 'তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়। ওদের ফিকির করো না। এ সময় কেউ অরণ্যে প্রবেশ করতে সাহস করবে না।'

খানিক পর ফিরে গেল ওরা। নিশ্চিন্ত হয়ে হাসান সোহেলের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে চলতে লাগল। সোহেলের গর্দান ছিল আনত। দু'হাতে ও ধরে রেখেছিল হাসানকে। খানিক পর কাঁপতে লাগল সোহেল। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল হাসান। এদিক ওদিক দুলছে ও। ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল হাসান, কিঞ্চিৎ সোজা হয়ে বসল ও। কিন্তু কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই আবার ঢিলা হয়ে এল ওর গর্দান। ঘোড়া থামিয়ে হাসান ওর পেছনে চড়ে বসলো।

আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। হালকা আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। মাঝরাতের দিকে এসে কোব্বাদের মহলের কড়া নাড়ল হাসান। উত্তেজিত কুকুরগুলো ডাকতে লাগল তারস্বরে। গোলামরা একে অপরকে জাগাতে লাগল। ভেসে এল কাউসের কণ্ঠস্বরঃ 'কে?'

ঃ 'আমি হাসান।' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল ও। 'দরজা খোল, জলদি করো।'

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কাউস। বললঃ 'মুনীব আপনার ব্যাপারে দারুণ পেরেশান। আপনি চলে যাবার খানিক পরই তিনি আমায় হুকুম দিয়েছিলেন আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। আপনার গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু গিয়ে শোনলাম আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। মুনীবের ধারণা ছিল সোজা এখানেই ফিরে আসবেন। কোথায় ছিলেন আপনি? ও কে?'

ঃ 'ও আমার ভাই।' দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করে জবাব দিল হাসান। 'ও আহত, একটু সাহায্য কর তো!'

কাউস এগিয়ে গিয়ে ধরলো সোহেলকে। সামান্য নুয়ে হাসান ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে বললঃ 'দরজা বন্ধ করে কুকুরগুলো থামাও। তোমার মুনীবকে বলবে আমরা তার আশ্রয়ে রয়েছি।'

ঃ 'তাকে সংবাদ দেয়ার দরকার নেই। তিনি শোবার সময়ও আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছেন।'

কিছু না বলেই তাকে অনুসরণ করল হাসান। আঙ্গিনা পেরিয়ে শোবার ঘরের সিঁড়ি ভাংছিল ওরা, ভেসে এল মাহবানুর কণ্ঠঃ 'কি হয়েছে কাউস?'

ঃ 'বেটি, হাসান এসেছে।'

মাহবানু এগিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে বললঃ 'আপনি কোথায় ছিলেন? ও কে?'

ঃ 'আমার ভাই, ও আহত।'

কিছু না বলে ওদের আগে আগে চলল মাহবানু। বাড়ীর এক কামরায় সোহেলকে শুইয়ে দিল হাসান। দু'জন গোলাম এবং পরিচারিকাকে সাথে নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মাহবানু। লাঠি ভর দিয়ে কামরায় ঢুকলেন কোববাদ।

ঃ 'কি হয়েছে? এ কে?' সোহেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কোব্বাদ।

ঃ 'ও আমার ছোট ভাই। তুরজকে আমি হত্যা করেছি। তার লোকেরা আমাদের খুঁজছে। সোহেল আহত না হলে আপনাকে আমি কষ্ট দিতাম না। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনার ঘর ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।'

এক গোলামের দিকে তাকিয়ে কোব্বাদ বললেনঃ 'দারোয়ানকে গিয়ে ফটক বন্ধ রাখতে বল। আর সবাইকে বলে দাও, ওদের আগমনের খবর যেন কাউকে না বলে।'

ফিরে গেল গোলাম। বিছানার পাশে একটা সোফায় বসলেন কোব্বাদ.

তাকালেন সোহেলের দিকে। মাহবানুকে বললেনঃ 'বেটি! এখনো ওর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। নতুনভাবে ব্যান্ডেজ করে দাও তো!'

ছুটে অন্য কামরা থেকে ব্যান্ডেজ করার জিনিসপত্র নিয়ে এল খাদেমা। দ্রুত হাতে মাহবানু খুলে ফেলল সোহেলের রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে নতুনভাবে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। কঁকিয়ে পানি চাইল সোহেল। আলতোভাবে মাথা তুলে ওকে একটু পানি দিল হাসান। চোখ মেলে চাইল সে। শুশ্রূষাকারীদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে আবার বন্ধ করে দিল চোখ।

ঃ 'বেটি! ওদের খাবার ব্যবস্থা করো।' বললেন কোব্বাদ।

ঃ 'না, না, এখন কষ্ট করবেন না। আমার ক্ষিধে নেই।' বলল হাসান।

মাহবানুর দিকে ফিরলেন কোব্বাদ। বললেনঃ 'আচ্ছা বেটি, ওদের জন্য দুধ নিয়ে এসো।'

খাদেমাকে সাথে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাহবানু। হাসানের দিকে ফিরে বললেন কোব্বাদঃ 'বসো হাসান, তোমার পোশাকের এ রক্ত যদি তোমার ভাইয়ের না হয়, আমি খানিক দেখতে চাই।'

কোব্বাদের পাশে একটা আসনে বসতে বসতে হাসান বললঃ 'আমার যখম মামুলী, আপনি ভাববেন না।'

ঃ 'তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। আহা! তোমার রক্ত দেখছি এখনো বন্ধ হয়নি!'

উরুর কাপড় খানিক সরিয়ে হাসান খুলে ফেলল রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। ওষুধ দিয়ে দ্বিতীয়বার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন কোব্বাদ। বললেনঃ 'যখম ততো মামুলী নয়। কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। নিজের গাঁও থেকে সরাসরি তুরজের ওখানে চলে গিয়েছিলে?'

ঃ 'জ্বী।'

ঃ 'আফসোস! তোমাকে আমি বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করিনি। আমার ধারণা ছিল বিদায়ের পূর্বে ঘটনা সম্পর্কে মাহবানু তোমায় খবরদার করবে। কিন্তু আমার মতো সেও সাহস করেনি। কাউসকে তোমার পেছনে পাঠিয়েছিলাম। ফিরে এসে ও বলেছে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছ তুমি। গাঁয়ের লোকেরা ওকে বলেছে তুরজের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তুমি ফিরবে না। তোমার সিপাইসুলভ প্রশিক্ষণ থেকে আমি আশা করেছিলাম, নিজকে বিপদে জড়াবে না। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমায়ও তুমি তোমার দুশমন ভাব।'

ঃ 'আপনাকে দুশমন ভাবলে আশ্রয়ের জন্য এখানে আসতাম না।'

ঃ 'এতদিন পর তুমি ফিরে এলে। জাহাদাদের দোস্তের জন্যে আমার মনে কোন স্নেহ না থাকলেও এমন খবর শোনানোর সাহস হতো না। একটু আগেও বিছানায় শুয়ে

ভাবছিলাম, হয়তো কোথাও দূরে চলে গেছ তুমি, আর কখনো তোমায় দেখব না। তুরজের লোকেরা তোমার পিছু নিয়ে আমার বাড়ী পর্যন্ত এসে থাকলেও এ মুহূর্তে তোমার কোন বিপদ নেই। তবুও সাবধানে থাকা ভাল। বিপদ কেটে যাওয়া পর্যন্ত বাড়ীর নিচের গোপন কামরায় তোমাকে কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। বাড়ীর পিছন দিকটা ঘন অরণ্য বেষ্টিত হয়ে নদী পর্যন্ত চলে গেছে। বিপদ এলে গোপন কামরা থেকে সুড়ং পথে বনে পৌছে যেতে পারবে। তোমার ভাই হয়ত কয়েকদিনেও চলার উপযোগী হবে না। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে কোন বিপদ এলে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওর হিফাজত করব আমি। এবার তোমার পুরো কাহিনী আমি শুনতে চাই।'

ঃ 'গ্রাম থেকে বেরুতে বেরুতে প্রতিজ্ঞা করছিলাম সন্ধ্যার আগেই তুরজকে খুন করব। আফসোস! প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সময় সূর্য ডুবে গেছে। সোহেল আহত না হলে এখানে না এসে বাহরাইনে আমার মামার কাছে চলে যেতাম। আমি নতুন বিপদ নিয়ে এসেছি আপনার জন্যে। তুরজের লোকেরা আমায় খুঁজছে। সকাল পর্যন্ত হরমুজের ফৌজ এ এলাকার প্রতিটি কোণা ছেয়ে ফেলবে। আপনি সোহেলের হিফাজতের জিম্মা নিলে নিজের জন্যে আপনাকে নতুন বিপদে জড়াবো না।'

ঃ 'আমার মা ছিলেন আরবী, মেহমানদারী শিখেছি তার কাছে। এ মুহূর্তে এ এলাকার অন্য সব ঘর আর অরণ্যাঞ্চল থেকে আমার ঘর বেশী নিরাপদ। প্রতিশ্রুতি দাও, আমার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে না।'

বৃদ্ধা পরিচারিকাকে সাথে নিয়ে দুধের পিয়ালা হাতে কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। এগিয়ে হাসানের সামনে পিয়ালা ধরল ও। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে পিয়ালা হাতে নিল হাসান। সোহেলের দিকে ফিরে ওর ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে উঠাতে চাইল মাহবানু। ব্যথায় মুখ বিকৃত করে চোখ খুলল সোহেল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। খাদেমা এগিয়ে বললঃ 'দুধটুকু খেয়ে নাও বেটা।'

শুকনো ঠোঁটে জিহ্বা বুলাল ও। পিয়ালা হাতে নিয়ে দু'তিন চুমুক খেয়েই আবার চোখ বন্ধ করে নিল। বালিশে মাথা নামিয়ে রাখলো মাহবানু। বিমূঢ়ের মত তাকাল পিতার দিকে।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে কোব্বাদ বললেনঃ 'হাসান, এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। এ বেলা তোমার ভাই এখানেই থাকুক। কোন বিপদ এলে ওকেও তোমার কাছে পৌছে দেব। তুমি এসো।'

মশাল হাতে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল কাউস। হাসান তাকে অনুসরণ করল।

সিঁড়ি পেরিয়ে নিচতলার এক কামরায় পৌছল ওরা। একটা পুরনো ছেঁড়া কার্পেট বিছানো সেখানে। এক বৃদ্ধ গোলাম বসে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। তার সামনের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বিরাট এক সিন্দুক। দাঁড়িয়ে গেল গোলাম।

ঃ 'এ কামরার সামনের দিকে কোন গোপন পথ দেখছো?' হাসানের দিকে ফিরে বললেন কোব্বাদ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে হাসান বললঃ 'না, এমনিতে কোন পথ চোখে পড়ছে না।'

কোব্বাদের ইশারায় গোলাম এগিয়ে সিন্দুক একদিকে ঠেলে দিল। নিচে বিছানো তক্তা তুলতেই বেরিয়ে এল সুড়ং পথ।

ঃ 'একে গোপন কামরায় নিয়ে যাও।' গোলামদের বললেন কোব্বাদ। 'আর উপরে আসার এবং বেরোবার পদ্ধতিও ওকে বুঝিয়ে দিও।'

বেরিয়ে গেলেন কোববাদ। কাউস এবং আরো কয়েকজন গোলামের সাথে সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল হাসান। খানিক পর এক প্রশস্ত কামরায় এসে দাঁড়ালো ওরা। ঝকঝকে দুটো বিছানা পাশাপাশি পাতা। তাকে জ্বলছে প্রদীপের আলো। প্রদীপটা নামিয়ে বিছানার পাশে রেখে দিল কাউস। অন্য গোলামদের বললঃ 'ওকে দরজা খুলে দেখিয়ে দাও।'

তাক থেকে একটা রশি তুলে নিল গোলাম। দু'হাতে শক্ত করে ধরে টান দিল নিচের দিকে। হালকা গরগর আওয়াজ সৃষ্টি হল দেয়ালে। তাকের নিচের একখন্ড পাথর উপরে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। দেয়াল থেকে বেরিয়ে এল চলাচলের মত এক ফাটল। বিছানার কাছে এক লৌহদন্ডের সাথে রশি পেঁচিয়ে রাখল গোলাম। বিজয়ীর হাসি দিয়ে তাকাল হাসানের দিকে।

ঃ 'এ পথে আপনি বেরোতে পারবেন।' বলল কাউস। 'একটা পড়োবাড়ীর সামনের ঘরে ঝোঁপের কাছে বেরিয়েছে এই সুড়ং।'

ঃ 'আমার মনে আছে, একবার হরিণ শিকারে এসে এ বাড়ীর পেছনে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখেছিলাম।'

ঃ 'কিন্তু বাইরে থেকে আপনি কোন দরজা দেখেননি নিশ্চয়ই। সব সময়ই তা বন্ধ থাকে। সামনে জংলী ঝোঁপ ঝাড়। দরকারের সময় সুড়ংয়ের বাইরে এসে একটা ঘোড়া পাবেন। আমাদের কাউকে ডাকতে হলে উপরের তক্তায় আঘাত করবেন। জওয়াব না পেলে বুঝবেন ওখানে কোন বিপদ আছে।'

ঃ 'ওটা বন্ধ করার পদ্ধতি কি?' দেয়ালের ফাটলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল হাসান।

মৃদু হেসে আরেক গোলামকে ইশারা করল কাউস। এগিয়ে ও খুলে দিল লৌহ দন্ডের সাথে পেঁচানো রশি। পাথর সরে এলো আগের জায়গায়। রশির প্রান্ত তাকে রেখে দিল গোলাম। প্রদীপও তুলে রাখল তাকে। চলে গেল গোলাম দু'জন।

বিছানায় গা এলিয়ে দিল হাসান। কিন্তু হাজারো দুশ্চিন্তায় ঘুম এলো না অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ওর হারানো দিনের হাজারো ঘটনা এবং ভবিষ্যতের কল্পনাগুলো

দুর্ভাবনার আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জুলুমের এ অন্ধ স্রোতের বিরুদ্ধে ওর হৃদয়ে জ্বলছিল ক্ষোভের আগুন। ঘন্টাখানেক এপাশ ওপাশ করার পর ঘুম নেমে এল চোখের পাতায়। অনুভূতির তিক্ততারা পরিবর্তিত হতে লাগল স্বপ্নে। কখনও নিজের গাঁয়ে ঘুরছিল ও। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হাকচ্ছিল কখনো। আবার ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখে আচমকা ছুটে যাচ্ছিল স্বপ্ন। কিন্তু খানিক এপাশ ওপাশ করতেই আবার হারিয়ে যেতো স্বপ্নের নতুন উপত্যকায়। তার শেষ স্বপ্নটা ছিল অনেক দীর্ঘ। কিন্তু জেগে মনে হল কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ওর হৃদয়ে জমা হয়ে আছে।

ঘুমের ভাব এখন আর নেই। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা কিংবা চোখ খুলে এদিক ওদিক চাওয়ার পরিবর্তে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত স্বপ্নগুলো জুড়ছিল অনেক্ষণ ধরে। স্মৃতি রোমন্থন করে এটুকুই শুধু স্মরণ হল ওর, রোমানদের কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেয়ে পাহাড়, অরণ্য আর উপত্যকা পেরিয়ে ছুটছে ও। পিছু ধাওয়া করছে শত্রুরা। একটা নদী পেরুতেই ও দেখল ধাওয়াকারীরা ফিরে যাচ্ছে। দেখলো ডাকাত পড়েছে বস্তিতে। ওর পিতা, ভাই আর বোনকে হত্যা করছে ওরা। ওদের কয়েকজনকে খুন করে ও যখন পালাচ্ছিল, গ্রামের বাইরে ডাকাতদের একটা দল ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। আহত হয়ে পড়ে গেল ও। ডাকাতরা ওকে নিয়ে চলেছে নদীর দিকে।

আবার দেখল, এক আলীশান মহলের সামনের খোলা মাঠে ও দাঁড়িয়ে। ডাকাতদের পরিবর্তে ইরানী সিপাইদের জটলা দেখা যাচ্ছে তার চারপাশে। দৈত্যের মত এক জল্লাদ বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। ছুটে পালাচ্ছে ও। চিৎকার করে সিপাইরা পিছু নিল ওর। মহলে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে ও। ওখানে সোনার সিংহাসনে দেখল এক অপরূপা শাহজাদী! হীরার মুকুট ঝলমল করছে ওর মাথায়। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এল সিপাইরা। কিন্তু শাহজাদী হাত বাড়াতেই থেমে গেল ওরা।

জল্লাদ এগিয়ে বললঃ 'শাহজাদী! একে আশ্রয় দেবেন না। ও ইরানের বিদ্রোহী। ও তুরজকে খুন করেছে।'

এক সাদা দাড়িওয়ালা দাঁড়িয়েছিল সিংহাসনের পাশে। শাহজাদীর কানে কানে কি যেন বললেন তিনি। মাথা দুলিয়ে জল্লাদকে শাহজাদী বললেনঃ 'তোমরা ভুল বলছ। ও ইরানের বিদ্রোহী নয়। যেতে দাও ওকে।'

হাসান এ স্বপ্নকে ভাবল কুদরতের এক ঠাট্টা। তবুও ও অনুভব করল, এত তাড়াতাড়ি যদি এ স্বপ্ন শেষ না হতো।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে চোখ খুলল ও। দেখল, তার স্বপ্নে দেখা শাহজাদী মুকুট ছাড়াই তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ 'আপনি অনেক ঘুমিয়েছেন।' বলল মাহবানু। 'আমি তিনবার এসেছি। বেলা প্রায় দুপুর হতে চলল।'

ঃ 'আমার ভাই কেমন আছে?' উঠে বসতে বসতে বলল হাসান।

ঃ 'আপনার ভাই আপনার কাছেই শুয়ে আছে। ভোরেই ওকে আমরা এখানে পৌছে দিয়েছি। আপনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন।'

পাশের বিছানার দিকে তাকাল হাসান। সোহেলের কপালে হাত রেখে বললঃ 'ওর তো জ্বর।'

ঃ 'আপনি ভাববেন না। আব্বাজান বলেছেন ও শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে।'

ঃ 'তুরজের লোকেরা এদিকে এসেছিল?'

ঃ 'না, এখনো আসেনি। একটু সাবধানতার জন্যেই আপনার ভাইকে আমরা এখানে পৌছে দিয়েছি।'

সিঁড়িতে দেখা দিল কাউস। এক জোড়া কাপড় হাসানের বিছানায় রেখে একদিকে সরে দাঁড়াল ও।

ঃ 'আপনি কাপড় পাল্টে নিন। কাউস আপনাকে উপরে নিয়ে আসবে।'

ঃ 'আপনার কি মনে হয় আমি উপরে এলে আপনাদের কোন বিপদ হবে না?'

ঃ 'এখনো কোন বিপদ নেই। যদি বিপদ এসেই পড়ে এখানে পৌছতে আপনার দেরী হবে না।'

ঃ 'কিন্তু সোহেল উপরে যেতে পারবে না।'

ঃ 'উপরে যাবার দরকার নেই ওর। ঘুম থেকে জেগে উঠলে এখানেই খানা পৌছে দেয়া হবে। এখানে আসার আগে সোহেল সামান্য নাস্তা করেছে। কিন্তু আপনার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে লেগেছে।'

উপরে চলে গেল মাহবানু।

কাউস বললঃ 'আপনি নিশ্চিন্তে পোশাক পাল্টে নিন। মুক্ত হাওয়ায় ঘুরতে চাইলে ফিরে এসে সুড়ং পথে আমি আপনাকে বাইরে নিয়ে যাব। ততোক্ষণে আপনার খাওয়া হয়ে যাবে।'

চলে গেল কাউস।

একটু পর উপরের কামরায় খানা খাচ্ছিল হাসান। সামনে বসেছিল কোব্বাদ আর মাহবানু। ও বারবার আঁড় চোখে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। স্বপ্নের শাহজাদী আর বৃদ্ধ উজিরের ছবি বার বার ভেসে উঠছিল ওর হৃদয়ে।

মাহবানুর ললাট তার পিতার মতই প্রশস্ত। চেহারার রং যেন দুধে গোলাপ মেশানো। সোনালী চুল। টানা টানা চোখ। জোড়া ভ্রুর নিচে মায়াময় ডাগর নয়ন। খাড়া নাক। পদ্মকলির মত তাজা দুটো ঠোঁট। কথা বলার সময় দেখা যায় মুক্তার দানার মত ঝকঝকে দাঁত। মৃদু হেসে দাঁতের ঝলক দেখানোর প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র ঠোঁট দুটো নাড়লেই টোল পড়ে তার সুন্দর গালে। ঝলমলিয়ে ওঠে চোখ দুটো। অনাবিল হাসিতে ভরে ওঠে চেহারা। সে যখন কথা বলে, মনে হয় সেতারের মধুর সুর ছড়িয়ে পড়ছে ইথারে।

গতকাল কোব্বাদের ঘর থেকে ও যখন বিদায় নিয়েছিল মাহবানুর এ অপার সৌন্দর্য ওর হৃদয়ে আঁকা ছিল না। কিন্তু এখন অনুভব করছে, মাহবানুকে হাজার বার দেখেও মাহবানুর চেহারা কেমন এ প্রশ্নের সঠিক জবাব সে দিতে পারবে না। সে শুধু এতটুকু বলতে পারে, মাহবানু সুন্দরী, রূপসী।

খাওয়া শেষে ও কোব্বাদকে প্রশ্ন করলঃ 'বাইরের অবস্থা কি আপনি আমাকে বলবেন না?'

ঃ 'বাইরের অবস্থায় তোমার পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। ওরা তোমাকে খুঁজছে ঠিকই, তবে আমার বিশ্বাস ওরা এদিকে আসবে না।'

ঃ 'কিন্তু ওরা আমাদের গ্রামে গিয়ে থাকলে, আমি ফিরে এসেছি একথা তো গোপন থাকবে না। এতে সোহেলের সাহায্যকারী আর তুরজের হত্যাকারী কে তা বুঝতে ওদের অসুবিধা হবে না।'

ঃ 'তা ওরা জেনেছে।' নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন কোব্বাদ। 'আমি এক ব্যক্তিকে তোমাদের গ্রামে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছে, যে তুরজের হত্যাকারীর খবর দিতে পারবে তাকে পাঁচশ দিনার এনাম দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে হরমুজ। আশপাশের গ্রাম বাদ দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় এখন তোমাকে তালাশ করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমার ঘরের চেয়ে নিরাপদ কোন ঘর নেই তোমার জন্য। ক'দিন পর ওদের উৎসাহে ভাটা পড়লে এখান থেকে বেরুবার চিন্তা করতে পারবে।'

কাউস কামরায় ঢুকে হাসানকে লক্ষ্য করে বললঃ 'সোহেল জেগে উঠেছে, আপনাকে ডাকছে সে।'

হাসান তাকাল কোব্বাদের দিকে। মাহবানু বললঃ 'আপনি যান। আমি ওর খানা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কাউস বললঃ 'ওকে আমি খাওয়ার কথা বলেছিলাম, সে বলেছে তার ক্ষিধে নেই। তার জ্বরও কমেনি, আর যখমেও নাকি যন্ত্রণা অনুভব করছে।'

ঃ 'আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি।' বললেন কোব্বাদ। 'কিন্তু তার খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। কমপক্ষে ওকে দুধ খাইয়ে দাও।'

হাসান বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

রাতের বেলা সোহেলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। হাসানের পীড়াপীড়িতে কয়েক লোকমা মুখে দিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার। কাউস এসে থালা-বাসন তুলে নিয়ে গেল। হাসান বিছানায় শুতে শুতে বললঃ 'সোহেল, এখানে অসুস্থ হওয়াকে আমি খুব ভয় পাই। আমরা কয়েক দিন এখানে অবস্থান করলে ওরা ভাববে আমরা ওদের জন্য নতুন মুসীবত হয়ে এসেছি। আমি চাই তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও। আমরা চলে যাব বাহরাইনে। ওখানে আমাদের জন্য কোন বিপদ নেই।'

ঃ 'মামুজানের দেশ আমি কখনো দেখিনি। ভাইজান! ফৌজে ভর্তি হয়ে আপনি যখন চলে গেলেন, বড় ভাইয়াকে আব্বাজান মামুজানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে যেতে আমি জিদ ধরেছিলাম। কিন্তু আব্বাজান বললেন, রাস্তা খুব বিপজ্জনক। আপনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে আমরা সবাই ওখানে যাবো।'

ঃ 'মামুজান শেষ যখন আমাদের এখানে এলেন তখন তুমি খুব ছোট ছিলে।'

ঃ 'আপনি কখনো ওখানে গিয়েছিলেন ভাইজান!'

ঃ 'হ্যাঁ, আম্মাজানের সাথে একবার আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স আট বছর। আমরা জাহাজে সফর করেছিলাম। ইয়ামেনগামী ইরানী মুসাফিররা ছিল আমাদের সাথে। সে বার তিন মাস ছিলাম ওখানে। ফিরেছিলাম এক হিন্দি ব্যবসায়ীর জাহাজে। পারস্য উপসাগর পেরিয়ে নদীর অনেক পথ কিশতিতে সফর করেছি আমরা। মনে পড়ে গাঁয়ের কাছেই কোথাও আমরা নেমেছিলাম। নদীর সবুজ শ্যামল তীর আর দ্বীপগুলোর মনোরম দৃশ্য এখনো আমার মনে পড়ে। ইয়ামেন, বাহরাইন এবং হিন্দুস্তানী ব্যবসায়ীদের কিশতিগুলোর অধিকাংশই নদী পথে আমাদের এলাকা পর্যন্ত পৌছত। তুমি খুব শীঘ্র ঘোড়ায় সফর করার উপযুক্ত না হলে কোন কিশতিতে সওয়ার হতে চেষ্টা করব আমরা।

বাহরাইনের দিনগুলো এখনও আমার স্মৃতিতে ভাসছে। মামাতো ভাইয়ের সাথে আমি ঘোড়া হাকাতাম। বিদায়ের সময় তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, বড়ো হয়ে আমি তোমার কাছে চলে আসবো! আম্মাজানের মৃত্যুর পর একবার ওখানে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় কাজাখরা পারস্য উপসাগরে কতগুলো জাহাজ ধ্বংস করে দিল। এ জন্যে আব্বাজান আমাকে সফরের অনুমতি দিলেন না।

একবার মামুজানের চাকর আমাকে নিতে এল। তখন আমার শখ ছিল কিসরার সিপাই হওয়ার। তাই গোলামের সাথে আমি যাইনি। যখন আমি ছিলাম রোমানদের কয়েদী, প্রায়ই ভাবতাম, যদি ফৌজে ভর্তি না হয়ে বাহরাইন চলে যেতাম, কাজাখদের হাতে পড়লেও এ মুসীবত সইতে হতো না আমায়। এখন আমি ভাবছি, যে এলাকার আরবরা কিসরার জন্য খুন ঝরিয়েও তুরজ আর হরমুজের মত ইরানীর জুলুম থেকে নিরাপদ নয় সেখানে কাজাখদের সংগী হওয়াই ভাল।'

ঃ 'ভাইজান! জলদস্যুরা এখনো কি সে এলাকায় প্রবেশ করে! গত কয়েক মাসে নদী পারের কতক বস্তি ওরা লুট করেছে। শুনেছি, লুটপাট করতে গিয়ে হরমুজের মহলের দুয়ার পর্যন্ত পৌছেছিল ওরা। ইরানীদের অত্যাচারে যেসব আরব পালিয়ে গেছে, তাদের কেউ কেউ কাজাখদের সাথে শামিল হয়েছে। যখন আমি তুরজের কয়েদী ছিলাম, ভাবতাম, হায়! যদি কোন কাজাখ আমায় এখান থেকে মুক্তি দিত!'

খানিক নীরব রইল হাসান। বললঃ 'সোহেল, যে কোন সময় তুরজ বা হরমুজের লোকেরা এ এলাকা অবরোধ করতে পারে। হয়তো সহসা তোমাকে ছেড়ে আমায় চলে

যেতে হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে তুমি অত্যন্ত সাহসের সাথে কাজ করবে। যদি আমি বিপদে পড়ি কোব্বাদ তোমাকে বাহরাইন পৌঁছে দেবেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সোহেল। আচানক হাসান অনুভব করল ও ফুলে ফুলে কাঁদছে। হাসান উঠে বসল।

ঃ 'সোহেল! তুমি কাঁদছো?'

ঃ 'ভাইজান! আমি আপনার জন্য ভাবছি। এখন হরমুজের সমস্ত ফৌজ আপনাকে খুঁজছে। আপনি গ্রেফতার হলে ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে। আমি আহত এ জন্যেই আপনি এখানে থেমেছেন। ভাইজান! আপনি চলে যান এখান থেকে। ওরা এ বাড়ীতে হামলা করলে আপনি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি ধরা পড়লেও বড় জোর আমাকে ওরা গোলাম বানাবে।'

হাসান তাকে শান্ত্বনা দিয়ে বললঃ 'সোহেল! আমরা দুর্বল এবং মজলুম। হাত আমাদের শূন্য। জুলুমের প্রচন্ড দাপটের বিরুদ্ধে সাহসকিতার সাথে দাঁড়াতে হবে আমাদের। আমাদের আহত হাতেই উঁচু করতে হবে ন্যায় ও ইনসাফের ঝান্ডা। এ পরীক্ষায় হিম্মত আর দৃঢ়তাই আমাদের শেষ অবলম্বন। ছোট্ট ভাইটি আমার, সাহস নিয়ে এগিয়ে চলো। অশ্রু নয়, এ জমিন চায় আমাদের খুন। প্রতি মুহূর্তেই তুরজের মত লোকের সম্মুখীন হব আমরা। যদি সাহস হারাই, শীতের ঝরা পাতার মত আমাদের পিষে ফেলবে ওরা।'

ঃ 'ভাইজান!' নিজকে খানিক সংবরণ করে বলল সোহেল, 'তুরজ অথবা হরমুজের লোকদের আমি ভয় পাইনা। ভয় হয়, আমাকে ছেড়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা আপনি করবেন কী না। আগামীকালই আমি বিলকুল ঠিক হয়ে আপনার সাথে সফর করতে পারব। পথে জ্বর অথবা যখমের কষ্টের কথা আমি বলব না।'

ঃ 'সোহেল! আরো কয়েক দিনের বিশ্রাম তোমার প্রয়োজন। তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারলে নিজেকে বিপদে ফেলব না, এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও।'

ঘুম থেকে জেগে হাসান অনুভব করল শরীরটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে তার। যখমেও হালকা ব্যথা পাচ্ছিল। উঠে ঘরের কোণে রাখা সোরাহী থেকে পানি খেল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল চেয়ারে। গোপন কক্ষটা অসহ্য লাগল তার কাছে। রশি টেনে গোপন দরজা খুলে সুড়ং পথে বেরিয়ে গেল হাসান। এক গোলাম এগিয়ে সালাম দিয়ে বললঃ 'জনাব, আপনি কোথাও যেতে চাইলে ঘোড়া তৈরী করতে আমার দেরী হবে না। আমাদের লোকেরা অরণ্যে পাহারা দিচ্ছে। ওদের কথা মত ঘোড়ার আরামের জন্য জীন খুলে দিয়েছি।'

ঃ 'এখনই জীন লাগানোর দরকার নেই। আমি একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

হাঁটতে শুরু করল হাসান। বনের বিশুদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ

করল। কিন্তু একটু পরই রোদটা অসহ্য ঠেকল তার কাছে। ফেরার পথে অনুভব করল জ্বর আসছে। ভাঙ্গা বাড়ীর কাছে পৌছে ওর দৃষ্টি আটকে রইল সামনের প্রাসাদের বেলকনিতে। সোনালী চুলগুলো কাঁধ জুড়ে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহবানু। ছাদে উড়ে এসে বসল এক জোড়া শ্বেত পায়রা। জানালার সামনে এসে ডিগবাজী খেতে লাগল ওরা। মাহবানু দু'হাত প্রসারিত করল গরাদের বাইরে। কবুতর দুটো বসলো এসে তার হাতে। আবার ওদের হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল মাহবানু। শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে ওরা এসে বসল জানালার চৌকাঠে। ছাদ থেকে আরো কতগুলো কবুতর বেরিয়ে এল। মৃদু হাসির মুক্তা ঝরিয়ে ওখান থেকে সরে গেল মাহবানু। হাসান লক্ষ্য করলো গরাদের চৌকাঠ ছেড়ে কবুতরগুলো জমা হচ্ছে ছাদে। এবার মাহবানুকেও দেখা গেল ছাদে। সাথে মালশা হাতে এক খাদেমা। মালশা থেকে কিছু খাবার ছাদে ছড়িয়ে দিল মাহবানু। আচানক হাসান অনুভব করল জংগলের দিকে তাকিয়ে আছে মাহবানু। ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে সরে গেল হাসান। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল প্রাচীরের আড়ালে। দ্বিতীয়বার ছাদে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল মাহবানু নেই। একটু পরে সুড়ং পথে ও ফিরে এল গোপন কক্ষে। তখনও সোহেল ঘুমিয়ে। সুড়ংয়ের দরজা বন্ধ করে হাসান গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

সহসা মৃদু তরঙ্গে ভেসে এল কারো পায়ের আওয়াজ। বিছানায় উঠে বসল ও। কামরায় ঢুকল মাহবানু। চেয়ারে বসতে বসতে বললঃ 'আমি আপনাকে দেখেছি। ছাদে পায়রাগুলোকে খাওয়াচ্ছিলাম। এ কবুতরগুলো বড় ভাইয়ার চিহ্ন। যুদ্ধ যাত্রার আগে এগুলো আমাকে দিয়ে গেছেন তিনি। আপনার ভাই কেমন আছে? আপনি চিন্তা করবেন না। আমার বিশ্বাস, তাড়াতাড়িই ও সুস্থ হয়ে যাবে।'

হাসান বললঃ 'পুরো ঘটনাই আমার মনে হচ্ছে এক স্বপ্ন। তিন দিন পূর্বে কে ভেবেছে আগের চেয়ে বেশী অসহায় আর নিঃস্ব হয়ে আমি এখানে ফিরে আসব। সাধারণভাবে যেখানে আমার মত লোক আপনাদের হিসাবের বাইরে, সেখানে আমাকে ভাইয়ের মতো সেবা করছেন। আজ আমি এতো অসহায়, আপনাদের আবেগের শোকর গোজারীর ভাষাও খুঁজে পাই না।'

ঃ 'দেখুন, মুসীবতের অমানিশা আমাদের উভয়কে চারদিক থেকে ঠেলে একই দিকে নিক্ষেপ করেছে। এ ঘরই এখন আমাদের আশ্রয়। এ আঁধার দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পরস্পরের সহযোগিতার দরকার আছে। জুলুমের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে আমরা একে অপরের হাত ধরেছি। বাচাঁর তাগিদে প্রচন্ড ঢেউয়ের মাঝে আমরা একই কিশতিতে সওয়ার হয়েছি। এ তুফান থেকে নাজাত পেলে হয়তো আমাদের দু'জনের পথ ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সব সময়ই একথা আমাদের স্মরণ থাকবে, যখন আমরা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিলাম, আপনি আমাদের সাহস যুগিয়েছেন। আপনাকে পেয়ে অনুভব করছি, আমরা এখন আর একা নই।'

ঃ 'আপনি এত রহমদীল! হায়! আমি আপনাদের পেরেশানী বাড়াইনি যদি

হৃদয়কে এ শান্তনা দিতে পারতাম।'

ঃ দীলকে আপনি শান্তনা দিতে পারেন। আমরা নিকৃষ্টতম দুশমন থেকে নাজাত পেয়েছি আপনারই ওসিলায়।'

ঃ 'কিন্তু আমার ভয় হয়, এক নেকড়েকে হত্যা করে হয়ত তার চেয়ে হিংস্র হায়েনাকে আপনাদের ঘরের পথ দেখিয়েছি।'

ঃ 'আমাদের জন্য এত পেরেশান হওয়া উচিত নয়। আপনার ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে আমরা এখানে থাকব না। আব্বাজান মিয়ানদাদের সংবাদের অপেক্ষা করছে। তিনি আমাদের জন্য মাদায়েনে কোন ঠিকানা পেয়ে থাকলে এখানে থাকব না আমরা। আপনার জন্য খানা পাঠাচ্ছি।'

ঃ 'না, এখন আর ক্ষিধে নেই।'

ঃ 'সামান্য কিছু তো মুখে দেবেন।' বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল মাহবানু। ও বেরিয়ে যেতেই হাসান অনুভব করল, উদাসীন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গোটা কামরা।

ঃ 'একটু দাঁড়ান, আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

থামল সে। ফিরে হাসানের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'বলুন।'

আবেগ মিশ্রিত স্বরে হাসান বললঃ 'আমি বলতে চাইছি, আমি আপনাদের কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ।'

মুচকি হেসে চলে গেল মাহবানু। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জ্বর অথবা ব্যথার কোন অনুভূতি রইল না। হাসানের হৃদয় বলছিলঃ 'মাহবানু, আমি এক আরব। আমার ঘর লুট হয়েছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই আমার। পেরেশানী ছাড়া তোমায় আমি আর কিছুই দিতে পারছি না। তবুও আমি চাই না চিরদিনের জন্য আমাদের দু'জনার পথ আলাদা হয়ে যাক।'

বিছানায় শুয়ে নিজকে শাসাচ্ছিল সে। তুমি আহাম্মক হয়োনা। এক দুর্ঘটনাই তোমাদেরকে এক কিশতিতে সওয়ার করেছে। কিন্তু জামানার কোন সয়লাবই তোমাদের মাঝের বাঁধার প্রাচীর ভাঙতে পারবে না।'

দশদিন কঠিন জ্বরে পড়ে রইল হাসান। কোব্বাদের ধারণা, যখম বিগড়ে যাওয়ার ফলেই ওর জ্বর হয়েছে। নিয়মিত তিনি ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতেন। এগার দিনে জ্বর সারলে সামনে খানা দেখে ক্ষিধে অনুভব করল সে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে এল সোহেলের অবস্থাও। তবে এত দুর্বল ছিল ও, হাঁটতে গেলেই পা কাঁপতো।

হাসানের অসুস্থতার সময় এক মুহূর্তের জন্যও ওকে অপরিচিত ভাবতে দেননি কোব্বাদ এবং মাহবানু। দিনে তিন চারবার ওকে দেখতে আসতেন তারা। জ্বর আর যন্ত্রণার মাঝেও যখনই ও মাহবানুকে দেখত, ওর চিন্তা ও অনুভূতির সমগ্র দুনিয়া তার মৃদু হাসির গভীরে হারিয়ে যেতো।

প্রথম প্রথম মাহবানুর নীরব দৃষ্টি অজানা আর অদেখা এক পুলকের পয়গাম বয়ে আনত ওর জন্য। কিন্তু এখন এমন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত ভেসে ওঠে তার সামনে– যার জীন্দেগীর সব পথ হারিয়ে গেছে নিদারুণ অন্ধকারে। একাকীত্বে ওর চিন্তা চেতনা ঘুরপাক খায় মাহবানুকে কেন্দ্র করে। কানে বাজতে থাকে ওর মধুর কণ্ঠস্বর। রাতের বেলা ঘন্টার পর ঘন্টা এপাশ ওপাশ করার পর ওর মানসিক দুশ্চিন্তা যখন স্বপ্নের দুনিয়ায় আশ্রয় খুঁজে পায় মাহবানু তখন থাকে ওর সফর সংগী। কিন্তু এসব মধুর চিন্তা আর মনোরম স্বপ্নের গভীরতা যখন ও উপলব্ধি করে– দেখার খাহেশ, চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর পাওয়ার আরজু নিরর্থক মনে হয় ওর কাছে। মানসিক দ্বন্দ্ব চরমে পৌছলে তার শেষ ফয়সালা হয় তার ইচ্ছার প্রতিকূলে। তবু প্রতিটি মুহূর্ত ওর হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকে মাহবানুর মুহাব্বতের জরীন নকশা।

চার

হাসানের অসুস্থতার সময় মাহবানু এবং তার পিতা অধিকাংশ সময় কাটাতেন তার পাশে। ও বাইরের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে শান্তনা দিয়ে বলতেনঃ 'এখন আপনার কোন বিপদ নেই।'

তবুও চঞ্চল হয়ে ও বলতঃ 'হায়! যদি আপনাদের এত তকলীফ না দিতাম। যদি জানতাম আমি আপনাদের মুসীবতের কারণ হবো তবে তুরজের ঘরের দিকে পা বাড়াতাম না কখনোই। জ্বর পড়ে গেলেই আমি চলে যাব এখান থেকে। এখন যখমে তেমন ব্যথা নেই। ব্যথা ও জ্বর কমে যাচ্ছে। যদি আমায় একা যেতে হয় সোহেলের হিফাজতের জিম্মা থাকবে আপনাদের ওপর। খুব জলদিই ফিরে আসব আমি। যদি দেখি আমি এলে আপনারা বিপদে পড়বেন, সোহেলকে বের করার অন্য কোন ব্যবস্থা করব।'

কিন্তু যখনি ও চাইত সোহেলের দিকে, সব সংকল্পই টলে যেত তার। হাসান গ্রেফতার হলে কি বিপদ আসবে, বুঝত সোহেল। সে জানত, আরো কয়েক দিনেও সফরের উপযুক্ত হবে না সে।

হাসানকে সুস্থ হতে দেখে ও বললঃ 'এখন শুধু আমার জন্য এখানে থাকা উচিত নয় আপনার। তুরজের লোকেরা এখানে এলেও আমায় ওরা হত্যা করবে না। কিন্তু আপনার ব্যাপার আলাদা। ওরা আপনাকে হত্যা করলে একদিনও আমি বাঁচব না।'

কখনো ও কাঁদো কাঁদো ভংগীতে, কখনো অনুচ্চ আওয়াজে অশ্রু ঝরিয়ে হাসানকে বাধ্য করতে চাইত ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার ওয়াদা করতে, কিন্তু হাসান

বুঝত, এটা কিছুতেই হবার নয়।

একদিন ভোরবেলা। কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে ফিরে এসেছে হাসান। গোপন কক্ষের কাছে পৌছতেই ওর কানে ভেসে এল মাহবানু আর সোহেলের আওয়াজ। থমকে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে লাগল সে। মাহবানু বলছেঃ 'দেখো সোহেল, তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে তোমার ভাই যাবেন না। এখানে সোহেলের কোন বিপদ নেই, এ কথা হাজার বার বললেও তিনি শান্তনা পাবেন না।'

ঃ 'কিন্তু আপনি তো তাকে বুঝাতে পারেন। আপনি যদি শুধু এদ্দুর বলেন, তার যাওয়ার মধ্যেই আমাদের সবার কল্যাণ, নিশ্চয় তিনি বুঝবেন।'

ঃ 'আমার ভয় হয় তিনি আবার না ভাবেন, আমাদের বাঁচার কথাই আমরা ভাবছি।'

সোহেল বললঃ 'ভাইজান আপনার ব্যাপারে এমনটি ভাববেন না। কিন্তু একথা তার কাছে গোপন করা আপনার উচিত নয় যে, গতকাল সন্ধ্যায় তুরজের লোকেরা এ গাঁয়ে এসে গোলামদের কাছে ভাইজানের কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। আমার বিশ্বাস, বারবার ওরা এখানে আসবে। ভাইজান এখানে আছে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ হলে সুড়ং পথে বেরুবার মওকাও ওরা দেবে না।'

ঃ 'হায়! তিনি যদি নিজের জীবনের কোন গুরুত্ব দিতেন! তুমি সুস্থ হয়ে গেলে তাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতাম। তিনি আমাকে কি ভাববেন এ পরোয়া করতাম না।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। এরপর মৃদু কান্নার সাথে ভেসে এল সোহেলের আওয়াজঃ 'হায়, যদি আমি মরে যেতাম।'

ঃ 'ছি! এমন কথা বলো না। তোমার জীবন তোমার ভাইয়ের কাছে কতটা প্রিয় তা কি তুমি বোঝ না? আমিও তোমাকে আমার ভাইয়ের মতই মনে করি। ওয়াদা করছি, তাকে বুঝানোর চেষ্টা আমি করব। তিনি তো এখনো এলেন না। এতক্ষণ বাইরে থাকা তার উচিত নয়। গোলাম পাঠিয়ে ওর খবর নিচ্ছি আমি।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে সংকীর্ণ সুড়ং পথে মাথা বের করে হাসান বললঃ 'গোলাম পাঠানোর দরকার নেই, আমি এসে গেছি।'

মাহবানু চলে যাচ্ছিল, ফিরে ওর দিকে চাইল। গোপন কক্ষে ঢুকে রশি খুলে সুড়ং পথ বন্ধ করে দিল হাসান। মাহবানুর দিকে ফিরে বললঃ 'আমি অবাক হচ্ছি কিভাবে এতগুলো দিন এখানে কাটিয়ে দিলাম। আমাকে বাইরে যেতে দেখে এক গোলাম বলল, সুড়ংয়ের মুখ থেকে যেন বেশী দূরে না যাই। তার পেরেশানীর কোন কারণ আমাকে বলেনি। তার কথায় বুঝেছি, এখানে বেশীদিন থাকা আমার জন্য বিপজ্জনক।'

পেরেশান হয়ে মাহবানু ওর দিকে তাকিয়ে রইল। নেমে এল বিবর্ণ নীরবতা।

নীরবতা ভেংগে সোহেল বললঃ 'ভাইজান! গোলামের পেরেশানীর কারণ আমি বলতে পারি। কাল সন্ধ্যায় তুরজের লোকেরা এ গাঁয়ে এসেছিল। খোদার দিকে চেয়ে এখান থেকে আপনি পালিয়ে যান।'

মাহবানুকে বলল হাসানঃ 'তুরজের লোকেরা এখানে আসলো অথচ আপনি আমায় তা বলেননি কেন?'

ঃ 'ওরা ঘরে ঢুকতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে সাবধান করতাম। আমাদের গোলামরাই ওদের সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

ভ্রূ-কুঁচকে মাহবানুর দিকে চাইল হাসান। বললঃ 'আপনারা পেরেশান হবেন না। আগামীকাল রাতেই আমি রওয়ানা হয়ে যাব। এর মানে এই নয় যে, আগামী দিন পর্যন্ত আমি অবস্থান করতে চাই। বিপদ এলে যে কোন সময় বেরিয়ে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত।'

বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মাহবানুঃ 'আফসোস! অবস্থা যদি এমন হতো, চলে যাওয়া থেকে আমরা আপনাকে বিরত রাখতে পারতাম! আমি বুঝি, এ পরিস্থিতিতে সোহেলকে ছেড়ে যাওয়া আপনার জন্য কতখানি কষ্টের। কিন্তু এতটুকু শান্তনা আপনাকে দিতে পারি, এ ঘরের প্রাচীর যতক্ষণ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার ভায়ের একটা পশমও কেউ বাঁকা করতে পারবে না।'

নিশুতি রাত। হাসানকে ঝাঁকুনি দিয়ে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল মাহবানু। ভয় পেয়ে চোখ খুলেই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল হাসান। অনুচ্চ কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'ওরা এসে গেছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আপনি জলদি তৈরী হয়ে নিন। ওরা কেন এসেছে, আব্বাজান তা জানতে গেছেন। আমায় বলে গেছেন সুড়ং পথে আপনাকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে।'

হাসান বিমূঢ়ের মত তার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'ওরা এখন এসে থাকলে ওদের নিয়ত ভাল নয়। আমার তলোয়ার কোথায়?'

ঃ 'আপনার সব জিনিসপত্র বাইরে গোলামের কাছে। একটা শিরস্ত্রাণও আব্বাজান আপনার জন্য বাইরে পাঠিয়েছেন।'

জুতা পড়ে জলদি সুড়ং পথ খুলতে লাগল হাসান। প্রদীপ তুলে নিল মাহবানু। চকিতে চোখাচোখি হল পরস্পরের। দু'জনের দৃষ্টিই আটকে রইল সোহেলের ওপর। নাক ডাকার মৃদু শব্দ আসছিল ওর। অশ্রু ভেজা চোখে মাহবানু বললঃ 'ওকে জাগিয়ে দেব?'

ঃ 'না।'

বেরোবার সময় সোহেলের কপালে চুমো খেল হাসান। মাহবানুর হাত থেকে প্রদীপ নিয়ে ঢুকল সুড়ং মুখে।

ঃ 'এখন আমার সাথে আসার দরকার নেই আপনার। ফিরে গিয়ে সুড়ং পথের দরজা বন্ধ করে দিন। সোহেল জেগে উঠলে ওকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করবেন।'

ঃ 'আমাদের নিয়ে ভাববেন না। হাবেলীর ফটক এত মজবুত যে ওরা হামলা করলেও আমাদের গোলামরা কমপক্ষে ভোর পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। আমি বেরিয়ে বালাখানার গরাদে আব্বাজানের ইশারার অপেক্ষা করব। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে হলে তিনি গরাদে প্রদীপ রেখে দেবেন। অথবা একটু পরই কোন গোলাম আমাদের কাছে পৌছবে।'

হাসান হাঁটা দিল কিছু না বলেই। সুড়ংয়ের প্রান্তে পৌছে জ্বলন্ত প্রদীপ নীচে রেখে দিল ও। বুক কাঁপছিল তার। ভাষা ছিল নীরব। দৃষ্টিতে ছিল পিপাসার্ত আত্মার ফরিয়াদ। নিজের অজান্তেই হাত ধরল একে অপরের। উচ্ছ্বাসের আকাশ নীলিমায় বিচরণ করলো ওরা মুহূর্তকাল। আচানক একে অপরের হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিষণ্ণ বেদনায় ভরে গেল হৃদয়ের দুটো গোলাপ ঝাড়।

ঃ 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।' বলল হাসান। 'গোলামকে জাগিয়ে এক্ষুণি আমি ফিরে আসছি।'

ঃ আমার মনে হয় জেগেই আছে গোলাম।'

ঃ 'তবুও ওকে হুশিয়ার করা জরুরী।'

চলে গেল হাসান। খানিক পর ফিরে এল সৈনিকের বেশে। মাহবানুর কাছে এসে বললঃ 'আপনার কথাই ঠিক। আপনার গোলামকে জাগাতে হয়নি।'

ঃ 'ও একা নয়। বনে পাহারা দিচ্ছে আরো একজন। দুজনই জানে, ওদের মধ্যে কেউ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে না জাগিয়ে কোতল করে দেয়া হবে। এ হুকুম আব্বাজানের।'

চুপচাপ কেটে গেল আরো কিছু সময়। নীরবতা ভাঙলো মাহবানুঃ 'আশ্চর্য, যতোক্ষণ সফরের জন্য আপনি তৈরি হননি, আপনি যেন চলে যান এ দোয়াই আমি করেছি। হামেশাই আমার ভয় ছিল, আপনার জীবন বিপদের মুখোমুখি। কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে বড় খায়েশ, হায়! আপনি যদি আর একটি দিন অন্তত অবস্থান করতেন।'

ঃ 'এখান থেকে বিদায় নেয়া আমারও জিন্দেগীর এক চরম পরীক্ষা।'

ঃ 'আমি জানি, সোহেল আপনার কত প্রিয়। যদি ও আপনাকে সঙ্গ দিতে পারত!'

ঃ 'সোহেল আমার সাথে থাকলেও, বিদায়ের মুহূর্তে একই অনুভূতি হত আমার। আপনার গোলাম আচানক আমায় জাগিয়ে বেরিয়ে যেতে বলবে, আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সুযোগও আমি পাব না, এ ভাবনা ছিল আমার পেরেশানীর কারণ। আমি ভাবতাম, বিদায়ের মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্যে আপনার সামনে মুখ খোলার সুযোগ পেলে সেই কথাই বলব, গোটা জীবন এখানে কাটিয়ে দিলেও যা আমার মুখে আসত না।

কিন্তু এখন আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কিছু বলার চেষ্টা করা উপহাস বলেই মনে হবে হয়তো। মাহবানু! আমি শুধু আপনাকে একটা কথাই বলতে পারি, আমাদের মাঝে যখন থাকবে অসংখ্য পাহাড় আর ময়দানের দুস্তর ব্যবধান, আমার জীবনে এমন কোন মুহূর্ত আসবে না যা আপনার কল্পনা ছাড়া থাকবে। প্রহরের পর প্রহর কল্পনায় আপনার সাথে কথা বলব আমি।'

ঃ 'মনে করুন আমি এখানে নেই।' বলে মুচকি হাসল মাহবানু।

আচানক দুশ্চিন্তার মেঘ ছেয়ে গেলে তার চেহারায়। উজ্জ্বল চোখ দুটো ভরে এল অশ্রুতে। নীরবে হাসান তাকিয়ে রইল মাহবানুর দিকে। বললঃ 'সোহেলের জন্য আবার আমায় আসতে হবে। সোহেল এখানে না থাকলেও আপনাকে দেখার ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষা হতো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। আমি এক গরীব, নিঃস্ব আর অসহায় ইনসান। আমার ভবিষ্যতের সব পথ ভয়াল মরুর প্রশস্ততায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু যদি আমি হতাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্রাট, মাদায়েন আর কনষ্টান্টিনোপলের মত সুন্দর শহরগুলোতে আমার জন্য তৈরী করা হতো সোনা চাঁদির মহল, তবুও এখানে অবস্থানের এ কয়টা মুহূর্তই হতো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

হাসানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মাহবানুর হৃদয়ের গভীরে গেঁথে গেল। অকস্মাৎ ভেংগে গেল ওদের মাঝে বাঁধার সব প্রাচীর। কাঁপা আওয়াজে ও বললঃ 'আপনি জানেন, আপনার মোকাবিলায় যদি কোন শাহানশাহ দাঁড়ায় আমার সামনে আর আমায় জিজ্ঞেস করে সোনা চান্দির মহল অথবা এক অসহায় নিঃস্বের সাথে মরু বিয়াবানে অনিশ্চিত জিন্দেগী যাপন এর কোনটা তুমি পছন্দ করবে– নির্দ্বিধায় শেষেরটাই আমি কবুল করবো। আর বলবো, এ সেই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে যাকে আমি পছন্দ করি। তার হৃদয়ে যদি আমার জন্য এতটুকু জায়গা হয়, মরুর মাটিকে সোনার তৈরী মহলের উপর প্রাধান্য দেব আমি। কিন্তু আমরা দু'জন একই রকম অসহায়, মজবুর। যদিও আমাদের পরস্পরকে জানার আর বুঝার মওকা মিলেছে, তা এক দুর্ঘটনা।

ঃ 'আমি শুধু চাইছিলাম আপনি আমায় ভুলে যাবেন না।'

ঃ 'আপনি জানেন, আপনাকে ভুলতে আমি পারবো না। হামেশা আমি আপনারই প্রতীক্ষায় থাকব।'

মাটির দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল মাহবানু। সে চুপ করলে নীরবতা ছেয়ে গেল গোটা অরণ্যে।

হাসান বললঃ 'অনেক দেরী হয়ে গেল। হায়, যদি জানতে পারতাম আপনাদের ঘরের দরজায় এখন কি হচ্ছে। আপনার আব্বাজান এখানে কোন সংবাদ পাঠাচ্ছেন না কেন?'

ঃ 'কোন বিপদ দেখলে অবশ্যই তিনি সংবাদ দিতেন। তখনই এমন সংবাদ আমি পাব আব্বাজান যখন বাড়ীতে হামলার আশংকা করবেন। পেরেশান হবেন না।

আমার বিশ্বাস পালিয়ে যাবার মওকা আপনি পাবেন।'

ঃ 'এমন হলে পালাতে পছন্দ করব না আমি। শুধু এ শান্তনা নিয়েই এখান থেকে যেতে পারি যে, এ ঘরের হিফাজতের জন্য আমার আর দরকার নেই। আপনি ফিরে যান। আমি দেখতে চাই দেউড়িতে কি হচ্ছে।'

ঃ 'না, না।' তার হাত ধরে বলল মাহবানুঃ 'ওদিকে যেতে পারবেন না আপনি। কিছুক্ষণের মধ্যে সংবাদ না এলে গোলাম পাঠিয়ে খবর নেব। আপনার বাহাদুরীতে আমার সন্দেহ নেই। তবুও সোহেলের কথা আপনার খেয়াল থাকা উচিত।'

হাসান কিছু বলতে চাইল, কিন্তু ঠোঁটে আংগুল রেখে তাকে চুপ করিয়ে দিল মাহবানু। বৃক্ষের পেছনে শোনা গেল কারো পায়ের আওয়াজ। তীর ধনুতে গাঁথল হাসান। হাঁটু গেড়ে চাইতে লাগল গাছের পেছন দিকটায়। আগন্তুককে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে পিছু হটে মাহবানুকে বললঃ 'ও কাউস, সম্ভবত আমাদের খুঁজছে। ওর চলার গতিতে মনে হচ্ছে, বিপদ কেটে গেছে।'

অনুচ্চ কণ্ঠে মাহবানুকে ডাকলঃ 'কাউস।'

ওরা দুজনই বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।

ঃ 'সুড়ংয়ের কাছে থাকার কথা ছিল আপনাদের। কিন্তু আপনারা কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন।' অনুযোগের সুরে বলল কাউস।

মাহবানু বললঃ 'তুমি বলতে চাইছ, পাহারাদার এমনি আমাদের পেরেশান করেছে?'

ঃ 'ওরা দরজার বাইরে শুনেছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভেবেছে ওরা তুরজের লোক। দরজা খুলতে বলায় জবাব দেয়ার পরিবর্তে পাহারাদার অন্য গোলামদের জাগানো জরুরী মনে করেছে। আমিও আহাম্মকের মত কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই মুনীবকে জাগাতে ছুটে গেলাম। মুনীব গোস্বা ভরে যখন দরজায় পৌছলেন, দেখলাম ওরা মাদায়েনের সিপাহী। আপনার ভাইয়ের সাথে এসেছে।'

ঃ 'ভাইজান এসেছেন?' দীলে আনন্দের স্পন্দন অনুভব করল মাহবানু।

ঃ 'না, তিনি কাল আসবেন। হরমুজের নামে কোন এক বড়লোকের চিঠি এনেছেন তিনি। নদী পেরিয়ে তিনি শোনলেন হরমুজ এ এলাকা সফর করছেন, আজ গিয়েছেন তুরজের গাঁয়ে। বাড়ী না এসে তাই তিনি সোজা চলে গেছেন ওখানে। মিয়ানদাদ যে চিঠি বয়ে এনেছে তাই পড়ে হরমুজ তাকে আজ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ফৌজের আরো দু'জন লোক এসেছে মিয়ানদাদের সাথে। ওরা এ এলাকার বাসিন্দা। এখান থেকে এক মঞ্জিল দূরে ওদের গ্রাম। নিজের কাছে না রেখে ওদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে মিয়ানদাদ। তারা বলেছে, প্রথম আপনার ভাইয়ের সাথে অহংকার দেখিয়েছেন হরমুজ। কিন্তু সিপাহসালারের চিঠি পড়তেই আচানক বদলে গেছে তা।'

ঃ 'ওরা কি চল গেছে?'

ঃ 'কে, সিপাইরা? না, ভোর পর্যন্ত ওরা এখানেই থাকবে। পথ ভুলে আমাদের বাড়ী ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা। অনেক নাকানি চুবানি খেয়ে এখানে পৌঁছেছে। ওরা এত পরিশ্রান্ত, মুনীবের সাথে কথা বলার সময় ঘুমে ঢুলছিল।'

হাসানের দিকে চাইল মাহবানু। বললঃ 'চলুন।'

ঃ 'আমার মনে হয় আমি চলে গেলেই ভাল হয়।'

ঃ 'না, না, আপনি এখন যেতে পারবেন না।'

কাউস বললঃ 'আপনাকে ডাকতে মুনীব আমায় পাঠিয়ে দিলেন। মিয়ানদাদের সাথে দেখা করে যেতে বলেছেন তিনি। ও কালই এখানে পৌঁছবে।'

হাসান বিমূঢ়ের মত তাকাল মাহবানুর দিকে। কোন দ্বিধা ছাড়াই মাহবানু কাউসকে লক্ষ্য করে বললঃ 'ইনি আজ যাবেন না। ঘোড়া নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের বল ওর জন্য আর অপেক্ষা না করতে।'

ঃ 'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি তো সুড়ং পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।'

ঃ 'আমি বাইরে থেকে দেউড়ির দরজা খুলে নেব।'

চলে গেল কাউস।

ঃ 'আসুন।' বলল মাহবানু।

চুপচাপ হাসান তার অনুসরণ করল। খানিক পর ওরা প্রবেশ করল সুড়ংয়ে। দরজা বন্ধ করে প্রদীপের আলোয় হাসানের দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'তখন সত্যি আপনি যেতে চাইছিলেন?'

ঃ 'না।' মাথা তুলে জবাব দিল হাসান। 'তা আমার মনের কথা ছিল না। আমি আরেক পরীক্ষা থেকে বাঁচতে চাইছিলাম।'

ঃ 'কাল হয়ত আপনাকে বিদায় দেয়ার সুযোগ আমার হবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এটাই আমাদের শেষ মোলাকাত নয়। যেদিন আপনি আপনার গাঁয়ে রওয়ানা করছিলেন, আব্বাজান ছিলেন দারুণ পেরেশান। গাঁয়ের ব্যাপারে আপনাকে আমি সাবধান করিনি। বারবার আব্বাজান বলেছেন, সম্ভবত এ নওজোয়ানকে আর কখনো দেখব না। সেদিনও আমার মন বলছিল, অবশ্যই আপনি ফিরে আসবেন। আমি জানতাম গ্রামে গিয়ে আপনি কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তবুও চিরদিনের জন্য আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, এ আমি ভাবতেই পারিনি।'

ঃ 'সেদিন যদি আমার বিধ্বস্ত গাঁ দেখে তুরজের গাঁয়ের পথ না ধরতাম, আর তুরজকে হত্যা করে এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য না হতাম, তাহলে সম্ভবত আমার ব্যাপারে চিন্তা করা ও জরুরী মনে করতে না। মাহবানু, তোমার চোখে যদি উছলে ওঠা অশ্রু না দেখতাম, আমার জিন্দেগীর এক মুহূর্তও তোমার স্মরণ থেকে খালি থাকবে না একথা বলার সাহস আমার কোন দিনই হতো না। কিন্তু আমি ভয় পাই, কয়েক

অথবা কয়েকটি বছর পর অতীত নিয়ে যখন ভাববে, এ ঘটনাগুলো উপহাস বলেই হয়তো মনে হবে তোমার কাছে।'

ঃ 'না, না।' প্রতিবাদী কণ্ঠে বলল মাহবানু। 'এমনটি কখনোই হবে না।' বলেই তার কম্পিত হাতে হাসানের কাঁধ চেপে ধরলো।

ঃ 'মাহবানু! আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল হাসান। 'হায়, যদি তোমার মন এত নরম না হতো আর আমাকে এ অনুভূতি দিতে যে, আমি এক কৃষকের বেটা, যার জীবনের সকল রাস্তা বিরান ভূমিতে বিলীন হয়ে গেছে। তবু তোমার স্মরণেই আবাদ থাকতো আমার এ হৃদয় ভূমি। বলতে দ্বিধা নেই, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু আমার এ ভালবাসা হবে চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শূন্য।'

ঃ 'ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি নিরাশ নই।'

ঃ 'মাহবানু! কোব্বাদের বেটি তুমি। তোমার ভবিষ্যত মরু বিয়াবানের ঝুঁপড়িতে নয় বরং সুরম্য শহরের মর্মরের প্রাসাদের দিকেই যাবে।'

ঃ 'ভবিষ্যত বলতে আমি দু'জনার ভবিষ্যতকেই বুঝিয়েছি হাসান।'

ঃ 'না না।' ধরা গলায় বলল হাসান, 'আমার বদনসীব জীবনের অংশীদার তোমায় করব না।'

উদাসীনতায় ভরে গেল মাহবানুর দুনিয়া। হাসানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। তাদের গভীর নিঃশ্বাস আর দীলের স্পন্দন ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ ছিল না সুড়ংয়ে। এক সময় নীরবতা ভেঙ্গে বলল হাসানঃ 'মাহবানু! যদি তুমি কোব্বাদের বেটি আর জাহাদাদের বোন না হতে, আর আমার দীলে না থাকতো কৃতজ্ঞতার এ অনুভূতি, তবুও আমি বলতাম, ভিন্ন পথে চলার জন্যই আমাদের জন্ম হয়েছে।'

ঃ 'আপনার কি মনে হয়, আমাদের জিন্দেগীতে এমন কোন মুহূর্ত আসবে যখন পরস্পরের সান্নিধ্যের প্রয়োজন অনুভব করব না আমরা?'

কাতরভাবে হাসান চাইল মাহবানুর দিকে। দীলের গভীরে এতক্ষণ যে আবেগকে লুকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল ও, বেরিয়ে এল তা সয়লাব হয়ে। কাঁপা আওয়াজে ও বললঃ 'মাহবানু! আমার এ কথা বলাই কি যথেষ্ট নয়, তোমায় আমি ভালবাসি। যদি এমন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তোমার সাথে সুড়ংয়ের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতেই আমার জিন্দেগীর সফর খতম হয়ে যাবে, আর অপর পক্ষে এর বাইরে অনন্তকাল বেঁচে থাকব আমি তবে তোমার কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্যকেই সে অনন্ত জীবনের উপর প্রাধান্য দেব আমি।'

নরম ক'টি আঙ্গুলে তাড়াতাড়ি ওর ঠোঁট চেপে মাহবানু বললঃ 'এর বেশী বলার দরকার নেই তোমার। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, কোন দিন কোব্বাদের বেটি আর জাহাদাদের বোনকে উপহাস করবে না। তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করব আমি।

তুমি হামেশা আমার ছিলে, আমার আছো এ অনুভূতি নিয়েই তোমার প্রতীক্ষা করব। এক বাহাদুর আর শরীফ ব্যক্তি আমায় ভালবাসে, এ আমার গর্ব ও অহংকার। এ অহংকার নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই আমি।'

ওর নরোম আঙ্গুল ঠোঁটে ছোঁয়াল হাসান। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নীরব ও নির্বাক হয়ে। আবেগ মথিত কণ্ঠে বললঃ 'মাহবানু! আমার ধারণা ছিল দীলকে আমি ধোকা দিচ্ছি। কিন্তু যদি আমার মত নিঃস্ব ব্যক্তির ভালবাসার পুরস্কার ভালবাসা হয়, তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি, দুনিয়ার কোন পাহাড়, সাগর, মরুভূমি আর ধুসর প্রান্তর আমাদের মাঝে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না।'

মাহবানুর ঠোঁটে ফুটে উঠল হৃদয় চেরা সেই হাসি। আনন্দের অশ্রু ভর করলো ডাগর দুটি হরিণ চোখে। নিচু হয়ে প্রদীপ হাতে নিয়ে বললঃ 'চলো।'

নীরবে এগিয়ে গেল দু'জন। বাকী পথ কেউ কোন কথা বলল না। কোন কথার আর দরকারও ছিল না। গোপন কক্ষে প্রবেশ করল ওরা। সোহেল তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। সুড়ংয়ের মুখ বন্ধ করে দিল হাসান। চেরাগ রেখে মাহবানু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল আবার। তারপর মৃদু হাসির ঝিলিক তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল কামরা থেকে। আর সে হাসির ছটা নিয়েই বিছানার দিকে এগিয়ে গেল হাসান।

ঘুম থেকে জেগে উঠল হাসান। দেখল সোহেল তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ঃ 'ভাইজান, আমার জ্বর পড়ে গেছে।' বলল সোহেল।

স্নেহভরা দৃষ্টিতে অনুজের দিকে তাকাল সে। দু'হাত প্রসারিত করল সামনের দিকে। সোহেল ঝাঁপিয়ে পড়ল হাসানের কোলে। ওকে বুকের সাথে চেপে ধরে হাসান বললঃ 'সোহেল, আজ রাতেই আমি এখান থেকে রওনা করব। এবার সম্ভবত আমার পরিকল্পনা আর পরিবর্তন করতে হবে না।'

ঃ 'আমি জানি, আপা আমায় বলেছেন। আবার আমার জ্বর না এলে আপনি অবশ্যই রওয়ানা করবেন। আমার বিশ্বাস, আর জ্বর আসবে না।'

ঃ 'ও এসেছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ। ভাইজান, তার সাথে তার ভাইও ছিল। আপনি তখন ঘুমিয়ে। আমি আপনাকে জাগাতে চাইলাম। কিন্তু ওনারা নিষেধ করলেন। ওনার ভাই বললেন, একটু পর আবার আসবো। আজ অনেক ঘুমিয়েছেন আপনি। তুরজ কিভাবে নিহত হল উনি তা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি সব ঘটনা বলে দিয়েছি, এতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। মাহবানু আপার মত তিনিও আমায় শান্তনা দিয়ে বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে এখানে আমার কোন বিপদ নেই। তিনি বিলকুল বোনের মত।'

কারো পায়ের আওয়াজ পেয়ে সোহেল কাত হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাল।

হাসানও দৃষ্টি ফেরাল সেদিকে। মিয়ানদাদ কামরায় ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল হাসান। করমর্দনের জন্য অসংকোচে হাত এগিয়ে দিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমি মিয়ানদাদ। আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পর অনেকটাই পরিচিত। জাহাদাদের দোস্তের স্থান বড় ভাইয়ের চেয়ে কম নয়।'

ঃ 'বসুন।' বলল হাসান।

সোহেলের বিছানায় বসল মিয়ানদাদ। হাসান ও সোহেল বসল সামনের বিছানায়। মিয়ানদাদ ছিল সুদর্শন নওজোয়ান। তার চেহারায় প্রথম দৃষ্টি দিয়েই হাসান অনুভব করল দূরে কোথাও দেখা হলেও সে অনুভব করত, এ জাহাদাদের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়।

ঃ 'আপনার কথা শুনেই আমি এখানে এসেছি।' বলল মিয়ানদাদ। 'আপনি তখন ঘুমিয়েছিলেন। আমার বোন বলেছে সারা রাত যথেষ্ট কষ্টে কেটেছে আপনার, তাই আপনাকে জাগানো ভাল মনে করিনি। আপনি নাস্তা সেরে নিন। ততোক্ষণে আমি গ্রামে একটা চক্কর দিয়ে আসি। ফিরে এসে সারাদিন ভাইজান সম্পর্কে আলাপ করব। মাদায়েনের কতক লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যুদ্ধের সময় যারা ভাইজানের সাথে ছিলেন। আরমিয়ার যুদ্ধের পরে ভাইজানের কি হয়েছে আমার এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারেনি। ভাইজানের এক আরব দোস্তের বাহাদুরীরও প্রশংসা তারা করেছে। কিন্তু আরমিয়ার যুদ্ধের পর কোথায় গায়েব হয়ে গেছেন তারা সে কথা কেউ বলতে পারেনি। এখন আপনি যখন এসে গেছেন, আপনার মুখেই সব ঘটনা শুনতে চাই। আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

উঠতে চাইল মিয়ানদাদ। হাতের ইশারায় তাকে বসিয়ে হাসান বললঃ 'বসুন, হরমুজ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন, একথা আপনি আমায় বলেননি। গতরাতে আমার দেরীতে শোয়ার এক কারণ ছিল এই দুশ্চিন্তা যে, আপনি এক জালেমের মেহমান।'

ঃ 'হরমুজ এখন আমাদের ওপর হাত তুলতে সাহস করবে না। সিপাহসালারের চিঠি শাহী ফরমানের চেয়ে তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

ঃ 'তার কাজে কোন পরিবর্তন আসবে এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?'

ঃ 'আব্বাজান আদৌ তাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমান সিপাহসালার পরিবর্তন না হলে আমাদের ওপর হাত তুলতে সে সাহস করবে না। ততোক্ষণই হরমুজ আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে, যতক্ষণ সে ভাবত মাদায়েনের উপর তবকা পর্যন্ত আমাদের ফরিয়াদ পৌছবে না। কিন্তু মাদায়েনে শাহানশাহের মুহাফিজ ফৌজের সিপাহসালার আব্বাজানকে বড়ো ভাইয়ের মত মনে করেন। আব্বাজানের চিঠি পেয়েই তিনি আমাকে তার এক দোস্তের কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি আরমিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইজানকে তিনি ভালভাবে চিনতেন। এ

দু'জন আমাকে নিয়ে গেলেন সিপাহসালারের কাছে। সিপাহসালার হরমুজের নামে চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে বললেন, স্বাভাবিক অবস্থায় হরমুজের কাছে আমি এমন চিঠি লিখতাম না। তার মত অহংকারী আর বদমেজাজী সর্দার ইরানে আর নেই। কিন্তু হরমুজের এলাকা মিশেছে আরব সীমান্তে। ওখানে রয়েছে এমন এক বিপ্লবের সম্ভাবনা যার প্রতিক্রিয়া ফোরাতের শস্য শ্যামল ভূমি পর্যন্ত পৌছতে পারে। এ কথা অজানা নয় যে, আরবরা রোম সালতানাতের সীমান্তে সফল হামলা করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং তাকে পরামর্শ দিয়েছি, বর্তমান অবস্থায় ঐসব লোকদের সহযোগিতা লাভ করতে হবে বিপদের মুহূর্তে যারা কাজে আসবে। আমি তোমার ভাইয়ের খিদমতেরও উল্লেখ করেছি। ইশারায় তাকে আরো বুঝানোর চেষ্টা করেছি, মাদায়েনের যেসব প্রভাবশালী বিশেষ করে ফৌজি অফিসার রোমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন, জাহাদাদের পিতার প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার ওরা বরদাশত করবেন না। হয়তো আমার এ চিঠিতে কিছুটা নমনীয় হবে সে। কিন্তু যদি দেখো তার ব্যবহারে কোন পরিবর্তন আসেনি, তবে তার সংগে সংঘর্ষে না গিয়ে তোমার পিতাকে মাদায়েনে নিয়ে আসবে।

মাদায়েন থেকে রওয়ানা করার সময় ভেবেছি, সিপাহসালারের চিঠি হরমুজের মত বদমেজাজী ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত শাহী মহলের দরজার কড়া নাড়ার উপযুক্ত আমি না হব, আমি থাকব এমনি পেরেশানে। কিন্তু চিঠি পড়ে মাদায়েনে কতজন ওমরা আমার পক্ষে জানার জন্য সে ছিল বেকারার। কিন্তু কাদের মাধ্যমে আমি সিপাহসালার পর্যন্ত পৌছেছি তা তাকে বলিনি। কারণ আমি জানি, দু'একজনকে ফৌজ থেকে বের করে দেয়া তার জন্য অসম্ভব নয়। সে আমায় আরো জিজ্ঞেস করেছে, সিপাহসালারের কাছে না গিয়ে সরাসরি এখানে আসনি কেন? জবাব দিয়েছি, আমি আপনাকে ভয় পাই।'

ঃ 'তুমি কি আমায় জালেম মনে করো?'

ঃ 'আপনাকে জালেম মনে করলে সিপাহসালারের চিঠি নিয়ে আপনার কাছে আসতাম না। কিন্তু আমার ভয় ছিল, হয়তো আপনার কাছে পৌছতে পারব না।'

ঃ 'তার কাছ থেকে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছেন এজন্য আমি খুশী হয়েছি।' বলল হাসান।

ঃ 'আমার শুধু এতটুকু প্রশান্তি, আব্বাজান আরো ক'দিন এখানে আরামেই থাকতে পারবেন। কিন্তু আমি মনে করি না হরমুজের মত ব্যক্তি তার খাসলত বদলাবে। আমি শুধু এর মাঝে ফৌজে তরক্কী করার সুযোগ চাই। এরপর মাদায়েনে কোন ভাল বাড়ী করার ব্যবস্থা করতে পারলে এদেরও সাথে নিয়ে যাব। এ মুহূর্তে হরমুজের দুশমন হয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ গোপনে পালাবার চেষ্টা করলেও কিসরা সালতানাতের কোন স্থানই আমাদের জন্য নিরাপদ হবে না।

এখানে এসে যখন শোনলাম আপনি তুরজকে হত্যা করেছেন, আর আপনার

ছোট ভাইকে নিয়ে আরো ক'দিন এখানে আপনার থাকা প্রয়োজন, ভাবছি এ অবস্থায় হরমুজের সাথে তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওদের লোকেরা আর আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি দেবে না। আমি আরো এক সপ্তাহ বাড়ী থাকব। তবে সামনের মাসে দু'চার দিনের জন্য আর একবার আসার চেষ্টা করব। এর মধ্যে আপনি ফিরে এসে সোহেলকে নিতে না পারলে অথবা এখানে ওর কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে আমি ওকে মাদায়েন নিয়ে যাব। ওখানে ও সামরিক প্রশিক্ষণেরও সুযোগ পাবে। বড়ো হয়ে ও যেন সেনাবাহিনীর বড় অফিসার হতে পারে সেভাবেই ওকে গড়ে তুলতে হবে। কোনদিন আপনিও হয়তো অনুবভ করবেন মাদায়েনের অবস্থা আপনার প্রতিকূলে নয়।'

ঃ 'সোহেল সফর করতে পারলে আমি আপনাকে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই একা যেতে হচ্ছে আমায়। অবশ্য আপনার সাথে মোলাকাতের পর ওর ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি।'

ঃ 'নিকৃষ্টতম দুশমনের সাথে সমঝোতা করেছি বলে আব্বাজান খুব নারাজ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি আপনাকে ডাকলে তাকে একটু বুঝানোর চেষ্টা করবেন।'

মিয়ানদাদ বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। খানিক পর হাসান, কোব্বাদ এবং মিয়ানদাদ খেতে বসল একত্রে। দুর্বলতার কারণে উপরে আসতে পারেনি সোহেল, তার খানা পাঠিয়ে দেয়া হল নিচে। সে যেন মন খারাপ না করে সে জন্য নিচে গেল মাহবানু।

কোব্বাদের চেহারায় এই প্রথমবার প্রশান্তির ছায়া দেখল হাসান। মাদায়েনে মিয়ানদাদের চেষ্টায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ হরমুজের মত জালেমও নিজের পদ্ধতি পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার আফসোস হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে শাহানশাহের দরবারে আওয়াজ তোলার পরিবর্তে এক উপদেশমূলক চিঠিতেই ও সন্তুষ্ট। কথা প্রসঙ্গে মিয়ানদাদ যখন বলল, আগামীতে আমরা সুযোগ না দিলে সে আর বাড়াবাড়ি করবে না, এতে রেগে গিয়ে কোব্বাদ জবাব দিলেনঃ 'মিয়ানদাদ, চিঠি দিয়ে কোন নেকড়ের খাসলত তুমি বদলাতে পারবে না। স্বীকার করি আমরা অসহায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি এবং তার জুলুমের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ না তুলি তাহলে সব বিপদ মুসীবত আমাদের দূর হয়ে যাবে– একথা মানতে আমি রাজি নই। সিপাহসালারের পরামর্শে হরমুজের যে তরবারী কোষবদ্ধ হয়েছে, ক'দিন, ক' সপ্তাহ অথবা ক'মাস পরই তা আবার কোষমুক্ত হবে না এ আমি বিশ্বাস করি না।'

ব্যথিত কণ্ঠে বলল মিয়ানদাদঃ 'আব্বাজান! এরচেয়ে বেশী আমি আর কি করতে পারতাম!'

ঃ 'জানি, এরচেয়ে বেশী কিছু করার ছিল না তোমার। এত জলদি সিপাহসালার পর্যন্ত পৌছতে পারবে এ আশাও আমার ছিল না। তবুও এতেই তোমার নিশ্চিন্ত হও

সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

ঃ 'আব্বাজান, মোটেও নিশ্চিন্ত এবং সন্তুষ্ট নই আমি। কিন্তু হরমুজ আমাদের এলাকার হাকিম। আমাদের অসংখ্য অভিযোগের পরও তার কিছুই আমরা করতে পারছি না, এ তিক্ত অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। আপনি এখানে থাকতে চাইলে একটাই পথ, তার সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া। আর মাদায়েন যেতে চাইলেও এমন কাজ করা ঠিক নয় যাতে সে আমাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কোন অবস্থায়ই তার সাথে লড়াই করতে আমরা পারব না। আমরা এমন এক দেশের বাসিন্দা, যেখানে শক্তিধর সব সময়ই সকল ত্রুটির উর্ধে আর যত অপরাধ সব দুর্বল ও কমজোরদের। এটাই আমাদের দূর্ভাগ্য। মাদায়েনের দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার উপযুক্ত হওয়ার মত সময় ও সুযোগ দিন, আপনাকে আমি নিরাশ করব না।'

হাসানের দিকে ফিরে মিয়ানদাদ বললঃ 'আপনি আমার স্থানে হলে কি করতেন?'

ঃ 'জানি না এ অবস্থায় কি আমি করতাম। তবুও আপনার অপারগতা আমি বুঝি। আমার ধারণা, সমঝোতা ছাড়া আপনার কোন উপায় ছিল না। কমজোর আর অসহায় প্রতিবেশীর রূপ না নিয়ে যদি প্রতাপশালী দুশমনের আক্রোশ থেকে সম্মানজনকভাবে বাঁচতে পারেন, তা হবে আপনার সৌভাগ্য। আপনার ঘর নিরাপদ থাকলে তার অধিবাসীরাও নিরাপদ থাকবে। আমার ভাই আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করতে বাধ্য না হলেও আমি চাইতাম, আপনারা হরমুজের জুলুম থেকে নিরাপদ থাকুন।'

ঃ 'আব্বাজান।' বলল মিয়ানদাদ, 'আপনি কি জানেন, আপনার পক্ষ থেকে সামান্য বিপদের আশংকা থাকলে হরমুজ মাদায়েনে আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ আপনাকে দেবেন না?'

ঃ 'আমি জানি।' বিষণ্ন চিত্তে বললেন কোব্বাদ। 'আমি আরো জানি, যত কিছুই আমি করব, হরমুজের দীল আমার উপর প্রসন্ন হবে না। এর পরও স্বীকার করছি, বর্তমান অবস্থায় এরচেয়ে বেশী কিছু করার তোমার ছিল না। এখন আমি একটু আরাম করতে চাই। গতরাতে তুমি দুই বেকুবকে পাঠিয়ে আমায় এত পেরেশান করেছ, এক মুহূর্তের জন্যও আরামে ঘুমুতে পারিনি।'

কোব্বাদ চলে গেলেন অপর কামরায়। মিয়ানদাদ এবং হাসান অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। নীরবতা ভেংগে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ জন্য যে, বড় পেরেশানী থেকে আমায় বাঁচালেন। এবার মাদায়েনে যেতে এ শান্তনা নিয়ে যেতে পারব, আব্বাজান আমার ওপর রাগ করেননি। আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি মাহবানুর ভাই। যদি আমি আব্বাজানকে বলতাম হরমুজের সাথে আমার দুশমনীর বড়ো কারণ হচ্ছে 'ও' তাহলে তিনি কষ্ট পেতেন।

কোনদিন হয়ত হরমুজের জুলুমের হিসাব আমি নিতে পারব, শুধু এই তার শান্তনা। অথচ তাকে খুশী না করে যদি সত্য কথা বলতে পারতাম, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হতো, আমি কিসরা সালতানাতের সিপাহসালার হলেও হরমুজের গর্দান পর্যন্ত আমার হাত পৌছাতে কষ্ট হতো।'

ঃ 'আমি কিসরার সিপাহসালার হওয়ার স্বপ্ন দেখি না।' বিষণ্ন হেসে বলল হাসান। 'এরপরও আমি অনুভব করছি, আমার ঘরের মত হরমুজের ঘর বিরান না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।'

কামরায় প্রবেশ করলো মাহবানু। ভাইয়ের পাশে বসতে বসতে বললঃ 'আব্বাজান কোথায়?'

ঃ 'তিনি তার কামরায় চলে গেছেন। তার বিশ্রামের প্রয়োজন।' হাসানের দিকে ফিরে বলল, 'এবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কাহিনী শুনতে চাই আমি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। কিন্তু আমার অতীত কাহিনীর গুরুত্ব– আমি ছিলাম জাহাদাদের সফর সঙ্গী.........'

অতীত কাহিনী শুরু করল হাসান, যা কয়েকবারই শুনিয়েছে ও। এ কাহিনী যখন শেষ হলো, মিয়ানদাদ আর মাহবানুর চোখে চিকচিক করছিল অশ্রুবিন্দু।

দিনের বাকী অংশ অনুজের সাথে গোপন কক্ষে কাটাল হাসান। সূর্যাস্তের খানিক পূর্বে মিয়ানদাদও এসে খোশগল্প করে গেল কিছুক্ষণ।

রাত এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। সুড়ংয়ের বাইরে ঘোড়ার লাগাম হাতে মেজবানকে বিদায় দিচ্ছিল হাসান। সোহেল এই প্রথমবার সুড়ংয়ের বাইরে এসেছে। মিয়ানদাদের হাত ধরে ও তাকিয়ে রইলো ভাইয়ের দিকে।

কোব্বাদের দিকে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল হাসান। কোববাদ বললেনঃ 'বেটা! তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে পেরেশান হবে না। আমরা ওর হিফাজতের জিম্মা নিচ্ছি। জীবন থাকতে ওর পশমও কেউ বাঁকা করতে পারবে না। যদি কোন বিপদ এসে যায় ওকে মাদায়েনে মিয়ানদাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আশা করি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে তুমি, কিন্তু নিজের ভাইয়ের জন্যে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়োনা। তুমি দু'বছর পর এলেও সোহেল এ অনুযোগ করবে না, আমরা তাকে খুশী রাখতে চেষ্টা করিনি।'

হাসান ফিরল মিয়ানদাদের দিকে। মোসাফেহা না করে কোলাকুলি করে সে বললঃ 'বাহরাইনের অধিকাংশ ব্যবসায়ী মাদায়েন আসা যাওয়া করে। বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির হাতে আপনার কোন পয়গাম পাঠালে ওরা আমায় খুঁজে নিতে পারবে। যদি আমি পয়গাম পাঠাই মাদায়েনে আপনার কোন বিপদ নেই, তাহলে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস এটাই আমাদের শেষ মোলাকাত নয়।' তারপর সোহেলের

মাথায় হাত রেখে বললঃ 'সোহেল! তুমি তো উদাসীন হয়ে যাবে না।'

ঃ 'না ভাইয়া।' জবাব দিল ও।

ব্যথাকাতর আওয়াজে মাহবানু বললঃ 'সোহেল আমার ভাই। ওকে আমি উদাসীন হতে দেবো না।'

মাহবানুর দিকে পলকের বেশী চাওয়ার সাহস হলো না হাসানের। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল ও।

একটু পরে বৃক্ষের আড়ালে মিলিয়ে গেল অপসৃয়মান অশ্বের খুর ধ্বনি।

পাঁচ

দুপুর। গ্রামের বাইরে এসে গীর্জার সামনে কুয়ো দেখে ঘোড়া থেকে নামল হাসান। পিপাসা মিটালো নিজের এবং ঘোড়ার। ঘাসের বোঝা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে দিল ঘোড়ার মুখে। ঘোড়াটা গাছের সাথে বেঁধে বসল তার ছায়ায়। একটু পরেই পা ছড়িয়ে ঝিমুতে লাগল সে। গীর্জা থেকে সোরাহী হাতে বেরিয়ে এল দু'ব্যক্তি। পানি নিয়ে ফিরে গেল তারা। আরো কিছু পরে এক বুড়ো পাদ্রী লাঠি ভর দিয়ে হাসানের কাছে এসে বললেনঃ 'বেটা! তুমি খানা খাবে?'

ঃ 'জ্বি, আমি পেছনের গ্রাম থেকে খেয়ে এসেছি।'

ঃ 'পানি তুলে দেব?'

ঃ 'জ্বী না, পানি পান করেছি। এ কূয়োর পানি খুব মিষ্টি।'

হাসানের কাছে বসে পড়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

ঃ 'ইরাক থেকে। বাহরাইনে আমার মামা থাকেন। ঘোড়া পরিশ্রান্ত তাই খানিকটা থামলাম এখানে।'

ঃ 'তোমাকেও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। এখানে ক'দিন থাকতে চাইলে তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের এ গীর্জা ছোট হলেও মেহমানদের জন্য হামেশা এর দরজা খোলা থাকে।'

ঃ 'শোকরিয়া, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পূর্বেই কয়েক ক্রোশ এগিয়ে যেতে হবে আমাকে। কোনদিন ফিরে আসার সুযোগ পেলে আপনার কাছে অবশ্যই থাকব।'

ঃ 'তোমার অবস্থা দেখে মনে হয় কোন বিপদ থেকে পালাচ্ছ, অথবা কোন অভিযানে যাচ্ছ তুমি।'

ঃ 'আমার বিপদতো ছেড়ে এসেছি অনেক পেছনে। এখন আমার পেরেশানীর কারণ হচ্ছে, আমার ছোট ভাই। তাকে রেখে এসেছি একজন নেকদীল ইরানীর আশ্রয়ে।

কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে আমাদের ইরানী হাকিম ওকে নিকৃষ্টতম সাজা দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।'

ঃ 'ইরাকের কোন আরব কবিলার সাথে তোমার সম্পর্ক থাকলে তুমি কি অবস্থার সম্মুখীন তা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন রোম ও ইরানের সীমান্তবর্তী আরব কবিলাগুলো কাইজার ও কিসরার গোলামীর জিঞ্জির খুলে ফেলে দেবে। তুমি যদি মজলুম ও অসহায় হও, তবে তোমায় এ সুসংবাদ দিচ্ছি, জালিমের হিসাবের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

ঃ 'আমার ঘর আজ ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নিহত হয়েছেন পিতা, ভাই। আমার বোন নিজের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যে দেশের ইজ্জত আজাদীর জন্য তলোয়ার ধরেছিলাম, এতটুকু মাথা গোঁজার স্থান নেই সেখানে। আপনি আমায় এ শান্তনা দিতে পারবেন না যে, নতুন কোন ইনকিলাব ওদের নেকড়ে স্বভাব বদলে দেবে, যারা আমাদের গ্রামকে করেছে ওদের শিকার ভূমি! দেশে আমার জন্য ছিল দুটো পথ। নিজেকে ঐসব বেরহম দুশমনের হাওলা করে দেয়া অথবা আমি বেঁচে থাকবো আর অপেক্ষা করব উপযুক্ত সময়ের।'

ঃ 'কিছু জালেম খতম হলেই যদি জুলুম বন্ধ হতো, তবে এ সমস্যা ছিল খুবই মামুলী। কিন্তু আমি অনুভব করছি, কাঁটাগুল্মে ভরা অরণ্যের কতক কাঁটা উপড়ে ফেললে কোন ফল হয় না। যে জালিমদের খতম করবে তুমি, সে স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসবে অন্য অনেকেই। এমনও হতে পারে, নতুন নেকড়েরা অধিক রক্তচোষা হবে পুরনো হায়েনার তুলনায়। তুমি কি অনুভব করছ না, মানবতার জন্য প্রয়োজন এক নতুন আলোর! ভেড়া আর নেকড়ের দুনিয়া এমন এক সমাজ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী, যেখানে আশ্রয় পাবে প্রতিটি মজলুম।'

মৃদু হাসি নিয়ে বৃদ্ধ পাদ্রীর দিকে তাকাল হাসান।

ঃ 'যদি আপনি আমায় খৃষ্টবাদের তাবলীগ করতে চান, তবে নিরাশ হবেন। কয়েক বছর রোমানদের জিন্দানখানায় বন্দী ছিলাম আমি। দেখেছি কাইজারের গোলাম কিসরার গোলামের চেয়ে ভাগ্যবান নয়।'

ঃ নতুন রোশনীর কথা বলে ঐ দ্বীনকে আমি বোঝাতে চাইনি, যার নীতিমালা কাইজারের ইচ্ছা ও হুকুমের অনুগত। আমি জানি, যে আইনের প্রথম উদ্দেশ্য হলো সম্রাটের ক্ষমতার হিফাজত করা, তা কখনোই এ দুনিয়ায় নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মুনীব আর গোলামদের দুনিয়ায় জীবনের ষাটটি বছর অতিক্রম করে বুঝেছি, এ দুনিয়ায় যতোদিন মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব খতম না হবে এভাবেই পশুত্ব আর জুলুমের আঁধারে ঘুরপাক খাব আমরা। বাদশাহী– চাই তা বেরিয়ে আসুক কাইজারের সুরম্য অট্টালিকা থেকে অথবা হোক কিসরার তখতের অলংকার, অবশ্যই তা স্রেফ লানত। ন্যায় ও ইনসাফ শুধুমাত্র সেই আইনের মাধ্যমেই কায়েম হতে পারে, যে

শক্তিশালী ও কমজোর, উঁচু ও নিচু আর আমীর ও গরীবের মধ্যে কোন ফারাক করে না।'

ঃ 'আপনি যদি এমন কোন আইন সম্পর্কে ভেবে থাকেন, তাহলে কাইজার ও কিসরা আপন সালতানাতে তার হস্তক্ষেপ কিভাবে মেনে নেবে?'

ঃ 'কাইজার ও কিসর্রা নিজেদের আইন আর খাহেশের বাইরে কোন কানুনের হস্তক্ষেপই সহ্য করবে না। যার হুকুমে রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে উঠে প্রভাতের আলোকরশ্মি, বান্দার অবস্থা সম্পর্কে গাফিল নন তিনি। ইরাকের জমিন তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, যাচ্ছো বাহরাইন, তুমি এ কথা বলনি!'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে তুমি সেই নতুন রোশনী দেখতে পাবে।'

ঃ 'মাফ করবেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'রোশনী দেখার জন্যে শুধু নয়ন খোলা জরুরী। আমার বিশ্বাস, বাহরাইনে তুমি তাদের সাক্ষাত পাবে, যারা তোমায় দেখাতে পারবে মুক্তির পথ। এরা সেই দ্বীনের ধারক, যারা মুনীব-গোলাম, কমজোর-শক্তিশালী, আর আরব-অনারবের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়েছে। তোমার বর্তমান নিয়ে তুমি নিরাশ। ওরা ভবিষ্যতের আলো দেখাবে তোমায়। জুলুম থেকে পালাচ্ছ তুমি, জুলুমের সামনে সিনা ফুলিয়ে দাঁড়াতে শেখাবে তোমাকে ওরা। এখানে একা তুমি, ওখানে পৌঁছেই দেখবে, বিরাট কাফেলা তোমার প্রতীক্ষা করছে। সে কাফেলার সাথে সফর করে তুমি বুঝবে, আল্লাহ তোমার নেগাহবান।'

ঃ 'আরবদের নতুন দ্বীন সম্পর্কে বলছেন আপনি!'

ঃ 'হ্যাঁ, সেই দ্বীনের কথাই আমি বলছি, যা দুনিয়ার নিপীড়িত, বঞ্চিত ইনসানের শেষ আশ্রয়। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি যুবক। সফর করতে পারবে সে কাফেলার সাথে, যাদের মঞ্জিল দজলা ফোরাতের আরো আগে। এ বয়সে ওদের পথের ধূলি দেখার সামান্য আশাই আমি করতে পারি শুধু।'

খানিক ভেবে হাসান বললঃ 'খসরু পারভেজের ফৌজে আমি ছিলাম সিপাই। আরমিয়ার যুদ্ধের পর রোমানরা আমাকে গ্রেফতার করেছিল। কয়েদী অবস্থায় বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে আমি ছিলাম বেখবর। রোমানদের জাহাজ থেকে ফেরার হওয়ার পর স্বদেশের পথে যেসব লোকের সাথে দেখা করেছি, তাদের মুখেই আরবদের কিছু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু যখন ওরা সিরিয়ার সীমান্তে মুসলমানদের হামলার কথা বলতো, আমার বিশ্বাস হতো না। রাতের বেলা এক রাহেবের কাছে আমি অবস্থান করেছিলাম। তিনি বললেন, আরবদের মাঝে যে নবী নতুন 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছেন, তিনি মারা গেছেন। কয়েকটি কবিলা তার দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে। তাদের ঐক্য মুসলমানদের চারদিক থেকে ধাওয়া করে ইয়াসরেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। যখন বিদ্রোহী কাবিলাগুলো

চারদিক থেকে ইয়াসরেবে হামলা করবে, এক দিনের জন্যও ওরা তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। সিরিয়ার মরুপ্রান্তর অতিক্রম করার সময় বনু তমীম এবং বনু ইয়ামামার বিদ্রোহের খবর আমি পেয়েছি। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে জেনেছি, বনু তমীম পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইয়ামামার বিদ্রোহীদের বিশাল বাহিনী তখনো মজুদ। বিদ্রোহ করেছে বাহরাইনও। এ পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র কোন মোজেযাই মুসলমানদেরকে বরবাদী ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে।'

গভীরভাবে হাসানের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ পাদ্রী বললেনঃ 'বেটা, বাহরাইন পৌছে অনেক মোজেযাই তুমি দেখবে। সমগ্র ইয়ামেনে বিদ্রোহীদের ঝান্ডা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। ইয়ামামায় বরবাদ হয়ে গেছে চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী লশকর। নবুওতের নতুন দাবীদার মুসায়লামা নিহত হয়েছে। বাহরাইনে এখনও দ্বীনের ওপর কায়েম আছে যেসব মুসলমান, বিদ্রোহীদের তুলনায় ওরা যদিও কম কিন্তু যে লশকর ইয়ামামা পৌছেছে, মুসলমানদের এ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে ওরা ফিরে যাবে, এ আশা করা যায় না। তদুপরি বাহরাইনের যেসব কবিলাগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা বুলন্দ করেছে ওরা অন্যান্য আরব কবিলাগুলোর চেয়ে শক্তিশালী নয়।'

অনেকক্ষণ পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে হাসান বললঃ 'আপনি খৃষ্টান হয়েও মুসলমানদের সমর্থন করেন?'

ঃ 'খৃষ্টান হলেও আমি সত্যকে পসন্দ করি। এ যুগের সবচেয়ে বড়ো সত্য হচ্ছে ইসলাম। পূর্ণ আলো নিয়ে সূর্য যখন আসমানে উদিত হয়েছে, চোখ বন্ধ করে এ দাবী করবো না যে, এখনো প্রভাত হয়নি। আমার সকল দোয়া আল্লাহর সে সব নেক বান্দাহদের জন্য, যারা এই জমিনে ন্যায় ও ইনসাফের ঝান্ডা তুলে ধরেছে। এক দুনিয়া বিবাগী তরবারী নিয়ে তাদের সাথে শামিল হবে এ বয়সে তা হয়তো আশা করা যায় না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হেজাযের কোন মুসাফিরের এখানে আসার প্রতীক্ষায় থাকব। আমার বয়স যদি হতো তোমার মতো, তোমার মতোই হতাম শক্তিশালী, তাহলে তোমায় বলতাম, যদি তুমি হও চির বসন্তের খুরমা বাগের প্রত্যাশী তবে চলো আমার সাথে। কিন্তু মক্কা মদীনা যে অনেক দূরে। আমার দুর্বল পা কয়েক কদমের বেশী আমার বোঝা বইতে পারবে না। তাই এখানকার দুয়ারে বসেই সেই কাফেলার অপেক্ষা করব, যাদের পথের ধূলায় শামিল হয়েছে ইনসানিয়াতের সমস্ত মর্যাদা। কিন্তু তুমি নওজোয়ান। পেরিয়ে যেতে পারবে পথের সব পর্বত, দরিয়া আর মরুবিয়াবান। তুমি ময়দানে জংগে আল্লাহর সেই বান্দাদের সংগী হতে পারবে, যাদের উদ্দীপ্ত দৃষ্টির সামনে সিংহের দীলও কেঁপে যায়।'

আশান্বিত হয়ে হাসান বললঃ 'আরবে ইসলামের ভবিষ্যত কি আমি জানি না। ন্যায় ও সাম্যের ধারক কোন কাফেলাকে যদি ইরাকের পথে রওয়ানা হতে দেখি, ইরানের বিশাল সালতানাতের সাথে যুদ্ধে ওদের সাফল্যের সম্ভাবনা কদ্দুর, সে কথা না

ভেবেই ওদের সাথে শামিল হব আমি এ ওয়াদা করছি আপনার কাছে।'

ঃ 'যখন তুমি শামিল হবে সেই কাফেলার সাথে, দেখবে বিজয়ের দিকে ছুটছে তোমার প্রতিটি কদম। আগামী দিনের আজাদী পাগল মানুষ তোমাদের কদমের নিশানা ধরেই খুঁজে নেবে ওদের পথ।'

উঠতে উঠতে হাসান বললঃ 'এবার আমায় এযাজত দিন। যদি কোন দিন নাজাতের পথ খুঁজে পাই, শুকরিয়া প্রকাশের জন্য আপনার কাছে আসব। কিন্তু আমার সামনে বড় সমস্যা হচ্ছে, আমার অল্প বয়সী ভাইকে এমন দুশমন থেকে নাজাত দেয়া, দুনিয়ার কোন শক্তির ভয়ই যার জুলুম রুখতে পারছে না।'

ঃ 'সন্ধ্যা তো হলো প্রায়। আজ রাতটুকুও এখানে থাকবে না?'

ঃ 'না, অনুমতি দিন, দোয়া করবেন ভাইটিকে যেন আবার বুকে পাই।'

ঃ 'আমি তোমার জন্য দোয়া করব। তোমার নাম কি?'

ঃ 'লোকে আমাকে হাসান বলেই জানে। আপনার নাম কি?'

ঃ 'আমার নাম ইউহান্না।'

খানিক পর। বৃদ্ধ পাদ্রীকে খোদা হাফেজ বলে হাসান ঘোড়ার পাছায় চাবুক কষল। মরুভূমির বালিতে ঝড় তুলে ছুটে চলল ঘোড়া।

মামার বাড়ীর কাছে পৌছে হাসান দেখলো ওখানে বিরাট এক কাফেলার ভিড়। কেল্লার মত বিরাট বাড়ী কায়েস বিন আরকামের। চার দেয়ালের বাইরে খেজুর বাগানে বাঁধা রয়েছে প্রায় দেড়শো ঘোড়া। হাসান ওখানে পৌছতেই এক ব্যক্তি এগিয়ে লাগাম ধরে বললঃ 'মেহমানরা খেতে বসেছেন। আপনি ভেতরে তশরীফ রাখুন।'

ঃ 'এটা কি কায়েস বিন আরকামের বাড়ী নয়?'

ঃ 'জ্বী হ্যাঁ, এ ঘর তারই।'

ঃ 'মেহমান কারা?'

ঃ 'আপনি জানেন না, আজ এখানে এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জমায়েত হয়েছেন?'

ঃ 'এ জমায়েতের কারণ কি?'

ঃ 'কারণ জানা না থাকলে ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই। এ পরিবেশে কোন আগন্তুক অন্দরে পা রাখতে পারবে না।'

ঃ 'আমি অপরিচিত নই, এটা আমার মামার বাড়ী।'

ঃ 'আপনার মামার বাড়ী? আপনি কি ইরাক থেকে এসেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'মাফ করুন, আপনাকে মুসলমানদের গোয়েন্দা বলে সন্দেহ হচ্ছিল। আপনার মামার ঘরে হাতেম বিন জবিয়ার দাওয়াত। এলাকার রইসরা তার সাথে মোলাকাত

করার জন্য এসেছে। আপনার মামা এবং অন্যান্য সর্দারদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেই হাতেম এসেছেন এখানে।'

ঃ 'হাতেম বিন জবিয়া কে?'

ঃ 'তিনি বাহরাইনের শাসক নোমান বিন মানযারের দক্ষিণ হাত এবং ঐ কবিলাগুলোর সর্দার, যারা মুসলমানদেরকে বাহরাইন থেকে বের করার প্রতিজ্ঞা করেছে। বাহরাইনে বিদেশী বিশেষ করে ইরানীরাও তাকে নেতা মনে করে।'

ঃ 'বনু তমীম, মুসায়লামা এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সংবাদ আমি পেয়েছি। তা যদি সত্য হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে বাহরাইনবাসীর এ লড়াই হবে আত্মহত্যার শামিল। আমার বিশ্বাস, মামা এবং তার কবিলার লোকেরা এ আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করবেন না।'

ঃ 'যদি তুমি তোমার মামাকে মুসলমানদের শক্তির ভয় দেখাতে চাও তাহলে তিনি তোমায় ভাগ্নে হিসেবে পরিচয় দিতেও অস্বীকার করবেন। হাতেম বিন জবিয়ার সঙ্গী হবার ফয়সালা করেছেন তিনি। এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কবিলার যেসব সম্মানিত ব্যক্তিরা এখনো দোদুল্যমান তাদেরকে হাতেমের ঝান্ডার নিচে একত্রিত করা। আমার বিশ্বাস, এখানে যারা জমায়েত হয়েছেন, কেউ মুসলিম শক্তিতে ভীত নন। আর বাহরাইনের অবস্থাও এত নৈরাশ্যজনক নয়। স্থানীয় মুসলমানদের পরাজিত করাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এরপরও হেজাযী কোন মুসলিম লশকর আমাদের ওপর হামলা করলে ইরানের বিশাল সালতানাত আমাদের সাহায্য করবে। লোহিত সাগর থেকে পারস্য উপসাগরের উপকূল পর্যন্ত সারা আরব মুসলমানদের কব্জায় চলে যাবে, কখনো ইরান তা বরদাশত করবে না। বাহরাইনের রণ সাজে পেরেশান হয়ে স্থানীয় মুসলমানরা জুয়াসীর কাছে জমায়েত হয়েছে। হাতেম বিন জবিয়ার অবরোধ দিন দিন ওদের সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। দেরী না করেই হাতেম যদি ওদের পরাজিত করতে পারে গোটা আরবে পড়বে এর প্রভাব। মুসলমানদের বিগত বিজয়গুলোতে যেসব কবিলা ঘাবড়ে গেছে, ওরাও উঠে দাঁড়াবে দ্বিতীয়বার।'

ঃ 'বাহরাইনে মুসলমানদের নেতা কে?'

ঃ 'ওদের নেতা ছিল আলা বিন হাজরানী। মুসলমানদের নবীর দূত হয়ে কয়েক বছর আগে এসেছিলেন তিনি। তার দাওয়াতে কয়েকটি কবিলা মুসলমান হয়েছে। কিন্তু মুহম্মদের (সা.) ওফাতের পর বাহরাইনের পরিবর্তিত অবস্থা তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। এখন তার স্থানে রয়েছে বনু আবদুল কায়ানের প্রভাবশালী সর্দার জারুদ বিন মোআল্লা। তার সারা কবিলাই মুসলমান। কিন্তু হাতেম এবং তার সঙ্গীরা মুসান্না বিন হারেসা শাইবানীকে বেশী বিপজ্জনক মনে করেন। তিনি মুসলমানদের সাথে না থাকলে এতদিনে তাদের নাস্তানাবুদ করে দেয়া যেতো।'

ঃ 'তিনি কোথায়?'

ঃ 'এখান থেকে চার মঞ্জিল দূরে তার বাড়ী। কিন্তু ওরা দু'জনই নিজেদের বাড়ীতে না থেকে সারা বাহরাইনের মুসলমানদের সংগঠিত করছে। নোমান এবং হাতেমের সাথে শামিল হওয়া সর্দারদের গ্রামগুলোতে ওরা চলে যায় বিনা দ্বিধায়। এ পর্যন্ত অনেক প্রভাবশালী সর্দার এবং তাদের খান্দানদের ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছে ওরা। একদিন আমরা শুনি অমুক এলাকার লোকদের সঙ্গী করে নিয়েছে হাতেম। ক'দিন পর আবার সংবাদ আসে মুসান্না বিন হারেসা সেই এলাকায় রওনা হয়েছেন, আর বিদ্রোহী কবিলাগুলো নতুন ভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। অনেক কথা বলেছি, আমায় ক্ষমা করবেন। ভেতরে গিয়ে আপনি মেহমানদের সাথে খানায় শরীক হোন। আপনার ঘোড়ার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করছি আমি।'

ঃ 'ভেতরে যাওয়ার আগে তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করছি, এরা যদি মুসলমানদের সাথে লড়াই করার ফয়সালা করে, তুমি কার পক্ষে থাকবে?'

ঃ 'ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমার কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আপনার মামা আমাদের সর্দার। তিনি যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরার ফয়সালা করেন, নিজের কবিলার সঙ্গ ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঃ 'অনেক বছর ধরে মামাকে আমি দেখিনি। মেহমানের ভিড়ে তাকে চিনে নেয়া আরো মুশকিল। তিনি যদি মেহমানদের সাথে খেতে বসে থাকেন, খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করতে চাই।'

ঃ 'এইমাত্র খাওয়া শুরু হয়েছে। আপনি আমার সাথে আসুন। খাওয়া শেষে আমি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব।'

তার সাথে প্রশস্ত হাবেলীতে প্রবেশ করল হাসান। শামিয়ানার নীচে বিছানো লম্বা দস্তরখানের এক দিকে বসে পড়ল সে।

মেহমানদের আলোচনার বিষয় ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। কেউ অনুচ্চ কণ্ঠে কেউ বা খানিক আওয়াজ করে খালিদ বিন ওয়ালিদের শান শওকত এবং তার ঝান্ডার নিচে সমবেত যোদ্ধাদের বাহাদুরীর স্বীকৃতি দিচ্ছিল। 'মুসলমানরা এদিকে আসার সাহসই করবে না। বিপদ মুহূর্তে ইরাকের কবিলাগুলো আর ইরানের বিশাল সালতানাত থাকবে আমাদের সাথে। ওরা আমাদের জল এবং স্থল দু'পথেই রসদ পাঠাতে পারবে। বাহরাইন পদানত করে মুসলমানরা ওদের সীমানা পর্যন্ত পৌছে যাক, ইরান কখনো তা সহ্য করবে না।'-এমনি ধরনের নানা কথা হচ্ছিল।

খাওয়া শেষে হাসানকে স্বাগত জানানো ব্যক্তি একজন বয়স্ক অথচ সুঠামদেহীর দিকে ইশারা করে বললঃ 'ইনিই আপনার মামা।'

বিনীত ভঙ্গিতে হাসান মামার কাছে পৌছে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললঃ 'মামুজান, আমি হাসান বিন ওতবা।'

ক্ষণিকের জন্য কায়েস বিন আরকামের দৃষ্টি আটকে রইল হাসানের চেহারায়।

হাত প্রসারিত করে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'বেটা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি। তোমার পিতার শেষ সংবাদ ছিল, তুমি নিখোঁজ অবস্থায় আছ। আগে বলো খানা খেয়েছ?'

ঃ 'আমি খানা খেয়েছি।'

ঃ 'তুমি অবিকল তোমার পিতার চেহারা পেয়েছ। কিন্তু তোমার সিনা ও কাঁধ তার চেয়ে প্রশস্ত ও মজবুত। মনে করেছিলাম, ওতবার মতো তার বেটারাও আমায় ভুলে গেছে। কিন্তু এমন সময় তুমি এলে যখন তোমাকে আমাদের খুবই প্রয়োজন।'

এরপর কায়েস মেহমানদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'তোমরা জান এ কে? এ আমার ভাগ্নে। পারভেজের ঝান্ডার নীচে ও লড়াই করেছে। ও এমন সব লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ সৈনিক একে অপরের সামনে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য এমন সিপাই প্রয়োজন, যার রয়েছে সংগঠিত ফৌজের সাথে লড়াই করার অভিজ্ঞতা। এ নাজুক পরিস্থিতিতে ওর আগমন এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুদরত বাহরাইনবাসীর বিজয় মঞ্জুর করেছেন।'

উপস্থিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়ল হাসানের ওপর। এক সর্দার এগিয়ে ওর সাথে মোসাফেহা করলেন। তার অনুসরণ করল অন্যান্য সর্দারেরা। এক নওজোয়ান হাত ধোয়াচ্ছিল মেহমানদের। পানির ভান্ড আরেক জনের হাতে দিয়ে এগিয়ে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল হাসানের দিকে। কায়েস বললেনঃ 'হাকাম, ও তোমার ফুফির বেটা। এর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে তোমার।'

অভিভূত হয়ে হাকাম মোসাফেহার জন্য হাত এগিয়ে দিল। হাসান বুকে জড়িয়ে ধরল ওকে। খান্দানের অন্যান্যরাও একে একে কোলাকুলি করল হাসানের সাথে। কায়েস হাসানের হাত ধরে নিয়ে গেল এক বিশালদেহী ব্যক্তির কাছে। লেবাসে তাকে মনে হচ্ছিল সম্পদশালী, চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল ধূর্তামি আর নিষ্ঠুরতা।

ঃ 'ইনি আমাদের নেতা হাতেম বিন জবিয়া।'

হাসানের সাথে মোসাফেহা করে হাতেম বললঃ 'তোমার আগমনকে কল্যাণের ইঙ্গিত মনে করি। অভিজ্ঞ সৈনিক আমাদের খুবই প্রয়োজন।'

ঃ 'কিন্তু আমি ....'

মাঝখানে হাসানের কথা কেটে হাতেম বললঃ 'মাফ করবে। আমার কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি এক সাধারণ সিপাই হিসেবে আমাদের সাথে শরীক হবে। ময়দানে যদি তুমি তোমার মামার আশা ভরসা উতরে যেতে পার, আমাদের অকৃতজ্ঞ দেখবে না।'

কায়েস বললেনঃ 'কোন আলোচনা ছাড়াই আমি ঘোষণা করছি, আমার খান্দানের লোকেরা ওকে সর্দার হিসেবে মেনে নিচ্ছে।'

হাসান হৃদয়ে অসহ্য কম্পন অনুভব করল। ও বলতে চাইল, মুসলমানদের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিতে নয়, আমি এসেছি মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে। কিন্তু এত লোকের সামনে মামাকে অপমান করতে মন চাইল না ওর। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও।

খানিক ··রের কথা। প্রাচীরের দুয়ারে মামাতো ভাই হাকাম এবং তার খান্দানের আরো কয়েকজন নওজোয়ানের সাথে কথা বলছিল হাসান। কায়েস মেহমানদের দেখাশোনার জন্য চক্কর দিচ্ছিলেন হাবেলীর অন্দরে-বাইরে। হঠাৎ হাসানের দিকে দৃষ্টি পড়লে কাছে এসে বললেনঃ 'বেটা! তুমি কিছুটা আরাম করে নাও। সন্ধ্যায় আমাদের মার্চ করতে হবে। হাকাম, বেটা তোমার ভাইকে অন্দরে নিয়ে যাও। এত ভিড়ে ওর আরাম হবে না।'

ঃ 'কি অবস্থায় আমি এখানে পৌছেছি, এখনো আপনাকে তা বলা হয়নি। মেহমানদের সামনে আপনাকে পেরেশান করতে চাইনি।'

পেরেশান হয়ে কায়েস চাইতে লাগলেন ওর দিকে। বললেনঃ 'তুমি কি কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছ?'

ঃ 'আমি বলতে এসেছি, ইরানীদের হাতে আমাদের ঘর বরবাদ হয়ে গেছে। আব্বা ও ছায়াদ নিহত হয়েছে। ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে আমার বোন। ছোট ভাইটি আহত। এক নেকদীল ব্যক্তির ঘরে ওকে লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

বিষন্ন বেদনায় স্তম্ভিত হয়ে খামোশ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন কায়েস। বললেনঃ 'কিন্তু তুমি তো কিসরার ফৌজে ছিলে! ইরানীরা তোমার দুশমন হল কেন?'

ঃ 'এক আরব কিসরার জন্য জীবন বাজী রেখেও নিজের খান্দানকে ইরানী জুলুম থেকে বাঁচাতে পারে না।'

ঃ 'এক কমজোর ব্যক্তি যখন ভুলে যায় শক্তিমানের সাথে টক্কর লাগানোর জন্য সে পয়দা হয়নি, তার পরিণতি বরবাদী ছাড়া আর কিছুই হয় না। ওতবা শেষ যখন এখানে এল, তার কথায় বুঝেছি, আরব কবিলাগুলোর ওপর ইরানী হস্তক্ষেপ তার পছন্দ নয়। আমার ভাল করেই স্মরণ আছে, সে বলেছিল, 'একমাত্র কোব্বাদ ছাড়া ইরাকের তামাম ইরানী জমিদার কৃষকদের সাথে জালিমের মত ব্যবহার করে। সেদিন বেশী দূরে নয় আরব কবিলাগুলো যখন তাদের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়াবে। আমি তাকে বুঝিয়েছি, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তুমি কখনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকবে না। ইরানী সালতানাত এক পর্বতের মত, এর সাথে টক্কর দিলে মাথাই ভাঙবে শুধু। আবার যখন শুনলাম কিসরার ফৌজে তুমি শামিল হয়েছ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম এই জন্য যে, তুমি সঠিক পথ বেছে নিয়েছ। ইরানী হুকুমত এবার আর তোমার খান্দানকে কোন কষ্ট দিবে না। আমার বিশ্বাস ছিল কিসরার ফৌজে যশস্বী হয়ে তোমার খান্দানের জন্য অনেক বড় সুযোগ হাসিল করতে পারবে তুমি। ইরানীরা তোমার ওপর জুলুম করেছে, এ খবর যদি আমায় শোনাতে এসে থাক, আমার প্রথম প্রশ্ন, তোমার সাথে তাদের দুশমনীর কারণ

কি? তুমি কি ময়দানে পিঠ দেখিয়েছ? অথবা পারভেজের পরাজয়ের পর তোমার পিতা কি ভেবেছিলেন যে ইরান এত কমজোর হয়ে গেছে, ইরানের কৃষকরাও তাকে ধাক্কা দিতে পারে?'

ক্ষণিকের জন্য শিরার সবগুলো খুন এসে জমা হল হাসানের চেহারায়। রাগ সামলে ও বললঃ 'মামুজান! কোন ময়দানে পিঠ দেখাইনি আমি। আমার পিতা, ভাই ও বোন অপরাধ করেননি ইরানী সালতানাতের বিরুদ্ধে। ওদের অপরাধ! আরব হয়েও ওরা চেয়েছিল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে। শাসকবর্গের জুলুমের জন্য এ উসিলাই কি যথেষ্ট নয় যে, শাসিতের দুর্বল হাত তাদের গলা পর্যন্ত পৌছবে না?

সব ঘটনা না শুনেই ফয়সালা করা ঠিক হবে না। আপনার বোঝা উচিত, আমার পিতা, ভাই আর বোনের খুনের প্রতিশোধ নিতে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আমি জানি আপনি আমাকে কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না। বিশেষতঃ এমন এক সময়, যখন মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্যে আপনার ইরানী সাহায্য জরুরী। কিন্তু অবশ্যই একথা আমি বলব, ইরানীরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধ বাহরাইনবাসীর বন্ধুও হয় তবুও ওদের বিরুদ্ধে আমার দীল থেকে ঘৃণা আর দুশমনীর অনুভূতি কমবে না। আমার অসহায়ত্বের অনুভূতি ওদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার অনুমতি না দিলেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভুলব না যে, জীবনের বিশেষ ফরজ আমি পূর্ণ করতে পারিনি। মামুজান! এখানে এ জন্যই এসেছি, এ ছাড়া আর কোন আশ্রয় আমার নজরে এল না। তবুও আপনার ওপর আমি কোন বোঝা চাপাবো না।'

কায়েসের পেরেশানী রূপান্তরিত হতে লাগল গভীর লজ্জায়। হাসানকে শান্তনা দেয়ার সঠিক শব্দ খুঁজছিলেন তিনি। হাবেলীর বাইরে শোনা গেল লোকদের শোরগোল। চমকে দরজার দিকে তাকালেন তিনি। এক যুবক ছুটে ভেতরে প্রবেশ করে চিৎকার করে বললঃ 'মুসান্না বিন হারেসা আসছেন।'

হাবেলীর অন্দর মহল নীরব হয়ে গেল কিছু সময়ের জন্য। ফ্যাকাশে হয়ে গেল হাতেম বিন জবিয়ার চেহারা। তরবারী হাতে উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু এগোবার সাহস পেলো না।

ছুটে বেরিয়ে গেলেন কায়েস। তাকে অনুসরণ করল অন্য সবাই। চোখের পলকে হাবেলী খালি হয়ে গেল। বাইরের বাগানে মেহমানরা জড়ো হয়ে এক অশ্বারোহীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলঃ 'মুসান্না কোথায়? তুমি কবে কোথায় তাকে দেখেছ? তার সাথে কত ফৌজ রয়েছে! তোমার কি বিশ্বাস, তিনি এদিকেই আসছেন?'

সমগ্র শক্তি দিয়ে ও চিৎকার করে বললঃ 'খোদার কসম! তিনি আসছেন। সোজা তিনি এদিকেই আসছেন। তার সাথে রয়েছে আরও তিনজন অশ্বারেহী। সম্ভবত তাদের পেছনে ফৌজও আসছে। গাঁয়ের দক্ষিণে পাহাড়ের চূড়া থেকে আমি তাদের দেখেছি। তার সফেদ ঘোড়া কয়েকবার আমি দেখেছি। তাকে চিনতে মোটেও ভুল হয়নি

আমার।'

তলোয়ার উঁচু করে চিৎকার দিয়ে কায়েস বললেনঃ 'যদি মুসান্নার সাথে শুধু তিন ব্যক্তি থাকে, আমাদের ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু তার পেছনে যদি ফৌজ এসে থাকে তাহলে মোকাবিলার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়াও। তীরন্দাজরা সামনে এগিয়ে নিজেদের অবস্থান নাও।'

হাতেম এগিয়ে বললঃ 'মুসান্না যদি লড়াইয়ের নিয়তে এসে থাকে, তবে ফৌজ তার সাথেই থাকবে, পিছনে নয়। চারজন ব্যক্তিকে এত ভয় পাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। তোমাদের ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাই মুসান্নার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার কথা তোমরা শোনবে না। কায়েস! ওরা তোমদের ভেড়া বকরী ঠাওরে এই গ্রামের পথ ধরেছে। এখন তোমাদের উচিত, ওরা কেউ যেন ফিরে যেতে না পারে। বীরত্ব প্রমাণ করার এরচেয়ে সুন্দর মওকা তোমার ভাগ্নে আর কখনো পাবে না।'

বাগানের কোণ থেকে কেউ আওয়াজ দিলঃ 'ওরা আসছে।'

দম বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল সবাই। দেখা দিল চারজন অশ্বারোহী। সবার আগের অশ্বারোহীর ঘোড়া দুধের মত সাদা। তাকে চিনে নিতে দেরী হলো না কারো। তার পাগড়ী এবং জুব্বাও ঘোড়ার মত সাদা। তার তাজাদম ঘোড়া লাফিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তীরন্দাজদের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন তিনি। বেপরোয়াভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে লাফিয়ে পড়লেন ঘোড়া থেকে। সালামের কোন জওয়াব না পেয়ে ঘোড়া পেছনের সওয়ারের হাতে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'কায়েস! আমি তোমার আর তোমাদের মেহমানদের জন্য শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

তীরন্দাজ সারির পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন কায়েস। এগিয়ে এসে বললেনঃ 'তোমার পক্ষ থেকে শান্তির পয়গামের প্রয়োজন নেই আমাদের। তুমি যে পথে এসেছ সে পথেই ফিরে যাও।'

ঃ 'নিজের ইচ্ছায় এসেছি আমি, নিজের মর্জিতেই ফিরে যাবো। বাহরাইনের মরু প্রান্তর অথবা পার্বত্য কোন পথ তুমি আমার জন্য রুদ্ধ করতে পারবে না। আমি এজন্য এখানে আসিনি, তোমাদের জংগী প্রস্তুতিকে খুব একটা বিপদ মনে করি। বরং আমার আসার কারণ, বাহরাইনের মাটিতে বাহরাইনের বাসিন্দাদের খুন ঝরানো আমি পসন্দ করি না। ইয়ামেনের বিদ্রোহীদের পরিণাম জেনেছ তোমরা। দেখেছ বনু তমীম আর ইয়ামামাবাসীর করুণ পরিণতি। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, যে কাফেলা আত্মপ্রকাশ করেছে হেজায থেকে আরব সীমান্তের আরো আগে ওদের মনজিল।

ইসলামের অনুসারীরা অনারবের লৌহবেষ্টনী ভেংগে ফেলতে দাঁড়িয়েছে। আরবের কয়েকটা কাঁটা ওদের আশাহত করতে পারবে না। তোমরা সে দ্বীনের সাথে বিদ্রোহ করেছ, আরববাসীকে যে জিল্লতি আর গোমরাহীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে

মানবতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। হেদায়েতের রোশনী থেকে চোখ বন্ধ করতে পার কিন্তু সেই ভয়াল রাত আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না, যেখানে আমাদের পূর্বসূরীদের জন্য জুলুম আর মূর্খতা ছাড়া কিছুই ছিল না।'

হয়রান হয়ে হাতেম বিন জবিয়ার দিকে তাকালেন কায়েস। সে এগিয়ে এসে বললঃ 'মুসান্না! এরা তোমার কথায় আসবে না। তোমরা বাহরাইনবাসীর আযাদীর দুশমন এরা তা জানে। জুয়াসীতে তোমাদের সংগীরা রয়েছে আমাদের সংকীর্ণ বেষ্টনীতে, এ জন্য তুমি এসেছ। কিন্তু আলোচনার সময় পেরিয়ে গেছে। এখন মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করার জন্য গোটা বাহরাইনবাসী প্রস্তুত। এসব লোককে লড়াইয়ে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না তুমি। কথা দিচ্ছি, অবরোধ দীর্ঘ করব না আমরা। আজ তুমি এখানে না এলেও দু'দিন পর জুয়াসীর ময়দানে আমাদের মোলাকাত হতো। এখন তোমাদের ফিরে যাওয়া আমাদের পছন্দ নয়। আমরা চাই খুন খারাবী ছাড়া হাতিয়ার ছেড়ে দিক মুসলমানরা। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তুমি তাদের লড়তে বাধ্য করবে। এজন্য যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে তোমাকে বিরত রাখার মধ্যেই ওদের কল্যাণ। এ মুহূর্তে কমপক্ষে দেড়শো লোকের তীরের আওতায় রয়েছ তুমি। হাতিয়ার ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিচ্ছি তোমাকে। ওয়াদা করছি, লড়াই খতম না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে বন্দী করে রাখা হবে। যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে তোমাকে কি শাস্তি দেয়া হবে।'

রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল মুসান্নার চেহারা। তিনি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে হাতেমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'কায়েসের ঘরকে লড়াইয়ের ময়দান বানাবার জন্য আমি আসিনি। ইনসানিয়াতের অর্থ যদি না বুঝে থাক, তবে তোমাকে বলতে চাই, পালাবার চেষ্টা করব না। আমরা মাত্র চার জন, কিন্তু আমাদের হাতিয়ার পেতে হলে কমপক্ষে তোমাদের বিশটা লাশ লুটিয়ে পড়বে। এতেই লড়াই খতম হয়ে যাবে ভেবো না। আমাদের কয়েক ফোটা খুন ঝরানোর পর কায়েসের সারা খান্দানের খুনও জমিনের পিপাসা মেটাতে পারবে না।'

কয়েক কদম দূরে নিজের ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়েছিল হাসান। ছুটে এগিয়ে এসে মুসান্না আর তীরন্দাজদের সামনে ঢালের মত দাঁড়িয়ে গেল। মুসান্না এবং তার সংগীদের দিকে ফিরে বললঃ 'আপনারা চারজন নন, পাঁচজন।'

পেরেশান হয়ে বিমূঢ়ের মত কখনো হাতেম আবার কখনো সঙ্গীদের দিকে তাকাল কায়েস। স্তম্ভিত হয়ে গেল হাসানের কান্ড দেখে। তার ছেলে এবং অন্যান্য আত্মীয়রা ঠোঁট কাটছিল রাগে।

হাসান বললঃ 'মামুজান! রোম ও ইরানের যুদ্ধ থেকে আমি শুধু এই শিক্ষাই পেয়েছি, শান্তির পয়গাম বাহকের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলনকারীরা ধ্বংস হয়ে যায়। ইরান এজন্যাই তাবাহ ও বরবাদ হয়েছে, হেরাক্লিয়াসের সন্ধি প্রস্তাব নাকচ করেছিল

পারভেজ। মুসলমানদের ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না। কিন্তু মুসান্নার মত আরো কয়েকজন যদি ওদের মধ্যে থাকে, তাহলে তাদের সাথে সংঘর্ষে যাবার মত ভুল আপনাদের জন্য উচিত হবে না।'

নিশ্চিন্তে হাসানের কাঁধে হাত রেখে মুসান্না বললেনঃ 'নওজোয়ান, আমি তোমার শোকর গোজারী করছি। আসলে কায়েসের কাবিলার কোন ব্যক্তি আমার ওপর হামলা করতে পারবে না।'

সারিবদ্ধ লোকদের দিকে ফিরে তিনি বললেনঃ 'আমি ফিরে যাচ্ছি। তার পূর্বে তোমাদের বলে যেতে চাই, আমরা শুধু চারজন নই। আমার কাবিলার পাঁচশো জওয়ান নিয়ে যাচ্ছিলাম জুয়াসীর দিকে। পথে শোনলাম, এখানে এলাকার সর্দাররা জমায়েত হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সাথীদের পথে রেখে আমি এখানে পৌঁছেছি। লড়াই করার নিয়ত থাকলে এ বাগানে এতোক্ষণে তোমাদের লাশ ছাড়া কিছুই থাকতো না। কিন্তু আমি এ আশা নিয়েই এসেছিলাম, তোমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রুখতে পারবো। আমি চাই, ফয়সালা করার আগে ভালভাবে ভেবে দেখবে। মুসলমানদের সাথে সন্ধি অথবা যুদ্ধের ফয়সালা করার জন্য এক সপ্তাহের বেশী সময় তোমরা পাবে না। জুয়াসীর কাছে যেসব মুসলমান বিদ্রোহীদের অবরোধে রয়েছে, তাদের সাহায্যে মদীনা থেকে লশকর রওনা করেছে। গতকাল পর্যন্ত যে বনু তমীম ছিল ইসলামের বিদ্রোহী, ওরাও শামিল হয়েছে লশকরের সাথে। এ বিশাল ফৌজের প্রতিটি সিপাইয়ের ঈমান হচ্ছে, বিজয় অথবা শাহাদাত। ওরা এক হপ্তার মধ্যে পৌঁছে যাবে জুয়াসী। এর পর কি হবে তা তোমাদেরকে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। শুধু বলব, হাতেম বিন জবিয়ার মুখে তোমরা আর কোনদিন লড়াইয়ের কথা শুনবে না। তোমাদের নসীব খারাপ! বাহরাইনে ইসলামের পতাকা উত্তোলনের মর্যাদা হাসিল করতে পারলে না তোমরা। কিন্তু আমি দেখছি মুসলমানদের লশকর যখন ইরানের দিকে এগিয়ে যাবে, কর্মচারীদের হাতে বিধ্বস্ত হবে অনারব জালিম শাসকের অট্টালিকা, তোমাদের সন্তানেরা ময়দানে হেজাযবাসীর পেছনে থাকতে পছন্দ করবে না। আল্লাহর দ্বীনের রোশনীতে ভবিষ্যতের মনযিল দেখছে আরববাসী। বাহরাইনের ভবিষ্যত আরবের ভবিষ্যতের চেয়ে পৃথক নয়। কায়েস! ধ্বংসের পথ থেকে তোমাকে ফেরাতে এসেছিলাম। তোমার দুশমন নই আমি। তোমার ভবিষ্যত বংশধর যখন অতীতের দিকে দৃষ্টি দেবে, গর্ব করে তখন বলবে মহানবী (সা.) যখন আহলে আরবকে আল্লাহর দ্বীনের পথে ডাকছিলেন, আহলে বাহরাইনও তার ডাকে সাড়া দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঊষর মরুতে যখন খোদার রহমতের বৃষ্টি হচ্ছিল, আঁচল প্রসারিত করে দিয়েছিল আমাদের পূর্বসূরীরা। মাশরিক ও মাগরিবে মুজাহিদরা যখন ইসলামের বিজয় পতাকা তুলছিল, আমাদের বাপ-দাদারাও কোন আরব কবিলা থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।

ইসলাম কোন খান্দান অথবা কবিলার ধর্ম নয়। এ এমন এক দ্বীন যা বরকত

আর এনাম বিলাতে আরব অনারবের পার্থক্য করে না। আর এর বিজয় কোন কবিলা অথবা কওমের বিজয় নয় বরং আরব অনারবের কোটি কোটি ইনসানের বিজয়। যারা জুলুমের মোকাবেলায় ন্যায় ও ইনসাফ, পাপের মোকাবেলায় নেকী, ঝগড়া ফাসাদের মোকাবিলায় শান্তি এবং স্বস্তি, বর্ণ ও গোত্রবাদের মোকাবেলায় মানবতা, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের প্রত্যাশী। তোমরা মানুষ, এ জন্যেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি। মানুষের শান্তি আর মুক্তির পথ ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই। আমি দেখছি আগামীতে গর্বের সাথে নয়, শরম আর লজ্জার সাথে এ দিনগুলোকে তোমরা স্মরণ করবে। যখন আলোর বন্যার উত্তাল তরঙ্গ অনারবের সীমানা ছুঁইছিল, অন্ধকার কুঠুরীতে দুয়ার রুদ্ধ করে পড়েছিলে তোমরা, এ জন্য বিবেক তোমাদের দংশন করবে। আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দিন। তোমাদের পরিণতি হোক অতীতের চেয়ে কল্যাণকর এ দোয়া করে আমি বিদায় নিচ্ছি।'

মুসান্না্র ব্যক্তিত্ব ছিল এমন, কোন অবিশ্বাস্য কথা বললেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। সবাই ছিল বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। প্রচন্ড বেদনা নিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল হাতেম। কিন্তু কেউ তার চোখের দিকে চাইতে অথবা কথা বলতে তৈরী ছিল না। সঙ্গীর হাত থেকে লাগাম নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন মুসান্না।

হাসান বললঃ 'আমি কায়েসের ভাগ্নে। ইরাক আমার জন্মভূমি। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কিন্তু আপনার যদি বিশ্বাস হয় কোন দিন আরবের মরুচারীদের হাতে অনারবের জালেম বাদশাদের সুরম্য অট্টালিকা ধূলিস্মাৎ হবে, তবে আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

মুচকি হাসলেন মুসান্না।

ঃ 'তুমি ইসলামের অনেক কাছে এসে গেছ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে তোমার প্রয়োজন পড়বে।'

হাসান ছুটে নিজের ঘোড়া খুলে তাতে সওয়ার হল। ঘোড়ার বাগ ঘুরালেন মুসান্না। এক বৃদ্ধ সর্দার ঘোড়া হাকিয়ে এগিয়ে এসে চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'মুসান্না! থামো।'

থামলেন তিনি। বুড়ো সর্দার বললেনঃ 'আমার জন্যে যদি তওবার দুয়ার রুদ্ধ না হয়ে থাকে, আমিও যাব তোমার সাথে।'

ঃ 'আমি যদি বুঝতাম, আপনার জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে আসতাম না আমি।'

ঃ 'আমার তিন ছেলে এবং কবিলার আরো বিশজন এখানে উপস্থিত। এখন ওদের সাথে নিয়ে যান। কবিলার বাকী লোকদের নিয়ে দু'দিনের মধ্যেই আমি পৌছে যাব।'

আরো দুজন সর্দার তার অনুসরণ করলেন। খানিক পর মুসান্না যখন বাগান

থেকে বেরিয়ে এলেন, তার সাথে ছিল ষাটজন অশ্বারোহী।

লুণ্ঠিত মুসাফিরের মত কায়েস এবং হাতেম দেখছিলেন এদিক ওদিক। এক সর্দার এগিয়ে এসে বললঃ 'আমি হয়রান হচ্ছি, তোমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে এসব কথা বরদাশত করলে?'

তার জবাব না দিয়ে কায়েসের ওপর টুটে পড়ল হাতেম।

ঃ 'নিজের লোকদের বাহাদুরীতে তুমি ফখর করেছ। তোমার লোকেরা মুসান্নার সামনে ছিল গোলামের মত দাঁড়িয়ে। তুমি তাদের তীর চালাতে হুমুক দাওনি কেন?'

ঃ 'তিনি এক দূত হিসেবে এসেছেন। দূতের গায়ে হাত তোলার প্রশিক্ষণ আমার লোকদের দেইনি।'

ব্যঙ্গের সুরে বলল হাতেমঃ 'সোজা কথা বলছো না কেন, তুমি ভয় পেয়েছ।'

ক্ষ্যাপা কণ্ঠে জবাব দিল কায়েসঃ 'মুসান্নাকে দেখে আমার দীলে এ খেয়াল এসেছিল, হায়! দূতকে কোতল করা যদি বৈধ হতো! তুমি বলেছ হেজায থেকে কোন সাহায্য পাবে না বনু আবদুল কায়েস। তুমি আরো বলেছ, বনু তমীম এবং ইয়ামামার পরাজিত কাবিলাগুলো তোমার সাথে শামিল হবে। এরপর সারা আরবের কবিলা পরপর তোমার সাহায্যে বেরিয়ে আসবে। তুমি বেকুব। আমি ঘোষণা করছি, আমি এবং আমার কবিলায় কেউ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইতে শরীক হবে না।'

ছয়

পরের দিন সন্ধ্যা। মুসান্না বিন হারেসা জুয়াসীর দুই মঞ্জিল দূরে এলাকার প্রভাবশালী এক রইসের গ্রামে তাবু ফেললেন। বাহরাইনের বিভিন্ন এলাকার কবিলাগুলো থেকে তাঁর ঝান্ডার নিচে জমায়েত হল অনেক স্বেচ্ছাসেবক। তাঁর ভাই মুয়ান্না এবং শাইবানী বাহরাইনের আরো কয়েকজন রইসকে দলভুক্ত করার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছিলেন। তাবুতে অবস্থানের অধিকাংশ সময় কাসেদদের কর্মতৎপরতা শুনে তাদের জরুরী পরামর্শ দিয়ে দিন কাটাতেন মুসান্না বিন হারেসা। এক দূত দূরের কোন এক গ্রামের রইসকে পয়গাম পৌছে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলে তাকে তাজাদম ঘোড়া দিয়ে অন্য কোন গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। অভিযান থেকে ফিরে অভিযাত্রীরা মুসান্নার মৃদু হাসি, অথবা দু একটা মিষ্টি কথা শুনেই দীর্ঘ সফরের কষ্ট, ক্ষুধা আর পিপাসার কথা ভুলে যেত। যদি কেউ সংবাদ দিত, অমুক কবিলার ওপর আপনার পয়গামের কোন প্রভাব পড়েনি, বিদ্রোহীদের সাথে থাকার জন্য ওরা অটল, তবে নিজের ভাই অথবা অন্য কোন সর্দারকে তাবুর দায়িত্ব দিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতেন

মুসান্না। জানবাজরা তাঁর সঙ্গী হবার জন্য জেদ ধরলে তিনি এই বলে ওদের থামিয়ে দিতেন, আমি আমার দেশবাসীর হাতে শহীদ হবো, এই যদি আল্লাহর মঞ্জুর হয় তবে আমার চারপাশে লৌহ প্রাচীর দিয়েও আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তিনি যদি তাঁর দ্বীনের খেদমতের জন্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, দুনিয়ার কোন শক্তিই আমায় পরাস্ত করতে পারবে না।'

মুসান্না নিজের প্রশস্ত তাবুতে স্থান দিয়েছিলেন হাসানকে। প্রতি মুহূর্তে ও অনুভব করছিল, এ মানুষটির ব্যক্তিত্বের সীমাহীন শক্তি তাকে আকর্ষণ করছে। কিসরার ফৌজের জেনারেলদের সে দেখেছে, সামান্য কারণে কঠোর শাস্তি দেয়ার ফলে সিপাইরা যাদের সামনে গর্দান ঝুকাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সালার আর সিপাইদের মাঝে এ মহব্বত ও সম্প্রীতি ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। উঁচু নিচুর কোন প্রভেদ ছিল না এখানে। কবিলার সর্দার আর সাধারণ মানুষ খানা খেতো একই দস্তরখানে। নামাজের সারিতে মনে হতো ওরা সব এক খান্দানের লোক। রোম ও ইরানের ফৌজ দেখেছে হাসান, অবসর সময়ে ওরা মেতে থাকত শবার, জুয়া আর বিলাসিতায়। ছাউনীর আশপাশের বস্তিগুলো হত ওদের শিকার ভূমি। কিন্তু ইসলামের গাজীরা প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদের প্রস্তুতি আর বিজয়ের জন্যে দোয়া করেই কাটিয়ে দিতেন। শরার আর জুয়া ওদের জন্যে ছিল হারাম। যেসব অপরাধ ও গুনাহকে সৈনিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ মনে করা হতো তারা ছিলেন সে সব থেকে পবিত্র। হাসান হয়রান হয়ে যেতো মানবিক ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের এ সম্পর্কের কথা ভেবে, যা উঁচু নিচুর সব ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়েছিল। সংগঠন ও সংহতির কোন অভাব ওদের ছিল না। বিবেকের সীমাহীন স্বাধীনতা সত্ত্বেও ওদের চিন্তা ও কর্মে ছিল আশ্চর্য রকমের মিল। সালারের সামান্য ইশারাকেই ওরা হুকুম মনে করত। তাদের জরুরী কেবল এতটুকু শান্তনা, মুসান্না তাদের মুক্তির পথে দেখবেন। ওরা ভাবত না, এ পথে কদম তুললে কত দরিয়া, কত পাহাড় আর মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে ওদের। তারা তাদের দৃঢ়চেতা নেতার প্রশস্ত পেশানীতে দেখেছিল বিজয় আর সাহায্যের সুসংবাদ।

চারদিন অতিবাহিত হয়েছে। মুসান্নার সাথে মন খুলে আলাপ করার মওকা পায়নি হাসান। কখনো মুহূর্তের জন্যে হাসানের দিকে ফিরতেন তিনি। তার হাল হকিকত জিজ্ঞেস করে সংগীদের হুকুম দিতেন তার আরামের দিকে খেয়াল রাখতে। তারপর আবার নিজের কাজে লেগে যেতেন তিনি। এক কোণায় বসে হাসান নীরবে শুনত কাসেদদের সাথে মুসান্নার আলাপ আলোচনা। প্রতি মুহূর্তে দূরের ও কাছের সব অবস্থার খবর পেত ও। কাসেদদের সংবাদ শুনে এবং তাদের নতুন অভিযানে রওয়ানা করিয়ে ওসব কবিলার প্রতিনিধিদের সাথে তিনি মোলাকাত করতেন, দ্বিতীয়বার যারা ইসলাম কবুল করছিল। তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধির দায়িত্ব এমন সব বিনয়ী ও নিষ্কলংক মোবাল্লেগদের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ওয়াকফ করা

ছিল দ্বীনে হকের প্রচার এবং প্রসারের জন্য। স্বেচ্ছাসেবকদের সামনে কোরানের দরস দিতেন এরা। শোনাতেন রাসূলে করীমের জীবন কাহিনী। বর্ণনা করতেন সাহাবাদের মর্যাদা। তাদের সান্নিধ্যে বসে হাসান অনুভব করত তার সামনে জ্ঞানের নতুন দরজা খুলে যাচ্ছে। এই দুনিয়ার বিশালতা সেই চিরস্থায়ী আনন্দে ভরপুর, ইসলাম পুর্ব যুগে যার অন্বেষায় অগনিত সত্যান্বেষী কাফেলা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জীবন দিয়েছিল আরব ও আজমের নিশানাহীন পথে। ইসলামের অতীত বর্তমানকে তার মনে হতো নিজের অতীত বর্তমান। ইসলামের ভবিষ্যতের জন্যে খোদার বান্দাদের দোয়াতে ও তার আত্মার প্রতিধ্বনি শুনতে পেত।

একরাতে মুসান্না গেছেন কোন অভিযানে। তাবুর সামনে খোলা ময়দানে বসে মোবাল্লিগদের বক্তৃতা শুনছিল স্বেচ্ছাসেবকরা। ইসলাম পুর্ব যুগের আরববের করুণ অবস্থার কথা বলে মুবাল্লিগ যখন আল্লাহর সেই নিয়ামত উল্লেখ করলেন, যা মহানবীর উম্মতের ওপর নাজিল হয়েছে, কেঁদে আকুল হলেন শ্রোতারা। বক্তৃতা শেষে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সবাই। হাসান ছুটে মুবাল্লিগের কাছে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ভাইসব, থামুন, আমি কিছু বলতে চাই।'

সবাই থেমে চাইল তার দিকে। খানিক নীরব থেকে আবার মুখ খুলল হাসান। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললঃ 'ভাইসব, তোমার সাক্ষী থেকো, আজ থেকে আমি ইসলাম কবুল করলাম।'

আবেগে তার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এল। লোকেরা একের পর এক এগিয়ে বুক মিলাল তার সাথে। সবাই তাকে মোবারকবাদ জানাল। জবাবে সে বার বার বলতে লাগলঃ 'ভায়েরা, আমার জন্যে দোয়া করবেন যেন আল্লাহর পথে অটল থাকতে পারি।'

ফজরের নামাজ শেষে ছাউনী থেকে বেরিয়ে এল হাসান। টিলার উপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সূর্যোদয়ের দৃশ্য। আচানক ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে। একটু পরই ডানদিকের টিলার আড়াল থেকে মুসান্না বিন হারেসা এবং তার তিন জন সংগী বেরিয়ে এলেন। দ্রুত নিচে নেমে পথে দাঁড়াল ও। তার নিকট এসে ঘোড়া থামালেন মুসান্না। অনুযোগের স্বরে বলল হাসানঃ 'আপনার সংগীরা ছাউনীতে খুব পেরেশান। তাদের ধারনা ছিল সন্ধ্যার আগেই আপনি ফিরে আসবেন। মাঝ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে আপনার খোঁজে রওয়ানা হয়ে গেছে কয়েকজন। গতকাল পর্যন্ত আপনাকে কিছু বলার অধিকার আমার ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমান। এক নওমুসলিমের আবেগের যদি কোন মূল্য আপনার কাছে থাকে, তাহলে বলব, বর্তমান অবস্থায় বাহরাইনের মুসলমানদের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আপনার নিরাপত্তা। বিশেষ করে বিদ্রোহীদের কাছে যখন যাবেন এই পরিমান জানবাজ আপনার সাথে থাকা উচিত, প্রয়োজনে যারা ঢাল তলোয়ারের কাজ দিতে পারে।'

মুচকি হেসে ঘোড়ার থেকে নামলেন মুসান্না। হাসানের সাথে কোলাকুলি করে

বললেনঃ 'তোমায় মোবারকবাদ। তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম বাহরাইনের ইসলামী ফৌজে ভাল এক সিপাহী বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমার মুখে কলেমা তাওহীদ শোনার খাহেশ আমার যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল আমার সাথে মহব্বতের কারণে নয় বরং দ্বীনকে তুমি গ্রহণ করবে দ্বীনের প্রকৃত মর্যাদা, শান শওকত ও সততায় মুগ্ধ হয়ে। যে দ্বীন আমার মতো হাজারো ইনসানকে মূর্খতা আর গোমরাহীর অন্ধকার আবর্ত থেকে তুলে এনেছে শান্তির সোনালী পথে, সে আলোয় স্নাত হবে তুমি, এ বিশ্বাস আমার ছিল। এখন থেকে তুমি আমার এক দ্বীনি ভাই। তোমার আবেগ প্রকাশের জন্যে অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। আমার জিন্দেগী আর সব মুসলমানদের চেয়ে মূল্যবান, তোমার এ ধারনা ভুল। আমরা সবাই একই পথের মুসাফির। এ পথে চলবার প্রথম শর্ত হলো দীল হবে মৃত্যু ভয় থেকে আজাদ। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, দ্বীনের জন্য বেঁচে থাকা যেমন সৌভাগ্যের, দ্বীনের পথে মৃত্যুবরণ তার চেয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যময়। আল্লাহর নবীর সাথে ইসলামের রাজপথ ধরে যারা সফর শুরু করেছিলেন, সে সব নেক বান্দাদের জীবন কাহিনী শুনলেই তুমি এর হকিকত বুঝতে পারবে।

একজন মুমিন মওতের দুয়ারে দাঁড়িয়েও দেখতে পায় আনন্দময় জীবনের ফুলেল বাগান। তাই তার মুখে সর্বদাই তুমি দেখতে পাবে অনাবিল মুচকি হাসি। যখন তার যখম থেকে বেরিয়ে আসে খুনের ফোয়ারা, তখন সে দেখতে পায় জান্নাতের চির বাসন্তি ফুলের বাগানে পানি সিঞ্চন করছে সে। এখনো তুমি খোদার সে সব প্রিয় বান্দাদের দেখোনি, রাসূলের সিরাত আর সুরত থেকে যারা পেয়েছিল রোশনী। তাদের কাফেলা যখন এখানে এসে পৌছবে, তুমি দেখতে পাবে মানবতার সুউচ্চ ধারনার চেয়েও তাঁরা অনেক বেশী মহৎ ও মহীয়ান।'

থামলেন মুসান্না। ঘোড়ার লাগাম এক সংগীর হাতে দিয়ে বললেনঃ 'তোমারা যাও, হেঁটেই আসছি আমি।'

সংগীরা চলে গেলে আবার হাসানের দিকে ফিরলেন তিনি। বললেনঃ 'এখনো এমন কোন কাজ করিনি যাতে গর্ব করতে পারি। ইসলামের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছে তাদের বস্তিতে যেতে কোন পাহারাদারের প্রয়োজন আনুভব করি না এ জন্য যে, আমি জানি আমার কবিলার প্রতিশোধের ভয়ে ওরা কেউ আমার ওপর হাত তোলার সাহস করবে না। তোমার মামাকে দেখেছ, অন্যান্য কবিলার সাথে মিশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু নিজের ঘরই যুদ্ধের ময়দান হোক তা তিনি চাননি। সে বস্তিতে হাজির হওয়ার সময়ও আমি জানতাম, হাতেম বিন জবিয়া বাইরের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেও তোমার মামার খান্দানের তলোয়ার আমার বিরুদ্ধে উত্তোলিত করতে পারবে না। হাতেমকে হত্যা করে বাইরাইনকে আমি এক জালিমের হাত থেকে নাজাত দিতে পারতাম কিন্তু আমি জানতাম সে কায়েসের মেহমান। আমার মত সেও তার হিফাজতে রয়েছে, তাই তাকে কিছু বলিনি।

তবুও সে অভিযানে আমি আমার ধারনার চেয়ে অধিক সাফল্য লাভ করেছি। যে সব লোক জমায়েত হয়েছিল কায়েসের বাড়ীতে তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিতে অস্বীকার করেছে। বিদায়ের সময় হাতেমের সাথে ছিল মাত্র তিরিশ ব্যক্তি। তোমার মামা আমায় পয়গাম পাঠিয়েছেন, বিদ্রোহীদের কোন সাহায্য তিনি করবেন না। আমার বিশ্বাস, ইসলামের দিকে এগিয়ে আসতে বেশী দেরী হবে না তার। এক প্রভাবশালী সর্দারকে কাল তার কাছে পাঠিয়েছিলাম। হয়তো দু একদিনের মধ্যে তোমাকে এ খোশ খবর শোনাতে পারব যে, তোমার মামাও আমাদের সংগী হয়েছেন। বাহরাইনের হাজারো ইনসান বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে দেখে আমি সন্তুষ্ট। শুধুমাত্র বিজয়ের আশা দেখেই এ দৌড়ঝাপ করছি, তা ভেব না তুমি। আমি যা করছি এ আমার দায়িত্ব। কেউ এগিয়ে না এলেও আমি হিম্মত হারাতাম না। আমার সামনে যদি থাকত দুশমনের নেজার প্রাচীর আর দোস্তরা বলত তুমি জীবিত ফিরে আসতে পারবে না, তবু অবশ্যই আমি ওদের কাছে যেতাম। ওদের রুখতাম আমার সিনা দিয়ে। মৃত্যুর মুহূর্তে এই হতো আমার শান্তনা যে, আমার জিন্দেগীর মাকসাদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার দেহ আর জেহেনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেছি খোদার দ্বীনের পথকে কন্টকমুক্ত ও বাঁধাহীন করতে। ঐ জমিনে আমার খুন ঝরেছে, যেখানে একদিন উড়বে ইসলামের বিজয় পতাকা। কিয়ামতের দিন আমার সামনে থাকবে বদর ও ওহুদের শহীদান, ডানে বামে থাকবে রাসূলের দ্বীন বুলন্দ করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছে তাদের সারি। পরাজয় অথবা ব্যর্থতা সে মুজাহিদের তকদীর নয়, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী যারা আখেরাতের চিরন্তন জীবনের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আখেরাতে যাদের ঈমান নেই মৃত্যু শুধু তাদেরই পরাজয় বয়ে আনে। এবার চলো, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

তার সাথে চলল হাসান। কয়েক পা এগিয়ে সে বললঃ 'আমি শুনেছি জুয়াসীতে মুসলমানদের অবরোধকারীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনকে দিন। হেজাযের যে লশকরের প্রতীক্ষা আপনি করছেন তারা কবে পৌছবে?'

ঃ 'খুব বেশী হলে চারদিনের মধ্যেই ওরা পৌছে যাবেন।'

ঃ 'বিদ্রোহীদের সংখ্যা দশ হাজারে পৌছেছে একথা কি ঠিক?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু এ সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা খতম হয়ে গেছে। বদলে যাচ্ছে বাতাসের গতি। হাতেম এবং তার সংগীরা গত পাঁচদিনে যে কয়জনকে দলে ভিড়িয়েছে আমাদের সাথে এসেছে তার দ্বিগুণ।'

ঃ 'ধরে নিন হেজাযী ফৌজ আসতে কদিন দেরী হল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিষ্ট হয়ে এসময় মুসলমানরা যদি হাতিয়ার ছেড়ে দেয়?'

ঃ 'এমন কথা ধরে নিতে পারি না। আমার ধারনার পূর্বেই পৌছে যাবে হেজাযের মুজাহিদ।'

খানিক নীরবে চললেন দু'জন। আচানক মুসান্না হাসানের দিকে ফিরে বললেনঃ 'মুরতাদদের সাথে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের লড়াই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু সাথে সাথেই আজমের বিশাল কাফের শক্তির সাথে শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে গোটা মুসলিম উম্মাহকে।'

ঃ 'ইরানের সাথে লড়াইয়ের ঝুঁকি নেবেন শুনে প্রথম সাক্ষাতেই খুশী হয়েছিলাম। আমার খুশীর কারণ ছিল পরিস্থিতি আমায় ইরানের দুশমন হতে বাধ্য করেছে। আমি ভাবতাম আহত মানসিকতা নিয়ে। কিন্তু এক সিপাই হিসেবে যখন ভাবি, আমার মনে হয় ইরানের মোকাবেলায় আরবদের দাঁড় করানো হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মোযেজা।'

ঃ 'এই মোজেযা দেখার জন্য বেশী সময় তোমাকে অপেক্ষা করতে হবেনা। আর আজম বলতে আমি শুধু ইরানের সীমান্তের কথা তো বলিনি?'

পেরেশান হয়ে হাসান প্রশ্ন করলঃ 'আপনারা কি রোম ও ইরানের সাথে একই সংগে লড়তে চাইছেন?'

ঃ 'না, আমি বলতে চাই রোম ও ইরান আমাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। তাদের তরবারীর জওয়াবে তরবারী তুলতে আমরা বাধ্য হবো। ইসলামের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলছে তাদের অধিকাংশই রোম ও ইরান দ্বারা প্রভাবিত, এ সত্য নিশ্চয় তোমার অজানা নয়।

রোম ও ইরানে কাইজার ও কিসরার ক্ষমতা খতম না হওয়া পর্যন্ত আরবের সীমানা নিরাপদ হবে না। বাহরাইনের স্থানীয় কবিলাগুলো এবং বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ আশা নিয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ছে, ইরান তাদের সাহায্য করবে। আরবে ইসলামের বিজয় ও সমৃদ্ধি যে কাইজার ও কিসরার জন্যে বিপজ্জনক, ওরা তা ভাল করেই জানে। এ জন্য সীমান্তবর্তী কবিলাগুলোর সহযোগিতায় আরবে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু আমি মনে করি, ইরান ও রোমের শক্তি সেই দ্বীনের পথ কিছুতেই আটকাতে পারবে না, খোদার জমিনে যে খোদারই বিধান কায়েম করতে চায়। রহমতের যে মেঘপুঞ্জ দেখা দিয়েছে হেজায থেকে, সে বারিধারা শুধু আরববের আসমানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তুমি বলছ, আহলে আরব যদি রোম ও ইরানের মোকাবেলায় দাঁড়ায় তবে তা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মোযেজা। আমি বলছি, ইতিহাসের চরম মোযেজা হচ্ছে আরবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও যারা জাগতিক উপকরণের মাধ্যমে ফয়সালায় পৌছাতে অভ্যস্ত ছিল তাদের ধারনা ইরানীরা চিরদিনের জন্যে রোমানদের পরাজিত করেছে। কিন্তু কয়েক বছর পর রোমানরা শুধু ইরানীদের পরাজিত করবে না বরং মক্কার কতক অসহায় মুসলমান তাদের দুশমনের ওপর বিজয় হাসিল করবে, এ ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। মোযেজায় যাদের ঈমান নেই নিজের চোখেই ওরা দেখতে

পাচ্ছে বরবাদীর গহীন আবর্ত থেকে বেরিয়ে রোমানরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে ইরানীদের গর্ব। আর অল্প কয়েকজন মুসলমান কুফরী লশকরকে পরাজিত করে প্রমাণ করেছে তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত। আমার দোস্ত, বাহরাইনের বিদ্রোহীদের সমস্যা আমার সামনে না থাকলে কতক জানবাজকে নিয়ে আজই ইরানের দিকে মুসলমানদের বিজয় পথ পরিষ্কার করা শুরু করতাম। বৈষয়িক উপকরণ কম হওয়া সত্বেও এ বিশ্বাস নিয়ে এগোতো আমার প্রতিটি কদম, যেন মাদায়েন আমার মনজিল। আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেও সেই লশকর এগিয়ে আসতো আমার পেছনে যাদের প্রতিটি সিপাহীর মধ্যে রয়েছে আমার স্বপ্ন এবং সাহস।'

মুসান্নার কথা বলার সময় হাসানের দীলের অবস্থা এমন ছিল, যদি তিনি বলতেন বাহরাইনের বিশাল পাহাড় তুলে নিক্ষেপ করব সমুদ্রে অথবা পরিবর্তন করে দেব দজলা ও ফোরাতের রোখ, তবুও তার একথা বলার সাহস হতো না যে আপনি অসম্ভব কথা বলছেন।

পারভেজের শান শওকত দেখেছে সে। দেখেছে ইরানী ফৌজের এমন সব নামজাদা জেনারেলদের, যারা পরতো রেশমী কাপড়। যাদের তলোয়ারের বাট ছিল হীরক খচিত। সৈন্য আর অস্ত্রের আধিক্যকেই ভাবত বিজয়ের একমাত্র সোপান। শানশওকতের এই সব উপকরণ ছাড়াই মুসান্না বিন হারেসার ব্যক্তিত্বকে ওর মনে হচ্ছিল অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তার চেহারায় ছিল দৃঢ়তা আর একীনের এমন রোশনী হাসানের দৃষ্টির কাছে যা ছিল অরিচিতি। এ রোশনীতে দেখা যাচ্ছিল ভবিষ্যতের নতুন মনজিল। অতীতের বিস্তারিত কাহিনী শোনার সুযোগ হয়নি বলে দুঃখ ছিল তার। ও কামনা করছিল এক বাহাদুর এবং রহমদীল ব্যক্তির হামদর্দী। কিন্তু এখন তার ব্যক্তিগত দুঃখ মুসিবত অর্থহীন মনে হচ্ছে। মুসান্নার সান্নিধ্য তাকে ব্যক্তিগত খায়েশের দ্বীপ থেকে তুলে নিয়ে এল বিশাল জগতে, প্রতিনিয়ত যেখানে উন্নত চিন্তা চেতনার চর্চা ও বিকাশ ঘটছে।

ও প্রশ্ন করলঃ 'আপনারা কি মনে করেন, বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার পর দরবারে খেলাফত থেকে ইরানের দিকে এগিয়ে যাবার অনুমতি পাবেন আপনি?'

ঃ 'আমি জানিনা, শুধু এদ্দুর বলতে পারি, বাহরাইনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে আমার মতের কয়েক শো অথবা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক পাবো। কমপক্ষে আমার কবিলার প্রতিটি জওয়ান আমাকে সংগ দেবে কিছু না ভেবেই। ইরাকের সে এলাকার দিকে আমি এগিয়ে যাব, যেখানে সোনা ফলে, কিন্তু অমানুষিক শ্রমের বিনিময়েও কৃষকদের ভাগ্যে জোটেনা এক টুকরো রুটি। ইরানী শাসকবর্গ যাদের ভারবাহী জানোয়ার মনে করে, তাদের কাছে নিয়ে যাব ন্যায় এবং সাম্য ও স্বাধীনতার পয়গাম। যখন আমরা মাদায়েনের পথ ধরব, ওরা হবে আমার সফর সংগী। সফর শুরু করলে দরবারে খেলাফত কি করবে তা আমি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, সিদ্দিকে

আকবর (রাঃ) আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

ঃ 'কিন্তু যদি ইরানের কোন সালার কিসরার হুকুম ছাড়াই কোথাও লড়াই শুরু করে দেয়, সে হবে নিকৃষ্টতম সাজার অধিকারী।'

ঃ 'ইরানের সিপাহসালার এবং সৈন্যরা শুধুমাত্র কিসরার বিজয়ের জন্যই লড়াই করে। কিন্তু আমারা জিহাদ করছি খোদার দ্বীনকে কায়েম করার জন্য। আর আমি মুসলমানদের সিপাহসালার নই। এখনো কোন পদের এখতিয়ারও হাসিল হয়নি। আমার অগ্রাভিযানের ফয়সালা ভুল কি সঠিক, সিদ্দিকে আকবর নিজেই তা নির্ধারণ করবেন। অবশ্যই তিনি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি যখন শোনবেন, বাহরাইনের একটা দল খোদার দ্বীন বুলন্দ করার জন্য ইরানের পথ ধরেছে, নিশ্চয় তার দোয়া আমরা পাব। আমার শুধু প্রমাণ করতে হবে, এখুনি ইরানের সাথে শক্তি পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। আমার বিশ্বাস, তা আমি প্রমাণ করতে পারব। ইসলামী লশকরের নেতৃত্ব রয়েছে এমন এক ব্যক্তির হাতে, যার কোন বিকল্প ইরানের কাছে নেই। এ আমাদের খোশ কিসমত। এখনো তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি। তবুও আমি অনুভব করছি, দ্বীনের ব্যাপারে তার চিন্তাধারা আমার চাইতে আলাদা নয়। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সহযোগিতা করবেন।'

ঃ 'তিনি কে?'

ঃ 'তার নাম খালিদ বিন ওয়ালীদ। যিনি তরবারীর অগ্রভাগ দিয়ে আরব আজমের পুরাতন নকশায় টানছেন নতুন রেখা। যার লড়াইয়ের ইতিহাসে 'পরাজয়' নামের শব্দ নেই। তিনি বাহরাইনের বাসিন্দা হলে হয়তো ইতিমধ্যেই ইরানের পথে কয়েক মনযিল আমরা অতিক্রম করে যেতাম। প্রায়ই আমি ভাবি, আমার তৎপরতার কোন এক সংবাদে যদি এই মহান ইনসানের চেহারায় দেখা দেয় মৃদু হাসি, তবে তা হবে আমার জন্যে অনেক বড় এনাম।'

তাবুর কাছে এসে হাসানকে ছেড়ে সেসব স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে ফিরলেন মুসান্না, যারা ছুটে এসে স্বাগত জানাচ্ছিল তাকে।

সেদিনই সন্ধ্যার একটু আগে কায়েস বিন আকরাম এবং তার দেড়শো অশ্বারোহীকে স্বাগত জানালেন মুসান্না বিন হারেসা। রসদ বোঝাই আশিটি উটের কাফেলা আসছিল তাদের পেছনে। ঘোড়া থেকে নেমে মুসান্নার সাথে মুসাফেহা করে কায়েস বললেনঃ 'আপনি আমার বাড়ীতে গেলেন অথচ আপনাকে খাওয়ানোর কোন সুযোগ আমার হলো না এ কথা মনে হলেই আমার বড় কষ্ট হয়। আফসোস, হাতেমের মতো লোকের সাথে মিশে আরবদের মেহমানদারীর আদব পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার সে খাবার আমি এখানে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'শোকরিয়া, এখানে খাবার ও রসদের কোন কমতি নেই। অন্যান্য কবিলার সর্দাররাও আপনার মত মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। এইমাত্র সংবাদ পেলাম, আলা বিন হাজরামীর লশকর কাল জুয়াসী থেকে এক মনজিল দূরে ছাউনী ফেলবেন।

শেষরাতে তাদের সম্বর্ধনার জন্যে আমরা এখান থেকে রওনা হব। আপনার সরঞ্জামাদি এখানে না নামিয়ে ওখানে পাঠিয়ে দিন। মদীনার লশকরদের হয়তো খাদ্যের প্রয়োজন হতে পারে। আলা বিন হাজরামীর থাকার এন্তেজাম করার জন্যে কয়েকজন আসরের পরই এখান থেকে রওনা হবে। আপনার উঠগুলো ওদের সাথে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। উঠের হিফাজতের জন্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাকর্মীকে দায়িত্ব দিচ্ছি।'

ঃ 'মদীনার লশকর এসে থাকলে এক মনযিল নয়, তাদের সম্বর্ধনার জন্যে তিন মনযিল সফর করেও আনন্দ অনুভব করব। কিন্তু আমার ভাগ্নে কোথায়?'

ঃ 'মামুজান, আমি এখানে।'

একদল স্বেচ্ছাকর্মীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে জওয়াব দিল হাসান।

তার সাথে মুসাফেহা করে আদর করে কাঁধে হাত রেখে কায়েস বললেনঃ 'আমার সাথে রাগ করে চলে এসেছ তুমি। কিন্তু আমি তোমার শোকর গোজারী করছি। এক বুড়োকে বরবাদী থেকে তুমি বাঁচিয়েছো।'

ঃ 'আমিও আপনার শোকর গোজারী করছি। অসহায় হয়ে আপনার কাছে না গেলে মুসান্না বিন হারেসার সাথে মোলাকাত হতো না, আর এ মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ না হলে হয় তো আজ এখানে থাকতাম না।'

মুসান্নার দিকে ফিরে কায়েস বললেনঃ 'আমার ভাগ্নে রোম ও ইরানের লড়াইগুলোতে অংশ নিয়েছিল। এই নওজোয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমার খান্দানের নেতৃত্ব দেবে, আপনি যাওয়ার আগে সংগীদের এ খবরই আমি শোনাচ্ছিলাম। এখন ইসলামের ঝান্ডা হাতে তুলে নেয়ার পর আপনার কাছে দরখাস্ত করব, ওকে অন্য কোন দায়িত্ব না দিয়ে থাকলে আমার লোকদের নেতৃত্ব আমি ওর হাতেই দিতে চাই।'

ঃ 'ওর কোন পরীক্ষা এখনো আমি নেইনি, তবুও আমি অনুভব করছি ও আপনাকে নিরাশ করবে না।'

পরদিন সূর্যাস্তের ঘন্টা খানেক পূর্বে জুয়াসীর এক মনযিল দূরে আলা বিন হাজরামীর লশকরকে স্বাগত জানাল মুসান্না বিন হারেসা এবং তার সংগীরা। লশকরে বনু তমীম এবং হানিফের সেসব স্বেচ্ছাসেবকও ছিলেন বিদ্রোহের যুগেও যারা কায়েম ছিলেন দ্বীনের ওপর। রাস্তার বিভিন্ন মনযিলে ওরা শামিল হয়েছে মদীনার লশকরের সংগে। এরা ছাড়াও ইয়ামেনের কতক সর্দার নিজ নিজ কবিলার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আলা বিন হাজরামীর লশকরে ছিলেন।

রাতের শেষ প্রহর। আলা বিন হাজরামী ফৌজের সালারদের সাথে আগামী লড়াই সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। মুসান্না বিন হারেসা তাবুতে প্রবেশ করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেনঃ 'সকালে আমরা হামলা করব না।'

উপস্থিত সবাই তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আলা বিন হাজরামী বললেনঃ 'দুশমনের সংখ্যাধিক্য কি বাহরাইনে কোন সমস্যা করেছে?'

নিশ্চিন্তে বসতে বসতে জওয়াব দিলেন মুসান্নাঃ 'আমার যদি একীন না হতো যে, এ লড়াইয়ে আমরা বিজয় লাভ করছি তবে সন্ধ্যার অন্ধকারও আমার তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে পারতো না। বিদ্রোহীদেরকে আমি পরাজয়ের স্বীকৃতির সুযোগ দিতে চাই। আমি চাই ওদের বেশীর ভাগ আমাদের হাতে খুন হওয়া থেকে বেঁচে যাক, গোমরাহীর পথে ছেড়ে এসে মিশুক আমাদের সাথে। আমার বিশ্বাস, দিনকতক ওদের রসদের পথ আটকে রেখে ছোটখাট দু একটা হামলা করলে হাতেম বিন জবিয়ার সংগ ছেড়ে ওদের অধিকাংশই পালিয়ে যাবে। এরপর হাতেমের যৎসামান্য ফৌজকে মামুলী হামলায়ই আমরা পরাজিত করতে পারব। আজকে যারা আমাদের দুশমন কাল ওরাই দজলা ফোরাতের উপকূলে ইসলামী লশকরের আগে আগে থেকে গৌরব বোধ করবে। আমার দৃষ্টিতে আরবের ভবিষ্যত হলো ইসলাম। বাহ্‌রাইনের ভবিষ্যত আরব থেকে আলাদা হতে পারে না। আরব সীমান্ত ছেড়ে আমরা যখন সামনের পথ ধরব শুধু বাহরাইনবাসীই নয় বরং অধিকাংশ ইরাকী থাকবে আমাদের সাথে। সেই দরিয়ার মত হবে আমাদের অবস্থা, পথ চলতে চলতে যে নদী-নালাকেও কোলে টেনে নেয়। বাহরাইনে ইসলামী ঝান্ডা উত্তোলনের জন্যে অতিরিক্ত খুন ঝরাতে হবে না আমাদের। এখন নতুন কোন সাহায্যকারী পাবে না হাতেম। পুরানোরাও তাকে ছেড়ে একে একে চলে যাবে। নিজের শক্তির চেয়ে ইরানী সাহায্যের আশায়ই সে বিদ্রোহ করেছিল। বাহরাইনে এসে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করার অবস্থায় নেই ইরান।'

বনু আবদুল কায়েসের এক রইস বললেনঃ 'মুরতাদরা যে জুলুম আমাদের ওপর করেছে তা প্রকাশের অযোগ্য। তবুও মুসান্না বিন হারেসার এ প্রস্তাবে আমি একমত। বিদ্রোহীদের ফিরে আসার ব্যাপার নিরাশ হলেই শুধু ফয়সালামূলক লড়াইয়ে আমরা যাব। আমার বিশ্বাস, আমরা সফল অবরোধ করতে পারলে হাতেমের সংগে অল্প সংখ্যক বিদ্রোহীই থাকবে।'

আলা বিন হাজরামী মুসান্নাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বাহরাইনের অবস্থা আপনার চেয়ে বেশী কেউ অবগত নয়। এই যদি হয় আপনার ফয়সালা, আরো কদিন অপেক্ষা করতে আমরা তৈরী।'

অবরুদ্ধ হয়ে বনু আবদুল কায়েসের যে অবস্থা হয়েছিল দুদিন পর হাতেম বিন জবিয়ার সেই অবস্থা হল। দিন দিন কমতে লাগল তার সংগী। এক রাতে হাতেমের কয়েকজন সাথী ফেরার হয়ে মুসলমান ছাউনীতে এসে বললঃ 'হাতেমের সাথে ইরানী এবং বিদেশী মিলে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য রয়েছে। তারা আশা করছে, ইরাকে কিসরার করদ প্রজারা তাদের সাহায্যের জন্য আরবী লশকর জমা করছে। বিদেশীরা দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।'

খানিক পর। বিদ্রোহী ছাউনী থেকে ভেসে এল শরাবীদের চীৎকার। তিন দিক থেকে হামলা করেছে মুসলমানরা। বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাওয়া শুকনো ঘাসের মত হল বিদ্রোহীদের অবস্থা। আঁধারের সুযোগ নিয়ে তিন হাজার ব্যক্তি পালিয়ে গেল সমুদ্র উপকূলের দিকে। আটশো নিহত এবং আহত হলো। বাকীরা এদিক ওদিক লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে হাতিয়ার সমর্পন করল ভোরবেলা। হাতেম ছাড়াও আরো কতক প্রভাবশালী সর্দার নিহত হল। এ সংঘাতের পরে সমুদ্র উপকুলে একটিমাত্র কেল্লা রইল বিদ্রোহীদের দখলে। পরের সন্ধ্যায় বিদ্রোহীদের ধাওয়া করে কেল্লার কাছে পৌছলেন মুসলমানরা। কিশতিতে সওয়ার হয়ে দারাউ দ্বীপে পালিয়ে গেল ওরা। রাতভর আশপাশের বন্দরে মুসলমানরা কিস্তির তালাশ করল। কিন্তু জানতে পারল বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রভাবাধীন স্থানীয় মাল্লারা নিজেদের কিশতিগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়েছে।

পরদিন। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে উট ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নদীর পারে কাতারবন্দী হল মুজাহিদরা। তাদের মনযিল কোথায় সেনাপতি এবং কয়েকজন সালার ছাড়া কারো জানা ছিল না। ওরা শধু জানত, ভোরেই ওদের মার্চ করতে হবে। ভোরের তাজা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে সাগর তরঙ্গের লীলাময় দৃশ্য দেখছিল ওরা। দরিয়ার মাঝে বিন্দুর মত একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। সবার আগে ছিলেন আলা বিন হাজরামী এবং মুসান্না বিন হারেসা। সাগরের ঢেউ ওদের ঘোড়ার পা ছুয়ে যাচিছল। আচানক ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে লশকরের দিকে ফিরে আলা বিন হাজরামী বুলন্দ আওয়াজে বললেনঃ 'ইসলামের গাজীরা, বাহরাইনে খোদাদ্রোহীদের পতাকা ধূলায় লুণ্ঠিত। তোমাদের সততা ও নিষ্ঠার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন গৌরবময় বিজয়। দুশমন এখন আশ্রয় নিয়েছে দারাইন। ওরা ভাবছে, দ্বীপকে কেন্দ্র করে ওরা আমাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এ তরঙ্গ আমাদের মাঝে বাঁধা হয়ে থাকবে আমরা ওদের কিছুই করতে পার বনা। অল্প কয়েক হাজার বিদ্রোহী আমাদের জন্যে বড় বিপদের কারণ হবে তেমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ইরানের দালাল হয়ে ফিতনার নতুন দুয়ার ওরা খুলে দিতে পারে। এ দ্বীপকে সামুদ্রিক ঘাটি করার মওকা ইরানকে আমারা দিতে চাই না। আমাদের সামনে সাগরের তরঙ্গমালা বাঁধা হয়ে থাকতে পারে না।'

থামলেন আলা বিন হাজরামী।

এক আরব বললঃ 'দারাইন বিজয়ের জন্যে শুধু গোটা কয় কিশতির প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্থানীয় মাল্লারা আমাদের সাহায্য করতে রাজী হবে।'

ঃ 'দারাইন বিজয়ের জন্যে কিশতিরও দরকার নেই। এই নদী ততো গভীর নয়। যদি তোমরা হিম্মতের সাথে কাজ কর তবে তোমাদের সুসংবাদ দিতে পারি, দারাইন

উপকূলে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের প্রতীক্ষা করছে। আমরা জোহর পড়ব ওখানে।'

মুসান্না দরাজ কণ্ঠে বললেনঃ 'মুজাহিদ সব! আমীরের হুকুম তোমরা শুনেছ?'

জওয়াবে উচ্চকিত হল 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মুসান্না এবং আলা বিন হাজরামী লাফিয়ে পড়লেন সাগরে। দেখতে না দেখতে গোটা ফৌজ সাগরে লাফিয়ে পড়ল। একটু পর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে সেদিনের সূর্য দেখছিল ইনসানিয়াতের শানদার বিজয়ের দৃশ্য। ইতিহাস বলছে, দারাইন আশ্রয় গ্রহণকারী বিদ্রোহীরা যখন দেখলো ঘোড়া আর উটে সওয়ার হয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছে মুসলমানরা, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ওরা। কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ঐসব দীলের গভীরে যদি পৌঁছতে পারতো, যেখানে রয়েছে মুসলমানদের দৃঢ়তা আর সাহসিকতার প্রাণ– তাহলেই ওরা খুঁজে পেত এ শানদার বিজয়ের মূল রহস্য।

সাত

দারাইন বিজয়ের কয়েক দিন পর ফিরে এসে বাহরাইনে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন আলা বিন হাজরামী। পারস্যের সাগর উপকূলের মত আভ্যন্তরীণ ফিতনা থেকে বাকী আরবও নিরাপদ ছিল। তৌহিদী কাফেলা জীবনের রাজপথে এগিয়ে চলছিল নতুন উদ্দীপনা নিয়ে।

আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। এখান থেকে কাইজার ও কিসরার সে বিশাল সালতানাত শুরু হয়েছে, অতীত শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে ছিল যার শানদার কাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে যুগের দৃষ্টি এই প্রথমবার আরবদের একটা জাতি এবং আরবকে একটা রাষ্ট্র হিসাবে দেখছিল। এ নতুন রাষ্ট্র ও নতুন জাতি নিজেদের ইতিহাসের সূচনাতে মোকাবিলা করছিল দুই বিশাল সাম্রাজ্যের।

সিরিয়া ছিল হেজাযের নিকটবর্তী। হেজাযবাসী সিরিয়ার রোমান শাসকদের পরিকল্পনা সম্পর্কে ছিল অনেকটা অবহিত। গত রোম-ইরানের লড়াইয়ে শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাইজার। তার প্রভাব ছিল এত প্রসারিত যে, যে কোন সময় তারা মুসলমানদের জন্যে এক বিপদ হিসেবে দাঁড়াতে পারত। ওদেরকে মদীনা আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে মুজাহিদরাই এগিয়ে গেল সিরিয়া সীমান্তে। প্রমাণ করল তাদের তরবারীই তাদের হিফাজত করতে সক্ষম। সিরিয়া সীমান্তে মুসলমান আর রোমানদের প্রাথমিক সংঘর্ষগুলোর ফলে সে কঠিন পথে এগিয়ে গেল হেজাযী কাফেলা, সামনে এগিয়ে ইয়ারমুক আর আজনাদাইনের প্রান্তর অতিক্রম করেছে যে পথ।

রোমানদের কাছে চরম পরাজয়ের পর আভ্যন্তরীণ বিপর্যের সম্মুখীন হল ইরান।

তাই ওদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনা থাকলেও একই সময় পূর্ব ও পশ্চিম দুই বিশাল সালতানাতের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ছিল কল্পনার বাইরে। কিন্তু রোমের খৃষ্টান এবং ইরানের মাজুসী উভয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যে আরবে ইসলামের উত্থানকে সমানভাবেই বিপজ্জনক মনে করত।

প্রথম খলিফার সময়ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মদ্রোহী আন্দোলনে ইরাক সীমান্তের যেসব কবিলা অংশ নিয়েছিল ওরা ছিল ইরানী হুকুমতের অধীন। মেসোপটেমিয়ার বনু ইয়ারবু গোত্রের ভন্ড নবী সুজা মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আরবের ধর্মদ্রোহী কবিলাগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল। নাবাজ নামক স্থানে আওস বিন খুজাইয়ামার হাতে পরাজিত হয়ে মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে সংগ দেবে এ আশা নিয়েই আরবে প্রবেশ করেছিল সুজা। কিন্তু তাদের অধিকাংশকে ইয়ামামার সংগী হতে দেখে নিরাশ হল সে। শক্তি পরীক্ষার জন্য ফৌজ নিয়ে রওয়ানা করল ইয়ামামার দিকে। মুসায়লামাকে পরাজিত করতে পারলে বিদ্রোহীরা এসে তার সাথে যোগ দেবে বলে ধারনা করল সে। কিন্তু মুসায়লামা লড়াইয়ের এ ঝুকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সে জানত, পরাজিত হলে বিদ্রোহীরা সুজার পতাকার নিচে জমা হবে। জয়লাভ করলেও এতটা কম জোর হয়ে পড়বে সে যা দিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সন্ধি প্রস্তাবের সাথে সে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দিল সুজার কাছে। প্রস্তাব কবুল করল সুজা। ভন্ড নবীর সাথে ভন্ড মহিলা নবীর সৃষ্টি হল হৃদ্যতা। ওদের পরবর্তী মোলাকাত হল মুসায়লামার শিবিরে। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হল দু'জন। যে কারণে আরবে প্রবেশ করেছিল সুজা সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে স্বামীই যথেষ্ট, এ প্রশান্তি নিয়ে সুজা দেশে ফিরে এল।

পরিবেশ এবং পরিস্থিতি যাচাই করলে মনে হয় আরবের আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দিয়ে ফায়দা লুটতে চেয়েছিল সুজা। সে এবং তার অনুসারীরা ছিল ইরান সরকারের অধীন। আরবের কোন গোত্র থেকে আত্মপ্রকাশ করলে অন্য সব নবুয়তের মিথ্যা দাবীদারদের মত পরিষ্কার হয়ে যেত তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ছিল মদীনা থেকে অনেক দূরে। ইসলামের প্রভাব তখনো পৌছেনি সেখানে। নবুয়ত দাবী করে মদীনা আক্রমণ করার কোন বাহ্যিক কারণ ছিল না। তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা থাকলে ইরানী শাসকদের সাথে হতো তার প্রথম সংঘর্ষ। যারা তাকে ইরানী শাসকদের দালাল মনে করে তাদের ধারনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুজা মদীনার দিকে যাত্রা করার আগেই কয়েক স্থানে ইরানীরা পর্যুদস্ত হয় মুসলমানদের হাতে। ইয়েমেনের ইরানী গভর্ণর ইসলাম কবুল করেছিলেন। বাহরাইনের বিদ্রোহীরা সাহায্য পেত ইরানের। এতে মনে হয়, মরু আরবে ইসলামের বদৌলতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল, রোমানদের মত ইরানীরাও সে সম্পর্কে বেখবর ছিল না। পার্থক্য ছিল রোমানরা শক্তি প্রদর্শন করে ভয় দেখাতে চাইছিল মুসলমানদের, জওয়াবে মুসলমাদেরও তরবারী ধরতে হয়েছিল, কিন্তু ইরানীরা

কেবল ষড়যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাহরাইনের বিদ্রোহ নির্মূলের সাথে সাথে বাহ্যত ষড়যন্ত্রের দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহরাইনের এক দৃঢ়চেতা সিপাহী মুসান্না বিন হারেসা ইসলাম আর অগ্নিপুজারীদের সংঘর্ষ অনিবার্য মনে করতেন। দিগন্তের ঈষাণ কোণে তিনি দেখেছিলেন প্রলয়ের ঘনঘটা। তিনি জানতেন, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটে গেলে এবং তাদের প্রস্তুতির সুযোগ দিলে ইরানীরা আরবদের আক্রমণ করতে কোন বাহানা খুঁজবে না। যে ইরানী অর্থনীতির বুনিয়াদ অসাম্যের ওপর স্বভাবতই তারা সে ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে, যার ভিত্তি সমতা আর ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। খোদার এ জমিনে তার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে যারা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে মুসান্না মাদায়েনকে ভাবতেন তাদের প্রথম মনযিল। তিনি মনে করতেন, ইরানের সাথে সংঘর্ষে গড়িমসি করলে অথবা ওদের প্রস্তুতির সুযোগ দিলে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে মুসলমানরা।

রোম ও ইরান উভয়েই দুশমন ভাবছে মুসলমানদের, যে কোন সময় এদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যেতে পারে ওরা। এ জন্যেই মুসান্না ইরানের দিকে খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের কবিলার জানবাজদের নিয়ে তিনি ইরাকে হামলা করলেন। তার কাছে খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করার এ ছিল সহজ পথ। শুরুর দিকে সীমান্তবর্তী ইরানের সামন্ত প্রভু এবং জমিদারদের কাছে এ হামলা ছিল হাস্যাস্পদ। কিন্তু খুব শীঘ্রই ওরা এক অযাচিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। আচানক কোন চৌকিতে হামলা করে ইরানী লশকর ছিন্নভিন্ন করে দিতেন মুসান্না। কোন ছাউনী থেকে বড় রকমের ফৌজের আগমন সংবাদ পেলেই কয়েকশো মাইল দূরে আরেক চৌকিতে হামলা করতেন তিনি। হাতের রেখার মতই ইরানের ভৌগলিক অবস্থা জানা ছিল তার। সংগীদের জন্য রসদের অভাব ছিল না। পিছনে বিস্তীর্ণ বিশাল মরু– প্রয়োজনে যেখানে আশ্রয় নেয়া যেত। সামনে ছিল শস্য ভূমি, যেখানে ছিল ঘোড়ার ঘাস আর সওয়ারদের জন্যে প্রচুর খাদ্য। যুগ যুগ ধরে ইরানী জমিদারদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক আর রাখালরা এদের মনে করত মুক্তির দিশারী।

হরমুজের অধীনস্থ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে মুজাহিদদের অভিযানের সূচনা। দক্ষিণ প্রান্তসীমা থেকে শুরু করে ফোরাতের অববাহিকা এবং হাফির থেকে পশ্চিমে হিরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল হরমুজের রাজ্যসীমা। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে সে কমপক্ষে দশ হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফৌজকে ময়দানে হাজির করতে পারতো। অধীনস্থ জমিদারদের কাছেও সাহায্য পেত সমপরিমাণ সিপাহী।

মুসান্না হরমুজকে মনে করতেন পথের প্রথম বাঁধা। অল্প কজন মুজাহিদ নিয়ে খোলা ময়দানে হরমুজের সাথে সংঘর্ষে আসতে পারবেন না, তাও তিনি জানতেন। এ তার উদ্দেশ্যও ছিল না।

নিয়মিত লড়াইয়ের পরিবর্তে গেরিলা হামলার মাধ্যমে ইরানী দাপট মিটিয়ে

দিতে চাইছিলেন তিনি। ইরাকের করদ কবিলাগুলোর মন থেকে 'ইরানী ভয়' উঠে গেলে ওদের দলে ভিড়ানো যাবে, এ প্রমাণ পেয়েছিলেন মুসান্না।

দুর্দান্ত প্রতাবশালী শাসককে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে বাধ্য করাই ছিল মুসান্নার প্রথম সাফল্য। দ্বিতীয় কামিয়াবী ছিল স্থানীয় আরবরা ইরানী জমিদারদের ছেড়ে ঝুঁকে পড়ছিলেন মুসলমানদের দিকে।

সীমান্তের যে সব কৃষক আর রাখালদের বস্তি অতিক্রম করতেন মুসান্না, ওদের মুর্ছিত চেহারায় ফুটে উঠত আশার আলো। তিন মাসের মধ্যে তিনি কোথাও দু'চার দিনের বেশী অবস্থান করেননি। বঞ্চিত মানুষগুলোর হৃদয়ে যে আসন তিনি লাভ করেছেন তা কোন কেল্লা অথবা দেশ জয়ের চেয়ে কম নয়। মুজহিদদের সাথে ছিল দ্বীনের মুবাল্লিগ। নিরাপত্তার ভয়ে ইরানী জমিদাররা যখনি পালিয়ে যেত ভেতরের দিকে, এসব মুবাল্লিগের জন্যে খুলে যেত দ্বীন প্রচারের পথ। মুজাহিদরা এগিয়ে যেতেন অন্য মনযিলের পথে। তিন মাসে যে সব গ্রাম আর বস্তি অতিক্রম করেছেন মুসান্না সেখানকার শতশত ব্যক্তি ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষায় ছিল উপযুক্ত সময়ের।

সাইরাস এবং দারার উত্তরসূরীদের সালতানাতের দিকে মুসলিম লশকর এগিয়ে যাবার জন্যে যিনি পথ পরিষ্কার করছিলেন, হাসান ছিল তার সফর সংগী। সৈনিক জীবন নতুন নয় তার কাছে। সে অংশ নিয়েছিল রোম-ইরানের লড়াইগুলোতে। যুদ্ধের নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও সে ছিল অভিজ্ঞ। কিন্তু ও যখন বাহরাইন থেকে ইরানের পথ ধরেছিল মুসান্নার সাথে, একজন অভিজ্ঞ সিপাই হিসেবে ও ভেবেই পাচ্ছিল না এ সীমিত যুদ্ধ সম্ভার নিয়ে ইরানের প্রতিকূলে কি করে একটা সফল লড়াই হতে পারে। অনারবের সে সব বড় বড় সেনানায়কদেরও সে দেখেছে, যারা ময়দানে আসত শানশওকতের সাথে। অনেক গাড়ী বোঝাই হয়ে যেত যাদের ব্যক্তিগত মালপত্রে। অথচ আশ্চর্য! সামান্য এক কবিলা প্রধান মাত্র পাঁচশো সংগী নিয়ে সে বিশাল সালতানাতের সাথে টক্কর দিতে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে রসদ পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না তার। এতবড় অভিযানে এত অল্প সংখ্যক ফৌজ ও কখনো দেখেনি। ও দেখেনি এমন দৃঢ়চেতা মানুষ, যার দৃষ্টি সাতরাচ্ছিল আশা ও বিশ্বাসের আলোর সাগরে। নিদারুণ হতাশায়ও এ মানুষটির দিকে তাকালে ওর মনের আকাশে পাখা ঝাপটাত আশার পাখীরা। সব কিছু ছেড়ে তার সাথে বাঁচা মরার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠতো তার মনে। মুসান্নাই তাকে মানবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যে প্রথম দিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবাবেগে উচ্ছসিত হয়ে উঠত ও। কিন্তু ইরানের কয়েকটা সংঘর্ষের পর ও অনুভব করল, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কূদরত তাকে নির্বাচিত করেছেন, তা এর থেকেও অনেক বড়। এই হিম্মত, দৃঢ়তা আর অসাধারণ বিজয় কেবলমাত্র সিরাতুল মুস্তাকিমে চলার ফল, আল্লাহর পথে এগিয়ে চলা মুজহিদদের দৃষ্টিই শুধু যা দেখতে পায়।

ইরাকে প্রবেশ করার সময় তার এক সংগী বলেছিলঃ 'হাসান, ইরাক সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফহাল। আমাদের এ অভিযানে সাফল্যের সম্ভাবনা কদ্দুর বলতে পার?'

নির্দ্বিধায় ও বলেছিলঃ 'এ অল্প কজন মুজাহিদ কোন্ ভরসায় ওদিকে যাচ্ছি আমি জানি না। শুধু এদ্দুর জানি, মুসান্নার সাথে আমি আগুনের সমুদ্রেও ঝাপিয়ে পড়তে পারি।'

কিন্তু এখন ও মনে মনে ভাবছে, মুসান্নার হাতে কেবল খোদায়ী দ্বীনের ঝান্ডাই নয় আল্লাহর সাহায্যও রয়েছে তার সাথে। গত কয়েক সপ্তাহে কুদরতের যে মোজেযা আমি দেখেছি, এরপর এ মুজাহিদ যদি পানির উপর হাঁটে অথবা বাতাসে উড়তে থাকে, আমি আশ্চর্য হবো না।

আট

দশজন মুজাহিদ নিয়ে তাগলীব কবিলার সর্দারের ঘরে অবস্থান করছিলেন মুসান্না বিন হারেসা। আশপাশের কয়েকটা গ্রামের আরব কৃষক আর রাখালদের মেহমান ছিল তার অন্য সংগীরা। আরবীয় ঐতিহ্যে মেহমানদারীর প্রমাণ দিলেন মুসান্নার মেজবান। তার জন্যে শোয়ার ঘরগুলো খালি করে দিলেন। মাটির তৈরী এ ঘরে ছিল তিনটি প্রশস্ত কামরা। চারপাশে প্রাচীর। বাইরের খেজুর বাগানে কবিলার কৃষক আর রাখালদের ছোট ছোট ঝুপড়ি।

একদিন সূর্যোদয়ের সময় বাড়ীর আংগিনায় পায়চারী করছিলেন মুসান্না। দুশ্চিন্তার ছাপ তার চেহারায়। প্রাচীর সংলগ্ন ছাপরার নিচে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। পাশে চাটাইতে বসে আছে কয়েকজন যুবক। গভীর চিন্তা থেকে মাথা তুলে তিনি বললেনঃ 'মুয়ান্না কোথায়?'

ঃ 'তিনি ভেতরে চলে গেছেন।' জওয়াব দিল এক নওজোয়ান।

ঃ 'ডাকো তাকে।'

নওজোয়ান ছুটে গেল বাড়ীর দিকে। খানিক পর মুয়ান্না এসে দাঁড়াল বড় ভাইয়ের সামনে। মুসান্নার মতোই দেখতে মুয়ান্না। কোন ভূমিকা ছাড়াই মুসান্না বললেনঃ 'এখনো হাসান এলো না। আমরা আর তার অপেক্ষা করতে পারছি না। তার খোঁজে যাচ্ছি আমি। আমার সাথে শুধু একজন থাকবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কোন হুকুম না পেলে তোমরা যাত্রা শুরু করবে। ভোর নাগাদ সীমান্তের বনু বকরের বস্তিতে পৌছে অপেক্ষা করবে আমার।'

ঃ 'ভাইজান! গতকাল হাসানের খোঁজে যে অশ্বারোহীরা গিয়েছিল তারা নিরাশ

হয়ে ফিরে এসেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিজকে জাহির করার জন্যে সে আপনার হুকুমের তোয়াক্কা করেনি। হয়ত তার সাথী আটজনকেও হারিয়েছি আমরা।'

ঃ 'হাসান এতটা মুর্খ নয়। আমার বিশ্বাস, অযথা কোন ঝুঁকি নেবে না ও। কিন্তু তিন দিন আগেই তো তার ফিরে আসা উচিত ছিল। আমি রাতে ভাবছিলাম, তাকে পায়দল পাঠিয়ে ভুল করেছি। কোন দুশমন সওয়ার ওকে ঘিরে ধরলে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে কঠিনই হবে।'

ঃ 'তাকে পায়দল পাঠানো হয়েছে দুশমন যেন তার তৎপরতার খবর না পায়। কোন অযাচিত বিপদ দেখে হয়তো কোন আরবের ঘরে লুকিয়ে পড়েছে ওরা, আসতে দেরী হচ্ছে এ জন্যে।'

ঃ 'কিন্তু এওতো হতে পারে, পুরস্কারের লোভে কোন আরব তাকে ইরানীদের হাতে তুলে দিয়েছে!'

ঃ 'তাও হতে পারে। কিন্তু হাসানকে চিনতে যদি আমি ভুল না করে থাকি, চরম মুহূর্তেও সাথীদের বাচাঁনোর চেষ্টা করবে সে। দেখ তো কেউ আসছে হয়তো।'

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে দু'ভাই তাকালেন দরজার দিকে। এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী ভেতরে ঢুকে মুসান্নাকে দেখে দ্রুত বললঃ 'জনাব, তিনি এসে গেছেন।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মুসান্না। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে অশ্বারোহী বললঃ 'ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্যে তিনি ঝরণার কাছে থেমেছেন।'

পেরেশান হয়ে মুসান্না প্রশ্ন করলেনঃ 'কিন্তু সে কে?'

ঃ 'জনাব, হাসান এবং তার সংগীদের কথা বলছি। ওরা সবাই এসে গেছে। দূর থেকে দেখে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল হয়তো কোন ইরানী দল আসছে। নহরের কাছে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম আমরা। কিন্তু এক অশ্বারোহী আগে ভাগে পাঠিয়ে দিল ওরা। ঘোড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে শোনলাম গনিমতের মাল। সওয়ারী ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচটি ঘোড়া আছে ওদের সাথে।'

ভাইয়ের দিকে ফিরে মুসান্না বললেনঃ 'যারা হুকুম মানতে পারে না, বেশী দিন আমাদের সাথে থাকতে পারবে না তারা। সালারদের খবর পাঠাও আজ রাতেই যেন যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে নেয়। হাসান এলেই আমার কাছে পঠিয়ে দিও। একান্তে তার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

খানিক পর। সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন মুসান্না। ভেতরে প্রবেশ করে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে রইল হাসান। সালামের জবাব দিয়ে তার দিকে একনজর তাকিয়েই মুসান্না দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। খানিক নীরব থেকে মৃদু হেসে হাসান বললঃ 'জনাব, আমার সব সাথী নিরাপদে ফিরে এসেছে।'

ঃ 'আমি জানি।' হাসানের দিকে চেয়ে রাগত স্বরে জওয়াব দিলেন মুসান্না। আমি আরো শুনেছি তুমি খালি হাতে ফেরনি।'

কিছু বলতে চাইল হাসান। কিন্তু মুসান্নার মেজাজ দেখে মুখ খোলার সাহস হল না। একটু বিরতি দিয়ে মুসান্না আবার বললেনঃ 'হয়তো তোমাকে বুঝাতে পারিনি যে, এমন এক সালতানাতের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই শুরু করেছি, যাদের বৈষয়িক উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আমাদের ইচ্ছা শক্তি প্রদর্শন নয় বরং আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা। এ মহান উদ্দেশ্য হাসিল করতে যেমন প্রয়োজন হিম্মত এবং সাহস তেমনি প্রয়োজন সংগঠন এবং সংযম। তোমার বাহাদুরীর পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছে থাকলে পায়দল আট ব্যক্তিকে এ অভিযানে পাঠাতাম না। কিছু কবিলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি এবং ইরানী লশকরের তৎপরতা জানার জন্যেই তোমায় পাঠানো হয়েছিল। শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছে থাকলে কয়েক ক্রোশ দূরে বসে তোমার অভিযানের ফলাফলের অপেক্ষা করতাম।

তোমাকে হামলার অনুমতি দেইনি, বরং এমন কোন বস্তিতে যেতে বলেছি, যার বিশ্বস্ত বাসিন্দারা হরমুজের পতাকাতলে সমবেত ইরানীদের তৎপরতার সংবাদ তোমায় দিতে পারে। গত পরশু সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোমার ফিরে আসার কথা। কিন্তু তুমি কোথায়, গত দু'দিনেও আমরা জানতে পারিনি। তোমার ভাইয়ের ব্যাপার আমি জানতাম। আমার যদি এতটুকু সন্দেহ হতো সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে আমার হুকুম সম্পর্কে তোমায় বেপরোয়া করবে, তাহলে তোমায় পাঠাতাম না এ অভিযানে।'

মাথা নিচু করে মুসান্নার কথা শুনল হাসান। তিনি নীরব হলে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বেদনা মাখা কণ্ঠে বললঃ 'নিজের ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার আমার থাকলে, কোন ব্যক্তি সেখানে যাওয়া থেকে আমায় ফেরাতে পারতো না। আমাদের পথ থেকে আমাদের গ্রাম ছিল মাত্র দু মঞ্জিল দূরে। কোব্বাদের সংবাদ যারা দিতে পারবে, কোন ঝুঁকি ছাড়াই তাদের কাছে আমি পৌছতে পারতাম। কিন্তু আপনার হুকুম অমান্য করার সাহস করিনি আমি।

আমার দেরীতে আসার কারণ, হরমুজের যুদ্ধ প্রস্তুতি জানার জন্য যেসব স্থানীয় স্বেচ্ছাকর্মীদের সাহায্য নিয়েছিলাম, ওরা হরমুজের বস্তি পর্যন্ত সব ফৌজি ছাউনী দেখে এসেছে। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আমায়। এক বস্তিতে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আমার কোন কাজ ছিল না। তবুও সেখানে আমি যাইনি। এমনকি স্থানীয় কাউকে পাঠিয়ে এ সংবাদও নেইনি, আমায় ভাই কেমন আছে অথবা আমি চলে আসার পর আমার আশ্রয় দাতার ভাগ্যে কি ঘটেছে। আমার ভয় ছিল, কোন দুঃসংবাদ আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে সেখানে যেতে আমায় বাধ্য করবে।'

শেষ কথাগুলোর সাথে ধরে এল হাসানের গলা। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল ও। মুসান্না এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় অনেক পরীক্ষা আসে তাদের সামনে। বাহরাইনের যেসব মুজাহিদ আমার সাথে এসেছে, এমন

কেউ নেই যার জিন্দেগী বেদনাশূন্য। আমাদের সংগীদের সবাইকেই কোন না কোন প্রিয়জনের স্মরণ অবশ্যই ব্যথা দেয়, পরীক্ষা ক্ষেত্রে তুমি একা নও। আমায় বলেছিলে, তোমার ভাই এক শরীফ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে। কোব্বাদের ঘর যতদিন নিরাপদ থাকবে, তারও কোন বিপদ আসবে না। হাসান হিম্মত রেখো। কোব্বাদের ঘরে যদি তোমার ভাই নিরাপদ নাও হয়, তবুও তুমি একা গিয়ে তার কোন উপকার করতে পারতে না। এ মুহূর্তে তার কোন বিপদ না হলে, সেদিন বেশী দূরে নয়, এক বিজয়ী লশকর নিয়ে তুমি ওখানে যাবে। শুধু তোমার ভাই-ই নয় বরং আরব কৃষকদের প্রতিটি সন্তানকে এ পয়গাম দিতে পারবে যে, ইরানের কর্তৃত্ব আমরা খতম করে দিয়েছি। এবার তোমরা স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পার। বড় কাজের জন্য বড় সাহসের প্রয়োজন। তুমি আমায় নিরাশ করনি, এজন্য আমি খুশী হয়েছি। এবার বলো হরমুজের কি সংবাদ এনেছ?'

ঃ 'অত্যন্ত জোশের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে হরমুজ। আমাদের ভয়ে যেসব জায়গীরদাররা পালিয়ে গেছে, মাদায়েনে না গিয়ে ওদের বেশীর ভাগ তার কাছে আশ্রয় নিচ্ছে। ইরানী জমিদারদের সে হুকুম দিয়েছে, যেসব আরবদেরকে মুসলমানদের সমর্থক বলে সন্দেহ হয়, দেরী না করে ওদের হত্যা করবে। হরমুজের রোষ থেকে বাঁচার জন্য কোন কোন আরব তার ফৌজে ভর্তি হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশই আমাদের অগ্রাভিযানের অপেক্ষা করছে। আমরা ইরানী সালতানাতের সাথে লড়াই করার ফয়সালা করেছি এবং বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হলে ওরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে রাজী হবে না। ওরা জানে, আরবের কোন বড় ফৌজ যখন ইরানে প্রবেশ করবে, শস্য শ্যামল এলাকার হিফাজতের জন্য ইরান সমগ্র শক্তি ময়দানে নিয়ে আসবে। আর পিছিয়ে আসতে হলে আমাদের সাহায্যকারীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে হরমুজ।

ইরান আমাদের সঠিক সংখ্যা জানে না। নইলে এ এলাকায় আমাদের তৎপরতা এতোদিন ওরা বরদাশত করত না। ওরা মনে করছে, আমাদের পেছনে আছে বিশাল ফৌজ। মাদায়েন সম্পর্কে যারা জানে সেসব আরবদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। বনু তাগলুব বস্তির এক রইস আমাকে বলেছে, আমাদের হামলায় যেসব ইরানী মাদায়েন পালিয়ে গেছে, ওরা নিজেদের দুর্বলতা অথবা ভীরুতা স্বীকার না করে আমাদের শক্তি সংখ্যা বলেছে বাড়িয়ে বাড়িয়ে। এজন্যই ইরানী হুকুমত আমাদের বিরুদ্ধে এতদিন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। হরমুজের মত লোক ইরানী হুকুমতকে বেশী দিন বসে থাকতে দেবে না। সে ঘোষণা করেছে, মাদায়েন থেকে বিশাল ফৌজ আমার সাহায্যে আসছে। খুব শীঘ্রই ইরানে ঢুকে পড়া মুসলমানদের এমন সাজা দেব, দ্বিতীয়বার এদিকে চোখ তুলে দেখার সাহস ওরা করবে না।

আমার বিশ্বাস, ইসলাম এবং অগ্নিপূজারীদের ফয়সালামূলক লড়াই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু হায়! দরবারে খেলাফতকে যুদ্ধে রাজী করাতে পারবেন আর

প্রয়োজনে মদীনা থেকে আমাদের সাহায্যে ফৌজি কাফেলা এগিয়ে আসবে, এ ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হতাম! মদীনার কোন সংবাদ কি পেয়েছেন? এতদিনে আমাদের দূতের তো ফিরে আসার কথা ছিল।'

ঃ 'মদীনা থেকে এক ব্যক্তি আমাদের দূতের চিঠি নিয়ে গতকাল এখানে পৌছেছে। সে লিখেছে দরবারে খিলাফত থেকে এখনো কোন সন্তোষজনক জওয়াব পায়নি।'

নিরাশায় ছেয়ে গেল হাসানের চেহারা। নীরবে তাকিয়ে রইল নেতার দিকে। মুসান্না শান্তনার স্বরে বললেনঃ 'ভয়ের কারণ নেই। হাসেম বিন ওমর আমাকে খলিফার দরবারে হাজির হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এই আস্থা নিয়ে আমি যাচ্ছি, তিনি আমার আবেদন নাকচ করবেন না।'

ঃ 'আপনি কবে যাচ্ছেন?'

ঃ 'আমি শুধু তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সীমান্তের কাছাকাছি রাখবে লশকরের ছাউনী। অগ্রাভিযানের সংকল্প ছেড়ে আমরা পিছু হটে গেছি, দুশমন যেন বুঝতে না পারে। আমাদের দাওয়াতী কাজ এবং ফৌজি তৎপরতা চলতে থাকবে। আমাদের অশ্বারোহীরা ছোট ছোট দলে এগিয়ে আবার ফিরে আসবে। এ পরিস্থিতিতে কোন বড় আক্রমণ এলে মরু প্রান্তর হবে আমাদের আশ্রয়। সে সব আরবদের সাহস অটুট রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য, ইরানীদের জুলুম থেকে নাজাত হাসিল করার আশায় যারা দিন গুনছে। তখনই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, যখন আমাদের তৎপরতা প্রমাণ করবে যে, আমরা ওদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী। আমার অনুপস্থিতিতে মুয়ান্না হবে তোমাদের নেতা। আশা করি তুমি হবে তার ভাল উপদেষ্টা। ফিরে এসে যদি জানতে পারি ঘোড়া হাসিল করার জন্য ঝুঁকি নিয়েছ তুমি তবে আমার আফসোস হবে।'

ঃ 'আমার ভুল হয়েছে, এসেই ঘোড়ার ব্যাপারে আপনাকে বলিনি। বললে আপনার হুকুম অমান্য করেছি, এ কথা আর বলতেন না। আমার সঙ্গীরা সাক্ষী, ঘোড়ার জন্য নয়, বরং কতক মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ইরানীদের সাথে সংঘর্ষের ঝুঁকি নিয়েছি। ফিরে আসার সময় পথের এক বস্তিতে অবস্থান করছিলাম আমরা। বনু বকর খান্দানের এক রইস আমাদের মেজবান। দুপুরে আরাম করছিলাম বাগানে, দুজন অশ্বারোহী এল। এদের একজন আহত। তারা এসেই আমাদের মেজবানের কাছে ফরিয়াদ করল, এলাকার ইরানী জায়গীরদারের কর্মচারীরা তাদের গ্রামে লুটপাট করছে। আহত যুবক আমাদের মেজবানের ভাগ্নে। সে বলল, ইরানীরা আমার পিতা সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তিনজনকে হত্যা করেছে। একটু পর এল আরেক অশ্বারোহী। বলল, ইরানীরা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পুরুষ ছাড়াও বেশ কিছু নারীকে নিয়ে গেছে গ্রেফতার করে।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে সে গ্রাম ছিল ছয় ক্রোশ দূরে। কিন্তু ওখানকার লোকেরা এত ভয় পেয়েছিল যে, পরিবার পরিজন ছেড়েই জীবন নিয়ে পালাচ্ছিল। আমি তাদের দৃঢ়তার সাথে বোঝালাম, জালেমের ভয়ে পালিয়ে গেলে জুলুম থেকে বাঁচা যায়না, বরং বাঁচতে হলে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে হয়।

প্রায় পঞ্চাশ ব্যক্তি আমাদের সঙ্গী হতে রাজী হল। সূর্যাস্তের সময় আমরা যখন হামলা করলাম জায়গীরদার এবং তার সাথীরা তখন মদে মাতাল ছিল। সংখ্যায় বিশের অধিক নয়। এগারটা লাশ ফেলে পালিয়ে গেল জায়গীরদার। কিন্তু আমাদের হামলার আগেই মেজবানের বোন-জামাই এবং গ্রামের আরো আটজনকে ফাঁসীতে লটকিয়েছিল ওরা। এক যুবতীর লাশও পেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম ও ইরানী জমিদারের মুখ আঁচড়ে দিয়েছিল। ইরানীদের প্রতিশোধের ভয়ে এবার পালাতে চাইল গ্রামের লোকেরা। আমার সাথীরাও বলল, এ পরিস্থিতিতে এখানে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং রাতেই ওখান থেকে আমরা রওনা করলাম। প্রায় আটশো লোকের কাফেলা ছিল আমাদের সাথে। হিরার দিকে আপন আপন আত্মীয়ের কাছে চলে গেল তিনশর মত। অন্যদের কোন আশ্রয় না থাকায় রইল আমাদের সাথে। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সবাই পৌঁছে যাবে এখানে। আমার একাজ সঠিক কি ভুল এ ফয়সালা এখানো করতে পারিনি। এক আহত যুবকের ফরিয়াদ শুনে আমি ভেবেছি আমার স্থানে মুসান্না বিন হারেসা হলে কি করতেন? এরপর আমার মনে হয়েছে, প্রতিটি মুসলিমের যা কর্তব্য আমিও তাই করেছি। যখন অসহায় মানুষের এক কাফেলা আমার সাথে চলতে চাইল, আমার বিবেক বলল, এ অবস্থায় ওদের তুমি ছেড়ে যেতে পার না। ওদের জন্যে আপনি কি করতে পারবেন আমি জানি না। বিশেষ করে ওদের সাথে রয়েছে নারী এবং শিশু। তবুও আমি অনুভব করেছি, আঁধার রাতের মুসাফিরদেরকে আলোর সেই মিনারের কাছে নিয়ে এসেছি, যিনি তাদের শান্তির পথ দেখাতে পারবেন।'

কিছুক্ষণ ভেবে মুসান্না বললেনঃ 'মোহাজেরদের মধ্যে যারা লড়াইয়ের উপযুক্ত তাদের নিয়ে আমি পেরেশান নই। ওরা মুজাহিদদের সাথে থাকতে পারবে। কিন্তু বৃদ্ধ, নারী আর শিশুদেরকে আমাদের সাথে রাখা হবে মুশকিল। ওদের বাহরাইনে পাঠানো যেতে পারে। স্থানীয় লোকেরা নিজেদের বস্তিতে ওদের আশ্রয় দিলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায়। আমরা ওদের বলব, যতদিন পর্যন্ত ইরানী আক্রমণ থেকে এ এলাকা নিরাপদ থাকবে ততদিন ওদেরকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দাও। কিন্তু আমার ভয় হয়, খুব শীঘ্রই ইরানী হুকুমত এ এলাকায় হামলা করবে। কেবলমাত্র আমাদের তৎপরতার ভয়েই ইরান আক্রমণ থেকে এখনো বিরত রয়েছে। এ অবস্থায় আবু বকর সিদ্দিকের খিদমতে হাজির হওয়া অতি জরুরী।'

ঃ 'খোদা করুন সিদ্দিকে আকবর যেন আপনার সাথে একমত হন। নইলে ইরানের সর্বত্র আরব কবিলাগুলো হবে নিরাপত্তাহীন। ইরানের মুক্তি প্রিয় লোকদের

খতম করে ওরা রোখ করবে বাহরাইনের। তখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব আমরা। কোন স্থান থেকে পিছু হটলে এমনও হতে পারে মুরতাদদের পরাস্ত করার পর যে সব কবিলা ইসলামের সাথে জুড়ে দিয়েছে নিজেদের ভবিষ্যত, ওরা আমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।'

ঃ 'ইসলাম এবং অগ্নিপুজারীদের লড়াই ইরানে হবে, আরবে নয়। আবু বকর সিদ্দিক তখনই ইসলামী লশকরকে সিরিয়া অভিযানের হুকুম দিয়েছিলেন, চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের দ্বারা যখন মদীনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পারশ্যবাসীকে আরবে চড়াও হওয়ার মওকা দেব তা কল্পনাও করা যায় না। তাও এমন অবস্থায়, আরবে যখন শেষ হয়েছে ধর্মত্যাগীদের ফিতনা আর মুসলমান প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে দুশমনের মোকাবিলা করতে সক্ষম। আমি তাকে বলতে যাচ্ছি, আমরা যদি ইরানের দিকে এগিয়ে না যাই, আরবে চড়াও হতে ওরা দেরী করবে না। রোমের মত ইরানের সাথেও আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। মরু আরবের সীমানায় আল্লাহর দ্বীন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ইসলাম এবং মাজুসীদের মধ্যে সন্ধি অথবা লড়াইয়ের সম্ভাবনা কদ্দুর মদীনায় এ নিয়ে আলাপ হবে না, বরং এখনই ইরানে হামলা করার উপযুক্ত সময় কিনা আলোচনা হবে এ নিয়ে। আমায় শুধু প্রমাণ করতে হবে, ইরানে হামলার যুক্তিযুক্ত সময় এখনই।'

ঃ 'খোদা করুন আপনার আশা যেন পুর্ণ হয়। যখন আপনি মদীনা থেকে ফিরে আসবেন আমরা যেন এ খোশ খবর শুনি, আমরা যে কাফেলার প্রতিক্ষায় দিন গুণছি আপনার পেছনে ওরা আসছে। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমাদের হুকুমত একই সময়ে দুই কেন্দ্রে লড়তে রাজী হবে না।'

ঃ 'এ জমিনে যদি খোদার দ্বীনের সাহায্য আমরা চাই, কয়েক কেন্দ্রে একই সময় সিনা উঁচিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য কুফরকে পরাজিত করা। সব কাফের এক হয়ে একই কেন্দ্রে আসুক অথবা ভিন্ন ভাবে আসুক এতে কোন পার্থক্য নেই। রোমানদের মোকাবিলায় দাঁড়ালে এই সুযোগে ইরানীরা আমাদের পেছন থেকে হামলা করবে না এই ধারনা মুহূর্তের জন্যে আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। যাতার দুপাটি একত্রে মিশে আমাদের পিষে ফেলবে সে অপেক্ষা আমরা করব না। এই প্রথম মদীনা যাচ্ছি আমি। সেখানে রাসূলের এমন সব সাহাবাদের সাথে আমার মোলাকাত হবে যাদের দৃষ্টি দিগন্ত প্রসারিত। ইরান আক্রমণের জন্যে বর্তমান অবস্থা কত অনুকূল তাদের বুঝাতে অসুবিধা হবে না। যে অসহায় মানুষগুলো শত শত বছর ধরে জুলুমের আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, কি আশা আর উচ্ছ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে হেজাযের দিগন্তে উদিত নতুন রোশনীর দিকে? কখনো ভাবি, এক অপরিচিতের কথার কোন গুরুত্ব যদি না দেন তারা। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদের মত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কথা ভাবলেই মনে এই শান্তনা খুঁজে পাই যে, তিনি আমার কথা বুঝবেন। যখন তার সামনে পেশ করব দজলা ফোরাত

বিধৌত শস্য শ্যামল এলাকার মানচিত্র, তার দৃষ্টি পেরিয়ে যাবে আলবুরুজের পর্বতকেও। আমি জানি, সেখানে না গেলেও এ অন্ধকার আবর্ত ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আমি শধু চাই, জিন্দেগীর রাজপথে শেষ কদম তুলে এ শান্তনাটুক,, বদর ও হোনাইনের কাফেলা মাদায়েনের পথ মাড়িয়েছে। আর এ পথের মনযিলগুলোর কতক চেরাগ আলোকিত করেছি আমার খুন দিয়ে।'

থামলেন মুসান্না। গলা বাড়িয়ে তাকালেন বাইরে। আবার ফিরলেন হাসানের দিকে।

ঃ 'হাসান, আমি জানিনা কোথায় শেষ হয়েছে খোদার জমিনের সীমানা। খোদার সৈনিকরা যখন এদিকে আসবে, কত দূর পর্যন্ত তাদের সংগ দিতে পারব তাও জানি না। হয়তো দিগন্তের প্রথম রেখার সামনেও যেতে পারব না। কিন্তু যখন মাদায়েনের অট্টালিকা সমুহ উড়বে ইসলামী নিশান, আমার আত্মা থাকবে সেখানে। মাদায়েন পেরিয়ে গাজীরা যখন নতুন শহর আর বস্তির পথ ধরবে, ওখানেও তাদের স্বাগত জানাব আমি। যতদিন হেজাযের কাফেলা সফর করতে থাকবে, আমার রুহ থাকবে সে চিরস্থায়ী আনন্দের সাথে। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের গাজীদের বিজয় হবে আমার বিজয়। শোষণ এবং জুলুমের প্রাসাদ ধূলিস্মাৎ করে মানবতার পতাকা উত্তোলনকারীদের উল্লাস হবে আমার উল্লাস।'

কথা শেষ করলেন মুসান্না। তার ঠোঁটে ভেসে উঠল অনাবিল হাসির রেখা। ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে কিছু বলতে চাইল হাসান। কিন্তু কোন কথা জোগাল না তার মুখে। খানিক নীরব থেকে ও বললঃ 'আপনি কবে যাচ্ছেন?'

ঃ 'সূর্যাস্তের সময় রওনা করব। তুমি মুয়ান্নাকে ডাকো।'

একটু পরে মুয়ান্নাকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল হাসান। মুসান্না ঘুরে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'মুয়ান্না, আমি আজ সূর্যাস্তের পরই রওনা করব। দু'জন অশ্বারোহী যাবে আমাদের সাথে। কিন্তু যাওয়ার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই, ভোর পর্যন্ত আমার সব সাথী পৌঁছে যাবে সীমান্তবর্তী নতুন ছাউনীতে। তবে আমরা এলাকা খালি করে দিয়েছি, ইরানীরা যেন বুঝতে না পারে। স্থানীয় লোকদের সাহস অটুট রাখার জন্যে সব সময় টহল দেয়ার ব্যবস্থা করবে। এক দল ফিরে এল অন্য দলকে রওনা করিয়ে দেবে। বাধ্য না হলে লড়বে না। লড়াই করতে গিয়ে পিছু হটতে হলে কয়েক মাইল দূরে হামলা করে দেবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরানীরা আমাদের বিরুদ্ধে বড় রকমের অভিযান পরিচালনা করবে। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি বেশী খারাপ হলে কয়েক ক্রোশ পেছনে সেসব রাখাল এবং কৃষকদের বস্তিতে আশ্রয় নিতে পারবে, যারা ইরানী বশ্যতা এখনো স্বীকার করেনি। হাসানের পিছনে আসছে মোহাজিরদের সেই কাফেলা, পরিস্থিতি যাদের বাধ্য করেছে ঘর ছাড়তে। তোমার জিম্মা হলো তাদের হেফাযত করা। দ্রুত আশপাশের গ্রামের লোকদের জমায়েত করো। আশা

করি কিছুদিনের জন্যে বিপদাপন্ন ভাইদের ওরা আশ্রয় দেবে। যারা লড়াইয়ের উপযুক্ত, তোমাদের সাথে ছাউনীতে থাকবে তারা। শুধু নারী এবং শিশুদের জন্যে ওদের আমরা কষ্ট দেবো। আমাদের টহলরত সিপাইদের দায়িত্ব হবে ফোরাতের তীর পর্যন্ত ইরানীদের তৎপরতার সংবাদ দেবে লশকরকে। বিপদ দেখলে মুহাজিরদেরকে সীমান্তের ওপারে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। আমি মদীনা যাচ্ছি লশকরের সালাররা ছাড়া বাকীরা যেন জানতে না পায়। তাদের বলবে, আমি কোন গোপন অভিযানে যাচ্ছি। হাসান থাকবে তোমার সাথে। আমার অনুপস্থিতিতে ওই হবে তোমার পরামর্শদাতা।'

বিশদিন পর। ছাউনীতে প্রবেশ করল এক অশ্বারোহী। দেখতে না দেখতে তাবু থেকে বেরিয়ে তার পাশে জমা হয়ে গেল মুজাহিদরা। ও ছিল মুসান্না সাথে যাওয়া দুজনের একজন। মুজাহিদরা জিজ্ঞেস করলঃ 'মুসান্না কোথায়? তুমি কোথেকে এসেছো? তিনি কবে আসবেন? এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা?'

ঘোড়া থেকে নেমে অশ্বারোহী জওয়াব দিলঃ 'তিনি ভালো আছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তিনি। তোমাদেরকে এক খুশীর খবর শোনাতে এসেছি। মুয়ান্না কোথায়?'

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল হাসান। বললঃ 'আমার সাথে এস।'

কিছু না বলেই ওকে অনুসরণ করল অশ্বারোহী।

নিজের তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মুয়ান্না। দূত এগিয়ে সালাম দিয়ে চিঠি পেশ করল তাকে। মুয়ান্না প্রশ্ন করলঃ 'ভাইজান কবে আসবেন?'

ঃ 'সম্ভবত আরো দু'সপ্তাহ থাকতে হবে।'

ঃ 'আচ্ছা, ভেতরে চলো।'

তাবুর ভেতর প্রবেশ করল তারা। বসে চিঠি খুলল মুয়ান্না। মুসান্না লিখেছেন- 'প্রিয় ভাই, খলিফার সাথে আমি দেখা করেছি। ইরানের সংবাদ তাকে বুঝাতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। আজমের গোটা চিত্রই ছিল তার চোখের সামনে। তবুও ইরানে অভিযানের জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে পরামর্শ জরুরী মনে করেছেন তিনি। ইয়ামামা থেকে মদীনা পৌছার হুকুম দেয়া হয়েছে তাকে। তার পথ পানে তাকিয়ে আছি আমি।

হযরত আবু বকর আমার দরখাস্ত শুনে মদীনার প্রভাবশালী লোকদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। প্রচন্ড আবেগে সবাই আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমগ্র ইরানের অলিগলি সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল। আমি তাদের যখন জিজ্ঞেস করি, ইরান অভিযানের ব্যাপারে সিপাহসালার খালিদের রায় কি হবে? তাঁরা বলেছেন, খালিদের রায় আমাদের চেয়ে পৃথক হবে না। কিসরার হুকুমতের ব্যাপারে আমাদের কি করা উচিৎ, খলিফাতুল মুসলেমীন খালিদকে তা জিজ্ঞেস করবেন না। তিনি জানেন,

ইসলাম এবং অগ্নিপুজারীদের সংঘর্ষ অনিবার্য। খালিদ এক বড় সিপাহসালার। যুদ্ধের ব্যাপারে তার আন্দাজ কখনো ভুল হয়নি। ইরান অভিযানের জন্য কত ফৌজ দরকার এবং এদের সংগঠিত করতে কদ্দিন সময় লাগবে, অভিযানের জন্য এ মুহূর্ত উপযুক্ত, না কি আরো কদিন প্রতীক্ষা করতে হবে, তা তিনি বলতে পারবেন। এ জন্যই শুধু খালিদকে ডাকা হয়েছে। আমার এ বিশ্বাসের কারণ, কখনো তিনি বৈষয়িক উপকরণের ওপর নির্ভর করেন না। প্রতিটি লড়াইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, মুসলমান যখন শাহাদাতের ইচ্ছা নিয়ে ময়দানে আসে, তাদের সাথে থাকে আল্লাহর সাহায্য। এবার সংগীদের এ খোশ খবর শোনাতে পার, বদর থেকে যাঁরা ইসলামের বিজয়ের সূচনা করেছিলেন, তোমরাও সে বাহিনীতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। ইরানের বঞ্চিত অসহায় মানুষদের এ পয়গাম দিতে পার, যারা আল্লাহর জমিনে ন্যায় ও ইনসাফের পতাকা তুলে ধরার জিম্মা নিয়েছে, তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা পূর্ণ সচেতন।'

নয়

একদিন ভোরবেলা পাহাড়ের টিলায় দাঁড়িয়েছিল হাসান। নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার মাঝে মাঝে খেজুর বাগান, রাখাল আর কৃষকদের বস্তি। তারো সামনে দিগন্ত প্রসারিত লতাগুল্মহীন পর্বত শ্রেণী। উত্তর-পূর্বের মালভূমি ফোরাত বিধৌত সবুজ শ্যামল ময়দানে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মিশে গেছে। এ মালভূমি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে সেসব সত্যাশ্রয়ী মুসাফিরদের ছাউনী, যারা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সালারে আজমের অপেক্ষা করছিল।

গত দশদিন ধরে ফজর নামাজ শেষে প্রাতঃভ্রমণের বাহানায় ছাউনী থেকে বেরিয়ে টিলায় এসে দাঁড়াত হাসান। উপত্যকা পেরিয়ে সামনে উঁচু প্রাচীরের মত টিলার দিকে গভীর মনযোগ দিয়ে চেয়ে থাকত দীর্ঘক্ষণ। ভোরের স্নিগ্ধ ছায়া মিলিয়ে যেতো। রোদ বাড়তে বাড়তে একসময় অসহ্য লাগলে ব্যর্থ মনে ফিরে আসত তাবুতে। কখনো ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকা পেরিয়ে আরো উঁচু টিলায় পৌছে চেয়ে থাকতো মুসান্নার পথ পানে। টিলাগুলোতে দৃষ্টি বুলিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়তো মাটিতে। আংগুল দিয়ে আনমনে নরম বালিতে আঁক কষতো। হাত দিয়ে রেখাগুলো মুছে আবার তাকাতো টিলার দিকে। সেদিনও এমনিভাবে তাকিয়ে থেকে হতাশ মনে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে এক টিলায় দেখা গেল উট ও ঘোড়ার আবছা ঝলক। পেছন থেকে আওয়াজ ভেসে এলঃ 'হাসান, ওখানে কি করছ?'

ফিরে তাকাল ও। মুয়ান্না এবং তার দুজন সংগী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ঃ 'আমি ওদের পথ দেখছি।' দীলের স্পন্দন সংযত করে জওয়াব দিল হাসান। 'তিনি আসছেন পুরো ফৌজ নিয়ে।'

ঃ 'তুমি কি স্বপ্ন দেখছো?'

ঃ 'আমার স্বপ্ন মিথ্যা হতে পারে না। ঐ টিলার দিকে দেখুন।'

মুয়ান্না এবং তার সাথীরা হাসানের ইশারা করা টিলার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। মুয়ান্না বললেনঃ 'আমার ধারনা এখনো তুমি স্বপ্নই দেখছ।'

ঃ 'না না এ স্বপ্ন নয়। আমি ওখানে ঘোড়া আর উটের কাফেলা দেখেছি। ওরা ছিল অনেক দূরে। এখন উঁচু এক টিলার আড়ালে পড়ে গেছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, স্বপ্ন আর বাস্তবের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।'

ঃ 'কিন্তু এদিক তো মদীনার পথ নয় বরং বাহরাইনের পথ। সত্যিই তুমি কোন লশকর দেখে থাকলে ওরা ইরানী। দীর্ঘপথ ঘুরে আমাদের পেছনে এসে হাজির হয়েছে।'

ঃ 'না, ওরা ইরানী হলে স্থানীয় আরবরা আমাদের সাবধান করত। হয়তো বাহরাইন থেকে কোন কাফেলা আমাদের সাহায্যে আসছে।'

ঃ 'যে উট আর ঘোড়া আপনি দেখছেন হয়তো তা কোন রাখালের।'

ঃ 'দানাপানি শূন্য টিলায় কোন্ রাখাল জানোয়ারদের নিয়ে আসবে?'

ঃ 'হাসান, আমার ধারনা তুমি হরিণের পাল দেখেছে।' বলল মুয়ান্নার এক সাথী।

বেশ রাগের সাথে জওয়াব দিল হাসানঃ 'হরিণকে উট অথবা ঘোড়া মনে করার মত ভুল আমি করতে পারি না। হরিণ ঘাস পানি তালাশ করে রাতের বেলা। প্রভাতের আগেই বনে চলে যায়।'

সংগীকে মুয়ান্না বললেনঃ 'তুমি গিয়ে মুজাহিদদের তৈরী হতে বলবে। হয়তো কোন অযাচিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হব আমরা।'

লাগাম ঘুরিয়ে ঘোড়া হাকাল অশ্বারোহী। ঘোড়া থেকে নামল মুয়ান্না এবং তার অপর সংগী। খানিক পর সামনের টিলার চূড়ায় একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল অশ্বারোহী। হাতে ইশারা করে চিৎকার দিয়ে হাসান বললঃ 'তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন!'

টিলার চূড়া থেকে অশ্বারোহীরা ধীরে ধীরে নামত লাগল নিচের দিকে। তাদের স্থানে এগিয়ে এল নতুন উট আর ঘোড়ার সওয়ার।

মুয়ান্নার সাথী বললঃ 'জনাব, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। সম্ভবত ওরা কোন ইরানী।'

ঃ 'হাসান আমার ঘোড়ার পিছনে বসো, জলদি করো।' বললেন মুয়ান্না।

হাসান তার দিকে না ফিরেই বললঃ 'ভাই, ওরা ইরানী হতেই পারে না। ইরানী হলে সূর্যের আলোয় ওদের শিরস্ত্রাণ, বর্ম আর ঢাল ঝলমল করত। যারা আচানক হামলা করতে চায় এত উঁচু দিয়ে দিনের আলোয় ওরা দুশমনের সামনে আসে না। দেখো, ওরা সোজা এদিকেই আসছে। ওরা নিশ্চয় জানে, এখানে এলে শুধু আমাদের ছাউনীর লোকেরাই নয় দূর দূরান্তের বস্তি থেকেও ওদের দেখা যাবে।'

ঃ 'আমাদের চেয়ে ওরা কয়েক গুণ বেশী হলে এতেই বা কি পার্থক্য?'

ঃ 'দু'হাজারের বেশী নয় এদের সংখ্যা। ঐ দেখ উটের শেষ কাতার টিলা থেকে নামছে। পেছনে কোন উট বা ঘোড়া দেখা যাচ্ছেনা। এদের চালচলন লড়াইয়ের জন্যে এগিয়ে আসা ফৌজের মত নয়। ইরানী ফৌজে আমি ছিলাম। তাদের কাতারবন্দী হওয়ার পদ্ধতি কি আমি জানি।'

মুয়ান্না খানিক বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথম অশ্বারোহী দল উপত্যকার মাঝামাঝি পৌছলে হাসান উচ্চ স্বরে বললঃ 'ওদের লেবাস দেখুন। নিশ্চয় ওরা আরব। ইরানী ফৌজের সাথে যে সামান থাকে এদের সাথে সেসব নেই।'

হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে সংগীর দিকে তাকিয়ে মুয়ান্না বললেনঃ 'তোমার ঘোড়া হাসানকে দাও। আমরা কিছুটা এগিয়ে দেখি।'

হাসান ছুটে তার হাত থেকে লাগাম নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুয়ান্নার পিছু নিল। টিলার নিচে উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসা কাফেলার আধা মাইল দূরে থামল ওরা। হাসানের দিকে তাকিয়ে মুয়ান্না বললেনঃ 'সামনের অশ্বারোহী আমার ভাই ছাড়া কেউ নয়। কিন্তু লশকরের পরিমান দেড় হাজারের বেশী মনে হয় না।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, লশকরের বেশীর ভাগ আমাদের দৃষ্টির বাইরে।'

ঃ 'মদীনা থেকে কোন বড় ফৌজ নিয়ে এলে কয়েকদিন আগেই আমরা খবর পেতাম।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে হাসান বললঃ 'সম্ভবত আপনার ভাই আমাদের চিনেছেন। দেখুন আসছেন সোজা এদিকে।'

কিছু না বলেই ঘোড়া হাকাল মুয়ান্না। খানিক পর দুজনেই দাঁড়ালো এসে মুসান্না বিন হারেসার সামনে। তার চেহারার বিজয়ের দৃপ্ত হাসিতে ওরা পাচ্ছিল অসংখ্য প্রশ্নের জওয়াব। মুসান্না ঘুরে পেছনের কাফেলার দিকে তাকিয়ে আবার এদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'এরা সারারাত সফর করেছে। তোমরা গিয়ে ওদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করো। আমার পথ দেখতে ছাউনী ছেড়ে এতদূর আসার দরকার ছিল না।'

ঃ 'কত লোকের ব্যবস্থা করব?' জিজ্ঞেস করলো মুয়ান্না।

ঃ 'আমার সাথে রয়েছে আঠারোশো মুজাহিদ।'

ঃ 'বাকী লশকর কত দূরে?'

ঃ 'মদীনার লশকর এখনো রওনা করেনি। এরা এসেছে বাহরাইন থেকে।

পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইরান অভিযানের জন্যে আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি লাভ করা। এ উদ্দেশ্য সফল হলে বাহরাইনের পথ ধরেছিলাম। এ মুজাহিদরা এসেছে ওখান থেকে। এদের অধিকাংশই আমাদের কবিলার সাথে সম্পর্কিত। অন্য কবিলার সর্দারদেরও আমি পয়গাম পাঠিয়েছি। আমার ধারনা বাইরাইন থেকে মুজাহিদদের আরো কাফেলা কদিনের মধ্যেই আমাদের সাথে মিশবে। ইনশাআল্লাহ এরপরই খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আমরা মাদায়েনের পথ ধরব। খালিদ বিন ওয়ালিদ শীগগীরই আসছেন সাথীদের এ খোশ খবর শোনাতে পার।'

ইরান সীমান্তে জমায়েত হওয়া লশকরের সংখ্যা কয়েকদিনেই পৌছল আট হাজারে। মুসান্না সংবাদ পেলেন দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ইয়ামামা থেকে রওনা হয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। একদিন সূর্যোদয়ের সময় মুসান্না এবং তার সংগীরা খালিদ বিন ওয়ালিদকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন। বাহরাইনের প্রতিটি সিপাই এবং সালার তাকে নিকট থেকে দেখার এবং একটু কথা বলার জন্যে ছিল বেকারার।

খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং মুসান্না বিন হারেসা যে তাবুতে বসে কিসরা সালতানাতের মানচিত্রে নতুন রেখা টানছিলেন তার আশেপাশে অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করল হাসান। কিসরার সিপাই এবং কাইজারের কয়েদী হিসেবে ও সে সব বিরাট ফৌজ দেখেছে যাদের রসদ সামানের পাহারাদারও এরচে অধিক। খালিদ বিন ওয়ালিদ বিশাল ফৌজ নিয়ে আসছেন এ ধারনা তারও ছিল না। কিন্তু দশ হাজার তার ধারনার চেয়ে অনেক কম। আচানক কেউ তার কাঁধে হাত রেখে বললোঃ 'আপনাকে আর বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মুসান্নার তৃতীয় ভাই মাসউদ। এক সপ্তাহ আগে পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাকর্মীর শেষ দলের সাথে ও এখানে পৌছেছে। মজবুত দেহের বাঁধন, লম্বা চওড়া এ সুদর্শন যুবকের বয়স বিশের বেশী নয়।

ঃ 'আপনার কি ধারনা ইরান বিজয়ের জন্যে এ ফৌজই যথেষ্ট মনে করেন খালীদ বিন ওয়ালিদ?' বলল হাসান।

ঃ 'আমার মনে হয় দুশমনকে প্রস্তুতির সুযোগ দেবেন না খালিদ। এখানে এসে ঘোড়া থেকে না নেমেই যদি হুকুম করতেন সূর্যাস্তের পূর্বেই ইরানের অমুক এলাকা আমরা কব্জা করতে চাই, তবুও আমি তাজ্জব হতাম না।'

ঃ 'আমার ধারনা, অভিযানের পূর্বে মদীনা থেকে অতিরিক্ত ফৌজ আসার অপেক্ষা করবেন তিনি। ইয়ামামা থেকে তিনি এখানে পৌছেছেন। এতো দীর্ঘ সফরের পর এমনতিই তো বিশ্রাম জরুরী।'

ঃ 'না, মদীনার অতিরিক্ত ফৌজের অপেক্ষা করলে ইয়ামামাতেই করতেন। তার আকস্মিক রওনা হওয়াই প্রমাণ করে, দেরী না করেই হামলা করার ফয়সালা করেছেন

তিনি।'

ঃ 'কিন্তু গত সপ্তাহে ইয়ামামা থেকে তার দূত এ পয়গাম নিয়ে এসেছিল যে, তিনি দরবারে খিলাফতে সাহায্য পাঠানোর আবেদন করেছেন। মদীনার জওয়াব না আসা পর্যন্ত ইয়ামামায়ই অবস্থান করবেন তিনি।'

ঃ 'মদীনা থেকে খলিফার পাঠানো সাহায্য খালিদের রওয়ানা করার আগেই ইয়ামামা পৌছেছে।'

ঃ 'আপনি বলতে চাইছেন, এ দশ হাজারে মদীনার সাহায্যও শামিল?'

মুচকি হাসল মাসউদ।

ঃ 'খালিদের দরখাস্ত পেয়ে একজন ব্যক্তিকেই শুধু পাঠানোর প্রয়োজন অনুভব করেছেন খলিফা।'

ঃ 'শুধু এক ব্যক্তি?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তিনি কে?'

ঃ 'তার নাম কা'কা বিন আমর তমিমী। তাঁকে পাঠানোর সময় খালিদের দূতকে খলিফা বলেছিলেন, যে সেনাদলে কা'কা বিন আমর থাকবে তারা পরাজিত হবে না। তাঁর সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক কথা আমি শুনেছি। মদীনার সেনাদলের এক সালার বলছিল, কা'কা বিন আমর যদি শূন্য হাতে সিংহের বেষ্টনীতে ঢুকে পড়েন তবু আমি অবাক হবো না।'

ঃ 'ইরানকে আমি সিংহের দল মনে করি না। তবুও পারশ্যের এ বিশাল সালতানাত জয় করতে হলে আমাদের প্রচুর সৈন্য দরকার।'

ঃ 'ইরানে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আমাদের কত লশকর জরুরী এ সিদ্ধান্ত শুধু খলিফাই করতে পারেন। আপাততঃ এ শান্তনাবাণী আপনাকে শোনাতে পারি, কোন ময়দানে অধিক লশকরের প্রয়োজন হলে খলিফা আবু বকর (রাঃ) আমাদের নিরাশ করবেন না।'

মুয়ান্না বিন হারেসা খিমার বাইরে এসে আশপাশে জমায়েত সিপাইদের বললেনঃ 'হাসান কোথায়? তাঁকে ডাকো।'

হাসানকে ডাকতে ডাকতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেল সিপাইরা। একটু পর হাসান ছুটে তাবুর কাছে পৌছল। মুয়ান্না বললেনঃ 'আমীরে লশকর তোমায় ডাকছেন।'

সাথে সাথেই তাবুতে প্রবেশ করল হাসান। খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুসান্না বিন হারেসা, কা'কা বিন আমর এবং বাহরাইনের কতক গ্রামীণ সর্দার চাটাইতে বসে কথা বলছিলেন। সেনাপতি খালিদের সামনে খোলা মানচিত্র।

ঃ 'ও হাসান' বললেন মুসান্না।

এক নজর হাসানকে দেখে মানচিত্র গুটিয়ে রেখে খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেনঃ 'তুমি কিসরা ফৌজে ছিলে?'

ঃ 'জ্বী।'

ঃ 'তুমি রোমানদের কয়েদখানায় ছিলে?'

ঃ 'জ্বী হ্যাঁ'।

ঃ 'বসো।'

আদবের সাথে খালিদের সামনে বসল হাসান। খালিদ বললেনঃ 'হরমুজের কাছে আমার পয়গাম নিয়ে যেতে কোন বিপদ অনুভব করবে না তো? আমি শুনেছি, সে খুব জালেম আর তোমাকে গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

ঃ 'তাকে যদি এ পয়গাম দিতে পারি যে, তোমার হিসাবের দিন ঘনিয়ে এসেছে, তবে তা হবে আমার জিন্দেগীর সবচে বড়ো সৌভাগ্য।'

ঃ 'কিন্তু অকারণে বিপদে জড়াতে চাইনা তোমায়। তোমার স্থানে এলাকার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠালে ভাল হয় না? স্থানীয় স্বেচ্ছাকর্মীরা এ জিম্মা কবুল করতে রাজী হবে?'

ঃ 'পয়গাম নিয়ে যে-ই হরমুজের কাছে যাবে, তার জীবন একই রকম, নিরাপদ আবার নিরাপদ নয়। হরমুজের এলাকার কেউ আমায় চিনবে না। আমায় দেখবে শুধু আপনার দূত হিসাবে। আপনার দূতের গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস করলেও বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে আমার অনেক বেশী।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। সূর্যাস্তের পর তুমি রওনা করবে।'

ঃ 'এখনই রওনা করলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারব। সামনের মনযিল পর্যন্ত পথের কোন বস্তিতে দিনেও আমার কোন বিপদ নেই।'

ঃ 'ঠিক আছে, ঘোড়া তৈরী কর। এখনি আমার পয়গাম পেয়ে যাবে।'

তাবু থেকে বেরিয়ে এল হাসান। চিঠি লেখায় মনযোগ দিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। লিখলেনঃ 'শান্তির আকাংখা থাকলে ইসলাম গ্রহণ করো। নইলে জিযিয়া দিয়ে থাকো। আর না হয় পস্তাতে হবে তোমায়। এমন লোকদের সম্মুখীন তোমায় হতে হবে যারা জীবনকে তোমরা যেমন ভালবাস, মৃত্যুকে তার চেয়ে বেশী মহব্বত করে ওরা।'

খানিকপর। খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুসান্না এবং তাঁর ভাই বিদায় দিচ্ছিলেন হাসানকে। মুসান্না তাঁর সাথে মোসাফেহা করে বললেনঃ 'হাসান, এবার তোমার প্রিয়জনের অবস্থা জানতে তোমায় নিষেধ করবো না। তুমি তাদের এ সুসংবাদ দিতে পার যে, তোমাদের দুঃখ মুসীবতের দিন শেষ হয়ে এসেছে। অবস্থা ভাল হলে সেই

নেকদীল ইরানীর কাছেও যেতে পার, যিনি দুঃখ মুসীবতে তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি দ্রুত ফিরে আসবে। অযথা কোন ঝুঁকি নেবে না।'

ঘোড়ার সওয়ার হয়ে হাসান তাবু থেকে বেরিয়ে এলে এক লম্বা চওড়া ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। বললেনঃ 'থামো।'

থেমে গেল হাসান। এই সুঠামদেহী সুদর্শন ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে বাহাদুরীর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তিনি এগিয়ে এলেন। মোসাফেহার জন্য হাত এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমার নাম কা'কা। আমি এমন ব্যক্তির খোঁজ করছি যে অনারবদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানে। তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এখন তোমার সময় নষ্ট করবো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

ঃ 'আপনার সাথে কথা বলার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল আমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসব। এরপর আলাপ করার অনেক সময় পাব আমরা।'

দশ

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। হরমুজের মহলে ব্যস্ততার সাথে প্রবেশ করল কয়েকজন প্রভাবশালী ইরানী জমিদার এবং সেনা অফিসার। দামী কার্পেটে মোড়া কামরা। দরজায় ঝুলছিল রেশমী পর্দা। দরবার কক্ষে ঢুকেই সকলে সোনা-রূপায় সাজানো মসনদের দিকে তাকাল। একটু পরে দৈত্যের মত এক ব্যক্তি বাদশাহী পোশাক পরে এগিয়ে এল মসনদের দিকে। তাকে দেখে সম্মানার্থে মাথা নিচু করল সবাই। মসনদে গিয়ে বসলেন তিনি। বর্শা হাতে দুজন হাবশী গোলাম দাঁড়াল তাঁর ডানে-বায়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির স্বরে তিনি বললেনঃ 'একজন মাত্র আরবের আগমন এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, এই সাত সকালে আমার মহলের কড়া নাড়তে হবে। তোমরা জান, ভোরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে আমার।'

ঃ 'আলীজাহ, জিম্মাদারীর অনুভুতি না থাকলে আপনার আরামের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তার শির উড়িয়ে দিতাম।' জওয়াব দিল এক অফিসার।

গর্জে উঠেলন হরমুজঃ 'সে এখনো জীবিত?'

ঃ 'আলীজাহ! আমি অনুভব করেছি, তাকে হত্যা করার জন্য আপনার অনুমতি জরুরী। আপনার সাথে দেখা করার জন্য সে জেদ ধরেছে। তার সাথে আলাপ করে বুঝেছি, সে কোন মামুলী ব্যক্তি নয়। সে বলছে, মুসলমানদের সিপাহসালারের পক্ষ থেকে এক পয়গাম নিয়ে আমি এসেছি। খালিদ বিন ওয়ালীদের চিঠি দেখিয়ে সে

আমাদের ধমকও দিয়েছে। আপনার হুকুম ছাড়া কোন দূতের গায়ে আমরা হাত তুলতে পারি না।'

হরমুজ গর্জে উঠে বললেনঃ 'কোথায় সে চিঠি?'

অফিসার এগিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদের চিঠি পেশ করলো হরমুজকে। দ্রুত হাতে চিঠি খুললেন হরমুজ। তার সমস্ত রাগ আর ক্ষোভ এসে জমা হল চেহারায়। চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'সে আরবকে নিয়ে এসো!'

দরজার সামনে দাঁড়ানো পাহারাদারকে ইশারা করল অফিসার। দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। নেমে এল গুমোট নীরবতা! উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে হরমুজ বললেনঃ 'তোমাদের গাফলতি এবং ভীরুতার কারণে মুসলমানদের এত সাহস হয়েছে যে, তাদের দূত আমার ঘর পর্যন্ত এসেছে?'

ফৌজের আর এক অফিসার জওয়াব দিলঃ 'জনাবে আলা! মুসলমানদের এ দুঃসাহস সীমান্তবর্তী সে সব জমিদারদের অযোগ্যতার ফল, যারা বাহরাইনের গুটিকতক মুসলমানকে নিজেদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। ওরা একটু সাহস দেখালে ভুখা-নাংগা মরুচারীরা আমাদের দিকে চোখ তুলেও চাইতে সাহস করতো না। কিন্তু আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, ওরা এগিয়ে আসার সামান্য চেষ্টা করলে ওদের প্রতিটি কদম উঠবে ধ্বংসের দিকে। আমরা আমাদের সীমান্তের হিফাজতই শুধু করব না, বরং ওদের পেছনে ধাওয়া করবো মক্কা-মদীনার প্রাচীর পর্যন্ত।'

ঃ 'তুমি খালিদ বিন ওয়ালীদের নাম শুনেছ?' তাচ্ছিল্য ভরে অফিসারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন হরমুজ।

ঃ 'হ্যাঁ জনাব, অনেক কিছুই শুনেছি তার সম্পর্কে। কিন্তু আমার ধারণা সেনাপতি সুলভ দৃষ্টির অধিকারী হলে ভুখা নাংগা আরবদেরকে সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি দেবেন না তিনি।'

ঃ 'বেকুব! এ চিঠিতে সে এ পয়গাম পাঠিয়েছে, অচিরেই ভুখা নাংগা আরবরা পৌছবে এখানে।'

আবারো অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো কামরায়। এক সর্দার দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'জনাব! খালিদের তৎপরতা মুসান্নার চেয়ে ভিন্ন হবে না। সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত বস্তিতে লুটপাট করে এরা পালিয়ে যাবে। আমাদের এলাকায় পা রাখার দুঃসাহস করবে না।'

ঃ 'দুঃসাহসের প্রথম প্রমাণ এ লিখনী। এ লেখা যদি খালিদের হয়ে থাকে, বেশী দিন তোমাদেরকে তাঁর অপেক্ষা করতে হবে না।'

ফৌজি অফিসারের দিকে ফিরে হরমুজ বললেনঃ 'সময় নষ্ট করা যাবে না। তিন দিনের মধ্যেই খালিদের ফৌজের সঠিক সংখ্যা আমি জানতে চাই।'

এক বৃদ্ধ সর্দার বললেনঃ 'জনাব, আমার আবেদন, খালিদের দূতের ব্যাপারে কোন ফয়সালা করতে তাড়াহুড়া যেন না করেন। তাকে কোতল করলে মুসলমানদের

সাথে আপনার লড়াই অপরিহার্য হয়ে পড়বে।'

ঃ 'আমি বেকুব নই।' ক্ষ্যাপা কণ্ঠে জওয়াব দিলেন হরমুজ। 'আমি জানি, আমাদের শক্তির ভয়-ই এ মরুচারীদের লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারে। দূত ফিরে গিয়ে বলতে পারবে না, আমরা তার ধমকের গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি চাই, সে এখানে এলে ভয় আর নৈরাশ্যের পরিবর্তে তোমাদের চেহারায় থাকবে হাসির ঝিলিক। কিসরার সাহায্য ছাড়াই চল্লিশ হাজার জোয়ান ময়দানে হাজির করতে পারব আমরা। দূতকে আমরা বুঝিয়ে দেব, মুসলমানরা এদিককার রোখ করলে, প্রতি কদমে থাকবে মানুষের প্রাচীর।'

নাংগা তলোয়ারের পাহারায় কামরায় প্রবেশ করল হাসান। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল হরমুজের সামনে। তার আপাদমস্তক দেখে নিশ্চিন্তে হরমুজ বললেনঃ 'চোরের মত না এলে মহলের দরজায় করাঘাত করার সুযোগ পেতে না। তোমার সাজা মৃত্যুদন্ড।'

ঃ 'মওতকে ভয় পেলে খালিদ বিন ওয়ালিদের চিঠি তোমাকে পৌঁছানোর জিম্মাদারী কবুল করতাম না।'

ঃ 'তুমি কি মনে কর মুসলমানদের ভয়ে তাদের দ্বীন গ্রহণ করবো?'

ঃ 'তোমাকে ভয় দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমাদের কাজ শান্তির পথ দেখানো।'

ঃ 'তোমাদের সিপাহসালার লিখেছেন, আমরা জীবনকে যেমন ভালবাসি, মুসলমানদের মৃত্যু প্রেম তেমনি প্রবল। আমার পক্ষ থেকে তাকে এ পয়গাম দিতে পার যে, তার সিপাইরা মরতে চাইলে আমরা তাদের নিরাশ করবো না। আমরা বেকারার হয়ে তার অপেক্ষা করছি, এ পয়গাম খালিদকে দিতে পার।'

মুচকি হাসল হাসান।

ঃ 'বেশী দিন আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে না। আমাদের ঘোড়ার গতি অত্যন্ত তীব্র।'

চিৎকার দিয়ে হরমুজ বললেনঃ 'একে নিয়ে যাও। সূর্যাস্তের পর আমাদের এলাকায় দেখলে গর্দান উড়িয়ে দিও।'

রাতের প্রথম প্রহর। বিছানায় শুয়ে আছেন কোব্বাদ। গত দু'সপ্তাহের কঠিন অসুস্থতা তাঁকে দারুণ দুর্বল করে দিয়েছে। সূর্যাস্তের একটু আগেই যে বৃদ্ধ ডাক্তার এসেছেন তিনি এখন কোব্বাদের বিছানার পাশে বসে আছেন। আলতো পায়ে কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। পিতার কাছে বসতে বসতে ডাক্তারকে বললঃ 'এখন আব্বাজানের অবস্থা কেমন?'

ঃ 'বেটি, পুরানো রোগ এতো জলদি ঠিক হয়না। তবুও আমার বিশ্বাস, আমার অষুধে কাজ হবে।'

চোখ তুলে চাইলেন কোব্বাদ। বললেনঃ 'আমার মনে হয় অনেক ঘুমিয়েছি। ব্যথাও বেশ কমেছে।'

ঃ 'আপনি শুধু এক বেলা বিশ্রাম করেছেন।' বললেন ডাক্তার। 'খানিক পর অন্য অষুধ দেবো, ভোর পর্যন্ত আরামে ঘুমুতে পারবেন।'

ঃ 'আমার ধারণা ছিল বেটা আপনাকে মাদায়েন থেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু মাহবানু বলল আপনি হীরা থেকে এসেছেন। তখন অসুস্থতার জন্য আপনার সাথে কথা বলতে পারিনি।'

ঃ 'হীরার হাকীমের হুকুমে আমি এখানে এসেছি। তিনি আমায় বলেছেন, আপনার ছেলে শাহানশাহের মুহাফিজ ফৌজে চাকুরী করেন। সে ফৌজের সালারে আলার ইচ্ছে, আমি যেন আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে যত্ন নেই।'

ঃ 'সালারে আলা আপনাকে চেনেন?'

ঃ 'জী হ্যাঁ। তিনি হীরার হাকিমের দোস্ত। একবার তিনি অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য আমাকে মাদায়েন পাঠানো হয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর কোন দোস্ত অথবা প্রিয় ব্যক্তি অসুস্থ হলেই ডেকে পাঠান আমায়।'

ঃ 'আমি হয়রান হচ্ছি, এতোসব প্রভাবশালী লোকদের সাথে পরিচয় থাকা সত্বেও হীরা থাকতেই আপনি পছন্দ করছেন।'

মৃদু হাসলেন ডাক্তার।

ঃ 'আমি খৃষ্টান। আপনি জানেন, মাদায়েন খৃষ্টানদের অনুকুলে নয়।'

কোব্বাদ গভীর ভাবে তাকে দেখে বললেনঃ 'আপনি ইরানী নন, সম্ভবতঃ আরবও নন।'

ঃ 'জনাব আপনি ঠিক ধরেছেন।' মুচকি হেসে বললেন ডাক্তার। 'আমার পিতামাতা ছিলেন গ্রীক। এরপর স্থায়ীভাবে আবাদ হয়েছেন সিরিয়ার ইন্তাকিয়ায়। শাহানশাহ নওশেরওয়াঁ ইন্তাকিয়া বিজয় করে আমাদের গোলাম করে নিয়ে এলেন মাদায়েন। তিনি ছিলেন আমার প্রতি মেহেরবান। আমার ধর্মীয় কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না। আমি শুনেছি, আপনিও খৃষ্টানদের ঘৃণা করেন না।'

ঃ 'আমি শুধু সে সব খৃষ্টানদের ঘৃণা করি, কিসরার প্রজা হয়েও যারা কাইজারকে বেশী সম্মানিত মনে করে। কিন্তু যারা ইরানী সালতানাতের ওফাদার তাদের কখনো আমি অভিযোগের মওকা দেইনি।'

ঃ 'কাইজার ও কিসরার পরামর্শদাতারা আপনার মত উদারতার পরিচয় দিলে অতীতে কাইজার এবং কিসরাকে ভয়ংকর লড়াইগুলো দেখতে হতো না। এখন মনে হয়, বেদনাদায়ক অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। আমার মনে হয়, সম্মিলিত বিপদের অনুভূতি খুব শীঘ্র রোম ইরানকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করবে।'

ঃ 'সম্মিলিত বিপদ বলতে যদি তুমি মুসলমানদের বুঝিয়ে থাক, তাহলে অবশ্যই

আমি বলতে পারি, এর মোকাবিলার জন্য কিসরাকে কমপক্ষে কাইজারের সহযোগিতা নিতে হবে না। আমি জানি, ইরানী রইসদের জুলুমের কারণে স্থানীয় আরবদের মন বিগড়ে আছে। বিপদের সময় অনেক কবিলাই আমাদের সঙ্গ দেবে না। কিন্তু মুসলমানরা কোন ময়দানে ইরানী ফৌজের মোকাবিলা করবে, এ আমি ভাবতেও পারি না। আমাদের সীমানায় ওদের ছোটখাট আক্রমণ করার কারণ, বিস্তীর্ণ মরুময় প্রান্তর ওদের পক্ষে। নিয়মিত লশকরের সম্মুখীন হলে ওরা পিছু হটে যাবে। মুসান্না বিন হারেসার হামলার অর্থ এ নয় যে, আরবের যাযাবর বেদুইনরা ইরানের সাথে লড়াই করার উপযুক্ত হয়ে গেছে।'

মৃদু হাসলেন ডাক্তার।

ঃ 'এক সালতানাত আর এক জাতি হিসেবে আরববাসী এই প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করল। সে দ্বীনের শক্তিকে আমি ভয় পাই, অল্প কয়েক বছরে যে সবগুলো কবিলাকে দলে ভিড়িয়েছে। হীরা থেকে রওনা হওয়ার সময় আমি শুনেছি, আরবদের এক ফৌজ দুমাতুল জন্দলের পথ ধরেছে। আজ পথের এক বস্তি অতিক্রম করার সময় জেনেছি তাদের অন্য লশকর মাত্র কয়েক মঞ্জিল দূরে ছাউনী ফেলেছে। যে লশকরের আগমন সংবাদ পথে পেয়েছি, তাদের সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালীদ। আর সবাই জানে, আজ পর্যন্ত খালিদ কোন ময়দানে পরাজিত হয়নি। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর হাতে মুসায়লামার চল্লিশ হাজার সিপাহীর চরম পরাজয় কোন মোজেযার চেয়ে কম নয়। জনাব, আপনাকে পেরেশান করতে চাই না। তবুও আমি অনুভব করছি, আগামী কয়েক মাসের ইতিহাস রোম ইরানের জন্য হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরানের কোথাও যদি আরবরা পা রাখার জায়গা পায়, আর আমরা তাদের পরাজিত করতে না পারি, তাহলে ওদের দুঃসাহস বেড়েই যাবে।'

বিরক্ত হয়ে কোব্বাদ বললেনঃ 'কিন্তু আপনি কেন ভাবছেন না, ইরানী লশকর মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে?'

ঃ 'মাফ করুন। মুসলমানরা কিসরার বিরাট লশকরের সামনে দাঁড়াতে পারবে এ আমি কল্পনাও করি না। আমি শুধু বলতে চাই, ওদেরকে দুশমন ভেবে যদি রোম ইরান এক হয়ে যায় তবে কিসরাকে ইরান এবং কাইজারকে সিরিয়া সীমান্তে তাদের পথ আটকাবারও প্রয়োজন হবে না। বরং মক্কা মদীনার প্রাচীর পর্যন্ত আমরা ওদের ধাওয়া করতে পারব।'

ঃ 'আপনি পেরেশান হবেন না। কিসরার ফৌজ ময়দানে এলে স্থানীয় আরবরা ওদের সঙ্গ না দিলেও বিরোধিতার সাহস করবে না। মুসান্না বিন হারেসার অতীত বিজয়গুলোর কারণ, মাদায়েনের পরিস্থিতি এদিকে মনযোগ দেওয়ার সুযোগ দেয়নি আমাদের। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদকে যদি এদিকে পাঠানো হয়, ইরানী হুকুমত বেশী দিন আপন কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল থাকবে না। আমি আপনাকে শুধু একটা প্রশ্নই

করছি, মুসলমানদের ব্যাপারে ইরানের খৃস্টানদের অভিমত কি?'

ঃ 'মুসলমানদের ব্যাপারে ইরানের খৃস্টানদের অনুভূতি মাজুসী সম্প্রদায়ের চাইতে ভিন্ন নয়। আপনাকে আমি এ আশ্বাস দিতে পারি, ওফাদারীর পরীক্ষা এলে ওরা থাকবে কিসরা ফৌজের প্রথম কাতারে। ইরানীদের প্রতি ওদের দরদ না থাকলেও ওরা মুসলমানদের দোস্ত হতে পারে না। আপনি জানেন, মেসোপটিমিয়ার শাজাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে খৃষ্টানরাও ছিল তার সাথে।'

ঃ 'স্থানীয় খৃষ্টানদের ওফাদারীতে আমার সন্দেহ নেই। আর যেসব আরব খৃষ্টান নয়, ওরা মুসলমানদের সাথে মিলবে, এমন ভয়ও নেই। আমার আফসোস এ জন্য যে, ইরানী জমিদারদের কঠোরতায় ওদের মন খারাপ হয়ে গেছে।'

মাহবানুর দিকে ফিরে কোব্বাদ বললেনঃ 'বেটি, আমাদের মেহমান পরিশ্রান্ত। কাউসকে ডেকে এর আরামের ব্যবস্থা করো।'

কাউসকে ডাকল মাহবানু। এক খাদেমা ছুটে এসে বললঃ 'কাউস এখানে নেই। দেউড়ী থেকে এক পাহারাদার এসেছিল। ও তার সাথে গেছে।'

ঃ 'ঠিক আছে।' বললেন কোব্বাদ। 'মেহমানকে তার কামরায় নিয়ে যাও। কাউস এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

খানিকপর। মাহবানুর সাথে অন্য এক কামরায় প্রবেশ করলেন ডাক্তার। শ্রান্তিতে বিছানায় বসে পড়লেন তিনি। মাহবানু জিজ্ঞেস করলঃ আব্বাজানের অবস্থা খারাপ নয়, আপনি কি নিশ্চিত?'

ঃ 'বেটি! তাঁর অসুখের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে কিছু বলতে পারছি না। পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। চিকিৎসায় আমি ত্রুটি করবো না।'

ঃ 'আপনার শোকর গোজারী করছি। আমার ভাই মাদায়েন। যদি অসুবিধে মনে করেন তাকে ডেকে আনাব। গত তিন মাসে চারবার এসেছিলেন তিনি। আব্বাজানকে জিজ্ঞেস না করেই তাঁকে আমি ডেকে পাঠাতাম। আপনি জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ফৌজী কর্মচারীদের সহজে ছুটি মিলে না। গেল বার তিনি এলে আব্বা দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ঘরের পরিস্থিতির কারণে তার তরক্কীর পথ বন্ধ হোক, তিনি তা চান না। আব্বাজান সফরের উপযুক্ত থাকলে ভাইজান আমাদেরকে মাদায়েন নিয়ে যেতেন।'

ঃ 'পিতার অবস্থা সম্পর্কে আপনার ভাই বেখবর নন। অনেক চেষ্টা করে আমাকে তিনি এখানে পাঠিয়েছেন। ছুটি পেলে নিজেই হীরা থেকে এখানে নিয়ে আসতেন আমাকে। মুসলমানদের অগ্রাভিযানের রটনা সঠিক হলে ছুটি পাওয়া আপনার ভায়ের জন্য মুশকিল হবে। আমার পরামর্শ হল সবর আর ধৈর্যের সাথে কাজ করুন। খোদানাখাস্তা তার অসুস্থতা বেশী হলে হীরার হাকিমকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠানোর জিম্মা আমি নিচ্ছি।'

ডাক্তারের দিক থেকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি সরিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল মাহবানু। ফিরে এল কোব্বাদের কামরায়। শুয়ে আছেন তিনি। বিছানার পাশে এক কুরসীতে বসে আছে খাদেমা। তার পাশে বসল মাহবানু। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল খাদেমাঃ 'অষুধ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। আপনিও খানিক আরাম করুন।'

ঃ 'আমার চেয়ে তোমার আরামের দরকার বেশী। দিনে অনেক ঘুমিয়েছি। কাউস এলেও আরাম করতে পারব। কিন্তু সে কোথায় গায়েব হয়ে গেল?'

ঃ 'জানিনা। পাহারাদার তার কানে কানে কিছু বলতেই সন্তর্পনে বেরিয়ে গেল সে।'

একটু পর কামরায় ঢুকল কাউস। মাহবানুকে হাত দিয়ে ইশারা করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। পেরেশান হয়ে মাহবানু ও বেরিয়ে এল।

ঃ 'কি ব্যাপার কাউস। তুমি এত হয়রান কেন?'

জওয়াব না দিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কয়েক কদম দূরে দাঁড়াল কাউস। কাঁপতে লাগল মাহবানুর হৃদয়।

ঃ 'কাউস তুমি নীরব কেন?'

কাউস জিজ্ঞেস করলঃ 'ডাক্তার কোথায়?'

ঃ 'তিনি কামরায়। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জওয়াব দাওনি।'

ঃ 'মুনীব কি ঘুমিয়ে আছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'বেটি আস্তে কথা বলো, সে এসেছে?'

ঃ 'কে?' কাঁপা আওয়াজে বলল মাহবানু।

ঃ 'হাসান।'

মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মাহবানু। কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু কণ্ঠ রোধ হয়ে এল তার। প্রতি মুহূর্তে তার দীলের স্পন্দন বেড়ে যেতে লাগল। কাঁপা কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'সে কোথায়?'

ঃ 'আমি তাকে ছাদে রেখে এসেছি। সেখানে তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ডাক্তারের উপস্থিতিতে তাকে ভেতরে নিয়ে আসা ভাল মনে করিনি। তিনি খুবই ব্যস্ত। তুমি যাও। তার জন্য এখনি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওর ঘোড়া পথে মরে গেছে।'

সিঁড়ির দিকে এগুল মাহবানু। পা তার কাঁপছে। ধীরে ধীরে কদম তুলে খানিক থেমে, খানিক দ্রুত হেঁটে পৌঁছল ছাদে। দশমীর চাঁদ অকৃপণ ভাবে আকাশময় ছড়াচ্ছে আলোর ফোয়ারা। হাসান সিঁড়ির দরজার কয়েক কদম দূরে রেলিং ধরে তাকিয়ে ছিল বনের দিকে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘরে দাঁড়াল হাসান, থমকে দাঁড়িয়ে গেল

মাহবানু। এগিয়ে এল হাসান। মাহবানুর চেহারায় হৃদয়চেরা সেই মুচকি হাসি। চোখে তার আনন্দাশ্রু।

ঃ 'হাসান! এতদিন কোথায় ছিলেন।'

ঃ 'আফসোস! অনেকদিন তোমাদের খবর নিতে পারিনি। আব্বাজান কেমন আছেন?'

ঃ 'তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নেই। তাঁর চিকিৎসার জন্য হীরা থেকে এক ডাক্তার এসেছেন। তার অষুধে কয়েকদিন পর একটু আরামে ঘুমিয়েছেন তিনি। কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের জওয়াব দেননি। এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনার কোন বিপদ নেইতো?'

ঃ 'আমার জন্য ভাববেন না। আমি ভালো আছি। এক্ষুণি আবার রওনা হয়ে যাবো।'

ঃ 'আব্বাজান আপনাকে বারবার স্মরণ করছিলেন। তাঁর সাথে দেখা না করেই চলে গেলে তিনি খুব আফসোস করবেন। তবে কেউ যদি আপনার পিছু নিয়ে থাকে তাহলে আটকাবো না।'

ঃ 'হরমুজের লোকেরা আমার পিছু না নিলেও কয়েক মুহূর্তের বেশী অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সোহেলকে নিতে এসেছিলাম। কাউস বলল ও এখানে নেই।'

ঃ 'আব্বাজান ভাইজানের সাথে ওকে মাদায়েন পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে ও বিপদমুক্ত ছিল না। ভাল ছিল না শরীরও। ভাইজান বলেছেন, মাদায়েনে ওর জন্য ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে। মাদায়েন পৌছেই সুস্থ হয়ে গেছে ও। ভাইজান মাদায়েনে তার ফৌজি তালীমের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এখন ও খুব খুশী। আমার মত ভাইজানও তাকে নিজের ভাই মনে করেন। গেল বার ভাইজান এসে বললেন, সোহেলের স্বাস্থ্য এতটা ভাল হয়েছে, এখন গায়ের লোকেরা তাকে দেখলে চিনতেই পারবে না। আব্বাজান সফরের উপযুক্ত ছিলেন না, না হয় আমরা সবাই মাদায়েন চলে যেতাম।'

ঃ 'তার মানে, হরমুজের কাজে এখনো কোন পরিবর্তন আসেনি?'

ঃ 'না, হরমুজের কারণে আমরা পেরেশান নই। সীমান্ত এলাকায় মুসলমানদের হামলা শুরু হলে তার মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। এখন সে এ এলাকার প্রতিটি লোকের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছে। কদিন আগে আব্বাজানকে দেখার জন্য আমাদের ঘরেও সে এসেছিল। এখন তার ঘরে এলাকায় নেতৃস্থানীয়দের মিটিং চলছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে জওয়াবী তৎপরতার পরামর্শের জন্য আব্বাজানকে ডেকেছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেননি।'

ঃ 'তার মানে, আপনার আব্বার স্বাস্থ্য ভাল হলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হরমুজকে সাহায্য করতে রাজী হতেন!'

ঃ 'আব্বাজান হরমুজকে এখনো ক্ষমা করেননি। তবুও মুসলমানরা ইরান অধিকার করবে এ সহ্য করা যায় না। হরমুজ যখন আব্বাজানের কাছে এসেছিল, তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, যদি আরব কৃষকদের প্রতি ইরানী গভর্ণর এবং জমিদারদের ব্যবহার ভাল হত, তবে অল্প কজন মুসলমান ইরানী সীমান্তের দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহসও করত না। আব্বাজান তাকে আরব কৃষকদের ব্যাপারে তার কর্মপদ্ধতি বদলাবার পরামর্শ দিয়েছেন। সেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভবিষ্যতে ওদেরকে আর অনুযোগ করার সুযোগ দেবেন না।'

ঃ 'আপনি বলতে চাইছেন, পরিস্থিতি নেকড়েকে রাখালের পোশাক পরতে বাধ্য করলে ভেড়াদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ?'

ঃ 'না, হরমুজের কাজে আব্বাজান নিশ্চিন্ত নন। কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে নিকৃষ্টতম দুশমনকে সমর্থন করবেন। তাঁর ধারণা, সর্বাবস্থায় শাহানশাহের সাথে ওফাদারীর প্রমাণ দেয়ার মধ্যেই আরব কৃষকদের মুক্তি। হরমুজের মত কঠিনমনা ব্যক্তিও তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করতে লজ্জা অনুভব করবে।'

ঃ 'হরমুজ ঐ সব লোকদের সাথে বাড়াবাড়ি করতেও লজ্জা পায়নি যাদের ভাই এবং দোস্তরা কিসরার তখত ও তাজের জন্য জীবন দিয়েছিল।'

ঃ 'একথা আব্বাজানের কাছে বলেছিলাম। জওয়াবে তিনি বললেন, আরব কৃষকরা যদি এ লড়াইয়ে আগ্রহের সাথে শরীক হয়, তবে হরমুজের জুলুমের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ মাদায়েনের প্রাচীর পর্যন্ত শোনা যাবে। ওদের সাহায্য করবে ইরানের দেশপ্রেমিকরাও। এরপরও হরমুজ যদি সোজা পথে না আসে তার স্থানে পাঠানো হবে অন্য কোন ভাল গভর্ণর। কিসরার কান পর্যন্ত যাদের আওয়াজ পৌছবে না, হরমুজ জুলুম করবে শুধু তাদের ওপর। আব্বাজান একদিন বলছিলেন, ইরানের অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, হাসান ঘরে ফিরে এলে হরমুজ তার সাথে মোসাফেহা করতেও কুণ্ঠিত হবে না। কমপক্ষে আমাদের ঘরে তাঁর কোন বিপদ হবে না।'

ঃ 'যদি বলি হরমুজের সাথে আমি দেখা করেছি, কথাও বলেছি তার সাথে কিন্তু ঐ জালেমের সাথে মোসাফেহা করার প্রয়োজন অনুভব করিনি, আপনি কি বিশ্বাস করবেন?'

ঃ 'আপনি হরমুজের কাছে গিয়েছিলেন?'

ঃ 'হরমুজকে বলতে গিয়েছিলাম, তোমার হিসাবের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

ঃ 'আর হরমুজের সিপাইরা আপনার পিছু ধাওয়া করছে?'

ঃ 'রাতের বেলা হরমুজের সিপাইরা আমায় খুঁজে পাবে না। সীমান্তের ওপারে পৌছে দিতে এসেছিল ওরা। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সূর্যাস্তের মধ্যে এলাকার বাইরে চলে যেতে না পারলে, আমায় হত্যা করবে। এতক্ষণে ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে না গিয়ে

থাকলে আমায় জংগলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা ভেবেছিলো সন্ধ্যার পূর্বে আমি সীমান্ত পেরোতে পারব না। কিন্তু ওরা জানে না, সীমান্ত পার হবার আগে আমার ভাইয়ের খোঁজ আমি নেব। সীমান্তের শেষ চৌকির এক মঞ্জিল আগে আমি যখন ঘোড়ার বাগ এদিকে ফিরিয়ে দিলাম, ওরা বাঁধা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ওরা ছিল দু'জন। আমার ঘোড়ার তুলনায় ওদের ঘোড়া ছিল তাজাদম। আমার কাছে কোন তলোয়ারও ছিল না। হরমুজের মহলে ঢুকার সময় আমাকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। সূর্যাস্তের সময় নদীর কিনারে ঘন বাগান পেরোচ্ছিলাম আমরা। আমি সাথীদের বললামঃ 'এতোক্ষণে সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। আমরা রাস্তা ভুলে যায়নি তো!'

অর্থবোধক হেসে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল ওরা। আমি বললামঃ 'তোমাদের অনুমতি পেলে আমি একটু পানি পান করব।'

ঃ 'পানি পান করার জন্য আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের কয়েদী নও। আমাদেরকে শুধু তোমার হিফাজতের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ঃ 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সম্ভবতঃ পথ ভুলে সীমান্তের অনেক দূরে এসে পড়েছি আমরা। আপনাদের অনুমতি ছাড়া এক মুহূর্তও কোথাও থামা আমার জন্য ঠিক নয়।'

ঃ 'এক মুহূর্ত অথবা ঘন্টায় এখন আর কোন পার্থক্য নেই। উড়াল দিলেও মাঝরাতের আগে আর সীমান্ত পেরোতে পারবে না তুমি।'

কয়েকজন আরব আর ইরানী জমা হল আমাদের চারপাশে। আমি একজনকে বললাম পানি আনতে। বস্তির লোকদের সাথে আলাপে মত্ত হল আমার সংগীরা। কিছুক্ষণ পর আমরা যখন ওখান থেকে রওনা করলাম তখন সন্ধ্যা। বস্তির বাইরে ছিল গ্রাম প্রধানের মহল! আচানক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম আমি। দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লাম বাগানের ভেতরে। ওরাও চিৎকার করতে করতে বাগানে ঢুকল। ততোক্ষণে আমি তাদের দৃষ্টির আঁড়ালে। প্রাচীরের গা ঘেঁষে পূর্ণ শক্তিতে দৌড় লাগালাম। লুকিয়ে পড়লাম ঘন বৃক্ষের আড়ালে। ওরা বেরিয়ে গেল বাগানের অপর প্রান্ত দিয়ে। প্রাচীর থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, বাইরে মাত্র একজন সিপাই। বেসামাল ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে রেখেছিল সে। কিছু ঘোড়া ছুটছে এদিক ওদিক। দেয়াল টপকে আবার আমি ফিরে এলাম। তার তরবারী ছিনিয়ে সওয়ার হলাম ঘোড়ায়। বাকী ঘোড়াগুলো ভাগিয়ে দিলাম এদিক ওদিক। শোনা গেল বাগানের অপর দিক থেকে ফিরে আসা সিপাইদের আওয়াজ। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। এক বনে ঢুকে স্বস্তির শ্বাস নিলাম। মাটিতে পড়ে ঘোড়াটা মরে গেল। কি আশ্চর্য মিল দেখো! এর আগেও এই জংগলই একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিল। আমার সৌভাগ্য যে, এবার আমি আহত নই।'

ঃ 'কিন্তু আপনি হরমুজের কাছে কেন গিয়েছিলেন?'

ঃ 'সে লশকরের সিপাহসালারের দূত হয়ে আমি হরমুজের কাছে গিয়েছিলাম, ইরানে জুলুমের পতাকা ধুলায় লুটিয়ে দেয়ার জন্য কুদরত যাদের নির্বাচন করেছেন।'

ঃ 'হাসান!' ধরা আওয়াজে বলল মাহবানু। 'তুমি মুসলিম ফৌজে শামিল হয়েছ?'

ঃ 'হ্যাঁ।' নির্দ্বিধায় জওয়াব দিল হাসান।

অশ্রু ভেজা কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'এখন তুমি আমায় বলতে এসেছ, হরমুজের জুলুম জাহাদাদের দোস্তকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে তরবারী তুলতে বাধ্য করেছে?'

ঃ 'মাহবানু! কিভাবে ভাবতে পারলে, জাহাদাদের দোস্ত মিয়ানদাদের দুশমন হতে পারে?'

মাহবানুর চোখ থেকে উছলে এল অশ্রুর বন্যা। কান্নার গমকে সে বললঃ 'মুসলমান যখন এগিয়ে আসবে ইরানের দিকে, সমগ্র শক্তি দিয়ে কিসরার লশকর তাদের মোকাবেলা করবে। কিসরার লশকর ময়দানে এলে মিয়ানদাদ থাকবে প্রথম সারিতে।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাসান। মাহবানুর নীরব দৃষ্টি বার বার প্রশ্ন করছিলঃ 'তুমি কি সেই? ময়দানে আমার ভাইয়ের মোকাবিলা করবে, এও কি সম্ভব!'

একটু পর ব্যথাভরা কণ্ঠে হাসান বললঃ 'মাহবানু, মৃত্যু যখন ধাওয়া করেছিল আমায়, আশ্রয় দিয়েছিলে তুমি, আহত ছিলাম, সেবা করেছ। যখন নিরাশার আঁধারে আমি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, তোমার দৃষ্টি আমার হৃদয়ে জ্বালিয়েছিল আশার আলো। আমি অকৃতজ্ঞ নই। শোন মাহবানু, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমার জীবনের একমাত্র সাধ ও স্বপ্ন ছিল দুনিয়ার সব হাসি আনন্দ তোমার পায়ের কাছে জমা করব। বাহরাইনের বিরাণ ভূমিতে তোমার জন্য খুঁজছিলাম চির বাসন্তি খর্জুর বীথি। তোমার জন্যে শান্তির ঘর বানাতে চাইছিলাম আমার আহত হাতে। আমার দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে তোমার জন্য খুঁজেছি ঝলমলে আলো। এ ছিল এক পাগলের স্বপ্ন। তবুও আমি ভাবতাম, কোন মোজেযা যদি সময়ের এ সয়লাবের গতিপথ বদলে দেয়, আচানক এমন এক জান্নাতে আমি পৌছব, জীবন যেখানে মৃত্যুভয় শূন্য। শক্তিমানের হাত যেখানে পৌছবে না দুর্বলের শাহরগ পর্যন্ত। ফিরে এসে তোমায় এ পয়গাম দেব, তোমার জন্য শান্তির নীড় খুঁজে পেয়েছি, আর পূর্ণ হয়েছে আমার জীবনের সবচে বড় আরজু। মাহবানু! আমি ফিরে এসেছি তোমাকে এ কথা বলতে, পাগলের মতো যে মনোলোভা স্বপ্ন আমি দেখতাম তা পূর্ণ হয়েছে। আমি দেখেছি সে দ্বীনের মোজেযা, বংশীয় বিদ্বেষের প্রাচীর যে উপড়ে ফেলেছে। যার আইন শাহানশাহের শক্তি নয়, বরং জনতার অধিকারের হিফাজত করছে। আমি দেখেছি সেই জান্নাত, যেখানে ঘুচে গেছে উঁচু-নিচু, আমীর-গরীব, আর শক্তিধর ও দুর্বলের ভেদাভেদ।

কয়েক বছর আগেও যাঁরা ছিলো ইসলামের দুশমন, এখন ওরাই ইসলামের জন্য বাঁচা-মরাকে সৌভাগ্য মনে করে। মাহবানু! তোমায় হয়তো বোঝাতে পারবো না, মুনীব-গোলাম, আর জালেম-মজলুমের দুনিয়ায় শান্তি ও ইনসাফের অন্বেষীরা যে বিরাট বিপ্লবের প্রত্যাশা করছে, তা সমাগত। যদি জাহাদাদ বেঁচে থাকতো, দেখতো নূরের সে

ফোয়ারার একটা ঝলক, গোটা আরবকে আবেষ্টনীতে নেয়ার পর যে আজ আজমের দিকে এগিয়ে আসছে, তার অনুভূতি আমার চেয়ে ভিন্ন হতো না। ভাই বোন আর পিতার সামনেই নয় বরং মাদায়েনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করত কোন শাহানশাহ নয়, বরং মুসলমানরা বুলন্দ করছে মানবতার ঝাণ্ডা। যারা ইনসানিয়াতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের বিজয় আমারই বিজয়।'

এর কোন জওয়াব ছিল না মাহবানুর কাছে। তার মুখে ও শুনতে চাইছিল, বিচ্ছেদের দিনগুলোর কাহিনী। যার প্রতিটি মুহূর্ত বছরের চেয়ে দীর্ঘ মনে হয়েছে ওর কাছে। অশ্রুর পরিবর্তে অশ্রু আর হাসির জওয়াবে হাসি দেখতে চাইছিল ও। কিন্তু যে সরল ব্যক্তিটি ভালবাসা আর বিশ্বাসে ওকে অভিষিক্ত করেছিল তাকে মনে হচ্ছিল দুর্বোধ্য। ও নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কয়েক কদম এগিয়ে জংগলের দিকে তাকাল হাসান। ফিরে বললঃ 'কাউস আমার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছে। বেশী সময় থাকতে পারিনি বলে আফসোস হচ্ছে আমার। তোমার আব্বাজানের সাথেও কোন কথা বলতে পারলাম না। তবে আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব। মাহবানু, আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে দুশমন ভাববেন না। একদিন হয়ত মুসলমানদের ব্যাপারে তোমার অনুভূতিও আমার থেকে ভিন্ন হবে না। যদি আমি ফিরে না আসি, অথবা লড়াইয়ের ময়দানে খতম হয়ে যায় আমার জীবনের সফর, আর আমি শামিল হই ঐ সব শহীদানদের সাথে, আঁধারের আবর্তে যারা আপন খুনে চেরাগ জ্বালাচ্ছেন, জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তেও এ ঘরের নকশা ঝলমল করবে আমার দৃষ্টিতে। যখন দজলা ফোরাতের উপত্যকা থেকে মুছে যাবে জুলুম আর শোষণের সয়লাব, আল্লাহর জমিনে কায়েম হবে তারই দ্বীন, খতম হবে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, ভেদাভেদ ঘুচে যাবে শাদা-কালো, আমীর-গরীব আর আরব-আজমের, ঝুপড়ি আর মর্মর প্রাসাদের অধিবাসী সকলেই দেখবে ইনসাফের একই মানদণ্ড, আশা করি এ ঘরের লোকেরা সেদিন আমাকে দুশমন ভাববে না।'

কাঁপা আওয়াজে মাহবানু বললঃ 'আমি শুনেছি মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র লশকর গত কয়েক মাস ধরে ইরানী এলাকায় হামলা করে যাচ্ছে। এখন আরেক লশকর এসে শামিল হয়েছে তাদের সাথে। আমি জানি না কি হবে এদের অভিযানের ফল! জাহাদাদ বেঁচে থাকলে মুসলমানদের ব্যাপারে কি মত পোষণ করতো তাও জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি, যদি তুমি বল আরবের পর্বতমালা উপড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে মুসলমানরা, অথবা ওখানকার বালুকাময় শৃংগগুলো রূপান্তরিত হবে সোনা রূপায়, আমি বিশ্বাস করব। কিন্তু মুসলমানদের সাফল্যের ব্যাপারে যদি তুমি স্থির নিশ্চিত হও, তবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, কিসরার বিরাট লশকর প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে যখন ময়দানে আসবে, কোন্ শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবে ওরা। তাও এমন পরিস্থিতিতে, যখন রোমও তাদেরকে দুশমন মনে করে! কাইজারের লশকরও যে কোন

সময় তাদের ওপর চড়াও হতে পারে?

হাসান, আমি মিয়ানদাদের বোন আর মিয়ানদাদ কিসরা সেনাবাহিনীর এক জবরদস্ত অফিসার। আমি কোব্বাদের বেটি, আর হরমুজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা থাকা সত্বেও তিনি শাহানশাহের পরাজয় সইবেন না। হাসান, যদি তুমি মুসলিম ফৌজে শামিল হয়েই থাক, মনে রেখো, কোব্বাদের বেটি আর মিয়ানদাদের বোন তোমাদের বিজয়ের জন্য কখনো দোয়া করতে পারবে না। তবে এ ঘরের অধিবাসীরা তোমার জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আমার জিন্দেগীর প্রতিটি শ্বাস তোমার নিরাপত্তার জন্যে দোয়া করবে। তুমি বাহরাইন গিয়েছ, ভাবতাম তোমার ফিরে আসা বিপদমুক্ত নয়। তবুও তোমার পথ পানে তাকিয়ে থাকতাম সকাল সন্ধ্যা। কখনো মনে হতো পথে হরমুজের লোকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছ তুমি। ওরা তোমায় কোতল করেছে। কখনো স্বপ্নে দেখতাম, হরমুজের লোকেরা ধাওয়া করেছে তোমায়। আহত হয়ে পৌছেছ আমাদের ঘরে। ওরা তোমায় ধরে নিতে চাইত। পথ আগলে দাঁড়াতাম আমি। ওরা তোমায় কোতল করতে চাইত, মাঝখানে আমি ঢাল হয়ে দাঁড়াতাম। চিৎকারের সাথে শেষ হত এ ভয়ংকর স্বপ্ন। আবার যাচ্ছ তুমি। জানি রুখতে পারব না। কিন্তু অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকব তোমার পথের পানে।

হাসান, মুসলমান হলে কি দুনিয়ায় সাথে মানুষের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়? তোমার ভাইকে মাদায়েন পাঠিয়ে দিয়েছি বলে তোমার আগমন সংবাদে আমি কতই না পেরেশান ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সোহেলের ব্যাপারে তোমার অসংখ্য প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে আমি অস্থির হয়ে যাব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সোহেলের এখানে থাকা না থাকা তোমার জন্যে সমান।'

ঃ 'ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় না পেলে সোহেলের বিচ্ছেদ আমার জন্যে হতো কঠিন পীড়াদায়ক। দীর্ঘ সময় পর এখানে পৌছে যখন শোনতাম সোহেল নেই, দুনিয়ার কোন শক্তি তার কাছে যাওয়া থেকে আমায় ফিরাতে পারত না। যদি তুমি বলতে হরমুজের সিপাইরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, সম্ভবত পিছপা হতাম না ওখানে যেতেও। কিন্তু বাহরাইন পৌছে আমি সে কাফেলার সাথে সফর শুরু করেছি, যারা দ্বীনী সম্পর্ককে সব সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর সেসব বান্দাদের আমি দেখেছি, ইসলামের বিজয় যাদের জীবনের সবচেয়ে বড় মাকসাদ। আল্লাহর পথে কোরবান করেছে ওরা জীবনের সকল হাসি আনন্দ। সেসব পিতা, স্বামী আর সন্তানদের আমি দেখেছি, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ব্যাকুলতা যাদের কাছে বিবি বাচ্চা আর পিতামাতার মুহাব্বতের চাইতে অনেক বেশী। এখন শুধু সোহেলই নয় বরং দুনিয়ার প্রতিটি মজলুম আর অসহায় মানুষ আমার ভাই। সোহেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও এ প্রশান্তি আমি অনুভব করছি, এমন লোকদের সাথে শামিল আমি হয়েছি যারা কেবল আপন ভাই-বেটার জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য শান্তি ও স্বাধীনতার মুক্ত

বীথিতে পানি সিঞ্চন করছে আপন খুনে।'

ঃ 'আপনার কি মনে হয়, মাদায়েন পৌছতে যে সব লাশ আপনাকে মাড়াতে হবে, মিয়ানদাদের লাশ থাকবে না তাদের সাথে?'

ঃ 'আল্লাহ যদি আমার দোয়া কবুল করে থাকেন, তবে মিয়ানদাদ আর সোহেলের পথ আমার পথের চেয়ে আলাদা হবে না।'

আশান্বিতা হয়ে মাহবানু বললঃ 'হাসান, প্রতিশ্রুতি দাও তোমার ধারনা যদি ভুল প্রমাণিত হয়, পরাজিত অথবা আহত হয়ে যদি প্রয়োজন হয় কোন আশ্রয়ের, আমাদের ঘরের পথ ভূলবে না।'

ঃ 'না! মুসলমানদের বিজয় আমার প্রাণের চাইতে বেশী প্রিয়। বিজয় অথবা শাহাদাত ছাড়া আমার তৃতীয় কোন পথ থাকবে না। আহত হয়ে পিছু হটবো না ময়দান থেকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এ পা দুটো বইতে পারবে শরীরের বোঝা, শিরায় থাকবে রক্তের শেষ বিন্দু, হৃদয়ে থাকবে প্রাণের স্পন্দন, এগিয়ে যাব সামনের দিকে। আমার দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লে এ শান্তনা পাব, আমার দায়িত্ব আমি পূর্ণ করেছি। যদি আমি বেঁচে থাকি, যখম দেখাতে নয়, বরং এ ঘরের লোকদেরকে ইসলামের বিজয়ের খোশ খবর শোনানোর জন্যই আসব। মাহবানু! মুসলমানদের শৌর্য বীর্য নিজের চোখে না দেখলে কখনোই এ কথা বিশ্বাস করতাম না যে, ওরা ইরানের সাথে লড়তে পারবে। কিন্তু এখন কিছুই অসম্ভব মনে হয়না আমার কাছে। যদি তুমি শুনে থাক মুসলমানদের নতুন লশকর পৌছেছে ইরানের সীমান্তে, বলব, সামনের মাসের নতুন চাঁদ আকাশে দেখা দেবার পূর্বেই তাঁদের বিজয়ের অবিশ্বাস্য সংবাদ আসবে তোমার কানে। আমার শুধু আফসোস, আল্লাহর সে নেক বান্দাদের তুমি দুশমন ভেবেছ, মানবতাকে যারা নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করছে।'

মাথা নিচু করল হাসান। নেমে এল বিষন্ন নীরবতা। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললঃ 'এবার আমায় এজাযত দাও।'

ঃ 'যাচ্ছেন আপনি?'

ঃ 'হ্যা, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'।

মাহবানুর চেহারায় ফুটে উঠল এক টুকরা বেদনা বিধুর হাসি। বললঃ 'বিজয়ের নাকাড়া বাজিয়ে এলে এ ঘরের দুয়ার তো আর বন্ধ করতে পারব না!'

ঃ 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের অনুমতি ছাড়া দরজার ভেতরে পা রাখব না আমি।'

ঃ 'আর তোমার সাথে যারা আসবে কারো ঘরে ঢুকতে তারাও কি আমার অনুমতি জরুরী ভাববে?'

ঃ 'ওরা যে বস্তিতে পা রাখবে জুলুম আর বর্বরতার ভয়ংকর অন্ধকার আঁচল গুটিয়ে নেবে সেখানে থেকে। তুমি দেখবে, আজ যারা তাঁদের দুশমন ভাবছে, তারাই

ওদের চলার পথে ফুলের পাপড়ি ছড়াবে।'

ঃ 'হাসান, তোমার কথা আমার বোধগম্যের বাইরে। মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। আরবের মরুচারীরা কিসরার পতাকা ধুলায় লুটাবে, মিয়ানদাদ ইরানের সিপাহী আর আমি ইরানের দুশমনের জন্য উদগ্রীব নয়নে তাকিয়ে থাকব, এ কিভাবে সম্ভব?'

ঃ 'আরবের বেদুইনরা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ছিল, ইসলামের বিজয়ের কল্পনা ছিল ওদের কাছে স্বপ্নের মতোই। শতশত বছর ধরে যে অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছিল, তার সামনে দেখতে ওরা রাজী ছিল না। কিন্তু এখন এ স্বপ্নই রূপান্তরিত হয়েছে সত্যে। ওরা ইসলামের পতাকাধারীদের পথ পানেই শুধু তাকিয়ে থাকে না, বরং এ আলোর শিখা আরব সীমান্তের বাইরে ছড়িয়ে দিতে বেকারার। আমার বিশ্বাস, আরববাসীর মত ইরানের লোকেরাও যখন চোখ খুলবে এ আলোয়, অতীত অন্ধকার ওদের মনে হবে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। আমাকে বিশ্বাস করো মাহবানু, নিজের চোখে সে আলো আমি দেখেছি।'

কিছু বলতে চাইল মাহবানু। সিঁড়ি থেকে ভেসে এলো কারো পায়ের আওয়াজ। কাউস ছাদে উঠে বললঃ 'আপনার ঘোড়া তৈরী। জলদি করুন, ভোর হয়ে এল প্রায়।'

ঃ 'চলো।'

বিষন্ন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল মাহবানু। সহসা দ্রুত পায়ে এগিয়ে ধরা গলায় ডাকলঃ 'হাসান!'

থামল হাসান। কিন্তু পিছন ফিরে দেখার সাহস হল না তার।

ঃ 'হাসান, ...হাসান, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

পলকের জন্য পিছন ফিরল হাসান। 'খোদা হাফেজ' বলে দ্রুত তালে এগিয়ে চলল সম্মুখপানে।

এগার

একদিন বিকেলে মাহবানু এবং ডাক্তার কোব্বাদের কাছে বসেছিল। কাউস এসে বললঃ 'মিয়ানদাদ এসেছে।'

কোব্বাদের চেহারা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পাশ ফিরে তিনি তাকালেন দরজার দিকে। ছুটে বেরিয়ে গেল মাহবানু। একটু পরেই ফিরে এল ভাইকে নিয়ে। লৌহবর্মে সজ্জিত মিয়ানদাদের শিরস্ত্রাণ ঝলমল করছিল। বিছানায় শুয়েই হাত প্রসারিত করলেন কোব্বাদ। মিয়ানদাদ তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলে কাউসের হাতে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাথা রাখল বৃদ্ধ পিতার বুকে।

ঃ 'আব্বাজান, আপনার শরীর এখন কেমন?'

কোব্বাদ তার কপালে চুমো খেয়ে বললেনঃ 'আমি বিলুকল ঠিক বেটা। সম্ভবতঃ কোন অভিযানে যাচ্ছ তুমি?'

ঃ 'আব্বাজান, হাফিরের দিকে এগিয়ে আসছে মুসলমানরা, আমাদের লশকরও এগিয়ে গেছে।'

আচম্বিত উঠে বসলেন কোব্বাদ। বললেনঃ 'দুশমনের মোকাবিলায় রওনা করে থাকলে, লশকর ছেড়ে এদিকে আসা ঠিক হয়নি।'

ঃ 'আব্বাজান, আমার জন্য ভাববেন না। সন্ধ্যার আগেই লশকরের সাথে শামিল হব। আমাকে এক হাজার সওয়ারের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'শুধু এক হাজার অশ্বারোহী পাঠান হয়েছে মাদায়েন থেকে?'

ঃ 'না আব্বাজান, আমাদের বাকী লশকর পেছনে আসছে। এত তাড়াতাড়ি এত বড় দায়িত্ব আমায় দেয়া হবে, এমনটি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু পারভেজ আমার কথা বললে সিপাহসালার দ্বিধাহীনভাবেই তা অনুমোদন করেন। পারভেজ বলেছেন, লড়াইয়ের ময়দানে নাম কুড়াতে পারলে তোমার উন্নতির পথ খুলে যাবে।'

ঃ 'তোমায় যখন পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পারভেজ হয়তো আমায় ভুলে গেছে। কিন্তু সে এক উত্তম দোস্ত। হায়, কোনদিন যদি তার এ উপকারের বদলা দিতে পারতে! বেটা! তিনি যদি তোমার সুপারিশ করে থাকেন তোমায় প্রমাণ করতে হবে, তার আশাগুলো তুমি পূর্ণ করতে পারবে।'

ঃ 'আব্বাজান। তাকে আমি নিরাশ করবো না। কিন্তু আমি দেখছি মাদায়েনের ফৌজ আসার আগেই ইরানের লড়াই খতম হয়ে যাবে। দরিয়া পেরিয়ে শুনলাম, দুশমন ফৌজ যে সব স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করত, হরমুজ একই সময়ে তার সবগুলো কব্জা করে নিয়েছেন। প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিল, হরমুজ খানিকটা সাহসিকতার সাথে কাজ করলে আঠার হাজার মুসলমান তার ফৌজের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। নিজেদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য ওরা শাহানশাহকে পেরেশান করেছে।'

কোব্বাদ বালিশে মাথা রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলেনঃ 'সেই ছেলেটার অবস্থা কি?'

ঃ 'সোহেল ভাল আছে। ওস্তাদরা তার স্মরণ শক্তির খুব প্রশংসা করেন। তেগ চালনা আর তীরন্দাজীতে ওর সমবয়স্ক কেউ ওর সাথে মোকাবিলা করতে পারে না। এ অভিযানে ও আমার সাথে আসতে চেয়েছিল। ওর বয়েস আর মাত্র তিন বছর বেশী হলেই সাথে নিয়ে আসতে পারতাম।'

ঃ 'ওর ভাই এসেছিল।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'প্রায় দিন দশেক আগে।'

ঃ 'এখন কোথায় সে?'

ঃ 'জানিনা।'

ঃ 'ও এখানে থাকলে ফৌজে শামিল করে নিতাম।'

হাসান সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছিল মাহবানু। কিন্তু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ খোলার সাহস পেলো না। হাসান যে মুসলমান হয়েছে একথা এখনো সে পিতাকেও বলেনি। উৎকণ্ঠিত হয়ে কখনো পিতা, ডাক্তার আবার কখনো ভাইয়ের দিকে চাইতে লাগল ও। নিরাশা আর অসহায়ত্বের আঁধারে হারিয়ে যেতে লাগল তার স্বপ্নীল পৃথিবীর সোনালী আকাশ। মিয়ানদাদ দাঁড়িয়ে শিরস্ত্রাণ হাতে নিয়ে বললঃ 'আব্বাজান, এবার আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

কোব্বাদ তার কাঁপা হাত মিয়ানদাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে বললেনঃ 'যাও বেটা। এ তোমার প্রথম পরীক্ষা। আশা করি হরমুজের সামনে আমায় লজ্জিত করবে না।'

মোসাফেহা করে ঝুকে পিতার হাতে চুমু খেয়ে বলল মিয়ানদাদঃ 'আব্বাজান, হরমুজের সামনে আপনাকে লজ্জিত করার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও আমি সহজ মনে করি।'

মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, চলুন, আপনাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিই।'

মাহবানুকে নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মিয়ানদাদ বললঃ 'আফসোস! হাসান এলো কিন্তু তুমি তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করোনি। ও থাকলে এখন আমি তাকে নিয়ে যেতে পারতাম। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশ নেয়ার পর হরমুজের কাছ থেকে আত্মগোপন করার প্রয়োজন হতো না ওর। মাদায়েনে ঐসব লোকদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, জাহাদাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাঁরা রোমানদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তাদের বলতে শুনেছি, এক আরব যুবক সব সময় ছিল জাহাদাদের পাশে। মুচকি হেসেছে ও তীর বৃষ্টির মধ্যেও। আফসোস, হরমুজকে খুশী করার ভালো সুযোগ ও নষ্ট করল। আহ্! তাকে যদি তুমি আটকাতে! আমার বিশ্বাস, মুহূর্ত দেরী না করেই ও আমার সাথে রওনা করত।'

ঃ 'না ভাইজান, ও বরং আপনার পথ আগলে দাঁড়াতো।'

ঃ 'কে, হাসান?'

ঃ 'হ্যাঁ, তার কথা শুনলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলাফলে এতটা আশান্বিত হতেন না।'

ঃ 'আমাকে মুসলমানদের শক্তির ভয় দেখালে ওর জিহবা ছিড়ে ফেলতাম।'

ঃ 'ভাইজান, সে আপনার দুশমন নয়, তার কথায় এতটুকু অবশ্যই বুঝেছি। ইরান-আরব লড়াইয়ের ব্যাপারে তার ধারনা যাই হোকনা কেন, জাহাদাদের ভাইয়ের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগুক তাও সে বরদাশত করবে না।'

ঃ 'তার হামদর্দীর প্রয়োজন আমার নেই। আমি অবাক হচ্ছি, মুসলমানদের

প্রিয়ভাজন হয়ে কিভাবে সে আমাদের ঘরে পা রাখার সাহস করল।'

ঃ 'ভাইজান, সম্ভবত আপনি জানেন না কি দুরন্ত সাহসে ভর করে ও এখানে এসেছিল। আপনি কি শুনেছেন, মুসলিম সিপাহসালারের দূত হরমুজের কাছে পৌছে ভরা দরবারে তাকে ভয় দেখিয়েছে?'

ঃ 'সে দূতের ব্যাপারে আমি শুনেছি। আমার ধারনা, জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হয়েই হরমুজের কাছে গিয়েছিল সে। হরমুজও এই প্রথম এক আহম্মকের খুনে হাত রাঙাতে পছন্দ করেননি। কিন্তু হাসানের সাথে এর সম্পর্ক কি?'

ঃ ভাইজান, সেই আহম্মক দূত হাসান ছাড়া আর কেউ নয়।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ মাহবানুর দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'সে মুসলমান লশকরে শামিল হয়েছে, আব্বাজানকেও একথা বলেছ?'

ঃ 'না, আমার ভয় ছিল তিনি এতে আঘাত পাবেন। সোহেলের খবর নিতে ও এসেছে, একথাই শুধু তাঁকে বলেছি।'

ঃ 'হায়, আমাকেও যদি বেখবর রাখতে! মাহবানু, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি চলি।'

ঘোড়ায় সওয়ার হল মিয়ানদাদ। দ্রুত এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, একটু দাঁড়ান।'

পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'বলো, কি বলতে চাচ্ছিলে।'

ঃ 'কিছুই না ভাইজান, কিছুই না।'

ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল মাহবানু। তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো অশ্রুতে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেখা গেল হাফিরের ময়দানে ইসলাম আর মজুসী পরস্পর দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখী। খালিদ বিন ওয়ালীদের লশকরের সংখ্যা আঠার হাজার। অপর দিকে হরমুজের সৈন্য এর আড়াইগুণের চেয়েও বেশী। একদল জাগতিক উপকরণ সমৃদ্ধ, অপর দলের ভরসা আল্লাহর সাহায্য। মাদায়েনের অগ্রবর্তী দলও এসে যোগ দিয়েছে হরমুজের ফৌজে। আরো বিশ হাজার ফৌজ তার সাহায্যে রওয়ানা হয়েছে সংবাদ পেল সে।

খালিদ বিন ওয়ালীদের লশকরের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য পেরেশান ছিল হরমুজ। এগিয়ে হাফির এলাকায় পানির সবগুলি ঝরণা কব্জা করে নিল সে। তার ফৌজ উৎকৃষ্টতর হাতিয়ারে সজ্জিত। জোশে উদ্বেলিত হয়ে বারশো ইরানী পরস্পর লৌহ জিঞ্জিরে যুক্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। দৈত্যের মত হাতীতে সওয়ার হয়ে ময়দানে এসেছে হরমুজ। হাতীর দেহে শোভা পাচ্ছে সোনা রূপার জিঞ্জির। আলীশান ঘন্টা ঝুলছে তার গলায়।

দু'দলের মধ্যে মাত্র দু'শ গজের ব্যবধান। ইরানী লশকর থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল এক অশ্বারোহী। দু'হাত উপরে তুলে বুলন্দ আওয়াজে বললঃ 'আমি খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে কথা বলতে চাই।'

ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন খালিদ।

ঃ 'আমি খালিদ।'

ঃ 'আমাদের সেনাপতি আপনাকে মোকাবেলার দাওয়াত দিচ্ছেন।'

ঃ 'আমি প্রস্তুত।'

অশ্বারোহী ফিরে গেল। খালিদ এগিয়ে ময়দানের মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে হরমুজের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুসলিম লশকরের বায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কা'কা বিন আমর। আচানক ঘোড়া হাঁকিয়ে খালিদের নিকটে এসে বললেনঃ 'হরমুজের মত জালেম এবং অহংকারী ব্যক্তি বাহাদুর হতে পারে না। আমার মনে হয় এ কোন ষড়যন্ত্র। আপনি হুশিয়ার থাকবেন।'

নিরুদ্বেগে জওয়াব দিলেন খালিদঃ 'আমি জানি, আপনি ফিরে যান।'

ফিরে গেলেন কা'কা। ইরানী লশকর থেকে এগিয়ে এল হরমুজের হাতী। কিন্তু থেমে গেল খালিদের পঞ্চাশ কদম দূরে। হরমুজ গায়ের ঝলমলে জুব্বা খুলে লাফিয়ে পড়ল নিচে। রোদের আলোয় ঝলমল করছিল তার বর্ম। দর্শকদের সন্দেহ রইলনা অযথা তর্জন গর্জন করছেন তিনি। কিন্তু কা'কার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হরমুজকে নয় দেখছিল ইরানী লশকরের তৎপরতা। তরবারী উঁচিয়ে এগিয়ে এল হরমুজ। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন খালিদ। নেযা গেড়ে রাখলেন জমিনে। তলোয়ার হাতে নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেলেন হরমুজের দিকে। দুজনের মাঝে যখন বিশ কদমের ব্যবধান, হরমুজ তাকালেন লশকরের দিকে। খালিদের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে আচানক দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর তুলনায় নিজ লশকর থেকে খালিদ অনেক দূরে, তবুও তিনি থামলেন না। দুজনের তলোয়ার যখন টক্কর খাচ্ছিল, তীব্র গতিতে এগিয়ে এল একদল ইরানী অশ্বারোহী। মোকাবিলা না করে পিছে হটতে লাগলেন হরমুজ। সঙ্গে সঙ্গে কা'কা বিন আমর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। যে কজন জানবাজকে তিনি আগে থেকে সাবধান করেছিলেন তারাও অনুসরণ করল তাঁর। হরমুজের ধারনা ছিল আপন সওয়ার থেকে দূরে সরাতে পারলে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে খালিদ নিহত হবেন। ভয় পেয়ে ময়দান ছেড়ে পালাবে মুসলমানরা। কিন্তু খালিদের লড়াইয়ের দূরদৃষ্টির সামনে হরমুজের ষড়যন্ত্রকে মনে হল বাচ্চাদের খেলা। ইসলামের এ সিংহ ময়দানে এসেই ঐ সব পথ দেখে নিয়েছিলেন, খোদায়ী সাহায্য যেখানে তার প্রতীক্ষা করছে। আল্লাহু আকবারের নারা বুলন্দ করে চোখের পলকে তিনি পৌঁছলেন হরমুজের কাছে। পালানোর চেষ্টা করল হরমুজ। কিন্তু ভয়ে পা দুটো নিঃসাড় হয়ে এল তার। খোদার সৈনিক তলোয়ার উঁচু করলেন। চোখের পলকে দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এগিয়ে আসা এক

দুশমন আচানক হামলা করল খালিদকে। খালিদের তরবারীর আঘাতে ছিটকে পড়লো খানিক দূরে। মুহূর্তের জন্যে অন্য অশ্বারোহীরা স্তম্ভিত হয়ে রইল। ওরা সবাই খালিদকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু ততোক্ষণে কা'কা এবং তাঁর সংগীরা পৌছে গেছেন।

প্রথম হামলাতেই আট দশজনকে কাবু করলেন তাঁরা। এক তমিমী নওজোয়ান এগিয়ে নিজের ঘোড়া পেশ করল খালিদকে। তরবারীর অগ্রভাগ দিয়ে হরমুজের শির গেঁথে উঁচু করলো এক সিপাই। গোটা ইরানী ফৌজ ততোক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইসলামী লশকরের সিপাহসালার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কখনো সামনে কখনো ডানে বাঁয়ে সালারদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর উপর্যুপরি হামলা করছিল ইরানী অশ্বারোহীরা। ওদের একদল তীর বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটলে সে স্থান দখল করত অন্য দল। যখন মুসলমানদের প্রথম সারি ইরানী অশ্বারোহীদের আওতায় এসে যেতো, ডান বাঁয়ের আরব শাহসওয়ারদের প্রচণ্ড হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হত ওরা। হরমুজ নিহত হলেও লশকরের সংখ্যাধিক্যে বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিল ইরানী সরদাররা। তাই প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেও এগিয়ে হামলা করছিল ওরা। প্রায় ঘন্টা খানেক প্রতিরোধমূলক লড়াই চালালেন মুসলমানরা। কিন্তু যখনই দু'দলের পদাতিক ফৌজ মোকাবিলায় এল, আর ইরানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পিছু হটতে লাগল মুসলিম ফৌজের প্রথম সারিগুলি, কা'কার নেতৃত্বে ডানের অশ্বারোহীরা দুশমনদের ভেড়া বকরীর মত হাকিয়ে লশকরের মাঝখানে গিয়ে পৌছলেন।

এ ছিল মুসলমানদের প্রথম জওয়াবী হামলা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক আবর্তিত অবস্থার সম্মুখীন হল দুশমন ফৌজ। বিব্রতকর অবস্থায় পিছু হটতে লাগল ওরা। মূল বাহিনীকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন খালিদ। প্রলয় ঘটিয়ে দিল ওরা দুশমনের সারিগুলিতে। অবস্থা বেগতিক দেখে সংরক্ষিত ইরানী ফৌজ ছুটে এল ময়দানে। খানিক পরই ডানে ধূলির ঝড় সৃষ্টি করে অর্ধ বৃত্তের মত চক্কর দিলেন মুসান্না বিন হারেসা। তাঁর পাঁচ হাজার তাজাদম অশ্বারোহী পৌছল দুশমনের পেছন দিকে। বদলে গেল লড়াইয়ের মোড়। এতক্ষণ যারা লড়ছিল বিজয়ের আকাংখা নিয়ে, নিশ্চিত পরাজয় দেখলো তারা চোখের সামনে। খোদার রাহে শহীদ হওয়ার কামনা ছিল যাদের, বিজয় এসে চুম্বন করছিল ওদের পায়ে। সূর্যাস্তের সময় ময়দানে লাশের স্তুপ রেখে পালিয়ে গেল ইরানীরা।

শেষ রাতের দিকে গভীর নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে উঠল মাহবানু। দেখলো বাতি নিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে খাদেমা। চোখে চিক্ চিক করছে অশ্রুবিন্দু।

ঃ 'কি হয়েছে? আব্বাজানের অবস্থা কেমন?'

ঃ 'তিনি ভাল। কিন্তু তোমার ভাই....'

ঃ 'কি হয়েছে আমার ভাইয়ের?'

ঃ 'ও আহত হয়ে ফিরে এসেছে।'

ঃ 'কখন এসেছে? এখন কোথায়?'

ঃ 'এইমাত্র পৌছেছে। মুনীবের কামরায় ডাক্তার তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। খোদার শোকর ডাক্তার ছিল এখানে। তিনি বলেছেন যখম খুব বিপদজনক নয়।'

খালি পায়েই মাহবানু ছুটলো পিতার কামরায়। কোব্বাদের বিছানার পাশে কার্পেটে বসেছিল মিয়ানদাদ। ডাক্তার তার পেশানীতে পট্টি বাঁধছিল। কোল বালিশে হেলান দিয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন কোব্বাদ। অশ্রু মুছে মিয়ানদাদের পাশে বসল মাহবানু। চেহারায় মৃদু হাসি টেনে ডাক্তারকে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমার বোনকে আপনি শান্তনা দিন। আমার কথা ও বিশ্বাস করবে না।'

ডাক্তার ফিরে মাহবানুর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বেটি, তোমার ভাই বিলকুল ঠিক। শীঘ্রই এ যখম সেরে যাবে।'

মিয়ানদাদের হাতে ঠোঁট ছোয়াল মাহবানু। ব্যান্ডেজ শেষে কোব্বাদদের দিকে তাকালেন ডাক্তার।

ঃ 'আপনি শুয়ে পড়ুন। মিয়ানদাদের চেয়ে আপনাকে নিয়েই আমার বেশী দুশ্চিন্তা।'

ঃ 'আপনার কি বিশ্বাস ওর যখমে অপারেশনের দরকার নেই?'

ঃ 'আমি নিশ্চিন্ত। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

ঃ 'এখন বসেই আমি বেশী আরাম বোধ করছি।'

মিয়ানদাদ উঠে চেয়ারে বসতে বসতে বললঃ 'আব্বাজান, আমার জন্য ভাববেন না। শ্রান্তিতে খানিকটা ঝিমুনি এসেছিল। এখন আমি আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারব। কাউস, কি দেখছ দাঁড়িয়ে? আমার জন্য খানা তৈরী করো।'

বেরিয়ে গেল কাউস। কোব্বাদ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেনঃ 'আমার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আপনার ইরানী ফৌজে। বেকার বুড়োর পরিবর্তে সহস্র নওজোয়ানের জীবন আপনি বাঁচাতে পারেন। আমার ইচ্ছে আজই আপনি মাযার পৌছে যাবেন। আপনার অষুধ আমি নিয়মিত ব্যবহার করব।'

ঃ 'দেরী না করে রওয়ানা করাই আমার কর্তব্য। মুসলমানরা লশকরের দিকে এগুলে হীরার ফৌজকেও আসতে হবে ময়দানে। এ অবস্থায় সেখানে আমার অনুপস্থিত থাকা ঠিক হবে না।'

মিয়ানদাদ খানিকক্ষণ কথা বলল মাহবানুর সাথে। খানা নিয়ে এল খাদেমা। তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ও। আলতো পায়ে মাহবানু কামরায় ঢুকে বললঃ 'ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

ঃ 'না, ঘুমাইনি। বসো, তোমার সাথে কথা আছে।'

মাহবানু বসল তার পাশে। মিয়ানদাদ খানিক নীরব থেকে বললঃ 'আমি

হাসানকে দেখেছি। আমার চোখের সামনে ও আমাদের তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আমার নেযায় আওতায় ও এসেছিল। যদি হঠাৎ আহত হয়ে না পড়তাম তবে শুনতে আমার নেযা তার খুনে রংগীন হয়েছে।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মাহবানুর চেহারা।

মিয়ানদাদ আবার বললঃ 'আমি তাকে তিনবার দেখেছি। দ্বিতীয়বার সে ছিল ঐসব অশ্বারোহীদের সাথে আচানক যারা পেছন দিক থেকে আমাদের সারিগুলি তছনছ করে দিচ্ছিল। ও যেদিকে রোখ করত, ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত আমাদের সারিগুলি। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দুয়ারে পা রাখছিল ও। আমার মনে হচ্ছিল ওর বেঁচে থাকাটা একটা মোজেযা। কোন ইরানী যদি এমন উম্মাদের মতো লড়তো, তার জিনের পাদানীত চুমো দিয়েও আমি গৌরব বোধ করতাম।'

ঃ 'ভাইজান, তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে আমি এখানে আসিনি।'

ঃ 'আমি বলতে চাইছি, আরবদের সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেছে ইরানীদের। যে হাসানকে আমি ভাই মনে করতাম সে এক আরব বৈ নয়। শোন, আহত না হলেও একবার এখানে অবশ্যই আসতাম। আব্বাজানকে বলব, দুশমন ফৌজ আমাদের চেয়ে বেশী দূরে নয়। আগামী যুদ্ধে ওদের পরাজিত করতে না পারলে এ এলাকা অভাবনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আমি চাই, দেরী না করে তোমরা মাদায়েন চলে যাও।'

ঃ 'কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় মাদায়েন পালাতে আব্বা পছন্দ করবেন না। কোন প্রকারে রাজী করালেও তাঁর স্বাস্থ্য এমন নয় যে, মাদায়েন পর্যন্ত সফর করতে পারবেন।'

ঃ 'বোনটি আমার! এক রোগীর জন্য সে ঘর নিরাপদ নয়, যেখানে সব সময় থাকে শত্রুর হামলার আশংকা।'

আলোচনার ধারা পরিবর্তন করে মিয়ানদাদ বললঃ 'মাহবানু, আমার বার বার মনে হয় হাফিরের ময়দানে হাসান আমায় দেখলে কি করত!'

ঃ 'ভাইজান, আপনি কি তাকে ভুলতে পারেন না?'

ঃ 'না, তাকে আমি ঘৃণা করি। আর একবার যদি ও আমার সামনে পড়ে নির্দ্বিধায় তাকে খুন করব। কিন্তু তাকে ভুলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম, দুশমন আমার পিছু নিয়েছে। আমি ঘরে ঢুকতে চাইছি, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। সিপাইরা আমায় গ্রেফতার করে গলায় রশি লাগিয়ে নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নদীর তীরে এক বৃক্ষের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে আমায়। এক ব্যক্তি ভারী বর্শা তুলে এগিয়ে এল আমার দিকে। আচানক অরণ্য থেকে বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী। হত্যাকারী নামিয়ে রাখল বর্শা। অশ্বারোহী তার তলোয়ার দিয়ে আমার বাঁধন কেটে বলল, 'এবার তুমি আজাদ!' সে অশ্বারোহী ছিল হাসান। এ ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে জেগে দেখলাম আমার সারা শরীর ঘামে ভেজা। মাহবানু, বলতো, আবার আহত হয়ে ও যদি আমাদের ঘরে

এসে তোমার কাছে আশ্রয় চায়, কি করবে?'

ঃ 'দ্বিতীয়বার আহত হয়ে ও এখানে আসবে, একথা কেন ভাবছেন আপনি?'

ঃ 'আমি জানি না। তবুও মনে কর সে ....'

মাহবানু দু'হাতে ঢেকে ফেলল নিজের মুখ। কান্নার গমকে গমকে বললঃ 'না ভাইজান, সে আসবে না, আর কখনও আসবে না।'

তাড়াতাড়ি মিয়ানদাদ তার মাথা বুকে চেপে বললঃ 'কাঁদছ তুমি? সে আমাদের কাছে আসবে না এ জন্য তোমার আফসোস হচ্ছে?'

হাত সরিয়ে বিষন্ন দৃষ্টিতে মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, আপনার এ জন্য কি আফসোস নেই?'

ঃ 'আমি বহুত আফসোস করেছি, আর বার বার ভাবছি, হায়, এ যদি স্বপ্ন হতো। কখনো কখনো ভাবি, হাসান হরমুজের যে জুলুম বরদাশত করেছে তা যদি আমি করতাম, সম্ভবত ও যা করছে আমিও তাই করতাম।'

ঃ 'ভাইজান, লড়াইয়ের কয়েকদিন পূর্বে যে হাসান আমাদের ঘরে এসেছিল, সে ঐ মানুষটির চেয়ে আলাদা, হরমুজের সাথে ছিল যার দুশমনী। তার কথায় আমি বুঝেছি, সে দুনিয়ার সব জালেমের দুশমন আর সব মজলুমের দোস্ত। বিশ্বাসের দৃঢ়তা আর সততার আলো ছিল তার দৃষ্টিতে। তাঁর চোখে ছিল বীরত্ব– ক্রোধ অথবা ঘৃণা নয়। তার আত্মনির্ভরশীলতায় আমি ছিলাম হয়রান, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল তার কথাগুলো। মুসলমানদের শক্তিমত্তার ব্যাপারে তার দাবী এবং তাদের বিজয় সম্পর্কে তার বিশ্বাস, আমার কাছে এক প্রবঞ্চিত ব্যক্তির খাহেশের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু যখনই তার দিকে তাকাতাম, মনে হতো সে মিথ্যে বলছে না।'

মুচকি হেসে মিয়ানদাদ বললঃ 'বোন আমার, তোমার দীল খুব সাদা। তোমাকে ভয় দেখানোই ছিল হাসানের মাকসাদ!'

ঃ 'আমাকে ভয় দেখিয়ে তার কি লাভ? আমি তো আর ইরানের সিপাহসালার নই।'

লড়াইর প্রথম নীতি হচ্ছে দুশমনের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেয়া। হাসানের মত অভিজ্ঞ সিপাই ধরে নিয়েছে তোমার নৈরাশ্য আর ভীতি তোমার ভাইকেও প্রভাবিত করতে পারে। তোমার ভাই সাহস হারালে হাজারো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারবে। কিন্তু ও আমায় চেনেনি। সে জানে না আরবের বিরান ভূমি থেকে বেরিয়ে যে সব প্রবঞ্চিত ইনসান ইরানের শস্য শ্যামল এলাকার দিকে যাত্রা করেছে, তাদের প্রতিটি কদম উঠছে মওতের দিকে। শীঘ্রই জামানার নীরব দৃষ্টি দৃঢ়তা আর একীনের রোশনীর পরিবর্তে মুসলমানদের চেহারায় দেখবে মৃত্যুর ভয়াল ছায়া। হাফিরের লড়াই থেকে বুঝেছি, দুশমনকে চরমভাবে পরাজিত করতে আমাদের আরও বেশী শক্তি ব্যয় করতে হবে। তোমার শান্তনার জন্যে বলছি, সে শক্তি আমাদের আছে! এখন তোমার কাছে

আমার একটা শর্ত আছে।'

ঃ 'শর্ত টা কি?'

ঃ 'আমার সামনে তুমি হাসানের প্রসংগ তুলবে না।'

ঃ 'আমি রাজী।'

ঃ 'সোহেলকেও জানাবে না যে তার ভাই আমাদের দুশমন।'

ঃ 'আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

ঃ 'কখনো এমন কথা বলবে না, 'হাসানের চেহারায় আমি বিশ্বাসের দৃঢ়তা আর সততার আলো দেখেছি।'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে মাহবানু জওয়াব দিলঃ 'আমি কি আপনার বোন নই? আমার শিরায় কি প্রবাহিত নয় আপনার পিতার খুন?'

হেসে মিয়ানদাদ দু'হাত বাড়িয়ে সিনার সাথে লাগাল মাহবানুকে। বললঃ 'মাহবানু কি বলতে কি বলেছি খেয়াল নেই। এখনো হাফিরের পরাজয়ের রেশ আমার মন থেকে মুছে যায়নি। নয়তো হাসানের ব্যাপারে এতটা রুষ্ট হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার এখন অনেক কাজ। এখুনি সব কৃষকদেরকে এখানে জমায়েত করতে চাই। তুমি জলদি আমার নাস্তার ব্যবস্থা করো।'

ঃ 'আপনার নাস্তা তৈরী। কিন্তু ভাইজান, এখন আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। যখম ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে বাইরে যেতে দেবো না।'

ঃ 'যখমের অনুভূতিও নেই আমার। এখনি গোসল সেরে আসছি আমি।'

পরদিন। আরব কৃষকে ভরা ছিল কোব্বাদের হাবেলী। উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে মিয়ানদাদ বললঃ 'অসুস্থতার কারণে আব্বাজান এখানে আসতে পারেননি। নইলে তিনিই তোমাদের সামনে কথা বলতেন। হরমুজ মরে গেছে, এ কথা তোমাদের জানাতে বলেছেন আব্বা। তার জুলুম থেকে তোমরা নাজাত হাসিল করেছ চির দিনের জন্য। তোমরা জান, হরমুজ আমাদের সাথেও ভাল ব্যবহার করেনি। আব্বাজান শুধু এ চিন্তায় অসুস্থ হয়ে গেছেন যে, তুরজের মত লোককে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল হরমুজ। আর অসহায় দর্শকের চেয়ে ভাল ছিল না আমাদের অবস্থাও। এরপরও বাইরের দুশমন যখন আমাদের ওপর হামলা করেছে, রাজী হয়েছি হরমুজের ঝাণ্ডার নীচে লড়াই করতে। কারণ হরমুজের স্থলে আমি মুসলমানদের গোলাম বনতে চাইনি।

লড়াইয়ের পর্যালোচনা করার কোন দরকার আছে বলে মনে করিনা আমি। সব ঘটনাই তোমাদের জানা। এ মুহূর্তে ভবিষ্যত নিয়েই কেবল আমরা ভাবব। আমার খান্দান কখনো তোমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন ছিল না তোমরাই এর সাক্ষী। তোমাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হরমুজের দুশমনী গ্রহণ করতেও আমরা পিছ পা হইনি। ইরান তোমাদের জন্মভূমি। তোমাদের কর্তব্য এর হিফাজত করা। তোমাদের

দায়িত্ব থেকে তোমরা গাফেল থাকলেও আমার বিশ্বাস ইরানের প্রচণ্ড শক্তির সামনে মুসলমানরা দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আমি চাই তোমাদের হাতেই আসুক এ বিজয়। তোমাদের কল্যাণ রয়েছে এরি মধ্যে। যখন প্রমাণ দেবে, হরমুজের জুলুমের পরও শাহানশাহের প্রতি তোমাদের ভালবাসা আর আনুগত্যে কোন পার্থক্য হয়নি, তোমরা নিজেদের ঘর আর জমি জিরাত দুশমনের হাত থেকে বাঁচিয়েছ জীবন বাজী রেখে, তখন কোন জালেমকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করবেন না। আমাকে যদি বিশ্বাস করো, এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, হরমুজের স্থলাভিষিক্ত হবেন কোন রহমদীল এবং ন্যায়বিচারক গভর্ণর। কিসরার প্রজা হয়েও জিম্মাদারীর অনুভূতি যদি তোমাদের না থাকে, আমার ভয় হয়, ভাল ব্যবহার পাবার যোগ্য তোমাদের মনে করা হবে না। তোমাদের কল্যাণকামী ইরানীরা কিসরার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদের পক্ষে আওয়াজ তুলুক এই যদি চাও, তবে প্রমাণ করতে হবে, যখন সালতানাতের হিফাজতের জন্য বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো জরুরী হয়েছে, ইরানীদের চেয়ে তোমরাও পিছিয়ে ছিলে না। চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশ নিতে খুব শীঘ্রই আমি রওয়ানা করব। আমার ইচ্ছে, এলাকার তরবারী ধারণ করার মত প্রতিটি জওয়ান থাকবে আমার সাথে।'

এক নওজোয়ান বললঃ 'জনাব, আমরা সবাই আছি আপনার সঙ্গে। আমাদের মধ্যে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।'

একের পর এক প্রতিটি খান্দানের বুড়ো, জোয়ান প্রতিশ্রুতি দিল মিয়ানদাদকে সাহায্য করার। খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদ। এরপর হাত তুলে বললঃ 'লড়াইয়ের জন্য তোমরা তৈরী হয়ে নাও। এক সপ্তাহের মধ্যেই এখান থেকে রওয়ানা করব আমরা।'

পেছনের সারি থেকে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধ আরব। মিয়ানদাদের নিকটে পৌঁছে বললঃ 'আপনাদের জন্য আমাদের জীবনগুলো হাজির। কিন্তু ইরানের অন্য সব জমিদাররাও যদি আপনার পিতার মত শরীফ, রহমদীল আর ন্যায়পরায়ণ হতেন! যদি নিশ্চিন্ত হতাম, কিসরার বিজয়ের পর হরমুজের মত জল্লাদ আমাদের উপর চাপানো হবে না! কোন স্থানে কিসরার উপর হামলা করেছি, এজন্য আমার মজলুম হইনি। আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ, আমরা আরব। ইরানী জমিদাররা দজলা ফোরাতের পানির চেয়ে সস্তা মনে করে আমাদের খুন। কোব্বাদ আমাদের কল্যাণকামী। বিপদের মুহূর্তে আমরা তাকে সঙ্গ দেইনি, তার বেটাকেও এ কথা বলার সুযোগ আমরা দেব না। কিন্তু আপনারা এমন কোন প্রতিশ্রুতি আমাদের দেবেন না, যা পূরণ করার সাধ্য আপনাদের নেই। এখানে এমন লোকও রয়েছে, যাদের ভাই আর বেটা রোমানদের মোকাবেলায় জীবন দিয়েছে।

অন্য বস্তির কথা বাদ দিয়ে শুধু আমার বস্তির কথাই বলব। এ বস্তিরই এক নওজোয়ান! গরীব কৃষকের বেটা হওয়া সত্ত্বেও মনে হত এক শাহাজাদা। ও ছিল

আপনার ভাইয়ের দোস্ত। কয়েক বছর ধরে আমরা জানতাম না সে কোথায়? কিন্তু সে যখন এল, ঘরের স্থানে দেখল ছাইয়ের স্তূপ। বস্তির ধ্বংসপ্রায় লোকেরা তাকে বলল- যে বৃদ্ধ পিতা, জোয়ান ভাই, আর অল্প বয়েসী বোন তোমার পথ পানে তাকিয়েছিল, হরমুজের এক আত্মীয় খুন করেছে তাদের। তোমার যে ছোট ভাই গাঁয়ের ছেলেদের বলতো, আমার ভাই হাতীতে সওয়ার হয়ে আসবে, ও এখন তার কয়েদী।'

বৃদ্ধের বক্তৃতায় পেরেশানী বাড়ছিল উপস্থিত লোকদের। কিন্তু হস্তক্ষেপ করার সাহস হলোনা কারো।

মিয়ানদাদ বললঃ 'আপনি কি হাসানের কথা বলছেন?'

ঃ 'জ্বী হ্যাঁ। ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের কোন স্বপ্ন সুখের প্রত্যাশা নেই এ কথাই আমি শুধু বলতে চাইছি। তবুও আপনাকে আমরা নিরাশ করব না।'

ঃ 'আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যদি আপনারা আমায় বিশ্বাস করেন, যরদস্তের কসম করে বলব, এ লড়াইয়ের পর আমার জীবন ও মৃত্যু হবে আপনাদের সাথে। জালেমের হাত থেকে যদি তলোয়ার ছিনিয়ে নিতে না পারি, অন্ততঃ আপনাদের জন্য ঢাল হবে আমার দেহ।'

বুলন্দ আওয়াজে এক নওজোয়ান বললঃ 'আমরা আপনার সাথে রয়েছি।'

উপস্থিত লোকের চীৎকার দিয়ে বললঃ 'আমরা আপনার সাথে রয়েছি, থাকব।'

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এল মিয়ানদাদের গর্দান। মাহফিল শেষে কৃষকরা পা বাড়াল ঘরের দিকে। ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। তার দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল হাসানের ছবি, খালিদ বিন ওয়ালীদের তলোয়ারের ঝিলিক। ইরানের বিশাল বাহিনীকে সে দেখলো এগিয়ে যাচ্ছে বীর দর্পে। তার মনে হলো মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের পায়ের তলায় পিষেই মারা যাচ্ছে। সে দেখতে পেলো হাসানের ভাই সোহেল তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলিম লশকরের বিরুদ্ধে। দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস আর পরিতৃপ্তি নিয়ে মহলের দিকে পা বাড়াল মিয়ানদাদ।

বার

কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত পরাজিত লশকরের পিছু ধাওয়া করলেন মুসান্না বিন হারেসা। ফোরাতের তীরে পর পর ইরানী রইসের দু'টি কেল্লা দখল করলেন তিনি। ছাউনী ফেললেন মাযারে, কারেনের ফৌজের সামনা-সামনি। অবশিষ্ট মুসলিম লশকর নিয়ে হাফিরে অবস্থান করছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। কারেনের ধারণা ছিল, মুসলমানদের গোটা লশকর মাযার না পৌছলে স্বল্প ফৌজ নিয়ে লড়াই শুরু করবেন না

মুসান্না বিন হারেসা। কোন কোন ইরানী সর্দার দেরী না করেই হামলা করে দেয়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করলেন কারেন।

ঃ 'যদি আমরা কয়েকদিন লড়াই মুলতবী রাখতে পারি, ইরাকের অধিকাংশ খান্দান জমায়েত হবে আমাদের ঝান্ডার নিচে। কোন বাঁধা ছাড়াই দুশমনকে আমরা হাঁকিয়ে দিতে পারবো দক্ষিণ দিকের ধূসর মরুভূমির দিকে। লড়াই মুলতবী হওয়ার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে আমাদের। কিন্তু দুশমনের কোন উপকার হচ্ছে না। যে সব স্থান থেকে মুসলমানরা সাহায্য পায়, তা এখান থেকে অনেক দূরে।'

গত লড়াইয়ের ফলাফল খুলে দিয়েছিল ইরানী জায়গীরদারদের চোখ। আরব কৃষকদের সাহায্য পেতে বিভিন্ন প্রকার লোভ দেখাতে লাগল ওদের। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে তাদের ওয়াদাকে বিশ্বাস করা আরব কৃষকদের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু আগামী দিনগুলোর ভয়ে ইরানীদের সন্তুষ্ট করতে বাধ্য হল ওরা। তারা এও জানতো, মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার পর লড়াই থেকে বিরত থাকা লোকদের ক্ষমার অযোগ্য মনে করবে ইরান সরকার। মুসলমানদের বিজয়ের সাথে নিজেদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা জুড়ে দেবার মত যুদ্ধ পরিস্থিতি তখনো সৃষ্টি হয়নি। এ কারণেই সীমান্তবর্তী যেসব কবিলা মুসলমানদেরকে দূর থেকে দেখেছে, ওরা ছাড়া বাকী সবাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শামিল হতে লাগল ইরানীদের সাথে। কেবলমাত্র আরবের খৃষ্টানদের কোন লোভ ছাড়াই মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড় করানো যেতো। ওদের পাদরী সাহেবরা ইসলামের সাথ দুশমনীতে অগ্নিপুজকদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এ অবস্থায় যে গতিতে বেড়ে যাচ্ছিল ইরানী লশকর, কারেনের খুশী হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তার ধারণা, সপ্তাহখানেকের জন্য লড়াই মুলতবী করা গেলে তার লশকর এ পরিমাণ বেড়ে যাবে, লড়াই না করে পালানোকেই কল্যাণ মনে করবে মুসলমানরা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন অফিসারের সাথে তাবুর বাইরে প্রশস্ত ঝর্ণার পারে পায়চারী করছিলেন কারেন। সাথে ছিল শাহী খান্দানের দু'জন শাহজাদা। আচানক ঝরণার অপর পার থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দৃশ্যতঃ দুশমনের হামলার কোন সম্ভাবনা এদিকে ছিল না। যে সিপাইরা কিশতিতে চড়ে পুল পাহারা দিচ্ছিল, নেজা, তরবারী এবং কামান নিয়ে প্রস্তুত হল ওরা। ধূলির ঝড় সৃষ্টি করে পুলের কাছে এসে থামল প্রায় দেড়শ অশ্বারোহী। এক সুদর্শন যুবক এগিয়ে কি যেন বলল পুলের মুহাফিজদের। ওরা একদিকে সরে গেল রাস্তা ছেড়ে। হাতের ইশারায় সঙ্গীদের অপেক্ষা করার হুকুম দিল যুবক। নিজে পুল পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গেল কারেনের দিকে। তার কাছে পৌছেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। আদবের সাথে কুর্ণিশ করে বললঃ 'জনাব, আমার নাম মিয়ানদাদ। আমি কোব্বাদের ছেলে।'

মৃদু হাসলেন কারেন।

ঃ 'আমি জানি। তোমার যখম সেরে যাওয়ায় আমি খুশী হয়েছি। কত লোক

সাথে এনেছ?'

ঃ 'আমার সাথে রয়েছে দেড়শ' অশ্বারোহী। পায়ে হেঁটে আসছে প্রায় দুশ'র মত। আমার সঙ্গীদেরকে ছাউনীতে নিতে আপনার এযাজত জরুরী।'

ঃ 'তুমি ওদের ছাউনীতে নিয়ে যাও।' এক অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন কারেন। ফিরে গেল অফিসার। কারেন মিয়ানদাদকে বললেনঃ 'তোমার পিতা কেমন আছেন?'

ঃ 'তার অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনার বিজয়ের কথা শুনলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

এক ইরানী শাহজাদা বললঃ 'তুমি তো অনেক লোক সংগে এনেছ! এরা সবাই কি আরব?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'মনে হয় আরব প্রজাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক খুব ভাল?'

ঃ 'এরা শুধু আমাদেরই প্রজা নয়, এর অর্ধেকেরও বেশী পাশের জমিদারদের জমিনে কাজ করে। আমাদের কৃষকদের স্বেচ্ছাকর্মী বানিয়ে পাশের এলাকায়ও গিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন থাকতে পারলে হাজার খানেক লোক আমায় সঙ্গ দিতে তৈরী হতো। জমিদারদের ধারণা ছিল প্রজারা স্বেচ্ছায় লড়াইয়ে অংশ নেবে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল।'

ঃ 'তাহলে তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন?' বললেন কারেন।

ঃ 'জনাব, লড়াইতে অনুপস্থিত থাকা ভাল মনে করিনি।'

ঃ 'মুসলমানরা নয় বরং লড়াই প্রথম শুরু করব আমরাই। আমার হুকুম, এক্ষুণি ফিরে গিয়ে আরো বেশী লোক নিয়ে আসার চেষ্টা কর। লড়াই শুরু হলে তোমায় ডেকে পাঠাব। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া ফিরে আসবে না তুমি। এখন সময় নষ্ট করো না। না, থামো। তোমার ঘোড়া পরিশ্রান্ত।' এক সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'একে সাথে নিয়ে তাজাদম ঘোড়া দাও।'

ঃ 'জনাব, সঙ্গীদের সাথে দেখা করে ওদেরকে একটু নিশ্চিন্ত করার অনুমতি চাই। নইলে ওরা আমায় ভুল বুঝতে পারে।'

ঃ 'তোমার সংগীদের নিশ্চিন্ত করার জিম্মাদারী আমি নিচ্ছি, এখন সময় নষ্ট করো না।'

অফিসারের সাথে ছাউনীর দিকে হাঁটা দিল মিয়ানদাদ। খানিক পর পুল পেরিয়ে গাঁয়ের পথ ধরল ও।

পরদিন এক অযাচিত অবস্থার সম্মুখীন হল কারেন। ভোরে ঘুম ভাঙতেই তিনি খবর পেলেন, মুসান্না বিন হারেসার লশকর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাবু থেকে বেরিয়ে জমায়েত

হওয়া অফিসারদের লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ 'মুসান্নার পাঁচ হাজার সিপাই আত্মহত্যার ইরাদা করেছে, এ কি হতে পারে!'

ঃ 'জনাব, রাতে ছাউনী এগিয়ে নিয়ে এসেছে ওরা। এখন তাদের আর আমাদের মাঝে মাত্র মাইল খানেক ব্যবধান। ওদের কাতারবন্দী দেখে মনে হচ্ছে, এগোতে অথবা পিছাতে ওরা কেবল হুকুমের অপেক্ষা করছে।'

লশকরকে প্রস্তুতির হুকুম দিলেন কারেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না, আচানক ময়দানে এসে যাবে মুসান্নার পাঁচ হাজার সিপাই। খানিক পর ঘোড়ায় চড়ে সারিগুলি পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি এমন সময় এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী ছুটে এল ময়দানে। তার কাছে পৌছে চীৎকার করে বললঃ 'জনাব, হাফিরের কাছে দুশমন ছাউনী খালি হয়ে গেছে।'

ঃ 'কবে?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন কারেন।

ঃ 'জনাব, কাল ভোরেই আমরা খবর পেলাম আরবদের কয়েকটা ছোট ছোট দলকে হাফির থেকে সামান্য দূরে পশ্চিম উত্তর দিকে বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে। খালিদ বিন ওয়ালিদের লশকরের তৎপরতা জানার জিম্মা আমাদের দেয়া হল। আমরা কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলাম হাফিরের দিকে। মুসলিম ছাউনীর চারদিকে ছিল খেজুর বাগান। দিনের আলোয় আমাদের লোকদের সেখানে পৌছা সম্ভব ছিলনা। আমরা জানতাম আশপাশের বস্তিতে ওরা টহল দিচ্ছে। কিন্তু খবর পাবার পর ওদের ছাউনীর অবস্থা জানার জন্য যে কোন ঝুকি নিতে প্রস্তুত হলাম আমরা। দুশমনদের অধিকারভূক্ত বস্তিতে পৌছতেই তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হলাম অকস্মাৎ। এক বাগানে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলাম। ওখানে দুশমনের আরেক অশ্বারোহী দল অপেক্ষা করছে জানতাম না।'

হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চিৎকার দিয়ে কারেন বললেনঃ 'বেকুব, আর কতক্ষণ বকবক করবে? আমি শুধু জানতে চাই, খালিদ বিন ওয়ালীদের সৈন্য কোথায়?'

শুকনো ঠোঁট জিহবায় ভিজিয়ে অসহায় ভংগিতে অশ্বারোহী জওয়াব দিলঃ 'আমি জানিনা জনাব! আমাদের সালার ওদের ছাউনীর অবস্থা জানার জন্য দশজন অশ্বারোহী পাঠিয়েছিলেন। যে বস্তিতে ভোরের দিকে ওদের দেখা গেছে সে দিকে গেছে চার জন। তীর বৃষ্টিতে বাগানে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছিল যারা, আমি ছিলাম তাদের সাথে। ধাওয়াকারী মুসলমানরা আমাদের চৌকির কাছে পৌছে ফিরে গেছে।'

ঃ 'আমি দুশমনের ছাউনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি।' গর্জে উঠলেন কারেনঃ 'কবে খালি হয়েছে ছাউনী?'

ঃ 'জনাব দুশমনের অশ্বারোহী দল যখন বাগান থেকে বেরিয়ে আমাদের উপর হামলা করল, ভেবেছি ছাউনীতেই রয়েছে দুশমন। কয়েক ক্রোশ দূরে দেখা অশ্বারোহীদের সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদের কোন সম্পর্ক নেই।'

ঃ 'কয়েক ক্রোশ দূরে ফৌজ দেখেও আমায় সংবাদ দাওনি কেন?'

ঃ 'জনাব, আমরা দেখিনি সে ফৌজ। এক স্থানীয় খৃষ্টান আমাদের সংবাদ দিয়েছিল। এর সত্যতা যাঁচাই করতে পাঠিয়েছিলাম চারজন অশ্বারোহী। ওদের একজন ফিরে এসেছে সন্ধ্যায়। বাকীদের গ্রেফতার করেছে মুসলমানরা। যে ফিরে এসেছে, আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল ও। তাকেও গ্রেফতার করেছিল দুশমনরা। কিন্তু সে এক নহরে লাফিয়ে ডুব মেরে পৌছে যায় অপর পাড়ে। খানিক শেওলার আঁড়ালে লুকিয়ে থেকে পায়ে হেঁটে ফিরে এসেছে। চৌকির কয়েক কদম দূরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল ও। জ্ঞান ফিরলে শোনলাম তার সঙ্গীরা গ্রেফতার হয়েছে।'

ঃ 'এরপরও তোমাদের সালার আমাকে খবর দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি?' চিৎকার দিয়ে বললেন কারেন।

ঃ 'জনাব, আপনাকে খবর দেয়ার পূর্বে দুশমনের ছাউনীর খবর নেয়া তার জন্য ছিল জরুরী। তাই তিনি আমায় হুকুম দিলেন আরব কৃষকের বেশে জীবন বাজি রেখে যেকোন ভাবে ওদের খবর নিতে। আমি ওখানে পৌছে দেখলাম কেউ নেই। এর পরই আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আমায় পাঠিয়ে দিলেন সালার।'

ঃ 'তুমি একাই এসেছ?'

ঃ 'আমরা রওনা করেছিলাম আট জন। পথে চৌকিতে ঘোড়া পরিবর্তন করার জন্য থামলাম। কিন্তু তা দুশমনদের কব্জায় চলে গেছে জানতাম না। পালানোর মওকা পেয়েছি কেবল আমি। সঙ্গীরা আগেই নেমে পড়েছিল, তাই ওরা কেউ আমার সাথে আসতে পারেনি।'

কারেন জিজ্ঞেস করলেনঃ 'পথে তোমাদের আর কোন বিপদ আসেনি?'

ঃ 'জী না জনাব। অন্যান্য চৌকিগুলো নিরাপদেই আছে। এখানে পৌছতে আমি চারটে ঘোড়া পরিবর্তন করেছি।'

ঃ 'পথে দুশমনের তৎপরতার কোন খবর পাওনি?'

ঃ 'আমার ধারণা, ছাউনী খালি করে কয়েক জনকে পিছনে রেখে গিয়েছিল ওরা। আমরা যেন ছাউনীর নিকট পৌছতে না পারি এবং আপনাকে খবর দিতে না পারি এ চেষ্টা করেছে ওরা। দুশমনের যেসব লোকেরা পথে চৌকি কব্জা করে আমার সঙ্গীদের ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়েছে, এরাই সম্ভবত আমাদের চার ব্যক্তির উপর হামলা করেছিল। আমার ধারণা, বাকী দুশমন ভয় পেয়ে ফিরে গেছে।'

দক্ষিণ দিকে ইশারা করে কারেন বললেনঃ 'বেকুব! ঐ দিকে দেখো। ওদের কি ভীত মনে হচ্ছে।'

ঃ 'জনাব, সঙ্গীদের পালানোর সুযোগ দেয়া ছাড়া এ সল্প সংখ্যক লোকের আর কোন ইচ্ছে থাকতে পারে না।'

এক প্রবীণ অফিসার সালারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'হায়! যদি জানতাম এ সল্প সংখ্যক লোকের কি ইচ্ছে?'

ঘোড়া ছুটিয়ে কারেনের নিকটে পৌছল ইরানী শাহজাদা কোব্বাজ। ডান দিকের দলগুলোর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। বললঃ 'আমাদের সামনের দুশমন তৎপর হয়ে উঠেছে। আপনার হুকুম পেলে ওদের অগ্রগতি রুখে দেব।'

দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে কারেন বললেনঃ 'আমার ধারণা দুশমনের গোটা ফৌজ তৎপর হয়ে উঠেছে। তুমি ফিরে যাও। তখনই হামলা করবে, আমাদের মাঝে যখন বড় জোর তিনশ' কদমের ব্যবধান থাকবে। এ লড়াইয়ে ওদের কাউকে প্রাণ নিয়ে পালানোর সুযোগ আমরা দেব না। ওদের সমগ্র শক্তি সামনে নিয়ে আসতে ওদের বাধ্য করবো। এরপর আমাদের ডান বামের অশ্বারোহী বাহিনী দু'দিক থেকে পৌছে যাবে ওদের পেছনে।'

লাগাম ঘুরিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে দিল কোব্বাজ। মুসান্নার লশকরের অশ্বারোহীরা প্রায় আধা মাইল লম্বা রেখা টেনে মামুলী গতিতে এগিয়ে এল। আচানক থেমে গেলো মধ্যবর্তী অশ্বারোহীরা। দুদিকের অশ্বারোহীরা অর্ধবৃত্তের আকারে ছড়িয়ে গেল দু'দিকে। চোখের পলকে ওদের বিস্তৃতি ঘটল মাইলখানেক। মুসলমানরা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে হামলা করলে, সামনে আসা দলগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি হবে, এ ভয় ছিল কারেনের। কিন্তু যখন বিস্তীর্ণ হল ওদের সারি, মধ্যবর্তী বাহিনীকে দুর্বল হতে দেখে দেরী না করেই সমগ্র ফৌজকে হামলার হুকুম দিলেন তিনি। নকীবেরা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দিল তার নির্দেশ। পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির হুঙ্কারে গর্জে উঠল প্রান্তর। ধূলায় ছেয়ে গেল দিগন্ত প্রসারিত ময়দান।

দু'দলই ছিল পরস্পরের তীরের আওতায়। কারেন দেখলেন মুসলমানদের মাঝের সরিগুলো পিছু হটে যাচ্ছে। এবার সতর্ক হবার প্রয়োজন নেই ইরানীদের। বিজয় অবধারিত ভেবে দ্বিগুণ উদ্দীপনায় হামলা করল ওরা। পাল্টা হামলা করল মুসলমানরা। ইরানীরা ওদের ঠেলছিল পিছন দিকে। আবেগ উচ্ছাসের পরিবর্তে সাবধানতা অবলম্বন করল ওরা। সিপাহসালার থেকে এক সাধারণ সিপাই পর্যন্ত, মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে বিজয়ের অংশীদার হতে উৎসুক ছিল। চুড়ান্ত হামলার আগে পিছু হটা লশকরের স্বাভাবিক পালানোর প্রতীক্ষা করছিল ওরা। মুসলমানদের পরাজয়ের ষোলকলা পূর্ণ হতে দেখেই উন্মত্ত দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গের মত এগিয়ে গেল ইরানীরা।

আচানক জওয়াবী হামলা করল মুসলমানরা। দেখতে না দেখতে তছনছ করে দিল ইরানীদের সামনের সারিগুলো। খানিক পরই আবার পিছু হটতে লাগল ওরা। কারেন দেখলেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সামনের দিকটা। পিছু না হটে প্রচন্ড গতিতে ডানে বায়ে সরে যাচ্ছে মুসলমানরা। এ ফাঁকা স্থান দিয়ে দিগন্তে দেখা গেল ধূলিমেঘ। এ ধূলিমেঘ থেকে বেরিয়ে এল এমন লশকর, ইরানীরা যাদের তখনো দেখেনি। মুহূর্তের মধ্যে ইরানীরা এসে গেল খালিদ বিন ওয়ালীদের জানবাজদের তীরের আওতায়। ধূলির ভেতর তলোয়ারের ঝনঝনানি আর যখমীদের চিৎকার শুনতে লাগলেন কারেন।

বিমূঢ়ের মত তিনি চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'ইরানের বাহাদুররা! তোমরা দুশমনের তিনগুণ, হিম্মতের সাথে এগিয়ে চলো।' কিন্তু যখমীদের চিৎকারে মিশে গেল তার আওয়াজ। মুসলমানরা ওদের সারি ভেদ করে ময়দানে লাশের স্তূপ বানিয়ে এগিয়ে গেল। কারেনের রক্ষীবাহিনী জওয়াবী হামলা করে সিপাহসালার থেকে দূরে রাখতে চাইছিল মুসলমানদের, কিন্তু বিফল হল ওরা। মুসলমানদের একটা দল নেযা আর তরবারী দিয়ে রাস্তা সাফ করে এগিয়ে এল। পরপর দু'জন অশ্বারোহীকে নিহত করে কারেনের উপর হামলা করল এক নওজোয়ান। প্রথম নেযার আঘাতেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল সিপাহসালারের সীনা। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল কারেন।

ইরানী লশকরের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা হয়ে গেল। আধমাইল পিছু হটে পিছনের ফৌজ এবার এগিয়ে এল সামনে। আবার শুরু হল প্রচন্ড লড়াই। মুসান্না বিন হারেসা দু'ভাগ করে যাদের ডানে বাঁয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন, ওদের আক্রমণের চাপে কখনো পিছু হঠত ওরা। কখনো হামলা করে রুখে দিত মুসলমানদের অগ্রাভিযান। আচানক পূর্ব দিক থেকে বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মত এক হাজার অশ্বারোহী এগিয়ে এল কা'কা বিন আমর তমীমীর নেতৃত্বে। ইরানী লশকরদের ডানের সারিগুলো পিষে ফেলল তারা। একই সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদের অশ্বারোহী দল বাম দিকে গিয়ে মিশল মুয়ান্না বিন হারেসার সাথে। তিন দিক থেকেই প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখীন হল ইরানী লশকর। কারেনের মৃত্যুতে তাদের সকল আশা আকাঙ্খা সম্পৃক্ত হল শাহজাদা কোব্বাজ আর আনুশজানের সাথে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এ দু'জনও লুটিয়ে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

একটু আগেও যে লশকর কোন ক্ষতি ছাড়াই বিজয় হাসিলের স্বপ্ন নিয়ে চরম সাবধানতার সাথে লড়ছিল, পরাজয়ের আগমন থেকে বাঁচার জন্য তারাই তখন লড়ছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। কিন্তু মুসলমানদের উপর্যুপরি হামলা ওদের শ্বাস ফেলার মওকাও দিল না। পেরেশান হয়ে নদীর দিকে সরে যেতে লাগল ওরা।

দুপুর পর্যন্ত দেখা গেল ময়দানে পড়ে আছে ইরানীদের লাশের পাহাড়। তখনো নদীর কিনারে চলছে প্রচন্ড লড়াই। শেষবার জওয়াবী হামলা করে মুসলমানদের খানিক পিছনে হটিয়ে দিল ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিশতির নিকট থেকে দূরে রাখা এবং ফৌজকে জীবন নিয়ে পালাবার মওকা দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল ওদের লড়াই। মুসলমানদের বেষ্টনী প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। পুল পেরোতে একের পর এক পড়ে যাচ্ছিল নিচে। পদাতিকরা পিষে যাচ্ছিল অশ্বারোহীদের ঘোড়ার পায়ে। পরস্পর টক্কর লেগে পানিতে পড়ছিল অশ্বারোহীরাও। লড়াইয়ের অন্তিম সময়ে মুসলমানদের হামলা ছিল এত প্রচন্ড, হাজার হাজার ইরানী পুলের দিকে না গিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে অপর পারে পৌছার চেষ্টা করতে লাগল।

পুলের হিফাযতের জিম্মা দেয়া হয়েছিল স্থানীয় আরবদের। এজন্য লড়াইয়ের শেষ দিকে ইরানী প্রভুদের চেয়ে স্থানীয় আরবদের ক্ষতি হচ্ছিল বেশী। মুসলমানদের

আরেক প্রচন্ড হামলায় শেষ হয়ে গেল আরবদের প্রতিরোধ শক্তি। প্রায় তিন হাজার লোক ছেড়ে দিল তলোয়ার। অন্যরা লাফিয়ে পড়ল নদীতে। পুলের এক অংশ কব্জা করল মুসলমানরা।

পলায়নপর লশকরদের পিছু ধাওয়া করতে চাইলে পুল ছাড়াই মুসলমানরা নদী পেরোতে পারত। কিন্তু এত বড়ো বিজয়ের পর শ্রান্ত ক্লান্ত সিপাইদের অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়ার অনুমতি দিলেন না আমীরে লশকর। নদীর পার থেকে শুরু করে মাযারের দিগন্ত বিস্তৃত ময়দানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল ইরানীদের লাশ। মুসলমানদের শহীদ আর যখমীর পরিমাণ ছিল ওদের এক দশমাংশেরও কম।

সূর্যাস্তের খানিক পূর্বে খালিদ বিন ওয়ালীদ, কা'কা বিন আমর, মুসান্না বিন হারেসা, মুয়ান্না, মাসুদ এবং আরো কয়েকজন সালার একটা বড়োসড়ো তাবুতে বসেছিলেন। লড়াইয়ের পূর্বে এ তাবু ছিল ইরানী সিপাহসালারের বিশ্রাম কেন্দ্র। সোনা চাঁদির বরতন, রেশমের পর্দা, মুল্যবান কার্পেট মোড়া মেঝে, সবখানেই ছিল অনারবের বিলাসিতার আধিক্য। পরবর্তী অভিযান সম্পর্কে সালারদের হেদায়াত দিচ্ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ, তাবুতে প্রবেশ করল হাসান। অনুমতি প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খালিদের দিকে। কিন্তু খালিদ এদিকে খেয়াল করেননি দেখে মুসান্না বললেনঃ 'কি ব্যাপার হাসান, তুমি কিছু বলবে?'

ঃ 'জনাব, আমীরে লশকরের খিদমতে আমি কিছু আরজ করতে চাই।'

ঃ 'বলো! কি বলবে।' খালিদ বললেন।

ঃ 'জনাব, জংগী কয়েদীদের সাথে আমি দেখা করেছি। এদের অধিকাংশই স্থানীয় আরব। ইরানীদের সংগে আসতে ওদের বাধ্য করা হয়েছে। আমার গাঁয়ের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে বুঝলাম, যদি ওদের ছেড়ে দেয়া হয় ইরানীদের হয়ে আর কখনো ওরা তরবারী তুলবে না।'

ঃ 'আমি জানি ইরানীরা জবরদস্তি করে আমাদের সম্মুখীন করেছে ওদের।'

ঃ 'অন্য এলাকার আরবদের ব্যাপারেও বলা যেতে পারে, ইরানী মুনীবদের ভয়ে ওরা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। আমাদের এলাকার জায়গীরদার ইরানী হলেও রহমদীল। কৃষকরা এজন্য তাকে সংগ দিয়েছে। স্থানীয় আরবদের সহযোগিতা করার ফলে হরমুজের হাতে তিনি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছেন। এসব লোকেরা তার উপকারের বদলা দিতেই এখানে এসেছে।'

ঃ 'তুমি কোবব্বাদের কথা বলছ?'

ঃ 'জ্বী হাঁ। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। হরমুজের এক জালিম আত্মীয়কে হত্যা করার পর তার লোকেরা যখন আমাকে ধাওয়া করছিল তখন তিনি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আমার একীন, তার সামনে ইসলামের তাবলীগ করার

সুযোগ পেলে কোন কৃষককে আমাদের মোকাবেলায় পাঠাতেন না।'

ঃ 'কোব্বাদের ব্যাপারে আমি শুনেছি। এমন লোক বেশী দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে না। তোমার যদি এ আস্থা থাকে যে কোব্বাদের প্রজারা দ্বিতীয়বার ইরানীদের সহযোগিতা করবে না, তাহলে ওদের তুমি ছেড়ে দিতে পার।'

ঃ 'জনাব, কয়েদীদের ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে কয়েকজন মুবাল্লিগ পাঠালে ভাল হয়, কমপক্ষে আমাদের এলাকা তাবলীগে দ্বীনের জন্যে অত্যন্ত উর্বর।'

ঃ 'তোমার কি বিশ্বাস, আমাদের মুবাল্লিগরা তোমাদের ওখানে স্বাধীনভাবে দ্বীনের তাবলীগ করতে পারবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণ আস্থাশীল। এ লড়াইয়ের পর সে সব জালেম জমিদারদের কর্তৃত্ব খতম হয়ে গেছে, যারা বাঁধা দিতো ইসলাম প্রচারে।

ঃ 'বহুত আচ্ছা, এ দায়িত্ব আমি তোমায় সমর্পন করছি। কাল ভোরেই তোমার সাথে কয়েকজন মোবাল্লেগকে পাঠিয়ে দেবো। এদের জন্য স্থানীয় লোকদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে তুমি। যে সব এলাকায় তোমরা সফল হবে, তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও হাতে নেবে। ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে তোমার দায়িত্বের পরিধিও বেড়ে যাবে। আমি দেখেছি তুমি একজন ভাল সিপাই। তোমার ব্যাপারে মুসান্নার কথা শুনে আমি বুঝেছি, তুমি ভাল একজন সংগঠকও হতে পারবে।'

ঃ 'জনাব, আপনার হুকুম আমি পালন করব। কিন্তু আগামী লড়াইগুলোতে একজন সিপাইয়ের জিম্মাদারী আদায় করার সুযোগ আমি আশা করবো। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের পূর্ণ সহযোগিতা মুবাল্লেগীনরা পাবেন, আমি দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলতে পারি। ফোরাতের তীরে কোব্বাদের গ্রাম হবে আমাদের প্রথম তাবলীগের কেন্দ্র। তার আশপাশের যে সব ইরানী রইসদের পক্ষ থেকে বাঁধা পাওয়ার কথা ছিল, মজলুম কৃষকদের প্রতিশোধের ভয়ে ওরা পালিয়ে গেছে অনেক দূরে। সব সময় মজলুম কৃষকদের সঙ্গে ছিলেন কোব্বাদ। স্থানীয় আরবরা হরমুজকে যেমন ঘৃণা করতো, তেমনি ভালবাসত কোব্বাদকে। আমার মনে হয় তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার সহজ পথ হচ্ছে, সাংগঠনিক দায়িত্ব এমন ব্যক্তিকে দেয়া যাঁর ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, আমানতদারী এবং নয্যাপরায়ণতার কারণে স্থানীয় আরবদের বেশী প্রভাবিত করতে পারবেন। এর সবগুলো গুণ রয়েছে কোব্বাদের মধ্যে। আমি জানি তিনি সত্যান্বেষী। আমার দরখাস্ত, তিনি দ্বীন কবুল করলে, যে এলাকাগুলোতে আমরা সফল হবো, তার দায়িত্ব তাঁকে দিলে বেশী দিন আমায় লশকর থেকে দূরে থাকতে হবে না।'

ঃ 'তোমার এ প্রস্তাব ভেবে দেখবো, খানিক পর তুমি আমার জবাব পেয়ে যাবে। এখন গিয়ে সফরের জন্য তৈরী হও।'

তাবু থেকে বেরিয়ে গেল হাসান। খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসান্নাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তোমার কি খেয়াল?'

ঃ 'হাসানের প্রস্তাবের সাথে আমি একমত। কোব্বাদের নেকদিলী এবং ভদ্রতার অনেক কিছুই আমি শুনেছি। তার নাম না শুনলেও হাসানের মত ব্যক্তির সাক্ষীই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোব্বাদ যদি একজন ভাল সংগঠক হন এবং স্থানীয় আরবরা যদি তার ন্যায় ও ইনসাফে খুশী থাকে, তবে তার খিদমতের ফায়দা আমাদের জরুরী। শুধু ইরাকই নয়, গোটা ইরান জয় করাই আমাদের মাকসাদ। এ বিজয়ের সুফল ভোগ করার জন্য বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র কোব্বাদের মত ব্যক্তিদের সহযোগিতা হাসিল করতে হবে। আমার বিশ্বাস, জুলুমকে যারা জুলুম মনে করে, ওরা বেশীক্ষণ ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে না।'

ঃ 'ঠিক আছে, হাসানের সাথে দেয়ার জন্য দশজন মোবাল্লেগ ঠিক করো। এ সময়ে কোব্বাদের নামে আমি চিঠি লিখাচ্ছি। হাসানের ধারণা সঠিক হলে দরিয়া পার পর্যন্ত এ বিস্তীর্ণ এলাকা তাকে সোপর্দ করা হবে। ইরাক কব্জা করার পর এমন লোকদেরই দরকার আমাদের, যারা আরবদের সম্মিলিত আস্থা বহাল রাখতে সক্ষম।'

তের

বেলা দ্বিপ্রহর। ঘোড়া ছুটিয়ে আঙ্গিনায় প্রবেশ করল মিয়ানদাদ। কয়েকজন চাকর ছুটে এসে জমা হল তার পাশে। মিয়ানদাদের চেহারা ধূলোমলিন। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই প্রশ্ন করলঃ 'কাউস কোথায়?'

ঃ 'জ্বি, সে তো ভেতরে।' ঘোড়ায় লাগাম ধরে জওয়াব দিল এক গোলাম। 'হুকুম হলে তাকে ডেকে দিই!'

ঃ 'না, তাকে ডাকার দরকার নেই। চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করে নদীর ওপারে নিয়ে যাও। এ ঘোড়া এখানেই থাকুক। মাল্লাদের বলো নদীর পারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে। গাঁয়ে যাদের পাও ডেকে নিয়ে এসো।'

উৎকণ্ঠিত চাকর বললঃ 'জনাব, খবর ভালতো? আপনাকে খুব পেরেশান দেখাচ্ছে।'

মিয়ানদাদ গর্জে উঠলঃ 'বেকুব! এখন কথা বলার সময় নয়।'

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস হলোনা গোলামের। দ্রুত অন্দরের দিকে এগোল মিয়ানদাদ।

কোব্বাদের কামরায় প্রবেশ করল মিয়ানদাদ। দেখল, মাহবানু ঝিমুচ্ছে পিতার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে। ফরাশে হাটু গেড়ে বসে কোব্বাদের পা টিপছে কাউস। কেব্বাদের দু'চোখ বন্ধ। মিয়ানদাদকে আচানক কামরায় ঢুকতে দেখে থেমে

গেল কাউসের হাত। দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

ঃ 'আব্বাজান ঘুমিয়ে আছেন?' প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না।' মাথা হেলিয়ে জবাব দিল কাউস। 'আজ তার অবস্থা খুবই খারাপ।'

কোব্বাদ আর মাহবানু প্রায় একই সংগে ভয় আর পেরেশানী নিয়ে চাইল মিয়ানদাদের দিকে। ক্ষীণ আওয়াজে কোব্বাদ বললেনঃ 'কি ব্যাপার বেটা। এত জলদি তুমি ফিরে এলে, লড়াই এখনো শুরু হয়নি?'

ঃ 'আব্বাজান।' জওয়াব দিল ও, 'আমি মাযার পৌছার আগেই লড়াই খতম হয়ে গেছে।'

ঃ 'লড়াই খতম হয়ে গেছে!' বলে বসতে চেষ্টা করলেন কোব্বাদ। কিন্তু দুর্বলতা আর কষ্টের কারণে আবার বালিশে মাথা রেখে দিলেন।

ঃ 'আব্বাজান, কি হয়েছে আব্বাজান?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

মুর্চ্ছিত চেহারায় মৃদু হাসির রেশ টেনে কোব্বাদ বললেনঃ 'আমি ভাল আছি। একটু মাথা ঘুরানি এসেছিল। পানি দাও আমায়।'

কামরার কোণে রাখা সোরাহী থেকে পানি নিল কাউস। এক হাতে তাঁর মাথা তুলে, ঠোঁটের কাছে পানপাত্র তুলে ধরল। কয়েক ঢোক গিলে পুত্রের দিকে আবার তাকালেন কোব্বাদ।

ঃ 'বসো বেটা। তুমি ওখানে পৌছার পূর্বে লড়াই খতম হয়ে থাকলে, এতে পেরেশান হওয়ার কি আছে? কারণ, তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা তুমি পূর্ণ করেছ। কয়েক হাজার লোক ভর্তি করে তুমি পৌছেছ ওখানে। মাযারের বিজয় তোমার তৎপরতার ফল, এ দাবী তো তুমিও করতে পার।'

বিষণ্ন কণ্ঠে মিয়ানদাদ বললঃ 'আব্বাজান, পরাজিত হয়েছি আমরা, কারেন নিহত। মাযার থেকে এক মঞ্জিল দূরে পলায়নপর পরাজিত সিপাইদের সাথে সাক্ষাত না হলে বিশ্বাসই হতো না মাযারে আমরা পরাজিত হয়েছি। ওরা বলেছে, আমাদের অর্ধেকেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে ময়দানে। ওরা আরো বলেছে, নদীর দিকের কোন এলাকায়ই এখন নিরাপদ নয়। মুসলমানদের সঠিক সংখ্যাও বলতে পারছে না ওরা। ওরা বলছিল, মুসলমানদের উপর হামলা করলে লৌহ প্রাচীরের মত অটল থাকে ওরা। ওরা যখন হামলা করে বানের পানির মত সামনের সব কিছুই খড় কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের এলাকার স্বেচ্ছাকর্মীদের কথা জিজ্ঞেস করে কোন শান্তনাপ্রদ জওয়াব পাইনি। ওরা মারা না গেলেও অবশ্যই বন্দী হয়েছে। আগামীতে মুসলমানরা কোন্ দিকে রোখ করবে এখনও বুঝা যাচ্ছে না। ওরা যদি এদিকে আসে, এ মুহূর্তে আমরা বাঁধা দিতে পারছিনা। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমাদের নতুন ফৌজ আসতে পারবে না ময়দানে। আব্বা, দেরী না করে আপনাকে এবং মাহবানুকে মাদায়েন পৌছে দিতে চাই। এ স্থান এখন আপনার জন্যে নিরাপদ নয়। জানি এ মুহূর্তে সফরে

কষ্ট হবে আপনার। দুশমনের এখানে পৌছা এর চেয়ে বেশী বেদনাদায়ক। আপনি এ কষ্টটুকু স্বীকার করলে আপনিও দুশমনের থেকে নিরাপদ থাকবেন, আমিও নিশ্চিন্তে অংশ নিতে পারব আগামী লড়াইগুলোতে।'

ঃ 'বেটা! আমার জন্য ভেবোনা তুমি, প্রায় মওতের কাছাকাছি পৌছে গেছি আমি। তুমি মাহবানুকে মাদায়েনে নিয়ে যাও।'

ঃ 'আব্বাজান, আপনাকে ছেড়ে মাহবানু মাদায়েন যাবে না। সময় নষ্ট করা উচিত নয়, যে কোন সময় মুসলমানরা এখানে চড়াও হতে পারে। ওদের পথ প্রদর্শক হবে এমন ব্যক্তি, আমাদের ঘরের প্রতিটি কোণ সম্পর্কে যে জানে।'

ঃ 'আমাদের কোন গোলাম দুশমনের দলে ভিড়েছে একি হতে পারে?'

ঃ 'না, সে আমাদের গোলাম নয় বরং এমন ব্যক্তি যাকে আপনি এক বেটা আর আমি এক ভাইয়ের মত ভালবাসতাম। তার নাম হাসান। আব্বাজান, সে মুসলমানদের দলে ভিড়েছে। তাকে দেখেছি আমি হাফিরের ময়দানে। সব অপমান আমি বরদাশত করতে পারি, কিন্তু বিজয়ের ঝান্ডা নিয়ে ও আমাদের ঘরে প্রবেশ করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। আজ সন্ধ্যার আগেই নদীর ওপারে পৌছতে হবে আমাদের। আমি ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। আপনার পালকী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বহন করতে গাঁয়ের লোকদের ডেকে পাঠিয়েছি। আপনার সফরে কষ্ট হলে নদীর ওপারের গ্রামে কয়েকদিন আমরা অপেক্ষা করব। কাউস এখানেই থাকবে।'

ঃ 'তুমি যদি হাসানকে ভয় কর তবে এখানেই থাকতে দাও আমায়।' নিশ্চিন্তে জওয়াব দিলেন কোববাদ। 'ও আমায় কিছুই বলবে না।'

অশ্রুভেজা কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'আব্বাজান, হাসানকে আমি ভয় পাই না। আপনি কি মাহবানুর ব্যাপারে ভাবছেন না?'

কোব্বাদের ফ্যাকাশে চেহারা রক্তাভ হয়ে উঠল হঠাৎ। তিনি উঠে বসলেন। মাহবানু তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাকে ঠেক দেয়ার চেষ্টা করে বললঃ 'আব্বাজান, আপনি শুয়ে থাকুন।'

ঃ 'আমার জন্য চিন্তা করোনা বেটি। তোমরা সফরের জন্য তৈরী হও।'

কাউসের দিকে ফিরে মিয়ানদাদ বললঃ 'জরুরী মালপত্র বেঁধে গাঁয়ের লোকদের হাওলা করে দাও। আব্বাজানের জন্য পালকী নিয়ে এসো। নদীর পারে খুব শীগগীরই আমাদের পৌছতে হবে। গাঁয়ের লোকদের বলবে চিকিৎসার জন্যে আব্বাজানকে মাদায়েন নিয়ে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেল কাউস। কতক্ষণ নিঃসাড় বসে রইলেন কোব্বাদ। এরপর চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখলেন। বারবার তাঁর কণ্ঠ থেকে বেদনামথিত শব্দ বেরিয়ে আসছিলঃ 'এ কিভাবে সম্ভব? এ কি করে হতে পারে?'

বেদনার্ত চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল মাহবানু।

ঃ 'তুমি কি ভাবছ?' বলল মিয়ানদাদ, 'চিরদিনের জন্য এ ঘর ছেড়ে যাচ্ছি না আমরা। শীগগীরই ফিরে আসব। এখন জলদি কাপড় পরে নাও। একটা ছোট সিন্দুক আর দু গাইটের বেশী যেন না হয় আমাদের মালপত্র। খাদেমা আপাততঃ এখানেই থাকবে। জলদি করো। এখন আমাদের ভাববার সময় নয়। হায়! হাফিরের লড়াই থেকে ফিরে এসেই যদি তোমাদের মাদায়েন পাঠিয়ে দিতাম!'

কোন জওয়াব না দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাহবানু।

তৃতীয় প্রহর প্রায়। গ্রামের লোকেরা কোব্বাদের পালকী তুলছে। মিয়ানদাদ বোনকে বললঃ 'তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নদী পারে পৌছে মাল্লাদের বলবে তোমাদের ওপারে পৌছে দিতে। আমরা পৌছতে পৌছতে তোমাদের রেখে নৌকা ফিরে আসবে।'

ঃ 'না ভাইজান, আমি আব্বাজানের সাথে যাব।'

জিনিসপত্র আর পালকী বহনকারীরা বেরিয়ে গেল দেউড়ী থেকে। তাদের পেছনে চলল মিয়ানদাদ আর মাহবানু। দেউড়ীর কাছে পৌছে আচানক থেমে গেল মাহবানু। ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা খাদেমার দিকে তাকাল ও। অশ্রু মুছছিল খাদেমা। ছুটে এগিয়ে গেল মাহবানু। কান্নার গমকে গমকে ও জড়িয়ে ধরল খাদেমাকে। বৃদ্ধা খাদেমা কম্পিত হাতে তার মাথায় আদর করতে করতে বললঃ 'বেটি, হিম্মত কর। আমার বিশ্বাস সে তোমার দুশমন হতে পারেনা।'

মাহবানু ফিরে চাইল দেউড়ীর দিকে। বেরিয়ে গেছে মিয়ানদাদ। কাউস আর এক গোলাম ছাড়া কেউ নেই ভেতরে।

ঃ 'না, না, মনকে এখন আর ধোকা দিতে পারছি না।' 'বলল ও। 'আমরা একে অপরকে আর দেখব না কোনদিন। ও যদি এখানে আসে আমার পক্ষ থেকে এ পয়গামটুকু দেবেন, তোমার দুশমনীর প্রতিশোধ তোমার ভাইকে দিয়ে নেয়া হবে না। কিন্তু খোদার দিকে চেয়ে একথা বলবেন না, এক পাগলী মেয়ে তার জন্য অশ্রুর ঝরণা বইয়ে দিয়েছিল।'

ঃ 'মাহবানু, কি করছ তুমি?' দেউড়ীর বাইরে থেকে আওয়াজ দিল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আসছি ভাইজান।' বলেই ও হাঁটা দিল দরজার দিকে। কোব্বাদ রওনা হওয়ার খানিক পরই গ্রামের এক লোক ছুটে এসে কাউসকে সংবাদ দিল, কজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে।'

দ্রুত দেউড়ীর দরজা বন্ধ করে দিল কাউস। সঙ্গীদের তীর তুনীর নেয়ার হুকুম দিয়ে ছুটে গেল ছাদে। খানিক পর ও দেখল সশস্ত্র চার ব্যক্তি। ফটকের পনর-বিশ কদম দূরে থামল ওরা। কাউসের দিকে তাকাল হাসান। গলা চড়িয়ে বললঃ 'কাউস, তোমার মুনিবকে খবর দাও। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই।'

ঃ 'তিনি অসুস্থ। দরজা খোলার অনুমতি নেই আমার।'

ঃ 'মিয়ানদাদ কোথায়?'

ঃ 'ঘরে নেই?'

ঃ 'ঠিক আছে, তোমার মুনীবকে বলো তার জন্য এক জরুরী পয়গাম নিয়ে আমি এসেছি। এ এলাকার যারা লড়াইয়ে গ্রেফতার হয়েছিল, ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাদের। তাঁদেরই চারজন এসেছে আমার সঙ্গে। বাকীরা হেঁটে আসছে। তোমার মুনীবের খান্দান সম্পর্কে মুসলমানদের নিয়ত খারাপ নয়, এ চার ব্যক্তি তার সাক্ষী।'

বাকী অশ্বারোহীদের দিকে তাকাল কাউস। নিজ গাঁয়ের লোকদের চিনতে দেরী হল না তার। হাসানকে দেখে গায়ের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যারা লুকিয়েছিল ঘরের কোণে, এক এক করে বেরিয়ে তার চার পাশে জমা হতে লাগল।

কাউসের কোন জওয়াব না পেয়ে হাসান বললঃ 'কাউস, তোমার মুনীবের শরীর বেশী খারাপ হলে তাঁকে পেরেশান করব না। তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করব এ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভয় পেয়ে যদি দরজা বন্ধ করে থাক তবে তোমাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার প্রথম জিম্মা হল এ ঘরের হেফাজত করা। মিয়ানদাদ ভেতরে থাকলে তাকে ডেকে দাও।'

জওয়াব না দিয়ে কাউস পেরেশান হয়ে কখনো হাসান কখনো সঙ্গীদের দিকে চাইতে লাগল। শিশু-বুড়োদের দেখাদেখি গাঁয়ের মহিলারাও জমা হচ্ছিল ওখানে। হাসান যে চার বন্দীকে ছাড়িয়ে এনেছিল ওরা কথা বলতে লাগল প্রিয়জন আর আত্মীয়দের সাথে।

ওদের একজন হঠাৎ ঘোড়া বাগিয়ে হাসানের কাছে পৌছে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'কাউস মিথ্যে বলছে। মিয়ানদাদ এবং তার পিতা ঘরে নেই, ওরা মাদায়েন রওয়ানা হয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা নদীর পার পর্যন্ত পৌছাতে গেছে ওদের। চাচা বলছেন, আমার ভাইও গেছে তাদের সাথে। ওরা রওনা হয়েছে বেশী সময় হয়নি। সম্ভবতঃ নদীও পেরোয়নি এখনো।'

হাসান লাগাম ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সঙ্গীরা অনুসরণ করল তার। কোব্বাদ, মাহবানু এবং সফরের জন্য নির্বাচিত আট ব্যক্তি সওয়ার হচ্ছিল কিশতীতে। তীরে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের লোকদের বলছিল মিয়ানদাদঃ 'এখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হতে হবে তোমাদের। এবার সমগ্র শক্তি দিয়ে দুশমনকে হামলা করবো। এখনো মুসলমানরা দেখেনি আমাদের হস্তিমুখ। বিরাট বিজয়ে অংশ নিতে তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আব্বার অবস্থা দেখছো তোমরা। ওর চিকিৎসার জন্যে ভাল ডাক্তার প্রয়োজন। তাঁকে মাদায়েন পৌছে দিয়ে নিশ্চিন্তে অংশ নিতে পারব লড়াইয়ে। তাড়াতাড়িই ফিরে আসব আমি। আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের চেষ্টা হবে তলোয়ার ধরতে সক্ষম সবাইকে একত্রিত করা।'

ঃ 'ওরা আসছে।' চিৎকার দিয়ে বলল এক নওজোয়ান। 'আপনি জলদি নৌকায় উঠোন।'

পিছন ফিরে দেখল মিয়ানদাদ। ক্ষণিকের জন্য পা তার আটকে রইল মাটির সাথে। প্রায় তিনশ গজ দূরে বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরোতে দেখা গেল কয়েকজন অশ্বারোহীকে। সবার আগে হাসান। নৌকায় লাফিয়ে পড়ে মিয়ানদাদ চিৎকার দিয়ে বললঃ 'কিশতি ওপারে নিয়ে চলো। জলদি করো।'

এক যুবক খুলে দিল রশি। দাঁড় বাইতে লাগল মাল্লা। পালকীতে নিঃসাড় পড়েছিলেন কোব্বাদ। হঠাৎ উঠে বসলেন তিনি। তীর তুলে নিল মিয়ানদাদ। সঙ্গীরা তুলে নিল তরবারী। বেদনা বিধুর মাহবানু কখনো পিতার দিকে কখনো মিয়ানদাদ আবার কখনো দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের দিকে চাইতে লাগল পেরেশান হয়ে। সঙ্গীদের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ কদম এগিয়ে ছিল হাসান। এক হাত উঁচিয়ে রেখেছিল ও। ও যখন নদীর পারে পৌছল, নৌকা চলে গেছে তখন পনর বিশ গজ দূরে। ও চিৎকার দিয়ে বললঃ 'থামো মিয়ানদাদ। আমার কথা শোন। আমি হাসান। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমাদের হিফাজতের জিম্মাও নিচ্ছি আমি।'

কিশতি থেকে শনশন আওয়াজে ভেসে এল এক তীর। বিঁধল তার বাম হাতে। ততোক্ষণে নদীর পারে চলে এসেছে হাসানের সঙ্গীরাও। দেরী না করেই ধনুতে তীর চড়াল ওরা। হাসান তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললঃ 'খবরদার, ওদের হামলা করবে না।'

এক ঝটকায় হাত থেকে তীর খুলে ছুঁড়ে ফেলল ও। এর মধ্যে গাঁয়ের লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এদিক ওদিক। হাসান ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। চিৎকার করতে লাগল জোরে জোরেঃ 'থামো মিয়ানদাদ, আমার কথা শোন। এরপর যেতে চাইলে তোমায় বাঁধা দেব না। তোমার পিতার জন্যে এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি আমি। তোমাদের গ্রাম, তোমাদের ঘর নিরাপদ। পালানোর দরকার নেই তোমাদের।'

অনিমেষ নেত্রে এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখছিল মাহবানু। কিছু বলতে চাইলেন কোব্বাদ। কিন্তু জবান স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর। গোলাম শুইয়ে দিতে চাইল তাঁকে। এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে দিলেন তিনি। ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিল অস্ফুট গোঙ্গানীর আওয়াজ। হাত প্রসারিত করে কিছু বোঝাতে চাইছিলেন তিনি মিয়ানদাদকে। কিন্তু কিশতির অপর প্রান্তে অটল দেয়ালের মত দাঁড়িয়েছিল মিয়ানদাদ। তার অনড় দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে হাসানের ওপর। কোব্বাদের অস্বস্তি দেখে সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টানছিল মাল্লা। গভীর পানি এলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল হাসান। সাঁতরাতে লাগল এক হাতে ঘোড়ার জিন ধরে।

কিশতির তুলনায় তার গতি ছিল মন্থর। ওদের মাঝের দুরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল

ক্রমশঃ। মাথা ছাড়া সমগ্র দেহটা ওর পানিতে ডোবা। খানিক পর নদীর মাঝখানটা পেরিয়ে কোমর বরাবর পানিতে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হল ও। কিশতি ভিড়েছে কিনারে। কয়েক লাফে হাসানের ঘোড়া পৌছল হাটু পানিতে। নিশ্চিন্তে নিশানা করল মিয়ানদাদ। মাহবানুর বেদনা মাখা চোখ বুজে এল। আচানক উঠে দাঁড়ালেন কোব্বাদ। মাল্লা আর গোলামরা বিমূঢ়ের মত চাইতে লাগল তাঁর দিকে। দ্বিধা কুণ্ঠিত কম্পিত পদে এগোলেন তিনি। হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে এল তার শক্তি। পড়তে পড়তে মিয়ানদাদকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন তিনি। ধাক্কা লেগে এক কদম এগিয়ে গেল মিয়ানদাদ। ধনু থেকে বেরিয়ে গেল তীর। বিঁধল হাসানের ঘোড়ার মাথায়। আহত ঘোড়া আরোহী সহ লাফিয়ে পড়ল পানিতে।

হৃদয়বিদারক চিৎকার বেরিয়ে এল মাহবানুর মুখ থেকে। 'আব্বাজান আব্বাজান' বলে এগিয়ে কোব্বাদকে তোলার চেষ্টা করল মিয়ানদাদ। চিৎ করে শুইয়ে দিল কোব্বাদকে। তার অর্ধ বোঁজা চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত্যুর পর্দা। মুখে পানি দেয়ার চেষ্টা করল এক গোলাম, কিন্তু সে পানি পড়ে গেল গাল বেয়ে। কোব্বাদের শিরায় হাত রেখে চিৎকার দিয়ে উঠল মিয়ানদাদঃ 'আব্বাজান, আব্বাজান।'

ঃ 'তিনি এখন আপনার আওয়াজ শুনবেন না।' বলল এক বৃদ্ধ মাল্লা। 'আপনি এবার নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করুন। ঐ দেখুন ওরা সবাই ঘোড়াসহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীতে, এখানে পৌছতে দেরী হবে না ওদের।'

অপর পারে নজর করল মিয়ানদাদ। সাথে সাথে ধনু তুলে বসল সে হাটু গেড়ে। প্রায় বিশ গজ দূরে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার করুণ অবস্থা দেখছিল হাসান। তুনীর থেকে তীর খুলে মিয়ানদাদ ধনুতে তাক করল। আচানক লাফিয়ে তাকে জড়িয়ে চিৎকার দিয়ে মাহবানু বললঃ 'না ভাইজান, না। দেখুন ওরা এসে পড়েছে। আপনাকে ওরা ক্ষমা করবে না। তাকে হত্যা করে নিজের জীবন আপনি বাঁচাতে পারবেন না।'

চিৎকার দিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'ছেড়ে দাও আমায়। মৃত্যু ভয় আমার নেই। হাসান আমাদের অসহায়ত্বের তামাশা দেখবে না।'

ধাক্কা দিয়ে মাহবানুকে একদিকে ফেলে ধনু তাক করল ও। কিন্তু তাকে তীর চালানোর সুযোগ দিল না মাহবানু। পড়তে পড়তে উঠে ও ধরে ফেলল তাঁর হাত। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'তোমাকে আত্মহত্যার সুযোগ আমি দেবো না। ভাইজান, প্রথমে আমাকে খুন করো।'

ঃ 'পাগলী মেয়ে, আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি দাসী হবে তা আমি দেখতে পারব না। ও আমার পিতার হত্যাকারী, তাকে আমি জিন্দা রাখব না।'

ঃ 'না না, আব্বাজান আপনাকে তীর চালাতে নিষেধ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল ও লড়াইয়ের নিয়তে আসেনি। ভাইজান, আপনি তীর ধনু ফেলে দিন। তাকে ফেরানোর জিম্মা নিচ্ছি আমি।'

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'তুমি.... তুমি তার সাথে যেতে চাইছ?'

ঃ 'তুমি যেমন বেকুব তেমনি জালেম। খোদার দিকে চেয়ে একবার আমায় প্রমাণ করতে দাও, আমি তোমার বোন, আমার খুন তোমার খুনের চেয়ে ভিন্ন নয়। তার অগ্রগতি রোধ করতে না পারলে তোমার তুনীর শূন্য করতেও নিষেধ করবো না।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভাইয়ের কোমরে ঝুলানো খঞ্জর টেনে নিল মাহবানু। ফিরে তাকাল হাসানের দিকে। আরো কয়েক কদম এগিয়ে এসেছে ও। খঞ্জরের অগ্রভাগ নিজের বুকে লাগিয়ে মাহবানু চিৎকার দিয়ে বললঃ 'যদি তুমি আর এক কদম এগিয়ে আসো কিশতিতে দেখবে আমার লাশ। আমার পিতাকে কিছু বলার থাকলে তিনি মরে গেছেন। আমার ভাই তোমার কথা শুনবে না।'

হাসান থেমে গেল। খানিক থেমে মাহবানু বললঃ 'তুমি ফিরে যাও। সঙ্গীদেরও বারণ কর এদিকে আসতে। তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে যদি কিছু বলার থাকে তোমাকে এ শান্তনা দিচ্ছি, তোমার দুশমনীর প্রতিশোধ তার উপর তুলব না।'

ঃ 'মিয়ানদাদ, আমি এগোব না। আমার সঙ্গীরাও ফিরে যাবে। আমায় একটু কথা বলার সুযোগ দাও। আমি তোমাদের জন্যে সন্ধি আর শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'আমি কিসরার সৈনিক। কিসরার দুশমন আমার দোস্ত হতে পারেনা। আমাদের মোলাকাত শুধু ময়দানে জংগে, আর কথাবার্তা কেবল তলোয়ারের ভাষায় হতে পারে।'

ঃ 'এই যদি হয় তোমার খায়েশ, বেশীদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবেনা।'

ঃ 'হাসান।' বলল মাহবানু, 'যাও, আমার পিতার কোন অধিকার যদি তোমার উপর থাকে, শেষবার অনুরোধ করছি, আমাদের পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না। এখন কথা বলে কোন ফায়দা হবে না।'

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হাসান। ধীরে ধীরে পা তুলে অপর পারে যাওয়ার জন্য সাঁতরাতে লাগল। এরি মধ্যে নদীতে নেমে পড়েছিল তার সংগীরা। গভীর পানিতে খানিক সন্তরণ করে অপেক্ষাকৃত কম পানিতে পেল এক সংগীর ঘোড়া। বুলন্দ আওয়াজে ও চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ফিরে চলো, ফিরে চলো।'

ঃ 'কিন্তু ওরা আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।' বলল একজন। 'আপনার ঘোড়াটা ও হালাক করে দিয়েছে।'

ঃ 'না না, তোমরা ফিরে চলো। এ আমার হুকুম।'

অনিচ্ছা সত্বেও ঘোড়া ফিরিয়ে নিল হাসানের সঙ্গীরা। নদী পেরিয়ে শ্রান্তিতে ও বসে পড়ল বালির ওপর। তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল তখনো। তাড়াতাড়ি এক ব্যক্তি নিজের পাগড়ী ছিঁড়ে যখমে ব্যান্ডেজ করতে করতে বললঃ 'আমি হয়রান হচ্ছি, আপনি ওদের ধাওয়া করার অনুমতি দেননি কেন? দেখুন ওরা এখনো নদীর পারে বসে আছে।

অনুমতি দিলে সহজেই ওদের গ্রেফতার করা যায়।'

ঃ 'আমরা ওদের গ্রেফতার করতে আসিনি।'

ঃ 'কিন্তু ওরা তো আপনার কথা শুনতেই রাজি নয়।' বলল আরেকজন।

বিষন্ন কণ্ঠে বলল হাসানঃ 'সম্ভবত কথা বলার উপযুক্ত সময় ছিল না।'

গাঁয়ের এক ব্যক্তি বললঃ মিয়ানদাদ হয়তো সন্দেহ করেছিল তাদের আপনি বন্দী করবেন।'

ঃ 'জানিনা কি ভেবেছে সে। তবে তার পিতা দ্বিতীয়বার বাঁচালেন আমার জীবন। তিনি আমায় মদদ না করলে যে তীরে মারা গেছে আমার ঘোড়া, সেই তীরেই খুন হতাম আমি।'

হাসান আর তার সাথীরা ওপারে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মিয়ানদাদ তার বোন এবং দু'জন গোলাম সওয়ার হলো ঘোড়ায়। বাকী লোকেরা পালকী এবং অন্যান্য মালামাল তুলে যখন অনুসরণ করল ওদের, হাসান নিজের সাথীদের বললঃ 'এসো, এবার যাওয়া যাক।'

নদী পার হয়ে প্রথম যে গ্রামে পৌঁছল ওরা সেখানেই কোব্বাদের দাফন করল মিয়ানদাদ। গ্রামের জমিদারের ওখানে রাত কাটাল। নিজস্ব চারজন গোলাম ছাড়া ওদের সাথে আসা বাকীরা ফিরে যাবার জন্য ছিল পেরেশান। সূর্যাস্তের পর ওদের বিদায় দিল মিয়ানদাদ। নিজের এক গোলামকে সাথে দিয়ে বললঃ 'গাঁয়ের পরিস্থিতি জেনে রাতেই তুমি ফিরে এসো।'

রাতের শেষ প্রহরে গোলাম ফিরে এসে বললঃ 'গাঁ বিলকুল নিরাপদ, আপনার ঘরের বাইরের খোলা ময়দানে তাবু খাটিয়েছে মুসলমানরা। সন্ধ্যার দিকে গাঁয়ের যেসব লোকেরা মাযারে বন্দী হয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। ওদের আগমনে ভয় ভীতি দূর হয়ে গেল লোকদের। ওরা বলছে, মুসলমানরা আমাদের দুশমন নয় বরং জালিম হুকুমতের গ্রাস থেকে বাঁচাতে এসেছে আমাদের।'

ঃ 'তাদের কাউকে তুমি দেখেছ?' প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'জনাব, কয়েকজনকেই দেখেছি আমি। প্রথমটায় লুকিয়ে এক কৃষকের ঘরে গেলাম। এরপর দেখলাম ওখানে আমার কোন বিপদ নেই। মুসলমানরা ঘোষণা করেছে, এ এলাকার লোকদের জানমাল. ইজ্জত আব্রুর মুহাফেজ আমরা। এতে ভয়ে জংগলে লুকিয়ে পড়া লোকেরাও ফিরে এসেছে। এসব অবিশ্বাস্য লাগছিল আমার কাছে। এক ঘরে গিয়ে কথা বললাম ফিরে আসা কয়েদীদের সাথে। ওরা বলল, শুধু আমাদের গাঁয়ের লোকদেরই নয়, মুসলমানরা সকল আরব কয়েদীদের ছেড়ে দিয়েছে। আপনি অকারণে ঘর ছেড়ে এসেছেন, এ জন্য গাঁয়ের লোকেরা দারুণ আফসোস করল। ওরা বলছিল, আপনি আবার ফিরে গেলে মুসলমানদের পাবেন উৎকৃষ্টতম বন্ধুরূপে। মুনীবের মৃত্যুতে ওরা দারুণ দুঃখিত।'

চঞ্চল হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে আব্বাজানের মৃত্যুর কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম।'

ঃ 'জনাব, আমাদের পূর্বেই নৌকার মাল্লারা গাঁয়ের লোকদের এ কথা বলে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ বলেছে রাতে আপনি এ গাঁয়ে থাকবেন। কয়েক ব্যক্তি প্রস্তুতি নিয়েছিল আপনার কাছে আসার জন্য। ওরা আমাকে মুসলমানদের সালারের কাছে নিয়ে যেতে চাইছিল। 'রাত অধিক হয়েছে সকালে দেখা যাবে' বলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি। ভয় হচ্ছে মুসলমানরা হয়ত আবার আপনার পিছু নেয়ার চেষ্টা করবে।'

মিয়ানদাদ ফিরল মেজবানের দিকে।

ঃ 'মুসলমানদের সালারকে আমি জানি। হত্যা না করে সে চায় আমাদের জীবিত গ্রেফতার করতে। নদী পেরোতে তাকে যদি এই ধারণা না দিতাম যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মোকাবেলা করার ফয়সালা করেছি আমি, তাহলে আমাদের পিছু ছাড়তো না ও। গাঁয়ের লোকেরা আসবে তার সাথে। আমার জন্যে আপনি মুছিবতে পড়েন তা আমি চাইনা। এখনি রওয়ানা করব আমরা। গরুগাড়ীতে আমাদের মালপত্র আপনি মাদায়েন পাঠিয়ে দেবেন। ইরানের বিরাট লশকরের সাথে খুব শীঘ্রই ফিরে আসব আমি। আমার বোনটাকে তার আগেই মাদায়েন পৌছানো জরুরী মনে করছি।'

একটু পরই মিয়ানদাদ আর মাহবানু বেরিয়ে এল মেজবানের ঘর থেকে। চারজন গোলাম ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। মালপত্র চাপানো হয়েছে গরুর গাড়ীতে। এক গোলামকে গরুর গাড়ীতে সওয়ার হওয়ার হুকুম দিয়ে মিয়ানদাদ ফিরল গাঁয়ের খবর নিয়ে আসা গোলামের দিকে।

ঃ 'তোমাকে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিচ্ছি। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তুমি বলবে, সন্ধ্যার সাথে সাথেই আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে গেছি। পথে মুসলমানদের দেখা পেলে বলবে, কয়েক ক্রোশ এগিয়ে গেছি আমরা। একটা ফৌজী দল আমাদের সাথে শামিল হয়েছে পথে। আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব, আমার পক্ষ থেকে কাউসকে এ পয়গাম দেবে।'

গোলামকে বিদায় করে মাহবানুকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল মিয়ানদাদ। মেজবানের সাথে মোসাফেহা করে নিজেও সওয়ার হল।

সূর্যোদয়ের সময় দূরের এক বস্তির কুয়ায় পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছিল ওরা। মাহবানুর অবসন্ন দেহটা ঝুঁকে ছিল ঘোড়ার জীনে। স্নেহভেজা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'এখান থেকে মাত্র চার ক্রোশ দূরে আমাদের চৌকি। ওখানে পৌছে কিছুক্ষণ আরাম করতে পারব আমরা। সামনে আমাদের কোন ভয় নেই।'

কোন জওয়াব দিল না মাহবানু। ঘোড়ার পানি পান শেষে চলতে লাগল ও।

প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল মাহবানু। তাদের অনুসরণকারী গোলামরাও ঘোড়া থামাল। মিয়ানদাদ খানিকটা এগিয়ে পিছনে ফিরে চাইল। বোনের কাছে এসে আওয়াজ করে বললঃ 'কি ব্যাপার, তুমি থেমেছ কেন?'

ঃ 'ভাইজান, একটু ধীরে চলুন। আমি আর পারছি না।'

ঘোড়া থেকে নেমে মাহবানু মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে।

ঃ 'বোনটি আমার, তোমার কষ্ট আমি বুঝি। আরেকটু হিম্মত করো। এখনো বিপদসীমা অতিক্রম করিনি আমরা।'

দাঁড়াল মাহবানু। ঘোড়ার জীনে দু'হাতে ভর করে সামলাল দেহের ওজন।

ঃ 'ভাইজান, যে ভয়ে আপনি পালাচ্ছিলেন, নদী পেরুনোর পর কেটে গেছে সে বিপদ। আমি বড় ক্লান্ত।'

ঃ 'মাহবানু, নিজের কারণে নয়, আমি পালাচ্ছি শুধু তোমার জন্য। এখনো যদি তুমি বুঝতে....' বলে থেমে গেল মিয়ানদাদ। গোলামদের দিকে ফিরে বললঃ 'তোমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো। আমরা আসছি।'

হুকুম তামীল করল গোলামরা। ওরা কয়েক কদম দূরে গেলে মিয়ানদাদ বললঃ 'এতোক্ষণে তোমার বোঝা উচিত ছিল, আমার সাথে শক্তি পরীক্ষা নয় বরং তোমাকে গ্রেফতার করাই ওর ইচ্ছে। নদীর পানি আর তীর আমাদের মাঝে বাঁধা না হলে ও ফিরে যেতো না। জংগী কয়েদীদের মুক্তি দেয়া আর গাঁয়ের লোকদের সাথে সম্প্রীতি সৃষ্টি, আমাদের ধোকা দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ও চায় আমরা তার অধিকারভুক্ত হই। আমাদের কৃষকদের ভয়-ভীতি এজন্য দূর করেছে যেন নিশ্চিন্তে আমরা ফিরে যাই। সকালে সেই বেকুব যখন বলবে নদীর কয়েক মাইল দূরের বস্তিতে আমরা অবস্থান করছি, এক মুহূর্ত দেরী না করে ওখানে পৌছার চেষ্টা করবে ও। আহত হওয়ার কারণে হয়ত নিজে আসতে পারবে না, কিন্তু এখনো জানিনা কত মুসলমান জমায়েত হয়েছে আমাদের গাঁয়ে। আমার তূনীর খালি হলে আমায় হত্যা করবে এ ভয় নেই আমার। কিন্তু তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে এ আমি দেখতে পারব না।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলল মাহবানু। ফিরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। রেকাবে পা রেখে ঘোড়ার জীনে বসতে বসতে বললঃ 'ভাইজান, আপনার যদি সন্দেহ হয় বন্দী হয়েও আমি বেঁচে থাকব, তাহলে তূনীরের শেষ তীরটা জমা রাখবেন আমার জন্য। আমি জানি ও আসবে না। কখনো আসবেনা ও। আমরা শুধু ভয়েই পালাচ্ছি।'

কথাগুলো বলার সময় মাহবানুর চোখ ভরে এলো পানিতে।

ঃ 'হয়ত তোমার ধারণাই সঠিক। তবুও আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। এখন ঘোড়ার গতি দ্রুত করার দরকার নেই, কিন্তু থামাও ঠিক হবে না।'

কিছুক্ষণ মামুলী গতিতে চলল ওরা। মিয়ানদাদ প্রায় আধমাইল দূরের এক বস্তি দেখিয়ে বললঃ 'মাহবানু, আফসোস, অকারণে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, ঐ বস্তিতে খানিক

আরাম করব। কাল থেকে কিছুই মুখে দাওনি, ঘোড়াগুলোও পারছে না আর। এখন আমারও বিশ্বাস ও আমাদের ধাওয়া করবে না। আমি হয়রান হচ্ছি, সোহেল মাদায়েনে, তার ভাই দুশমন হিসেবে আসবে না আমাদের সামনে, এ সাদামাটা কথাটা কেন আমার বুঝে আসেনি। মন দিয়ে শোন মাহবানু, সোহেল যেন হাসানের এসব কথা জানতে না পারে। কিন্তু হাসানকে আমি কোন দিন ক্ষমা করব না। আমি আশা করি খুব শীগগীরই মরু আরবের পথ ধরবে ইরানী ফৌজ। সোহেল যদি আমার আশা পুরো করে থাকে, ইরানী ফৌজের সিপাই হতে বেশী সময় লাগবে না ওর। তেগ চালনা আর তীরন্দাজীতে তার সমবয়স্ক কেউ তার সমকক্ষ হতে পারছে না। তাকে শিখাব মুসলমানদেরকে ঘৃণা করতে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো খুশীর দিন হবে সেদিন, যেদিন এক কয়েদী হিসাবে হাসান আসবে, আর জল্লাদের দায়িত্ব দেব সোহেলকে। মাহবানু আমায় প্রতিশ্রুতি দাও, মাদায়েন পৌছে সোহেলের সামনে হাসানের প্রসঙ্গ তুলবে না।'

ঃ 'এই শর্তে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যতদিন সোহেল আমাদের আশ্রয়ে থাকবে, তার উপর আপনি কঠোর হবেন না।'

ঃ 'আমাদের ধোকা দিতে হাসান যদি আমাদের গাঁয়ের লোকদের বুকের সাথে বুক লাগাতে পারে, তার ভাইয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতে কোন কষ্ট হবে না আমার।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তার কাছে হাসানের প্রসংগ আমি তুলব না।'

ঃ 'একথাও বলতে পারবে না, হাসান বেঁচে আছে, আর ও এসেছিল আমাদের ঘরে।'

ঃ 'একথাও তাকে আমি বলব না।'

খানিক নীরব থেকে মিয়ানদাদ বললঃ 'মরে গেছে সোহেলের ভাই, বেঁচে আছে কেবল আমাদের দুশমন।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, আমি ভাবছি, আব্বাজান যদি বেঁচে থাকতেন, কি বলতেন এসব কথা শুনে?'

ঃ 'অত ভাবনার দরকার নেই তোমার। আব্বাজানের রুহের ডাক আমি শুনছি। তিনি বলছেন, তুমি যদি আমার বেটা হয়ে থাক, হাসানকে ক্ষমা করো না।'

ঃ 'কিন্তু ভাইজান, তীর ছুড়তে আপনাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। উঠার পূর্বে বলতে চাইছিলেন কিছু, নিজের চোখে আমি দেখেছি, ঠোঁট তার নড়ছে কিন্তু রুদ্ধ হয়েছিল তার জবান।'

ঃ 'হাসান আমাদের ধাওয়া না করলে এ বিপদ আসতো না তাঁর। তিনি মুসলমানদের প্রতিশোধ থেকে বাঁচাতে আমায় তীর ছুড়তে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তাঁরও এ খেয়াল এসেছিল যে, সোহেলের কারণে ও আমাদের হামলা করবে না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হয়ত তিনি ভাবছিলেন আমাদের ঘরে যাকে আশ্রয় দিয়েছি, এত

নীচ সে হতে পারবে না। মৃত্যুর সময় তার সবচেয়ে বড়ো এবং সর্বশেষ বেদনা ছিল, জাহাদাদের দোস্ত– যাকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করতেন, মুসলমানদের লশকর নিয়ে দখল করতে এসেছে আমাদের গ্রাম।'

মিয়ানদাদ বোনকে নিয়ে মাদায়েন পৌছল চতুর্থ দিনে। দজলার পারে উপশহরে ছিল তার বাড়ী। একদিকে দেউড়ী সংলগ্ন প্রশস্ত আস্তাবল, অন্যদিকে চাকর-বাকরদের কামরা। আরেক দিকে ছিল বিরাট দালান, যা মেহমানখানার কাজ দিত। এক গোলাম তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরল। সোহেলের কথা জিজ্ঞেস করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'সকালেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে ও।' জওয়াব দিল গোলাম। 'এখনো ফেরেনি। সে বলছিল আজ ফৌজি খেলার প্রতিযোগিতা।'

সঙ্গী গোলামদের মিয়ানদাদ বললঃ 'তোমরা ঘোড়াগুলো আস্তাবলে বেঁধে রাখো। কিন্তু আমার ঘোড়ার জীন খোলার প্রয়োজন নেই।'

বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করল ওরা। সংকীর্ণ আঙ্গিনার সামনে এক বারান্দা। তার পেছনে তিনটি কামরা।

ঃ 'মাহবানু এ আমাদের নতুন ঘর। এবার তুমি বিশ্রাম করো, কিছুক্ষণের জন্য ফৌজি ছাউনীর দিকে যাচ্ছি আমি। আমাদের অধিকাংশ প্রতিবেশীই ফৌজী অফিসার। আজ অনেক মহিলারা আসবেন তোমার কাছে।'

বেরিয়ে গেল মিয়ানদাদ। বারান্দায় সাজিয়ে রাখা এক চেয়ারে বসল মাহবানু। একটু পরেই ফিরে এল মিয়ানদাদ। আঙ্গিনায় পা রেখে উচ্চস্বরে বললঃ 'এদিকে এসো মাহবানু, তোমায় একটা তামাশা দেখাবো।'

মাহবানু দ্রুত এগিয়ে গেল।

ঃ 'কি ব্যাপার ভাইজান?'

ঃ 'একটু বাইরে এসে দেখ।'

মিয়ানদাদের সাথে দেউড়ীর বাইরে এল ও। প্রায় শ' খানেক উচ্ছসিত তরুণের মিছিল। শ্লোগান তুলে এগিয়ে যাচ্ছে সড়কের ডানপাশ ধরে। সবার আগে ঘোড়ায় সওয়ার এক কিশোর।

ঃ 'ও কে?'

ঃ 'এখুনি জানতে পারবে।'

মিছিলটা বাড়ীর দিকে ফিরলে মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, ওকে সোহেলের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু এ মিছিলের কারণটাতো আমি বুঝিনি? ছেলেগুলো তো আবার ওর সাথে ঠাট্টা করছে না?'

ঃ 'মাদায়েনের ছেলেরা সোহেলের সাথে বিদ্রুপ করতে সাহস পাবে না। ওকে

দেখে মনে হচ্ছে কোন বড়ো একটা কাজ করে এসেছে।'

আচানক তাদের দেখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল সোহেল। এগিয়ে এল মিয়ানদাদ আর মাহবানুর সামনে। ওর দৃষ্টি মিশে যাচ্ছিল মাটির সাথে। লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল ওর চেহারা। থমকে দাঁড়িয়ে গেল মিছিলটা। বিমূঢ়ের মত পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল ওরা। একটু বয়স্ক এক বালক সসংকোচে মিয়ানদাদকে বললঃ 'তীরন্দাজী আর নেযাবাজীতে জিতেছে সোহেল। গতকাল তরবারী চালনা মোকাবিলা করে চারটি বালককে পরাজিত করেছে। জিতেছে ও তহমাসফের সাথেও।'

ঃ 'তহমাসফ কে?'

ঃ 'সে বাহমানের বেটা, লম্বায় আমার চেয়ে খানিকটা উঁচু। এবার ওর শেষ বর্ষ। তেগ চালনায় কেউ ওর মোকাবিলা করতে পারে না। বয়স্ক বালকেরা ঠেলে সোহেলের মোকাবিলায় এনেছে ওকে। সে বলেছিল চোখের পলকে সোহেলকে পরাজিত করব আমি। কিন্তু তার দর্প ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে সোহেল।'

ততোক্ষণে অন্য বালকেরাও জমা হয়ে গেল তাদের চারপাশে। সেদিকে ফিরে মিয়ানদাদ বললঃ 'এবার এসো তোমরা। বিশ্রাম নিতে দাও শ্রান্ত দোস্তকে।'

নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল ওরা।

ঃ 'সোহেল, আমি সিপাহসালারের কাছে যাচ্ছিলাম।' বলল মিয়ানদাদ। 'সড়কে তোমাদের মিছিল দেখে ফিরে এসেছি।'

ঃ 'ভাইজান, এদের আমি নিষেধ করেছি, কিন্তু আমার সাথে আসতে জেদ ধরেছিল ওরা। যদি জানতাম আপনি এসেছেন, ঘোড়া হাকিয়ে একাই ছুটে আসতাম।'

ঃ 'তুমি কোন বড়ো কাজ করবে, মিছিল বের করবে তোমার দোস্তেরা তুমি কি পছন্দ করো না? এবার গিয়ে বোনের সাথে কথা বল। আমি আসছি।'

হাঁটা দিল মিয়ানদাদ। বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাহবানু এবং সোহেল। নীরবে অনেকক্ষণ সোহেলের দিকে তাকিয়ে রইল মাহবানু। এক কদম এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'ভাইজান বলেছিলেন তুমি এখন সোহেলকে চিনতেও পারবে না। সত্যি বেশ ডাগর হয়েছ তুমি?'

ঃ 'আপনি ভাল আছেন?'

ঃ 'আমি দারুণ পরিশ্রান্ত।' বসতে বসতে জওয়াব দিল মাহবানু।

ঃ 'চাচাজী কোথায়? তিনি আসেননি?'

মাথা নত করে ধরা গলায় মাহবানু বললঃ 'বসো সোহেল।'

পেরেশানী নিয়ে সোহেল বসল। মাহবানু খানিকটা ভেবে তার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'সোহেল, আব্বাজান আমাদের কাছে আসবেন না। মাদায়েনের পথেই তিনি আমাদের ত্যাগ করেছেন।'

মাহবানুর আঁখি বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা। স্তম্ভিত সোহেল অনেকক্ষণ

নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল মাহবানুর দিকে। ধীরে ধীরে অশ্রুতে ভরে গেল তার চোখও। আস্তিনে ও ঢেকে নিল নিজের চেহারা।

ঃ 'নিজের ভাইয়ের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না?' একটু চুপ থেকে বলল মাহবানু।

আশান্বিত হয়ে তার দিকে তাকাল সোহেল। আচানক নিরাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল ওর চেহারা। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ও বললঃ 'তাঁর কোন সংবাদ আপনারা পাননি?'

ঃ 'হায়! তার সংবাদ যদি তোমায় দিতে পারতাম! তোমাকে একটু সাবধানে চলতে হবে সোহেল। হয়ত কিছু দিন আমাদের গাঁয়েও যেতে পারবে না।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, ভাইজান যদি বেঁচে থাকেন কোনদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন তিনি। আমরা ওখানে না গেলেও আমাদের কোন গোলামকে অবশ্যই পাঠাবেন আমাদের কাছে। হরমুজের ভয় ছিল তার। শুনেছি সে মরে গেছে, এখন মাদায়েন আসতেও ভাইজান হয়ত ভয় পাবেন না।'

ঃ 'সোহেল, প্রতিশ্রুতি দাও, মিয়ানদাদের সামনে হরমুজের মৃত্যুতে খুশী প্রকাশ করবে না। সে লড়েছে মুসলমানদের সাথে, ইরানের প্রতিটি মানুষ তাকে বাহাদুর হিসেবেই জানে। আমি জানি, তাকে তুমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু মিয়ানদাদ ইরানের সিপাহী। তার দুর্ণাম তিনি সইবেন না। তুমি হয়তো জানো না, মুসলমানরা আমাদের গ্রাম কব্জা করে নিয়েছে, ইজ্জত আব্রু আর জীবন নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে। মুসলমানরা আমাদের পিছু নেয়ার কারণেই আব্বাজানের মৃত্যু হয়েছে। কিশতীতে যখন নদী পেরোচ্ছিলাম, এক অশ্বারোহী নদীর পার পর্যন্ত আমাদের পিছু ছাড়েনি। ভাইজানের প্রথম তীরেই সে আহত হয়েছিল অপর তীরে ভাইজান তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে আব্বাজান বাঁধা দিতে চেষ্টা করলেন। ও বেঁচে গেছে কিন্তু উঠতে গিয়েই পড়ে গেলেন আব্বাজান?'

ঃ 'চাচাজান সে জালেমকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন কেন?'

ঃ 'ও মরে গেলে তার সঙ্গীরা আমাদের জিন্দা রাখবে না এ ভয় আব্বাজানের ছিল। বলতো সোহেল, ইরানী ফৌজ তাকে গ্রেফতার করে তোমার সামনে নিয়ে এলে কি করবে তুমি?'

ঃ 'যদি আমি জানি কে সে? তার বাড়ী কোথায়, তার গ্রেফতারের অপেক্ষা না করেই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বো। তার কেল্লা কতটা মজবুত, তার হিফাজতকারীর সংখ্যা কত এসব পরোয়া আমি করব না।'

দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী খৃষ্টান কবিলাগুলো মনে করত মুসলমানদের অগ্রাভিযান রোধ করার জন্য ইরানী সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাইরাই যথেষ্ট। কিন্তু এ অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে নতুন অবস্থা সম্পর্কে ভাবছিল ওরা। কিসরা এবং উরদুশিরের আমন্ত্রণে সেই সব সরদাররা জমায়েত হল মাদায়েনে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আগ্রহ দেখিয়েছিল। কয়েকদিন পর খবর রটল এরা নিজ নিজ লশকর নিয়ে এগিয়ে আসছে দজলার দিকে। বাহমানের নেতৃত্বে ইরানী ফৌজ আসছে ওদের পেছনে।

অসুস্থ উরদুশীর কিছুদিন পর খবর পেলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ হাফির আর মাযারের মত দজলায়ও ইসলামের বিজয় ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন। বাহমানের পরাজিত সৈন্য জমায়েত হয়েছে দজলার কয়েক মাইল দূরে।

ইরানের খৃষ্টান কবিলাগুলো দজলার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এলিশে জমা হল। ওরা কিসরার কাছে দ্রুত সাহায্য পাঠাবার জন্য আবেদন করল। কিসরা বাহমানকে হুকুম পাঠালেন দেরী না করেই এলিশ পৌছতে। কিন্তু পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া নতুন কোন ময়দানে মোকাবিলায় আসতে প্রস্তুত ছিল না বাহমান। ফৌজের নেতৃত্ব দিল জেনারেল জাবানকে। উরদুশিরের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য নিজে চলে এলেন মাদায়েন। এখানে পৌছে শুনলেন বিপজ্জনক অবস্থায় মোড় নিয়েছে শাহানশাহের অসুস্থতা। তখন ইরানের সেই অধ্যায়, শাসকের মৃত্যুকে মনে করা হত নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি। দেশের কর্তা ব্যক্তিরা সালতানাতের হিফাজতের চেয়ে নিজের আখের গুছানোর ফিকিরেই ব্যস্ত থাকতো বেশী।

মাদায়েনে রয়ে গেল বাহমান। এলিশে পৌছল জাবান। খৃষ্টান ছাউনীর পাশেই ছাউনী ফেললেন তিনি। বাহমানের হুকুম ছাড়া এলিশের সামনে যাওয়ার অনুমতি তার ছিল না। মাদায়েন থেকে কোন পয়গাম এল না কয়েক দিনেও। তবুও জাবান পেরেশান হল না। খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল প্রতিদিন। তার এ শান্তনাও ছিল, বিজিত এলাকাগুলো সংগঠিত করার কাজেই মুসলমানরা ব্যস্ত। তার ধারণা ছিল, বাহমান যখন মাদায়েন গিয়েছেন, কিসরার অসংখ্য ফৌজ নিয়েই ফিরবেন তিনি। কিন্তু একদিন তিনি সংবাদ পেলেন, খালেদ বিন ওয়ালীদ দজলায় আর অপেক্ষা না করে নিজেই এগিয়ে আসছেন এলিশের দিকে। পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই ইসলামের গাজীদের পাঁয়ের নিচে মথিত হল ইরানের ঝান্ডা। ময়দানে লাশের স্তুপ রেখে জাবান এবং তার খৃষ্টান বন্ধুরা পালিয়ে বাঁচলো। মাদায়েনে যখন পৌছল এলিশের পরাজয়ের খবর, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অসুস্থ শাসক।

এলিশের লড়াইয়ের পর জাবান ফোরাত থেকে কয়েক মাইল পিছনে সরে এসে ছাউনী ফেলল এক নদীর ধারে। পরাজিত সিপাইরা ওখানে জমা হয়ে প্রতীক্ষা করতে

লাগল বাহমানের নতুন নির্দেশের। এ নিয়ে তৃতীয় লড়াইয়ে অংশ নিল মিয়ানদাদ। তার সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ জাবান। তাকে এ সুসংবাদও দেয়া হলঃ 'যাদের পদোন্নতির সুপারিশ আমি করেছি, তাদের সবার আগে তোমার নাম।'

পরদিন প্রভাত। মিয়ানদাদের তাবুতে প্রবেশ করল এক সিপাই।

ঃ 'জাবান আপনাকে স্মরণ করেছেন।' বলল সে।

তাড়াতাড়ি জাবানের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল ও। নায়েবে সিপাহসালার এক প্রশস্ত তাবুতে বসা। এক নওজোয়ান দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তাবুতে পা রেখেই যুবককে চিনতে পারল মিয়ানদাদ! আদমান। কিসরার মুহাফিজ ফৌজে মিয়ানদাদের অধীনে ছিল সে। পুরনো বন্ধুরা হাতের ইশারায় অভ্যর্থনা জানাল পরস্পরকে।

ঃ 'তোমরা পরস্পরকে চেন?' জিজ্ঞেস করল জাবান।

ঃ 'জী, মুহাফিজ ফৌজে আমার অফিসার ছিলেন তিনি।' আদমান জওয়াব দিল।

মিয়ানদাদের দিকে ফিরল জাবান।

ঃ 'মিয়ানদাদ, পারভেজের ইচ্ছে শাহানশাহের মুহাফিজ ফৌজে তোমাকে পাঠিয়ে দিই। এখন তাঁর নায়েব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তুমি। তিনি লিখেছেন, নুতন সিপাইদের প্রশিক্ষণের জন্য একজন যোগ্য অফিসারের প্রয়োজন। তোমার সৌভাগ্য যে, তোমাকে এ দায়িত্বের উপযুক্ত মনে করা হয়েছে।'

ঃ 'কিন্তু আমার ধারনা ছিল লড়াই শেষ হওয়ার আগে তিনি আমায় ডেকে পাঠাবেন না।'

ঃ 'আমি জানি, তাঁর সুপারিশেই সিপাহসালার তোমাকে নিজের বাহিনীতে নিয়েছেন। তিনি অনুভব করছেন, মাদায়েনেই এখন তোমার প্রয়োজন বেশী। এ মুহূর্তেই তোমাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যও সিপাহসালার আমাকে তাগিদ দিয়েছেন। তুমি চলে যাচ্ছ বলে আমারও আফসোস হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যেই তোমার কল্যাণ। যুদ্ধের ময়দানে যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলেন পারভেজ তা পূর্ণ হয়েছে। তুমি যে এক অসাধারণ সৈনিক তা তুমি প্রমাণ করেছ। এবার তোমাকে কোন বড়ো পদে দেয়া যেতে পারে। মাদায়েনে এখন কেউ বলতে পারবে না, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে পারভেজ তোমাকে পদোন্নতি দিয়েছেন। আমার মনে হয় মাদায়েনের অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। নইলে সিপাহসালারও এতদিন সেখানে থাকতেন না, আর তোমায়ও ডেকে পাঠাতেন না পারভেজ। তাই আমি চাই অবিলম্বে তুমি রওনা হয়ে যাও।'

সালাম করে আদমানের সাথে বেরিয়ে এল মিয়ানদাদ।

নিজের তাবুতে এসে তাড়াতাড়ি নাস্তা দিতে বলল চাকরকে। তারপর বললঃ 'নাস্তা দিয়ে ঘোড়া প্রস্তুত কর।'

আদমানের কাছে বসে জানতে চাইলঃ 'কি হচ্ছে মাদায়েনে? এতদিন ওখানে কি

করছেন সিপাহসালার? ইমপেশিয়া কব্জা করে হীরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা, অগ্রাভিযানের হুকুম কবে পাবেন, তাও জানে না জাবান। তাহলে শাহানশাহ অসুস্থ, এ গুজব কি সত্যি?'

ঃ 'হ্যা, দারুণ অসুস্থ তিনি। সম্ভবতঃ সিপাহসালার এজন্যেই ওখানে অপেক্ষা করছেন।'

ঃ 'কিন্তু হীরাবাসীকে এ অবস্থায় ত্যাগ করা যায় না।'

ঃ 'হয়ত হীরার চেয়ে মাদায়েনের ফিকিরই তিনি বেশী করছেন।'

ঃ 'এও তো হতে পারে, এ অবস্থায় লশকরকে মাদায়েনের কাছে রাখাই তিনি ভাল মনে করছেন?'

খানিক ভেবে মিয়ানদাদ বললঃ 'আদমান! তুমি আমার দোস্ত। মাদায়েনে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে জানলে আমায় খুলে বলতে পার।'

ঃ 'কোন ষড়যন্ত্রের খবর আমার জানা নেই। কিন্তু শাহানশাহ যেহেতু অসুস্থ, বার বার পরাজিত হচ্ছে ফৌজ, এ অবস্থায় শাহী মহলের চার দেয়ালের ভিতরে সব কিছুই সম্ভব।'

ঃ কিন্তু বাহমান কোন ষড়যন্ত্রে শরীক হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। তিনি একজন সৈনিক।'

ঃ 'হয়তো বিপদে ভরসা করা যেতে পারে ভেবে শাহানশাহ তাকে মাদায়েন রেখে দিয়েছেন। আপনি জানেন, এমন পরিস্থিতিতে কখনো কখনো সালতানাতের ভাগ্য এসে যায় খোঁজাদের হাতে।'

ঃ 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, যতদিন শাহানশার মুহাফিজ লশকর রয়েছে পারভেজের হাতে, মাদায়েনে কোন ঘরোয়া ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে না।'

ঃ 'এ বিশ্বাস আমারও। কিন্তু ....'

ঃ 'কিন্তু কি?'

ঃ 'আপনি জানেন, নিজের সীমা লঙ্ঘন করেন না পারভেজ। তিনি তখ্‌ত এবং তখতে আসীন ব্যক্তির হিফাজত করেন। কিন্তু অসুস্থ শাসক চলে গেলে, তখতের নতুন দাবীদারদের ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করবেন না তিনি। তার বিশ্বস্ততা শুধু তখতে সমাসীন ব্যক্তির জন্যেই, হুকুমতের পরিবর্তনে তাঁর গদি উল্টায় না, মাদায়েনের জনগণ এবং ওমরারা তাকে সমভাবেই সম্মান করে।'

পিতৃবন্ধু আর তার কল্যাণকামী সম্পর্কে এ মন্তব্য পছন্দ হলো না মিয়ানদাদের, আলোচনার বিষয় পাল্টানোর প্রয়োজন অনুভব করল সে।

নাস্তা সারল ওরা। সফরের প্রস্তুতি নিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে আসতেই শোনা গেল লোকদের শোরগোল। এক সিপাই হাঁপাতে হাঁপাতে তাবুতে ঢুকে বললঃ 'জনাব, পাহারাদার সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু সে নাকি আপনাকে

চেনে।'

পেরেশান হয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে এল মিয়ানদাদ। একটু দূরে দেখা গেল সিপাইদের ভীড়। এক বৃদ্ধ ব্যক্তির গলায় রশি লাগিয়ে রেখেছে ওরা। অসহায় বৃদ্ধের মস্তক অবনত। 'কাউস।' বুড়ো গোলামের এ অবস্থা দেখে ব্যথা পেল মিয়ানদাদ। ছুটে সিপাইয়ের মুখে এক ঘুষি মেরে রশি খুলে দিল কাউসের। কাউসের দিকে তাকিয়ে তার চোখ থেকে বেরিয়ে এল অশ্রুর ফোয়ারা। ভয় পেয়ে পিছু হটে গেল সিপাইরা। ভারাক্রান্ত আওয়াজে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমার আফসোস হচ্ছে কাউস!'

ঃ 'বার বার বলেছি আমি আপনার গোলাম। কিন্তু ওরা আমার কথাই শুনল না। মুসলমানদের গোয়েন্দা ভেবে আমায় গ্রেফতার করে ঘোড়াটাও ছিনিয়ে নিয়েছে।'

ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিল যে সেপাই সে এগিয়ে এসে বললঃ 'আমরা দুঃখিত। আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ছাউনীর আশেপাশে দেখলেই গ্রেফতার করার।'

গর্জে উঠল মিয়ানদাদঃ 'খামোশ।'

কাউসের দিক ফিরে বললঃ 'কাউস, জরুরী এক কাজে মাদায়েন যাচ্ছি আমি। তুমি যাবে আমার সাথে?'

ঃ 'জনাব, আগে আমার কথা শুনুন। এরপর নিয়ে চলুন যেখানে খুশী।'

ঃ 'বলো।'

সিপাইদের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করল কাউস। তার হাত ধরে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমার সাথে এসো।'

তাবুর দিকে এগোল ওরা। আদমান বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল এতোক্ষণ, একদিকে সরে গেল সে।

ঃ 'আদমান, এখানেই দাঁড়াও তুমি। এখুনি আমি আসছি।' বলল মিয়ানদাদ।

তাবুতে ঢুকে নিঃশব্দে একে অপরেরর দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। মিয়ানদাদ বললঃ 'কাউস, দুশমন আমাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, অথবা উজাড় করে ফেলেছে বাগান, এ সংবাদ নিয়ে এলে এতটা সংকোচের প্রয়োজন নেই। গাঁয়ের কোন খবর এখন আর আমাকে অস্থির করবে না।'

ঃ 'আপনার ঘরবাড়ি, খামার সব নিরাপদ আছে একথা বলতেই এসেছি আমি।'

ঃ 'তুমি পালিয়ে এসেছ?'

ঃ 'না, হাসান আমায় পাঠিয়েছে। মাদায়েন যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ভাবলাম, হয়ত ফৌজের সাথেই আছেন আপনি।'

ঃ 'হাসানের দূত হয়ে এসেছ তুমি?'

ঃ 'হ্যাঁ, হাসানের পক্ষ থেকে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি, আপনি ফিরে গেলে আপনার জানমাল আর ইজ্জতের জিম্মা সে নেবে। তাদের সিপাহসালারের কাছ থেকে এ

ফরমান এনেছে সে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের সহযোগিতা করলে, আপনার গাঁও থেকে দজলা এবং মাযার পর্যন্ত বিজিত এলাকার দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে। এর পূর্বে আপনার পিতার জন্যও এ ধরণের ফরমান এনেছিল ও। আপনাদের উপকারের বদলা দিতে সে এসেছে। কিন্তু তাকে দুশমন ভেবে কথা বলার সুযোগ দেননি আপনি। কয়েকদিন আগে মুসলমানদের এক বড় সালার এলাকা পরিবদর্শনে এসেছিলেন। স্থানীয় আরব সর্দারেরা আপনাকে ফিরিয়ে নেয়ার দরখাস্ত করেছিল তার কাছে। হরমুজ যখন আরব কৃষকদের উপর জুলুম করেছে, আপনারা তাদের সাহায্য করেছেন শুনে তিনি দারুণ খুশী হয়েছেন।'

ঠোঁট কামড়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'ওদের ইরানের গাদ্দার বানাতে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে হাসান। কিন্তু সে আমায় ধোকা দিতে পারবে না।'

ঃ 'যদি আমার সন্দেহ হত হাসান আপনাকে ধোকা দিচ্ছে, তার দূত হয়ে এখানে আসতাম না আমি।'

ঃ 'তুমি আসল কথাটাই লুকাচ্ছ আমার কাছে, পরিষ্কার করে কেন বলছ না, আমি ফিরে গেলে তার প্রথম দাবী হবে মুসলমানদের দ্বীন আমি কবুল করি এরপর তাদের লশকরে শামিল হয়ে নিজের শাহানশাহ এবং জন্মভূমির বিরুদ্ধে লড়াই করি!'

মাথা নেড়ে কাউস বললঃ 'না, আপনার কাছে এ দাবী করবে না হাসান। তার বিশ্বাস, নিকট থেকে মুসলমানদের দেখলে ইসলাম থেকে আপনি দূরে থাকবেন না। তার কাছে ইসলাম কোন কবিলা অথবা কওমের ধর্ম নয় বরং শাশ্বত সহজ সরল এক পথ। যার মধ্যে বর্ণ অথবা বংশ কৌলিন্যের পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। আমাকে বিদায় দেয়ার সময় সে একথাও বলেছে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন মিয়ানদাদের মত ব্যক্তি মাদায়েনের চৌরাস্তার দাঁড়িয়ে ইসলামের তাবলীগ করবে।'

ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল মিয়ানদাদের। বললঃ 'যদি তুমি আমার পিতার গোলাম না হতে জিন্দা পুতে ফেলতাম মাটিতে। তুমি ফিরে গিয়ে সে দিনের প্রতীক্ষা করো, বিজয়ের নাকাড়া বাজিয়ে যেদিন এগিয়ে যাবে আমাদের ফৌজ। যেদিন ইরানের গাদ্দার আর দুশমনদের লুকানোর কোন পথ থাকবে না। এসো, তোমার ঘোড়া তুমি ফিরে পাবে।'

দরজার দিকে এগোল মিয়ানদাদ। কাউস বললঃ 'দাঁড়ান। আরো কিছু বলতে চাই আমি।'

থেমে গেল ও। খানিক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। কাউস বললঃ 'আমি হাসানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার ভাইকে সাথে নিয়ে ফিরব। সে যদি মাদায়েন থাকে, আমায় সাথে নিয়ে চলুন।'

ঃ 'না।' কঠোর কন্ঠে জবাব দিল মিয়ানদাদ। 'হাসানের ভাই ফিরে যাবে না।'

আশায় বুক বেঁধে কাউস বললঃ 'কোব্বাদের বেটা! আমি আপনার দুশমন নই।

শুনুন, হাসান চমৎকার ব্যবহার করেছে গাঁয়ের লোকদের সাথে। তার ভাইকে আপনি বন্দী করে রাখবেন, ওরা তা ভাল মনে করবে না। আমার মনে হয় তা পছন্দ করবে না মাহবানুও।'

ঃ 'মুসলমানদের গোয়েন্দাকে আমার বোনের সামনে যাবার অনুমতি আমি দেব না। ফিরে গিয়ে হাসানকে বলো, তার ভাই মরে গেছে, তার খোঁজে কোন গোয়েন্দা মাদায়েন পাঠানোর প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'সোহেল মরে গেছে!'

ঃ 'হ্যাঁ। কেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না?'

ঃ 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু হাসান করবে না, তাকে এর কোন সংবাদ আপনি দেননি এবং দেয়া জরুরীও মনে করেননি।'

ঃ 'আমার এ ভুলের সমালোচনা করতে পার, এখন আমার সময় নষ্ট করো না।'

বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে কাউস বললঃ 'সত্যিই সোহেল মরে গেছে?'

তার বাহু ধরে তাবু থেকে বের হতে হতে মিয়ানদাদ বললঃ 'বেকুব, তোমার এ প্রশ্নের জওয়াব একবার দিয়েছি আমি। ঘোড়া থেকে পড়ে ও মারা গেছে।'

অসহায়ের মত মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে গর্দান অবনত করল কাউস।

খানিক পর। তিনজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এল ছাউনী থেকে। মিয়ানদাদ ও আদমান পথ ধরল মাদায়েনের, গাঁয়ের পথ ধরল কাউস। আচানক আদমান প্রশ্ন করলঃ 'ঘোড়া থেকে পড়ে মরে যাওয়া ব্যক্তিটি কে?'

ঃ 'কেউ না।' ধরা আওয়াজে জওয়াব দিল মিয়ানদাদ।

নিশুতি রাত। মাদায়েনে প্রবেশ করেই উরদুশিরের মৃত্যু এবং শাহরিয়ারের সিংহাসন দখলের খবর পেল মিয়ানদাদ। পারভেজের বাড়ীর পথ ধরল ও প্রভাতেই। সালতানাতের পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়া কম লোকই অফিসের সময় ছাড়া পারভেজের সাথে মোলাকাত করতে পারত। ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য যারা প্রভাবশালী ওমরা অথবা দোস্তের সন্ধান করতো, তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। আঞ্চলিক অথবা গোত্রীয় ষড়যন্ত্রকারীরা তার সাথে আলাপ করে বুঝত, এই প্রবীণ লোকটির মুহাফিজ ফৌজের অফিসার ও সিপাইদের বেতন ছাড়া আর কিছুতেই আকর্ষণ নেই। নদীর ওপারে মুহাফিজ ফৌজের ছাউনীতে ছিল তার সরকারী অফিস। লোকদের প্রতি তার নির্দেশ ছিল, যারা অপ্রয়োজনীয় মোলাকাতের জন্য আসবে তাদের দেখাবে অফিসের পথ।

কিন্তু মিয়ানদাদের জন্য সর্বদাই তার ঘরের দুয়ার ছিল উন্মুক্ত। মুহাফিজ ফৌজের সাধারণ অফিসারদের মধ্যে সম্ভবত সে-ই প্রথম, মেহমান হিসাবে যে ছিল

পারভেজের ঘরে। এক বুড়ো গোলাম, স্ত্রী এবং কন্যা ছাড়া ঘরের আর কারো সাহস হতো না তার সাথে কথা বলার। বুড়ো গোলামের নাম কাফুর। অবসর সময়ে তার সাথে দাবা খেলতেন তিনি। খাদেমা ছিল ফেরদৌসী।

এ ফেরদৌসীরই কন্যা নিলুফার। উজ্জ্বল গায়ের রঙ। মিয়ানদাদ পিতার চিঠি নিয়ে প্রথম যখন এসেছিল, এ সুন্দরী মেয়েটির বয়স ছিল ষোলর কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ছিল নিটোল ও ভরাট। তার ছন্দময় চেহারায় সারাক্ষণ লেগে থাকত হৃদয়কাড়া মুচকি হাসি। প্রথম দিকে ও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো মিয়ানদাদকে। ধীরে ধীরে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হলো আকর্ষণ। তবুয়ো দু'জনার মাঝে বাঁধার প্রাচীর হয়ে রইল বংশ কৌলীন্য।

একদিন সন্ধ্যা। বাইরে থেকে ফিরে এল মিয়ানদাদ। ফেরদৌসী আর তার কন্যা পায়চারী করছিল পাইন বাগানে। কোন ভূমিকা ছাড়াই ও বললঃ 'আমি বাসা পেয়েছি, চলে যাচ্ছি কালই।'

উদাসীনতায় ছেয়ে গেল নিলুফারের চেহারা। মিয়ানদাদ খানিক নীরব থেকে বললঃ 'নিলুফার, আমার বোন যখন আসবে, তার একজন বান্ধবীর প্রয়োজন হবে এখানে।'

খুশীতে ভরে উঠল নিলুফারের চেহারা। বলল ঃ 'প্রতিদিন তার কাছে আমি যাব। মুনীব অনুমতি দিলে তাকে নিয়ে ভ্রমণ করব গোটা শহর। আপনি জানেন, ইস্পাহানে আমার এক সখী আছে। ও এলে তার সাথে মিশেও আপনার বোন আনন্দিত হবেন।'

ঃ 'কে সে?'

ঃ 'তার নাম ইয়াসমীন। আমরা তাকে শাহজাদী বলে ডাকি।'

ঃ 'বেটা, ইয়াসমীন আমাদের মুনীবের নাতনী।' বলল ফেরদৌসী। 'ওর মায়ের মৃত্যুর সময় ও ছিল চার মাসের শিশু। আমি দুধ পান করিয়েছি তাকে। নিলুর চেয়ে দু'মাসের বড় ও।'

নিলুফার জিজ্ঞেস করলঃ 'আপনার বোন কবে আসবেন?'

ঃ 'খুব শীগগীরই নিয়ে আসার চেষ্টা করবো।'

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর পারভেজের ঘরে পা রাখছিল মিয়ানদাদ। অথচ তার মনে হচ্ছিল, এতকাল এখানেই ছিল সে। পাইন বাগানের গোলাপ কুঞ্জ পেরোতে এক তরুনীকে দেখল মিয়ানদাদ। নুয়ে ফুল তুলছিল ও, মুখটা অন্য দিকে। থেমে গেল মিয়ানদাদ। আলতো পায়ে তার কাছে গিয়ে ডাকলোঃ 'নিলু!'

চমকে মিয়ানদাদের দিকে চাইল তরুণী। হঠাৎ ভুল ভাঙল ওর। তরুণীর রূপ ও যৌবন ছিল নিলুফারের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। দুধ আলতা মেশানো চেহারার

রঙ। চুলগুলো অনেকটা স্বর্ণাভ। লম্বায়ও নিলুফারের চেয়ে খানিকটা উঁচু। সংকোচে এক কদম পিছিয়ে গেল মিয়ানদাদ। মাথা নত করে বললঃ 'মাফ করুন। ভেবেছিলাম আপনি নিলুফার।'

সহসা তরুণীর উৎকণ্ঠিতভাব কেটে গেল। ক্রোধে বিবর্ণ চোখ দুটো ছলকে উঠল অনাবিল হাসির আভায়।

ঃ 'নিলুফার, নীলুফার, কে যেন তোমায় ডাকছেন।' উচ্চ স্বরে ডাকল ও।

সামনের বারান্দায় দেখা গেল নীলুফারকে। মিয়ানদাদকে সামনে দেখেই বিনম্র লাজে এগিয়ে এল। বললঃ 'ইয়াসমীন, এ হচ্ছে মিয়ানদাদ, মাহবানুর ভাই।'

ঃ 'আমি তোমাদের মনিবের সাথে দেখা করতে চাই।'

ঃ 'আপনি তশরীফ রাখুন। আমি তাকে সংবাদ দিচ্ছি।'

নীলুফার হাঁটা দিল বাড়ীর দিকে। মিয়ানদাদ তাকে অনুসরণ করল।

মোলাকাতের কামরায় পারভেজের সামনে মিয়ানদাদ উপবিষ্ট। অনেকক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পারভেজ। বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, আমার মনে হয় ফিরে এসে তুমি খুশী হওনি। একজন সিপাই যুদ্ধের ময়দানেই তার যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তুমি আমায় নিরাশ করোনি, এ জন্য আমি খুশী হয়েছি। এখানেই তোমাকে আমার প্রয়োজন। শাহানশাহ উরদুশির বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহাফিজ ফৌজের সংখ্যা বাড়াতে চাইলেন। দশ হাজার সিপাই নতুন ভর্তি করার ফয়সালাও করেছি আমি। ওদের প্রশিক্ষণের জন্য তোমার দরকার। উরদুশির চলে গেছেন। মুহাফিজ ফৌজ বৃদ্ধির ব্যাপারে নতুন শাহানশাহর কি ধারণা, তা এখনো জানি না। তবুও আমার নায়েব হিসাবেই তুমি কাজ করবে।'

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে জওয়াব দিল মিয়ানদাদঃ 'আপনি আমাকে কোন জিম্মা বহনের যোগ্য মনে করেন, এরচেয়ে খুশীর খবর আর কি হতে পারে!'

ঃ 'কালই তুমি আমার অফিসে যেও। ওখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবে।'

মিয়ানদাদ উঠে দাঁড়াল, কিন্তু পারভেজের হাতের ইশারায় বসে পড়ল আবার। তালি বাজালেন পারভেজ। কামরায় ঢুকল কাফুর।

ঃ 'কাফুর, সরুশ আর ইয়াসমীনকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

ফিরে গেল কাফুর। একটু পর মিয়ানদাদের গোলাপ কুঞ্জে দেখা তরুণী চল্লিশোর্ধ এক সুদর্শন ব্যক্তির সাথে প্রবেশ করল কামরায়।

ঃ 'মিয়ানদাদ, এ আমার জামাতা ও তার মেয়ে।' বললেন পারভেজ। মিয়ানদাদ উঠে উষ্ণ আবেগে মোসাফেহা করল। সরুশকে লক্ষ্য করে পারভেজ বললেঃ 'মিয়ানদাদের পিতা ছিলেন আমার দোস্ত।'

ঃ 'আমি অনেক কিছুই শুনেছি তোমার ব্যাপারে।' বললেন সরুশ। 'ফিরোজ বলেছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কয়েকটা লড়াইতেই তুমি অংশ নিয়েছে এবং এখন

সোজা যুদ্ধের ময়দান থেকে এসেছ। মুসলমানরা হীরার দিকে এগিয়ে আসছে আর জাবানের লশকর হীরার কয়েক মঞ্জিল দূরে ছাউনী ফেলে বাহমানের নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে– এ কথা কি সত্যি? বাহমানের সাথে এখনো দেখা করার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু ফৌজের যে সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মাদায়েনে আমার আলাপ হয়েছে তাতে বুঝলাম, হীরার ব্যাপারে বাহমান দারুণ নিশ্চিন্ত। তার শান্তনার কারণ হয়তো তুমি বলতে পারবে।'

ঃ 'বাহমানের কর্তব্যবোধে আপনি ভরসা রাখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, দুশমনকে হীরার দিকে এগিয়ে যাবার মওকা তিনি দেবেন না।'

পারভেজ বলে উঠলেনঃ 'হীরার দিকে মুসলমানদের এগিয়ে যাবার ইরাদা পুরণ হয়ে গেছে। এখন তোমার জিজ্ঞেস করা দরকার, হীরার পর ওদের পরবর্তী মনজিল অথবা পরবর্তী ময়দান কি– বাহমান যেখানে সিপাহী সুলভ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করবেন।'

এর পর সরুশ ও ইয়াসমীনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তোমরা মুসলমানদের লশকর এবং তাদের সিপাহসালারের কাহিনী শোনার জন্যে বেকারার ছিলে। আমার বিশ্বাস, মিয়ানদাদ তোমাদের মনের সাধ অনেকটাই পুরণ করতে পারবে।'

ঃ 'যুগ যুগ ধরে আমরা রোমের মত প্রচন্ড শক্তির মোকাবিলা করেছি। আমাদের সালার এবং সিপাইরা সংগঠিত লড়াইয়ের সব পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু ইরাকে আমাদের ফৌজ সে সব মরুচারীদের হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছে, যাদের অতীত গোত্রীয় লড়াইয়েই সীমবন্ধ ছিল। যদি শোনতাম, ওরা আচানক হামলা করে সীমান্তবর্তী কোন চৌকির মুহাফেজদের হত্যা করেছে, অথবা আমাদের গাফলতির সুযোগে কোন বস্তি কব্জা করে নিয়েছে, তাহলে এতটা তাজ্জব হতাম না। আমি বুঝতে পারছি না, আরবের বিচ্ছিন্ন কবিলাগুলো হঠাৎ এক হয়ে যবরদস্ত এক ফৌজি শক্তির মালিক হয়ে গেল কী করে? যুগ যুগ থেকে নিয়মিত লড়াইয়ের যে সব তরিকা পদ্ধতি আমরা আয়ত্ব করেছি, অল্প কদিনের মধ্যেই ওরা তা হাসিল করলো কেমন করে?'

ঃ 'আরবদের এ পটপরিবর্তন এ যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মোজেযা। ওদের ময়দানে দেখলে মনে হয়, লড়াই তাদের জন্য খেলার সমতুল্য। প্রথম দিকে আমি ভাবতাম, কোন অভিজ্ঞ ইরানী অথবা রোমান সালার ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এখন আমাদের চরম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জেনারেলও অকপটে স্বীকার করবেন, ইরানের মোকাবেলায় এক নতুন সালাতানাত, নতুন কওম ময়দানে এসেছে। যুদ্ধ জয়ের এমন সব পদ্ধতি ওরা জানে, যা আমরা জানতাম না। ওদের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য কোন ময়দান নির্বাচন করলে আমরা সবসময়ই ভাবি, জয়পরাজয়ের সম্ভাবনা কদ্দুর। বিশ হাজার সিপাই যথেষ্ট হলেও, চল্লিশ হাজার জমায়েত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সালাররা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কিন্তু কোন ময়দানের দিকে যাত্রা করতে মুসলমানরা মোটেও ভাবে না ওদের সংখ্যা কত। তাদের প্রতিটি সিপাই নিজস্ব দৃঢ়তা আর একীনকে

বিজয়ের জামানত মনে করে। ময়দানে ওদের আবেগ উচ্ছ্বাসে মেলার ভেড়া বকরীর মত দিশেহারা পাগলামী থাকে না, বরং মনে হয়, ওরা অলৌকিক মদদ পুষ্ট, ওদের কোন চালই হাঙ্গামা অথবা চঞ্চলতার ফল নয়। ওদের সাধারণ একজন সিপাই থেকে সিপাহসালার পর্যন্ত একই মন নিয়ে চিন্তা করে। সে তীব্র ঝড়ের মত ওদের গতি, যা বালির স্তূপকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যদি আমায় প্রশ্ন করেন, অমুক ময়দানে আমাদের পরাজয়ের কারণ কি– নির্দ্বিধায় আমি এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারব। কিন্তু আমাদের কোন অভিজ্ঞ জেনারেলও একথা বলতে পারবেন না যে, অমুক ময়দানে কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুসলমানদের সিপাহসালার। খালিদ বিন ওয়ালীদের বিজয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে তার গতি। হঠাৎ কোন নতুন ক্ষেত্রে এগিয়ে এলে আমাদের মনে হয়, সহসা দুরন্ত এক তুফানে আক্রান্ত হয়েছি আমরা। ফৌজের যে অংশকে আমরা যথেষ্ট নিরাপদ মনে করি, ওদের হামলা সাধারণত সেখানেই হয়। আমরা ডান-বাঁয়ের সিপাইদের বাঁচানোর কথা ভাবলে ওরা আমাদের মূল বাহিনীকে উলট পালট করে দেয়। মূলের দিকে নজর করলে আমরা দেখি দুশমনের আকস্মিক বাহিনী পৌঁছে গেছে আমাদের পেছনে।'

ঃ 'খালিদের লশকরের পরিমাণ কত?'

ঃ 'বিশ হাজারের বেশী নয়। কিন্তু ওরা যখন দিগন্তে ধূলির মেঘ সৃষ্টি করে এগিয়ে আসে, মনে হয়, মাটির বুক চিরে কোন নতুন শক্তি বেরিয়ে আসছে। ইরানীদের উপর মুসলমানদের হামলাকে ঠাট্টা মনে করতাম আমি। কিন্তু এখন আর ঠাট্টা মনে করি না।'

ঃ 'সত্যপ্রীতি একজন সৈনিকের বিশেষ সৌন্দর্য।' বললেন পারভেজ। 'কিন্তু মাদায়েনের কোন জলসায় এমন কথা বলো না কিন্তু।'

সরুশ বললঃ 'ইরাকে মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়গুলো দেখেই তুমি ভয় পেয়ে গেছ। আমার ধারনা, ইরানের সাথে মুসলমানদের নিয়মিত লড়াই এখনো শুরুই হয়নি।'

ঃ 'আমি ভয় পাইনি, নিরাশও হইনি। কিন্তু অবশ্যই বলব, ইরানের নেতাদের মনে এখনো এ বিপদের সঠিক ধারণা সৃষ্টি হয়নি।'

ঃ 'তার কারণ, চরম মুহূর্তেও আরবদেরকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিনা। তুমি পেরেশান হয়োনা। ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠতে বেশী সময় লাগবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, ইরাকের হিফাজতকে আমরা ওখানকার স্থানীয় আরবদের সমস্যা মনে করি। কিন্তু যখনই ইরানের আজাদীর উপর হস্তক্ষেপ আসবে, আলবুরুজ থেকে মাকরানের অরণ্য ভূমি পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে সব ইরানী। মরু আরবের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করব আমরা। আমার ইচ্ছে, ইস্পাহান থেকে আমার যে লশকর আসবে, তাদের নেতৃত্ব দেবে তুমি।'

ঃ 'আপনি ইস্পাহানের লশকরের সালার?'

ঃ 'সরুশ ইস্পাহানের রইস আদমী।' জওয়াব দিলেন পারভেজ। 'ত্রিশটা গ্রাম নিয়ে তার জায়গীর। তার নিজস্ব লশকরের পরিমাণ এক হাজারের চেয়ে বেশী। উরদুশিরের দাওয়াতে ও এখানে এসেছিল। কিন্তু ও এখানে পৌছার ঘন্টাখানেক আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন।'

বিদায়ের অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিয়ানদাদ। নানার কানে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল ইয়াসমীন। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে মিয়ানদাদকে বললেনঃ 'ইয়াসমীন তোমার বোনের সাথে দেখা করতে চাইছে, আজ তুমি না এলে কাফুর আর নীলুফারের সাথে ওকে তোমাদের ওখানে পাঠাতাম। তাকেই এখানে নিয়ে আসো না কেন। আরো সপ্তাহখানেক ইয়াসমীন এখানে থাকবে। আমার ইচ্ছে, এ কয়দিন এখানেই থাকুক মাহবানু।'

ঃ 'আমি তাকে এখুনি নিয়ে আসছি। আমার বিশ্বাস, এর সাথে মিশে ও বরং খুশীই হবে।'

মাথা নত করে পারভেজ আর সরুশকে সালাম করল মিয়ানদাদ। একবার চকিতে চাইল ইয়াসমীনের দিকে। আস্তে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল এরপর।

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল নিলুফার। হাতে গোলাপের তোড়া। নিলুফার এগিয়ে ফুলের তোড়া দিতে দিতে বললঃ 'নিন। মাহবানু গোলাপ ফুল খুব পসন্দ করে।'

ফুলের তোড়া হাতে নিতে নিতে মিয়ানদাদ বললঃ 'সে নিজেই তো এখানে আসছে।'

নিলুফার বললঃ 'কবে?'

ঃ 'ওকে আনতেই যাচ্ছি আমি। কয়েকদিন থাকবে এখানে।'

ঃ 'ওকে এখানে রেখে আপনি কি যুদ্ধে চলে যাচ্ছেন?'

ঃ 'না, সম্ভবতঃ কিছুদিন আমাকে মাদায়েন থাকতে হবে।'

নিলুফারের উদাস চেহারায় অকস্মাৎ ফুটে উঠল আনন্দের ফুলঝুরি। তার দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে হাঁটা দিল মিয়ানদাদ। নদীর পারের প্রশস্ত সড়ক দিয়ে এগিয়ে চলছে ও। তার মনে হচ্ছিল এ মিষ্টি মেয়ের ক্ষীণ হাসির রেখা সে রোশনীর সয়লাবে হারিয়ে গেছে, যা দেখেছে ও ইয়াসমীনের চেহারায়।

পনর

মাদায়েনে ইয়াসমীনের অবস্থানের প্রতিটি মুহূর্ত মিয়ানদাদের কাছে মনে হল জিন্দেগীর দূর্লভ পুঁজি। অতীতের আঁধার পথ পেরিয়ে ভবিষ্যতের সে মঞ্জিলের দিকে ছুটে যাবার জন্য ও ছিল বেকারার, যেখানে ঝলমল করছে আশা-আকাংখার সহস্র দীপালী। কিন্তু যে মনোরমা তার স্বপ্নের দুনিয়ায় ছড়িয়েছিল অনাবিল হাসির মুক্তা, সে -

এমন এক ব্যক্তির নাতনী, যাকে সে সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী মনে করে।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত ওর ইয়াসমীনের ভাবনায়। হঠাৎ তার হাসিরজ্জটা আর মেলামেশার কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে উঠত পারভেজের ভাবগম্ভীর চেহারা। মিয়ানদাদের ভবিষ্যতের মনোলোভা মঞ্জিলগুলো তখন হারিয়ে যেতো ভয় আর লজ্জার অনুভূতিতে।

ডিউটি শেষে প্রতিটি সন্ধ্যায় যখন ও নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াতো বার বার থেমে যেতো ওর পা। ইয়াসমীনকে একনজর দেখার এমন প্রবল খায়েশ জাগতো মনে যে, ও যে কখন বাড়ীর পথ ছেড়ে পারভেজের মহলের পথ ধরতো নিজেই টের পেতো না। পারভেজও তাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে, ওখানে গেলে তিনি আর তাকে ছাড়তে চাইতেন না। প্রায়ই খাওয়ার জন্য রেখে দিতেন তাকে। একরাতে খাওয়া শেষে বাড়ী যাবার অনুমতি চাইল ও, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন সরুশঃ 'তুমি দাবা খেলতে পারো?'

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু ভাল খেলোয়াড় নই।'

ঃ 'বসো, আমিও ভাল খেলতে পারি না।'

বসল ও। কিছুক্ষণ ওদের খেলা দেখলেন পারভেজ। এক সময় উঠে চলে গেলেন শোয়ার কামরায়। প্রথম বারে জিতল মিয়ানদাদ, দ্বিতীয় বারে হেরে অনুমতি চাইল ঘরে যাওয়ার। কিন্তু আরো খেলতে চাইলেন সরুশ। ইয়াসমীন এবং মাহবানুও খেলা দেখল কিছুক্ষণ।

ঃ 'চলো বোন, আমরা বিশ্রাম করি।' বলল ইয়াসমীন। 'ওদের খেলা সূর্যোদয় পর্যন্তও শেষ হবে না।'

চলে গেল ওরা। মিয়ানদাদ ও সরুশ ডুবে রইল খেলার মধ্যে। গভীর রাতে খেলা শেষ হল। খেলার শেষ চালে হেরে সরুশ বললঃ 'এখন বাড়ী না গিয়ে এখানেই বিশ্রাম করো।'

ঃ 'না, আমায় অনুমতি দিন। সোহেল আমার জন্য বসে আছে হয়ত।'

ঃ 'সোহেল কে?'

ঃ 'আমাদের এলাকার এক আরব কৃষকের বেটা। তাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করি।'

ঃ 'আমি কল্পনাই করতে পারছি না, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন আরব ইরানীদের দোস্ত হতে পারে।'

ঃ 'তাকে দেখলে আপনি বলবেন না সে আরব। আমি ওকে ফৌজি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। এখন মাদায়েনের কোন বালক তীরন্দাজী, নেযাবাজী এবং তেগ চালনায় তার মোকাবিলা করতে পারে না। তার কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, আরব কৃষক বস্তি নয়– কোন ইরানী রইসের ঘরে বড় হয়েছে ও।'

ঃ 'রোমানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি লড়াইতে আমি শরীক হয়েছি। সিরিয়ার লড়াইয়ে কয়েকটি আরব কবিলা ছিল আমাদের সাথে। তাদের প্রথম দেখার সুযোগ পেয়েছি তখনই। শুরুতে সংগঠিত লড়াইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ওরা ছিল বেখবর। কয়েকটা লড়াইয়ের পর ওরা কিসরা লশকরের উৎকৃষ্ট অংশে পরিণত হয়েছিল। আমি অনুভব করতাম, পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আর ওদের কোন মাকসাদের জন্য একত্রিত করতে পারলে ইরানী অথবা রোমানদের চেয়ে ওরা কোন দিক দিয়েই পিছিয়ে থাকবে না।'

ঃ 'আপনি সে যুগের কথা বলছেন, যখন আরবকে একটা রাষ্ট্র আর আরববাসীকে আমরা একটা কওম হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ওদের মাঝে ছিল কবিলা আর খান্দানের ঘৃণার প্রাচীর। কিন্তু নতুন দ্বীনের ফলে এখন ওখানে অতুলনীয় শক্তি জেগে উঠেছে। ইরাকের সংঘর্ষগুলোতে মুসলমানদের ধৈর্য আর শৃংখলা দেখে মনে হয়েছে, বছরের পর বছর গোপন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের উপর হামলা করেছে ওরা। আমাদের যে ফৌজি অফিসার রোমানদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার ময়দানে লড়াই করেছিল তারা বলেছে, শুধু লুটপাট করার জন্যই আরব কবিলাগুলো আমাদেরকে সংগ দিয়েছিল। বিজয়ের পরপরই ক্ষুধিত পশুর মত সিরিয়ার বস্তিতে, শহরে ঝাপিয়ে পড়েছে ওরা। কিন্তু ইরাকে মুসলমানরা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তার উপমা শুধু আরবই নয় বরং রোম ইরানের অতীত ইতিহাসের পাতা খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। স্থানীয় বাসিন্দারা ওদেরকে তাদের ইজ্জত আব্রুর রক্ষক মনে করে। ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ত পরে জানা যাবে, কিন্তু ইরাক সীমান্তের অধিকাংশ কবিলা নিজেদের কিসমত জুড়ে দিয়েছে ওদের সাথে। ঝড়ের মতই উদ্দাম গতিতে প্রসারিত হচ্ছে ওদের দ্বীন।'

ঃ 'এর কারণ, মুসলমানদের সাফল্য দেখে ওরা সাহস হারিয়ে ফেলেছে। যখনই কোন ময়দানে পরাজিত হবে ওরা, সমগ্র ইরাকে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহের দাবানল। আজ যে সব কবিলাগুলো বিজয়ী বেশে ওদের সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া, ওরাই মুসলমানদের ধাওয়া করতে ইরানী ফৌজের সহযোগিতা করবে।'

ঃ 'একথা হয়তো ঠিক, কিন্তু আফসোস! দুশমনকে আমরা যতটা ছোট করে দেখছি ওরা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বের দাবীদার।'

ঃ 'পেরেশান হয়ো না। আরবের মোকাবিলায় ইরান পিঁপড়ের মোকাবিলায় হাতীর সমতুল্য। আমার বিশ্বাস, অচিরেই শাহানশাহ কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবেন।'

নদীর ধারের প্রশস্ত সড়কে বেরিয়ে এল মিয়ানদাদ। আচানক এগিয়ে এল এক অশ্বারোহী। দ্রুত কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে ডাকলঃ 'ভাইজান?'

ঃ 'কে, সোহেল? কি খবর?'

ঃ 'আপনি অনেক দেরী করে ফেলেছেন, আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

স্নেহ ভরে তার কাঁধে হাত রেখে মিয়ানদাদ বললঃ 'সোহেল, কখনো আমার দেরী হয়ে গেলে তুমি শুয়ে পড়ো।'

ঃ 'যদি জানতাম দেরী হবে তাহলে এত পেরেশান হতাম না। আমার ভয় হল, পথে কোন দুশমন না আবার আপনাকে হামলা করে দিয়েছে।'

হেসে জওয়াব দিল মিয়ানদাদঃ 'মাদায়েনে আমার কোন দুশমন নেই। কখনো দেরী হলে বুঝবে, পারভেজ অথবা কোন দোস্তের কাছে আমি রয়েছি।'

ঃ 'কিন্তু আপনি তো বলতেন, মাদায়েনে দোস্ত দুশমন, আর দুশমন দোস্ত হতে সময় লাগে না।'

ঃ 'হয়ত কোন শাহজাদা অথবা বাদশাহর দোস্তদের ব্যাপারে একথা বলেছি, আমি তো এক মামুলী সিপাই। এবার চলো।'

ঃ 'আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হোন। আমি আপনার পেছনে আসছি।'

ঃ 'না, আমি হেঁটেই যেতে চাই।'

ঃ 'আমিও আপনার সাথে যাবো।'

সোহেল ঘোড়ার লাগাম ধরে অনুসরণ করল মিয়ানদাদের।

ঃ 'ভাইজান, আপা কয়দিন পারভেজের ওখানে থাকবেন?'

ঃ 'চারদিন পর দেশে ফিরে যাবে মেহমান। ও তখন চলে আসবে।'

ঃ 'ভাইয়া, আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেছেন?'

ঃ 'যেমন?'

ঃ আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফৌজি স্কুল পাশ দিলে নিয়মিত ফৌজে আমায় ভর্তি করে দেবেন।'

ঃ 'সে কথা আমার মনে আছে, কিন্তু তুমি এখনো অনেক ছোট। কমপক্ষে আরো এক বছর তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

ঃ 'ততদিনে যদি লড়াই খতম হযে যায়?'

ঃ 'লড়াই খতম হলেও ফৌজে বুদ্ধিমান জওয়ানদের প্রয়োজন খতম হবেনা।'

ঃ 'কিন্তু স্কুলে যে আমার কোন কাজ নেই। ওস্তাদজী বলেছেন, এখন আমার ময়দানী অভিজ্ঞতা দরকার। আমার চেয়ে ছোট এবং কমজোর বালকেরা, যাদেরকে প্রতিটি মোকাবিলায় আমি পরাজিত করেছি, ফৌজে ভর্তি হয়েছে।'

ঃ 'হয়তো বয়সে তোমার চেয়ে বড়। সোহেল লড়াই ভাল জিনিষ নয়। সৈনিক হওয়ার খায়েশে যে বালক ঘর ছেড়ে যায়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হাসিলের পর হামেশাই তার আফসোস থাকে, হায়! যদি এত তাড়াহুড়ো না করতাম! অল্প বয়সী সময়টা যদি কাটাতাম আনন্দ কোলাহলে। ফৌজে ভাল পদ পেতে তোমার বেশী দিন অপেক্ষা

করতে হবে না। মাদায়েন থাকতে যদি খারাপ লাগে, আমি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছি। পারভেজের জামাতা ফিরে যাচ্ছেন চারদিন পর। তাঁর বাড়ী ইস্পাহান। খুবই সুন্দর এলাকা। তিনি যেন তোমাকে সাথে নিয়ে যান সে ব্যবস্থা আমি করব।'

ঃ 'না, না ভাইজান।' আবেগ ঝরে পড়ল সোহেলের কণ্ঠ থেকে। 'দুনিয়াতে কোন শহর আমার কাছে মাদায়েনের চেয়ে সুন্দর নয়।'

ঃ 'তুমি আসলে আমার কথাটাই বোঝনি। সরুশের সাথে তার বেটি যাচ্ছে। সম্ভবত গোলাম ছাড়াও পথে তার হিফাজতের জন্য কতক সিপাহী পাঠাবেন পারভেজ। আমি তাদের বলব, তুমি এক উৎকৃষ্ট সিপাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে।'

ঃ 'ভাইজান।' হৃদয়ের স্পন্দনকে সংযত করে বলল ও, 'আমি খুব ছোট, আমাকে দেখেতো একথা বলবে না ওরা?'

ঃ 'না, আমি যখন বলব তুমি হুশিয়ার, বাহাদুর এবং বিশ্বস্ত নওজোয়ান, তোমার বয়স সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না ওরা।'

সোহেল প্রশ্ন করলঃ 'কাল আপনি ওখানে যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, প্রতিদিন ওখানে যাই আমি।'

ঃ 'আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার কথা ওদের বলতে ভুলে যাবেন নাতো?'

ঃ 'না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যে, ওরা তোমাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছে।'

নীরবে কিছুক্ষণ পথ চলল ওরা।

ঃ 'ভাইজান এখান থেকে ইস্পাহান কত দূরে?'

ঃ 'অনেক দূরে। তোমাদেরকে বেশ কয়েকদিন সফর করতে হবে।'

ঃ 'ইস্পাহানের পথে চোর ডাকাত নিশ্চয়ই আছে?'

ঃ 'সব পথেই চোর ডাকাত থাকে।'

ঃ 'কয়েকটা অতিরিক্ত তূনীরও সাথে নেব আমি।'

ঃ 'কেন?'

ঃ 'ডাকাতদের জন্য।'

ঃ 'সরুশের মত ব্যক্তিকে হামলা করবে না ডাকাতরা।'

ঃ 'এমনও তো হতে পারে, এলাকার কোন সামন্ত প্রভু অথবা কোন শহরের হাকিম তার দুশমন। আর সে ....'

বিরক্তি ভরে মাঝখানে কথা কেটে মিয়ানদাদ বললঃ 'সরুশ শুধু পারভেজের জামাতাই নয় বরং এলাকার খুব বড় নেতা। এক হাজার সিপাই তার জন্য জীবন দিতে সবসময় প্রস্তুত থাকে।'

পথে এ বিষয়ে আর কিছু বলার সাহস হল না সোহেলের। তার ভয় হচ্ছিল, যদি ইস্পাহানের দীর্ঘ পথে সৈনিক সুলভ যোগ্যতা প্রদর্শনের মওকা না পায় ও।

পরদিন। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পারভেজের মহলে পৌছল মিয়ানদাদ। দেউড়ি পেরিয়ে পাইন বাগানে প্রবেশ করল ও। আচানক জয়তুন বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইয়াসমীন। থেমে গেল ও। হতচকিত হয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। মৃদু হাসির ঢেউ তুলে এগিয়ে এল ইয়াসমীন। হঠাৎ দৃষ্টি নত হয়ে এল তার। কণ্ঠে ঈষৎ গাম্ভীর্য এনে ও বললঃ 'সম্ভবত আপনি আপনার বোনকে খুঁজছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ! কোথায় ও?'

ঃ 'নীলুফারের সাথে ঝর্ণার ধারে বসে আছে ও। ডেকে দেবো?'

ঃ 'না থাক, আমি দেখছি।' হাঁটা দিল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আব্বাজান এবং নানাজান তাদের এক দোস্তের বাড়ীতে গেছেন।' বলল ইয়াসমীন। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

থেমে গেলে মিয়ানদাদ।

ঃ 'ইয়াসমীন! ইয়াসমীন!' ভেসে এল নীলুফারের আওয়াজ।

দুষ্টুমীভরা হাসি নিয়ে মিয়ানদাদের দিকে চাইল ইয়াসমীন। ছুটে পালিয়ে গেল বৃক্ষের আড়ালে। আবার ডাকল নীলুফার। বৃক্ষের ঝুকে পড়া ডালপালার মধ্য থেকে ঈষৎ মাথা তুলে মিয়ানদাদের দিকে তাকাল ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে। আবার লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

ঃ 'নীলু! চিৎকার করছ কেন?' মাহবানুর কণ্ঠ। 'ও চলে গেছে হয়ত, চলো।'

চলে গেল ওরা। ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ইয়াসমীন। মিয়ানদাদ বললঃ 'ইয়াসমীন! আর লুকানোর প্রয়োজন নেই, ওরা ফিরে যাচ্ছে।'

থেমে গেল ওর হাসি। সামান্য নীরব থেকে মিয়ানদাদ ডাকলঃ 'ইয়াসমীন!'

কিন্তু জওয়াব এল না। নুয়ে থাকা দু'পাশের ডাল পালার ফাঁকে ফাঁকে এগোল মিয়ানদাদ।

একটু এগুতেই দেখল কয়েক কদম দূরে ঠোঁটে মুচকি হাসি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসমীন। ফিরে যাবে কিনা ভাবল সে, কিন্তু ইয়াসমীনের দৃষ্টির শিকল যেন আটকে দিল ওর পা দুটো। কয়েকটা মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ধুকধুক করতে লাগল ওর হৃদয়। সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেল সামনে। নত হয়ে এল ইয়াসমীনের দৃষ্টি।

ঃ 'ইয়াসমীন।' কোন রকমে উচ্চারণ করল মিয়ানদাদ। 'ভেবেছিলাম লুকিয়ে ঘরে পৌছে গেছ তুমি।'

মাথা তুলল ও। প্রেমের মধুর আবেশে সঙ্কোচিত হয়ে এল ওদের দুনিয়া। এক শব্দহীন অনুভূতি কথা বলছিল দুজনার মধ্যে। ঘুচে গেল অপরিচিতির ব্যবধান।

ঃ 'ভেবেছিলাম ইস্পাহান যাওয়ার পূর্বে আপনাকে বলতে পারব না, আপনার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করব। আব্বাজান বলেছেন, ইস্পাহান যেতে দাওয়াত

দিয়েছেন আপনাকে, আসবেন আপনি?'

মৃদু হাসল মিয়ানদাদ।

ঃ 'এ প্রশ্ন তাদের সামনেও করতে পারতে। আমি অবশ্যই আসব।'

ঃ 'আপনি ভুলে যাবেন না তো!'

ঃ 'তুমি জানো, তোমাকে আমি ভুলতে পারব না। কিন্তু ......'

ঃ 'কিন্তু কি?' পেরেশান হয়ে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'কিছু না, চলো।'

দু'কদম এগিয়ে কম্পিত হাতে তার হাত ধরল ইয়াসমীন।

ঃ 'বলুন, আপনাকে স্মরণ রাখার উপযুক্ত কি নই আমি?'

সংযত হতে চাইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'ইয়াসমীন, পারভেজের নাতনী তুমি। সরুশ তোমার পিতা। আমাদের মাঝে কত দরিয়া, কত পাহাড়ের ব্যবধান। আগামী দিনের দুনিয়ায় তোমার আমার পথ এক হয়ে মিশে যাবে, আমার জন্য এমনটি কল্পনা করাও অন্যায়।'

তার প্রশান্ত বক্ষে মাথা রেখে কম্পিত আওয়াজে ইয়াসমীন বললঃ 'আমি কেবল জানি আপনি আমার।'

মাথায় হাত বুলিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'ইয়াসমীন! ইয়াসমীন! তোমার নানা, তোমার আব্বা কি বলবেন?'

ঃ 'আপনি তাঁদের ভয় পান?'

ঃ 'তুমি তাদের ভয় পাওনা?'

ঃ 'না, আপনারও ভয় পাবার কারণ নেই। আমি জানি ওরা আপনাকে যথেষ্ট ইজ্জত করেন। তাদের কথা আমি শুনেছি।'

ঃ 'ইয়াসমীন!'

তার কাঁধে হাত দিয়ে একদিকে সরিয়ে বলল মিয়ানদাদঃ 'আমি তাদের শোকর গোজারী করছি, ওরা আমায় সম্মানের পাত্র মনে করেন। ধরে নাও হঠাৎ ওরা এখানে এসে আমাদের কথাবার্তা শুনলে কি ভাববেন?'

ঃ 'এতুটুকু বলতে পারি, ওদের দেখলে পালিয়ে যেতে অথবা কুয়ার লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করব না আমি।'

পরাজিত কণ্ঠে বলল মিয়ানদাদঃ 'ইয়াসমীন! তুমি যে এক শাহজাদী। এক লুণ্ঠিত মুসাফির আমি। কুদরতের কোন মোজেযা যদি আমাকে তোমার নানা আর পিতার সামনে অসংকোচে মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করার উপযুক্ত করেন, আমার প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন হবে তোমাকে ঘিরে। এ মুহূর্তে আমার দীলের স্পন্দন বলছে, মিয়ানদাদ, পারভেজের নাতনী বড় অবুঝ, পুষ্পিত সুন্দর, দীলদার। কিন্তু ও তোমার জন্য নয়, তুমি বোকামী করো না মিয়ানদাদ, পালিয়ে যাও। সরুশের বেটি ইস্পাহান পৌছলে মনেও

রাখবে না কে ছিলে তুমি?'

ঃ 'না, আপনার দীলের স্পন্দন বলছে, পালাতে পারবেন না আপনি। বড়ই খতরনাক ছুড়ি ইয়াসমীন, আপনার পিছু ছাড়বে না সে কিছুতেই।'

হেসে উঠলো ইয়াসমীন। তার খিলখিল হাসির ছটায় ঝরে পড়ল প্রেমের পরাগ। বাঙময় হয়ে উঠল কাননের কুসুম কলি।

ঃ 'ইয়াসমীন! ইয়াসমীন!' বাড়ীর দিক থেকে নীলুর কণ্ঠ ভেসে এল।

ঃ 'এ বেকুব মেয়েটা ভেবেছে বাগানে নেকড়ে ঢুকেছে।'

বিরক্তি নাক, মুখ কুঁচকিয়ে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'তুমি যাও ইয়াসমীন।'

ঃ 'আর আপনি?'

ঃ 'আমি ফিরে যাচ্ছি।'

ঃ 'না, নানাজান না আসা পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন না।'

ঃ 'আচ্ছা চলো।'

পা বাড়ালো ওরা। নীলুফার আর মাহবানুর দেখা পেল বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরোতেই।

ইয়াসমীন বললঃ 'নীলুফার, তুমি চিৎকার করছিলে কেন?'

ছুটে এগিয়ে এল নিলুফার। কিন্তু ইয়াসমীনের পিছনে মিয়ানদাদকে দেখে হকচকিয়ে গেল ও। অভিমানের সুরে বললঃ 'আপনি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন?'

ঃ 'নদীতে ঝাপ দিতে গিয়েছিলাম।' হাসতে হাসতে জওয়াব দিল ইয়াসমীন। 'রাস্তা থেকে ও আমায় ধরে এনেছে।'

ঃ 'নীলুফারকে পেরেশান করো না।' এগিয়ে বলল মাহবানু। 'ঘরের প্রতিটি কামরায় তোমাকে খুঁজেছে ও।'

ঃ 'নীলু। সত্যি তুমি পেরেশান ছিলে?'

জওয়াব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল নীলুফার। কিন্তু যখনি ইয়াসমীন এগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, হাসি আর সামাল দিতে পারল না, ফিক করে হেসে দিল।

মোলাকাতের কামরায় ইয়াসমীন আর মাহব্যনর সাথে কথা বলছিল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আরে! একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।' বলল ইয়াসমীন। 'হাসান কে?'

সহসা উন্মুক্ত তরবারী হাতে কোন ডাকাত কামরায় এলেও বোধ হয় এতটা পেরেশান হতো না মিয়ানদাদ আর মাহবানু। দু'ভাইবোনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। এরপর দুজনার দৃষ্টিই আটকে গেল ইয়াসমীনের চেহারায়। মাহবানুকে বলল ইয়াসমীনঃ 'গতরাতে ঘুমের ঘোরে কাকে যেন হাসান, হাসান বলে ডেকেছিলেন আপনি।'

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল মাহবানু। মিয়ানদাদ বললঃ 'হাসান আমাদের নিকৃষ্টতম দুশমন ছিল।'

ঃ 'কিন্তু নিকৃষ্ট দুশমনকে কেউ স্বপ্নে এমন বেকারার হয়ে ডাকে না।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাহবানু। ইয়াসমীন পেরেশান হয়ে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদের দিকে।

ঃ' ও এত হয়রান হবে জানতাম না। আমি তাকে ডেকে আনছি।'

ঃ 'না, না। তুমি বরং বস, আমি যাচ্ছি। এ মুহূর্তে ওকে পেরেশান করা ঠিক হবেনা। তুমি যার নাম নিয়েছ, ওকে মনে করি আমাদের পিতৃহন্তা। সম্ভবত স্বপ্নে তার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছিল ও।'

ঃ 'আমার আফসোস হচ্ছে। হায়! স্বপ্নের কথা যদি তাকে না বলতাম। সে কি বেঁচে আছে?'

ঃ 'আমি জানি না।'

ঃ 'পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেননি বলে কি ও ব্যথিত?'

ঃ 'ও যদি বেঁচে থাকে আমার বোনের বেশীদিন এ আফসোস থাকবে না। আমি যাচ্ছি ওর কাছে।'

মিয়ানদাদ উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পর গিয়ে দাঁড়াল মাহবানুর কক্ষে। মাথা নত করে চেয়ারে বসে আছে ও।

মিয়ানদাদ এগিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বললঃ 'বোনটি আমার, অত পেরেশান হয়ো না। ইয়াসমীন দুষ্টুমী করে ওর প্রসংগ তুলেছিল। হাসান কে, ও তার কি জানে?'

ভাইয়ের দিকে তাকাল মাহবানু। দু'চোখে নেমে এল ওর অশ্রুর নদী। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'তোমার ব্যাপারে ইয়াসমীনের মধ্যে কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়নি। আমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, হাসান ছিল আমাদের নিকৃষ্টতম দুশমন। তোমার সামনে ও কখনো আর তার প্রসংগ তুলবে না। এবার নিচে চলো।'

ঃ 'ভাইজান, আপনি যান, এখুনি আমি আসছি।'

তিন দিন পরের কথা। ভোরবেলা পারভেজের ফটকের সামনে বিশজন সশস্ত্র ব্যক্তি ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সরুশের সাথে ওরা যাচ্ছে ইস্পাহান। সোহেল মিয়ানদাদের সাথে পৌছল পারভেজের মহলে। দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহীর হিফাজতে মালপত্র বোঝাই দশটা উট রওয়ানা হয়ে গেছে ঘন্টা খানেক পূর্বে। ঘোড়া থেকে নেমে এক চাকরের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'সোহেল! এখানেই দাঁড়াও তুমি। এখুনি আমি আসছি। আর শোন, আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, কোন অবস্থায়ই এদের সামনে তোমার ভাইয়ের উল্লেখ করবে না। আর কারো সামনে, বিশেষ-

করে সরুশের বেটির সামনে তোমার অতীত বলার দরকার নেই।'

ঃ 'ভাইজান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নসীহত আমি ভুলব না।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিয়ানদাদ। কয়েক কদম দূরেই দেখা হল পারভেজ আর সরুশের সাথে। তাদের পেছনে আসছে ইয়াসমীন, নীলুফার আর তার পিতা-মাতা। ইয়াসমীন, সরুশ এবং মুহাফিজরা সওয়ার হল ঘোড়ায়। সরুশের সাথে মোসাফেহা করে মিয়ানদাদ বললঃ 'সোহেলকে নিয়ে এসেছি। ইস্পাহান দেখার চেয়ে ও এজন্য বেশী খুশী যে, ফৌজি স্কুলের বাইরে এই প্রথম তাকে কোন দায়িত্ব দেয়া হল। লড়াইতে শরীক হওয়ার জন্য ও বেকারার। গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি পদের জন্য এ বয়স উপযুক্ত নয়, ইস্পাহানের আবহাওয়া ওর গা সওয়া হয়ে গেলে কয়দিন আপনার কাছে থাকবে।'

সোহেলের দিকে তাকিয়ে সরুশ বললেনঃ 'নিজস্ব লশকরের প্রস্তুতির জন্য দু'মাস সময় নিয়েছি আমি। এ সময়ে ওকে উদাস হতে দেব না। শাহানশার ডাক পড়লে ওকে সাথে নিয়েই আমি আসব। মুসলমানদের সাথে এর পূর্বেই যদি লড়াই খতম হয়ে যায় তবে ওকে আকর্ষণ করার অনেক কিছুই ইস্পাহানে রয়েছে। ও যদি ভাল অশ্বারোহী হয়, আমার আস্তাবলে রয়েছে উৎকৃষ্ট ঘোড়া। যদি ও হয় ভাল তীরন্দাজ অথবা নেযাবাজ, আমাদের লশকরে ওর উপযুক্ত কোন পদে দিয়ে দেব। এ অবস্থায় সহসা মাদায়েন ফেরার প্রয়োজন হবে না ওর।'

ইয়াসমীনের দিকে চাইল মিয়ানদাদ, কিন্তু কিছু বলার হিম্মত হলো না। তাকিয়ে রইল ওর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা মৃদু হাসির দিকে। বড় করুণ সে হাসি। চোখে চিকচিক করছিল অশ্রুরাশি। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সরুশ। এগিয়ে চলল ক্ষুদ্র কাফেলা।

ষোল

ফোরাতের তীরে বিখ্যাত বন্দর ইমপেশিয়া। এ বন্দর দখল করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নৌকা চেয়ে নিলেন খালিদ (রাঃ)। কিছু সংখ্যক ফৌজ নিয়ে নদী পথে রওনা করলেন হীরার দিকে। ইরাকের খৃষ্টান কবিলাগুলোর কেন্দ্র ছিল হীরা। ইরানী গভর্ণরের নাম ছিল আজাদবাহ। নদীপথে বেশীদূর যেতে পারেননি খালিদ। হীরাবাসী কয়েক মাইল উপরে নদীর উৎস মুখের বাঁধ থেকে পানি ছেড়ে দিল অন্য দিকে। চড়ায় আটকে গেল নৌকা। কয়েকজন জানবাজকে নিয়ে নৌকা থেকে নেমে এলেন খালিদ। আজাদবাহের ছেলের নেতৃত্বে বাঁধ রক্ষাকারীদের উপর হামলা করলেন তিনি। নিহত হল গভর্ণরের ছেলে। কয়েকটা মৃত দেহ ফেলে বাকীরা পালিয়ে গেল।

বাঁধ খুলে দিয়ে খালিদ (রাঃ) সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন লশকরের কাছে। নৌকা নিয়ে চলে গেলেন খোরনক। নৌকা থেকে নেমে খোরনক এবং নজফ কব্জা করে ছাউনী ফেললেন হীরার সামনে। উরদুশীরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পালিয়ে গেলেন আজাদবাহ। কেল্লার চার দেয়ালের মধ্যে অবস্থান নিল শহরবাসী। খৃষ্টান কবিলার সর্দার এবং গীর্জার পাদ্রীদের এক প্রতিনিধি দল হাজির হলো খালিদের কাছে। সন্ধির শর্ত মেনে কেল্লার ফটক খুলে দিল ওরা।

কেল্লায় প্রবেশ করে সন্ধির শর্তগুলো পুরোপুরি পালন করল মুসলমানরা। এতে প্রভাবিত হল হীরাবাসী। অতীতে দেখা গেছে, বিবাদমান দু'দলের মধ্যে সর্বদাই সন্ধির শর্তাবলী ছিল শক্তিমানের স্বেচ্ছাচারিতা। যা হামেশাই এক পক্ষের খায়েশ পুরণে সহযোগিতা করত। দুর্বল ও নিঃস্বকে বঞ্চিত করা হত দৈহিক এবং আত্মিক স্বাধীনতা থেকে। মানবাধিকারের চুক্তির শব্দগুলো বিজয়ী দল মুছে দিত তরবারীর জোরে।

কিন্তু হীরার চুক্তিতে স্থানীয় লোকদের জানমাল এবং দ্বীন-ধর্মের নিরাপত্তার জিম্মা নিয়েছিল মুসলমানরা। যার ফলে কাগজের যে লেখায় খালিদ (রাঃ) দস্তখত করেছিলেন, তা হল এমন এক ঢাল, যার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীরা অতীতের ভয়াল আঁধার থেকে বেরিয়ে দেখতে পাচ্ছিল আগামী দিনের ঝলমলে আলোর রোশনী। যে পরিমাণ জিযিয়া অথবা কর আদায় হত ওদের কাছ থেকে ইরানী প্রভুদের দেয়া করের তুলনায় তা ছিল অনেক কম। মওকুফ করে দেয়া হয়েছিল গরীব নিঃস্বদের জিযিয়া। দুর্বল, বৃদ্ধ, লাওয়ারিশ আর এতিমদের সাহায্য দেয়া হত মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে। সাহায্য পেত অসহায় জিম্মিরাও।

আইনের চোখে মুসলমান আর জিম্মিদের জানমাল আর ইজ্জতের দাম ছিল সমান। কোন জিম্মি মুসলমানের হাতে নিহত হলে কেসাসের দায়িত্ব নিত সরকার। হুকুমতের কোন দায়িত্বশীল জিম্মিদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলে অযোগ্য মনে করা হত তাকে। ইরানী শোষণের চাকার নিচে শত শত বছর ধরে পিষ্ট হওয়ার পর হীরাবাসী এই প্রথম অনুভব করল, ওরাও মানুষ। মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার ওদেরও রয়েছে।

মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল ওরা। এলাকার ব্যবস্থাপনার জন্য আমীর নিযুক্ত করলেন খালিদ (রাঃ)। বিভিন্ন স্থানে কায়েম করলেন ফৌজি চৌকি। হীরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন কা'কা বিন আমরকে।

আম্বারা জমায়েত হওয়া ইরানী ফৌজের মোকাবেলার জন্য রওনা হলেন তিনি। আম্বারের মুহাফিজরা চরমভাবে বাঁধা দিয়েও হাতিয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হল শেষ পর্যন্ত। খালিদ বিন ওয়ালীদের পরবর্তী মঞ্জিল ছিল আইনুত্তামর। অধিকাংশ বসতি ছিল বনু তাগলুব, নমর এবং আয়াদের বেদুইন কবিলাগুলোর। ফোরাত থেকে শুরু করে সিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়েছিল ওরা। অতীতে এসব যাযাবরদের চারণভূমি রোম ইরানের

মাঝে সীমান্ত হিসেবে কাজ করত। হীরার লখমী এবং সিরিয়ার গাস্‌সানী শাসকদের উৎপীড়নের যুগে কখনো এদের কখনো ওদের সহযোগী হত এরা। যাযাবর বৃত্তির ফলে ইরাক এবং সিরিয়ার সুসভ্য কাইজার ও কিসরার প্রজা কবিলাগুলোর চেয়ে এরা ছিল অনেকটা স্বাধীন।

ইরাকে প্রবেশ করেই আইনুত্তামরে ইরানী লশকরের জমায়েত হওয়ার খবর পেলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। তিনি আরো জানলেন, যাযাবর কবিলাগুলোকে সাথে নিয়েছে মেহরান। এত দূরের ছাউনীতে ইরানী জংগী প্রস্তুতির একটা মাকসাদই হতে পারে যে, মুসলমানরা মাদায়েনের রোখ করলে, আইনুত্তামরে জমায়েত হওয়ার ফৌজ দক্ষিণ পূর্বদিকে এগিয়ে ওদের পেছনে পৌছে যাবে। দজলা ফোরাতের মাঝে কোথাও যখনই শুরু হবে চূড়ান্ত লড়াই, মুসলমানদের জন্য আরব থেকে রসদ আসার পথ রুদ্ধ করে দেবে ওরা।

মুসলমানরা আইনুত্তামরের রোখ করেছে, একদিন আচম্বিত এ খবর পেল মেহরান। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে খালিদের গতিরোধ করার হুকুম দিল সে বেদুইন কবিলাগুলোকে। ইরানী লশকর নিয়ে আইনুত্তামরের কেল্লায় অবস্থান নিল সে। বেদুইনদের নেতা ওকবা বিন আবি ওককা। আরবরাই আরবদের সাথে লড়তে পারে, এ দাবী নিয়ে ময়দানে এল সে। শুরু হল যুদ্ধ। ওকবার অসংখ্য লশকরের অবস্থা হল সে ভেড়ার পালের মত, যারা চারদিক থেকেই নেকড়ের আওতায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার হল ওকবা। ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল তার সঙ্গীরা। বেদুইনদের পরাজিত করে কেল্লা অবরোধ করলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। ইরানীরা কয়েকদিন অবরুদ্ধ থেকে ছেড়ে দিল হাতিয়ার।

আইনুত্তামরের পরাজয়ের সংবাদের পর ইরানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদ আচানক এক অজানা মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সালতানাতের উচ্চপদস্থ ওমরা এবং বড় বড় ফৌজি অফিসারদের মুখে একটাই সওয়াল, কোথায় গেলেন তিনি। খালিদের নেতৃত্বে আইনুত্তামর থেকে বেরিয়ে যাওয়া লশকরের রোখ ছিল দক্ষিণে, কিন্তু দক্ষিণে কিসরার কোন বড় শহর অথবা কেল্লা তো দূরের কথা, এমন কোন বস্তিও ছিল না যা কব্জা করার খায়েশ খালিদের মত সেনাপতিকে আকর্ষণ করতে পারে। ভয়ংকর মরু বিয়াবান ছাড়া কিছুই ছিল না ওখানে।

ইরানের কাছে খালিদ শুধু একজন দৃঢ়চেতা সিপাহসালারই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সে মিল্লাতের মুখপাত্র, আমীর-ফকীরের জগতে যিনি ন্যায়, ইনসাফ আর সাম্যের নিশান উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্যই আইনুত্তামর থেকে তার আকস্মিক অন্তর্ধানে গরীবের ঝুপড়ি থেকে কিসরার প্রাসাদ পর্যন্ত আলোচনার বিষয় ছিল একটাই, দক্ষিণে খালিদের এ অভিযানের লক্ষ্য কি? ইরানের সাথে লড়াই করার সংকল্প ছেড়ে

তিনি কি ফিরে গেছেন? এ কি কোন জংগী চাল, ইরানের জেনারেলদের যা বোধগম্য নয়? মাদায়েনের মত মদিনায়ও কি কোন অভ্যুত্থান হয়েছে? যাতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন তিনি?

ইসলামী লশকরের তৎপরতা অবহিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ইরানী গোয়েন্দাদের শেষ সংবাদ ছিলঃ 'সিরিয়ার বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরের ভয়ংকর বিশালতায় আমরা খালিদের লশকরের গতির সাথে তাল রাখতে পারিনি!'

অজানা মঞ্জিলের দিকে খালিদের পাড়ি জমানোতে মাদায়েনবাসী যেমনি ছিল খুশী তেমনি পেরেশান। কয়দিন পরই ওরা খবর পেল আইনুত্তামর থেকে তিনশো মাইল দূরে দূমাতুল জন্দলে হামলা করেছে খালিদ বিন ওয়ালীদ। সিরিয়ার পথে সে সব মরুচারী বেদুইনদের বস্তি ছিল, যারা গাস্সানীদের অধীন হওয়ার ফলে রোমানদেরও সহযোগী ছিল। ওদের ভৌগলিক এবং ফৌজি গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমানরা ছিলেন পুরো সচেতন।

এ জন্যই তাবুক অভিযানের সময় মহানবী (সা.) দুমাতুল জন্দলে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন খালিদ (রাঃ) কে। মাত্র পাঁচশো জানবাজ নিয়ে ওখানকার খৃষ্টান শাসক ওকিদর বিন আব্দুল মালিককে গ্রেফতার করলেন তিনি। ওকিদর মদিনায় পৌছে ইসলাম কবুল করল। ফিরে পেল হারানো সালতানাত। মহানবীর ওফাতের পর ধর্মত্যাগীদের ফিতনা যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ইসলাম ত্যাগ করল সে। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। হযরত ছিদ্দিকে আকবর যখন ইরাকে পাঠালেন খালিদকে, আয়াজ বিন গনমকে পাঠালেন দুমাতুল জন্দল। রোম ইরান ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উত্তর আরবে এগিয়ে আসার সম্ভাবনাকে নির্মূল করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আকস্মিক বিপদের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও হীরা থেকে আইনুত্তামর হয়ে দুমাতুল জন্দলের মাঝে ছড়িয়ে থাকা খৃষ্টান বেদুইন কবিলাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হতে পারত যে কোন সময়।

এ অবস্থায় উত্তরের আলজেরিয়ার খৃষ্টানদের পক্ষ থেকেও বড় রকমের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। এ সম্ভাবনা নির্মূল করাই ছিল দুমাতুল জন্দলে আয়াজ বিন গনমের আক্রমণের লক্ষ্য। কিন্তু ওখানে পৌছে কেল্লা অবরোধ করতেই যাযাবর কবিলার এক বিশাল বাহিনী ওকিদরের সাহায্যে ছুটে এল ময়দানে। কয়েক মাস ধরে কেল্লা অবরোধ করে রাখলেন আয়াজ। কিন্তু বেদুইন লশকরের কারণে রসদ আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। কেল্লার বাইরে বেদুইনদের হামলা করলে বেরিয়ে আসত কেল্লার ভেতরর ফৌজ, আবার কেল্লার দিকে ফিরলে বাইরের ফৌজ পৌছে যেত পেছনে। কেল্লার অবরোধ ছেড়ে আয়াজ বিন গনম বেদুইনদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এতে হেজায পর্যন্ত মরু আরবের গোটা উত্তর এলাকাই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ত। সৈন্যদের স্বল্পতা আর রসদের ঘাটতিতে দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছিল মুসলমানদের

অবস্থা। তবুও পিছু হটা সঠিক মনে করেননি তিনি।

এ পরিস্থিতিতে দরবারে খিলাফত থেকে দুমাতুল জন্দল পৌছার হুকুম পেলেন খালিদ (রাঃ)। এর সাথে আয়াজের দূত পৌছল তার কাছে। সিরিয়ার মরু প্রান্তরের বিশালতা তার গতির সামনে সংকীর্ণ হয়ে এল। একদিন প্রভাত রবির কিরণ দেখছিল কেল্লার বাইরে বেদুইন কবিলাগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে ইসলামের সিংহরা। যে কেল্লার অবরোধ করে বছর খানেক ধরে মোকাবিলা করছিলেন আয়াজ বিন গনম, দুমাতুল জন্দলের সে বিজয় হল দিনের তৃতীয় প্রহরে।

মাস খানেক দুমাতুল জন্দল অবস্থান করলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। একদিন তিনি সংবাদ পেলেন, আইনুত্তামরের পরাজিত কবিলাগুলো 'হাসিদে' জমা হচ্ছে। ওখানে পৌছেছে ইরানী ফৌজও। মার্চ করে তিনি পৌছলেন আইনুত্তামর। কা'কা বিন আমরের নেতৃত্বে এক লশকর রওনা করিয়ে দিলেন হাসিদের দিকে। কা'কা ইরানী এবং আরব কবিলাগুলো পরাজিত করে কব্জা করলেন হাসিদ। ইরাকী শহর খানাফেসে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করল পরাজিত দুশমন ফৌজ। কিন্তু কা'কার আগমনের সংবাদ পেয়ে পালিয়ে গেল ওরা। ইরানী আর তাদের আরব বন্ধুরা ফসিহতে অবস্থানের চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হলোনা তারা।

বাকী লশকর নিয়ে খালিদ (রাঃ) উত্তর পশ্চিম দিকে রওনা করলেন। ফোরাতের তীর ধরে পৌছলেন ফেরাজে। ফোরাতের ওপারে পূর্ব দিকে ইরান এবং পশ্চিমে রোম সালতানাতের সীমান্তের চৌকিগুলো দেখতো মুসলমানরা। এ চৌকিগুলোর মাঝে সিরিয়া ও ইরাকের সে সব কবিলাগুলোর ছাউনী, অতীত পরাজয়ের আগুন যাদের বুকে জ্বলছিল দাউ দাউ করে। স্বল্প ফৌজ নিয়ে এত বড় লশকরের মোকাবিলা না করে পিছু হটে যাওয়াই ছিল পরিস্থিতির দাবী। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যাকে 'খোদার তরবারী' আখ্যা দিয়েছিলেন সে বিজয়ী বীর, বিজয় অথবা শাহাদাত ছাড়া কোন পথ দেখলেন না। নদীর পারে ছাউনী ফেললেন তিনি।

রোমান সিপাহসালার ইরানী চৌকির মুহাফিজদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান করলে নির্দ্বিধায় সবাই এক হয়ে গেল। এ ঐক্যের ফল হল, খালিদের নাম শুনে যারা আঁতকে উঠত ওরাও সিংহ বনে গেল। রোমান সিপাহসালার কয়েকদিন প্রস্তুতির পর খালিদ (রাঃ)কে পয়গাম পাঠালঃ 'তোমরা নদী পেরিয়ে আসবে? না আমরা আসব?'

ঃ 'তোমরা আমাদের দিকে এগিয়ে এস।' জওয়াব দিলেন খালিদ (রাঃ)।

রোম ইরান আর বেদুইনদের সম্মিলিত বাহিনী নৌকাযোগে নদী পেরোল। ইরানীদের মত রোমান সিপাহসালারেরও ইচ্ছে ছিল, লড়াইয়ের শুরুতে বেদুইন কবিলাগুলো আগে ভাগে থাকুক। তাদের বিশাল ফৌজ শুধু বিজয়ে অংশ নিতে থাকবে ওদের পেছনে। সেনাপতি কবিলার সর্দারদের বললেনঃ 'নিজ নিজ লশকর নিয়ে

আলাদাভাবে ময়দানে এসো তোমরা। প্রত্যেকের বাহাদুরী যেন দেখতে পারি আমরা।'

ভিন্ন ভিন্ন তিন দিক থেকে হামলা করল বেদুইনরা। কিন্তু মুসলমানদের তীরের আওতায় আসতেই থেমে গেল ওদের গতি। নিজ কবিলার লোকদের বিপদের মুখে না ফেলে সর্দাররা অন্য কবিলাকে ঠেলছিল সামনের দিকে। দুশমনের ডানে বামে হামলা করার নির্দেশ দিলেন খালিদ (রাঃ)। চোখের পলকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল দুশমন সারি। কয়েকটা দল ভয়ে পেছনের রোমান এবং ইরানী ফৌজে গিয়ে মিশল। মূল ফৌজের দিকে সরে যেতে লাগল অন্যরা। আচানক মূল বাহিনীতে আঘাত হানলেন খালিদ (রাঃ)। তছনছ হয়ে গেল সরিগুলি। ওদের অগ্রবর্তী বাহিনী পিছিয়ে মিশল রোম ইরানী সঙ্গীদের সাথে, ওদের পেছনে নদী। ডানে, বাঁয়ে আর সামনে মুসলমানদের বেষ্টনী। রোমান আর ইরানীরা সামনে ঠেলছিল আরব কবিলাগুলোকে। কিন্তু ওরা পিছু হটে ময়দান থেকে পালাতে চাচ্ছিল। একদল বেদুইন সঙ্গীদের গালাগাল উপেক্ষা করে রোমান অশ্বারোহীদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল পশ্চিমে।

অন্য লশকর ইরানীদের সারি ভেঙ্গে এগিয়ে গেল পূবের দিকে। মূল বাহিনী ভেদ করে নদী পর্যন্ত পৌছে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। রোমান সিপাহসালার দেখছিল পলায়নপর লশকরের পিছু না নিয়ে সংগঠিত লশকর নিজের অওতায় আনার চেষ্টা করছে মুসলমানরা। জওয়াবী হামলার হুকুম দিল সে। কিন্তু তার আওয়াজ হারিয়ে গেল আল্লাহু আকবরের ধ্বনিতে। 'বিজয়ের মঞ্জিল বেশী দূরে নয়' খালিদের মতো এ একীন নিয়ে লড়ছিল প্রতিটি মুজাহিদ। এখনো দুশমন কয়েকগুণ বেশী। কিন্তু বিজয়ের চেয়ে পালানোর জন্য সিপাহসালারের হুকুমের অপেক্ষা করছিল ইরানীরা। বেশীক্ষণ রোমান সিপাহসালারের হুকুমের অপেক্ষা করতে পারল না, পালাতে লাগল ওরা। জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রইল না রোমানরাও।

নদীর দিকে এগিয়ে যাওয়া সিপাইদের কেউ কেউ নৌকাযোগে পৌছল অপর পারে। কেউ আবার ঘোড়াসহ লাফিয়ে পড়ল নদীতে। বিশাল ময়দানে ছুটে ছুটে আশ্রয় খুঁজছিল অন্যরা। মুসলমানরা ততক্ষণ তাদের পিছু ছাড়ল না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়াগুলো সক্ষম ছিল সওয়ারের বোঝা বইবার। ফেরাজের ময়দানে মাইলের পর মাইল নজরে ভাসছিল শুধু লাশ আর লাশ।

এ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ যেখানে রোম ইরান আর আরবরা এক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এর ফল ছিল সুদুর প্রসারী। মুসলমানদের এ বিজয়ের ফলে নিঃশেষ হয়ে গেল ওদের ঐক্যের ভিত্তি– ভবিষ্যতে যা হত ইসলামের জন্য বড় বিপদের কারণ। খালিদ বিন ওয়ালীদের হাতে পরাজিত হয়ে পরস্পরকে ওরা ভীরু, কাপুরুষ আর গাদ্দার বলে অপবাদ দিচ্ছিল। রোমান ও ইরানীরা পেছনে থেকে মুসলমানদের তলোয়ারের সামনে ঠেলে দিয়েছে ওদের, এ বিষাদে ভরেছিল বেদুইনদের মন। রোমান ও ইরানী সিপাইরা অভিযোগ করছিল যাযাবরদের পিছু হটার কারণে তারা

বাহাদুরী দেখাতে পারেনি। আবার রোমানরা বলছিল, চূড়ান্ত হামলার আগেই ইরানীরা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। ইরানীরা বলছিল, এক রোমান সিপাহসালারের পতাকার নিচে লড়াই করে ভুল করেছি আমরা। মোটকথা ফেরাজের পরাজয় সে দৃঢ়তা আর বিশ্বাসেরই পরাজয়, সিরিয়া ও ইরাকের সীমান্তে তিন দুশমনকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা সাহায্য করেছিল।

প্রভাত। ফজরের নামাজ আদায় করে ইসলামী লশকর হীরার ছাউনীর বাইরে খালিদ বিন ওয়ালীদের বক্তৃতা শুনছিল সবাই।

ঃ 'ইসলামের গাজীরা! তোমরা শুনেছ, দরবারে খিলাফত সিরিয়ার রণক্ষেত্রে পৌছার হুকুম পাঠিয়েছেন আমায়। আমার ইচ্ছে ছিল, নিজের হাতে মাদায়েনে ইসলামের নিশান বুলন্দ করব। কিন্তু খলিফা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমার খিদমতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর হুকুম অমান্য করার কোন সুযোগ নেই আমার। আল্লাহর কাছে দোয়া করো, নতুন অভিযানে আমি যেন তার ইচ্ছা পূরণ করে তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে এসে মিশতে পারি। খলিফার হুকুমে এখানকার অর্ধেক ফৌজ যাবে আমার সাথে। আমি আশা করি, মুসান্নার মত দৃঢ়চেতা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তোমাদের সাহস কমবে না। আল্লাহর পথে যখন পা বাড়াবে, সৈন্য সংখ্যা আথবা সরঞ্জামের আধিক্যের চেয়ে শাহাদাতের তামান্নাকেই খোদায়ী সাহায্যের অধিকারী মনে করো।

আমার প্রিয় দোস্ত, আমার ভাইয়েরা!

মাদায়েন আর দামেশক সে পথেরই মঞ্জিল, যে পথের ছুটে আসা ঝলমলে আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে তোমাদের জীবন। তোমাদের সৌভাগ্য যে, পূর্ব পশ্চিমের জুলুম শোষণের বিশাল দুর্গ ধুলিস্মাৎ করার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্বাচন করেছেন। হকের পথের সেই সব মুসাফির তোমরা, যাদের পায়ের ছাপ আগামী দিনের আদম সন্তানদের জন্য হবে আলোকবর্তিকা। তোমরা সেই কাফেলা, যাদের পথের ধূলায় আগামী দিনের পৃথিবী তালাশ করবে মানবতার মহিমা, ইনসানিয়াতের সৌরভ।

দোয়া করি, আল্লাহ তোমাদের সাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে দিন। তোমাদেরকে দান করুন সেই একীন ও ইচ্ছার দৃঢ়তা, পৃথিবীর সকল বাঁধা অতিক্রম করে যা পৌঁছে যায় মনজিলে মাকসুদে। ভবিষৎ বংশধরেরা যখন অতীতের দিকে তাকাবে, মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে যেন একথা বলতে পারে যে, আমাদের কবিলার অমুক ব্যক্তি ঐ সব সাহসওয়ারদের সংগী ছিল– যারা কাইজার ও কিসরার প্রাসাদে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে যখন শোনব, যে কাফেলাকে ছেড়ে এসেছি ইরাকে, কয়েক মঞ্জিল এগিয়ে গেছে ওরা– এর চেয়ে খোশ কিসমত আমার আর কী হতে পারে! ইরানের ব্যাপারে খলিফা বেখবর নন। আমার একীন, রসদ পাঠাতে দেরী করবেন না তিনি। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। আমীন।'

তিন দিন পর এক নিশুতি রাত। নয় হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিপাই বিদায় নিচ্ছিল সাথীদের কাছ থেকে। কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত প্রাণ প্রিয় নেতাকে এগিয়ে দিলেন মুসান্না। হীরার শস্য শ্যামল এলাকা পেরিয়ে এ লশকর যখন বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরে প্রবেশ করল, ঘোড়া থেকে নেমে আলিংগনাবদ্ধ হলেন দুই নেতা।

ঃ 'মুসান্না!' বললেন খালিদ (রাঃ)। 'আল্লাহ চাহে তো খুব তাড়াতাড়ি আমি ফিরে আসব।'

মুসান্নার চেহারায় ফুটে উঠল এক বেদনা বিধুর হাসি। 'খোদা হাফিজ' বলে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হলেন খালিদ।

একটু পর। এক টিলায় ঘোড়া থামিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদের লশকরের ঝলক দেখছিলেন মুসান্না (রাঃ)। টিলার আড়াল হয়ে গেল কাফেলা। মৃত্যুর বিভীষিকায়ও যে নয়নে থাকে মৃদৃ হাসির আভা, আচানক তা ভরে গেল অশ্রুতে।

এ ছিল ভালবাসা আর মহব্বতের সেই আবেগ যা দুই পুর্ণাংগ মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছিল বন্ধুত্বের এক অনাবিল সম্পর্ক।

মুসলমানদের সাথে রোমানদের নিয়মিত লড়াই শুরু হয়েছে, এ সংবাদ পাবার পর ইরানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল, খালিদ বিন ওয়ালীদ ইরাক ছেড়ে সিরিয়ার রণক্ষেত্রে চলে গেছেন। ইরাকের অর্ধেক ফৌজ ছাড়াও অনেক ট্রেনিংপ্রাপ্ত সালারও সংগে গেছেন তার। এখন স্থলাভিষিক্তের হাতে রয়েছে মাত্র ন'হাজার সিপাই। ইরানীদের বুকে এ আশা জাগল যে, এক সাথে কয়েক সপ্তাহের বেশী দুটো বিশাল সালতানাতের মোকাবিলা মুসলমানরা এখন করতে পারবে না। কিসরা সালতানাতের যেসব ওমরা এবং ফৌজি অফিসার আম্বাজ, এলিশ এবং ফেরাজের পরাজয়ে নিরাশার আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, এবার বিজয় নিশ্চিত ভেবে দেরী না করে দুশমনের উপর হামলা করার জন্য সম্রাটকে মন্ত্রণা দিতে লাগল।

এদিকে ইরাকের যেসব কবিলা মুসলমানদের সাথে নিজেদের ভবিষ্যৎ জুড়ে দিয়েছিল, ভাবল, বাতাসের গতি বদলে গেছে, ইরানী হুকুমত সামান্য তৎপর হলেই মুসলমানদের এ সামান্য লশকর হাতিয়ার ছেড়ে দেবে, আর পিছু হটে মরুপ্রান্তরে আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না ওদের– তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ইরানী দরবারের দিকে।

প্রজাদের সমর্থন হাসিল এবং সালতানাতের ওমরা এবং ধর্মীয় গুরুদের প্রভাবিত করার এর চেয়ে ভাল মওকা ছিলনা শাহরিয়ারের জন্য। গোয়েন্দারা তাকে সংবাদ দিচ্ছিলঃ 'বিপদের গন্ধ পেয়ে মুসলমানরা ছেলে-মেয়েদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। রোমানদের সাথে লড়াই বেঁধে যাওয়ার ফলে মদিনা থেকে মুসান্না কোন সাহায্য পাবে

না।'

ইরানের অভিজ্ঞ জেনারেল হরমুজকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের হুকুম দিলেন তিনি। দুশমনের আগমনের সংবাদ পেয়ে হীরা থেকে বেরিয়ে বাবেলের নিকট ছাউনী ফেললেন মুসান্না। হীরার চেয়ে এ এলাকা ছিল নিরাপদ। বিপদের সময় পেছনের মরুপ্রান্তরে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ ছিল।

দৃঢ়তার সাথে বাবেলের দিকে এগিয়ে এল ইরানী লশকর। ওরা ভেবেছিল নতুন ময়দানে পা রাখার চেষ্টা করবে না মুসান্না।

কয়েক দিন পর। বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি চলছিল মাদায়েনে। কিসরার দরবারে হাজির হল দুত। সে বললঃ 'যে বিশাল লশকরের সিপাহসালার ইরাকী সীমান্ত থেকে মুসলমানদের হাকিয়ে দেয়ার জিম্মা নিয়েছিলেন, পরাজিত হয়েছেন তিনি। ইরানীদের লাশের স্তুপ পড়ে আছে বাবেল ময়দানে।'

শাহানশাহ এবং দরবারীরা হতবাক হয়ে দূতের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। শাহরিয়ার মসনদ থেকে উঠে চলে গেলেন মহলের ভিতরে। দরবারীরা প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলল পেরেশান দূতকে। খানিক পর কসরে শাহী থেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল ওরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত ইরানী লশকরের পরাজয়ের খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। সিপাইদের মতে এ পরাজয়ের কারণ ছিল হরমুজের তাড়াহুড়া। মুজসী জ্যোতিষীরা জনগণকে বুঝাচ্ছিল যে, ইরানের কিসমতের সিতারা হয়ে পড়েছে রাহু গ্রস্ত। বিজয়ের যে ক্ষণভংগুর আশা জেগেছিল তাদের মনে, টুকরো টুকরো হয়ে গেল তা।

ভগ্নহৃদয় শাসক কয়েকদিন অসুস্থ থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মাদায়েনের ভাগ্য বিধাতারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমর্পন করল শাহজাদী দখতে জেনানকে। ওরা ঘোষণা করল, ইরানের আসমান রাহুর প্রভাব মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকদিন পরই ওরা অনুভব করল, এ কমজোর শাহজাদী কিসরার তাজ বহন করতে পারছে না। অপসারণ করা হল শাহজাদীকে। ক্ষমতার দাবীদাররা ছুটে এল ময়দানে। সালতানাদের বড় বড় ওমরারা মেতে উঠল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে।

দখতে জেনানের অপসারণের পর সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে ছিল শাহজাদী আজমেরী বানু। তার রূপ, সৌন্দর্য আর আত্মাভিমানের কাহিনী গোটা ইরানে ছিল মশহুর। তাকে যারা কাছ থেকে দেখেছে তারা জানত, মহলের ভেতরের অধিকাংশ ষড়যন্ত্র জন্ম নেয় তার একটু মুচকি হাসি ও সামান্য চোখের ইশারায়। দখতে জেনানকে অপসারণকারীদের এতটুকু প্রভাব ছিল না যে, দরবারীদের কোন সিদ্ধান্তে বাধ্য করবে। কোন ফয়সালা ছাড়াই মুলতবী হলো ওদের প্রথম বৈঠক। কিসরার মহলে পরদিন আবার জামায়েত হল ওরা।

মাদায়েনের এক প্রবীণ পরামর্শ দিলেনঃ 'ক্ষমতার দুজন দাবীদারের মধ্যে কারো

ব্যাপারেই যদি আমরা একমত না হতে পারি তবে ইরানকে আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে, তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো।'

একজন দরবারী উঠে সমর্থন জানালো এর। শাহী খান্দানের আরেক শাহজাদী পুরান দখতের নাম প্রস্তাব করল সে। শাহজাদী পুরান আজমেরী বানু এবং শাহপুরের চেয়ে বয়সে সামান্য বড়। মহলের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্রই ছিল সে সমান মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তখনই তার নামে প্রস্তাব এল, দরবারীদের একদল যখন শাহপুর অন্যদল আজমেরীর সমর্থনে ময়দানে এগিয়ে এসেছে। এ জন্যই পুরানের প্রস্তাবক জোরালো ভাবে কিছু বলতে পারল না।

দীর্ঘ আলোচনার পরও কোন ফয়সালা না হওয়ায় দবরারীদের মধ্যে সৃষ্টি হল চরম বিতন্ডা। পুরানের কোন একজন সমর্থক বললঃ 'দাবীদার দু'জনের মাঝে পুরানকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে দেয়া হোক।'

আলাপ চলছিল এ নতুন বিষয় নিয়ে। দরবারে প্রবেশ করল ইরানের সিপাহসালার বাহমান। কোন ভূমিকা ছাড়াই সে বললঃ 'সম্মানিত সুধী মন্ডলী! আমি এ বিতর্কে অংশ নিতে চাই না, বরং বলতে চাই, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের শুধু একজন সুলতানই প্রয়োজন নয় বরং এমন এক শাসকের দরকার আপনাদের সবার সাহায্য যিনি পাবেন। এই মাত্র খবর পেলাম, খোরাসানের গভর্ণর ফররুখ যাদ তশরীফ আনছেন। রাতেই পৌছবেন এখানে। তাঁর আসার পূর্বে কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, আমার পরামর্শ হচ্ছে তাকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে নিন।'

কিছুক্ষণের জন্য বিশাল দরবারে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। পেছনের দরজার হালকা পর্দা ঈষৎ সরে গেল হঠাৎ। বিজলীর চুমকি ঝরা দৃষ্টিতে এগিয়ে এলেন আজমেরী বানু। শাহী মসনদের নিকটে এসে তিনি বললেনঃ 'সিপাহসালারের পরামর্শের সাথে আমি একমত।'

শাহজাদা শাহপুর মসনদের পেছনে কয়েকজন উজিরের মাঝে বসেছিলেন। পেরেশানী আর রাগের সাথে আজমেরীর দিকে তাকালেন তিনি। দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'আমিও এ প্রস্তাবের সাথে একমত। আমি চাই ভোর পর্যন্ত এ সভা মুলতবী করে দেয়া হোক।'

একটু পর। বাহমানের বুদ্ধিমত্তা এবং সময়োপযোগী পরামর্শের প্রশংসা করতে করতে যে যার ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। শাহজাদী আজমেরী বানু বাড়ীর অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন পড়ন্ত বিকেলের নৈসর্গিক রূপ। দরজার বাইরে দেয়াল আংটার সাথে পেচানো শিকলে বাঁধা চিতা বাঘের বাচ্চা গভীরভাবে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। রমনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক এ যুবতীর কাজল কালো দু'টি চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল গোস্বা আর ঘৃণার আগুন।

এক খাদেমা ছুটে কামরায় ঢুকে বললঃ 'শাহজাদী! ছিয়াওখশ এসে গেছে।'

ঃ 'তাকে নিয়ে এসো।'

অস্থির হয়ে কামরার ভেতর কয়েকবার চক্কর দিলেন শাহজাদী। জানালার কাছে এক সোফায় বসলেন। কানে মুক্তার বালা, মাথায় হিরকখচিত টুপি পরে কামরায় প্রবেশ করল এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। ঝুঁকে সালাম করে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে।

ঃ 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ ফররুখ যাদকে মধ্যস্থ্য মেনে আমি ভুল করেছি?' বললেন আজমেরী।

ঃ 'না, আপনি ভুল করেননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার জন্য এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু ....'

ঃ 'কিন্তু তোমার সন্দেহ ফররুখ আমায় সমর্থন করবেন না?'

ঃ 'হ্যাঁ, জনতারও এ ধারণা। এ পরিস্থিতিতে ইরানের কিসমত এক নারীর হাতে সোপর্দ করবেন না ফররুখ। এই মাত্র শোনলাম, পুরান শাহপুরের পক্ষে নিজের দাবী প্রত্যাহার করেছেন।'

নিশ্চিন্তে জওয়াব দিল আজমেরীঃ 'এ আমার কাছে কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। ফররুখকে আমার পক্ষে নিতে পারলে পুরানের বিরোধিতার পরোয়া করিনা আমি। শাহপুরের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমস্যা কোন নারী নয়, পেশ করা হবে এক পুরুষের সামনে।'

ঃ 'ফররুখ সম্পর্কে এতটা নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয়। পঞ্চাশেরও বেশী তার বয়স।'

ঃ 'খোরাসানের হাকিম যদি অন্ধ না হয়ে থাকেন, শ্রবণ শক্তি যদি লোপ না পেয়ে থাকে তার, অথবা যদি বৈরাগ্য অবলম্বন না করে থাকেন, তার বয়স নিয়ে তুমি পেরেশান হয়ো না।'

ঃ 'আপনি বলতে চাইছেন ..... আপনি....'

বিরক্ত হয়ে শাহজাদী বললেনঃ 'আমি বলতে চাইছি, কোন ফয়সালা নেয়ার পূর্বে ফররুখ আমায় এক নজর দেখে নিক।'

ঃ 'কিন্তু তিনি সোজা শাহী মেহমানখানায় আসবেন। মাদায়েনের সব ওমরা থাকবে তার সম্বর্ধনার জন্য। হয়তো ওরা সারারাতও তার সাথে কাটাতে পারেন।'

ঃ 'তোমার কথা হচ্ছে, আমার সামনে আসার সুযোগ তার হবে না?'

ঃ 'জী হ্যাঁ।'

ঃ 'আমি ইরানের রাণী হতে পারব না এতে কি তুমি সন্তুষ্ট?'

অভিমানের স্বরে ছিয়াওখশ বললঃ 'আপনি জানেন, আপনাকে ইরানের সিংহাসনে বসানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন, একমাত্র খায়েশ।'

ঃ 'এর জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে তুমি তৈরী?'

ঃ 'আপনার ইশারায় আমি জীবনও দিতে পারি। আপনি জানেন, এ মুহূর্তেও আপনার কাছে আসতে আমাকে ঝুঁকি নিতে হয়েছে। শাহপুর আর পুরানের চর আজ মহলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।'

ঃ 'মহলের দারোগাকে বিশ্বাস করলে গোয়েন্দাদের ব্যাপারে চিন্তা নেই।'

ঃ 'মহলের দারোগা আমার দোস্ত। তবুও এ অবস্থায় কোন ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি হবেন না।'

ঃ 'তিনি পারভেজকে ভয় করেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, তিনি জানেন, মহলের পাহারাদাররা পারভেজের লশকরের মোকাবিলা করতে পারবে না। তিনি যখন আপনার সাফল্য দেখবেন, পারভেজকে তার ঘরে গিয়ে খুন করতেও দ্বিধা করবেন না।'

ঃ 'তুমি যাও। অগ্নিমন্ডপের পূজারীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওগে।'

ঃ 'আমি আপনার হুকুম তামীল করব। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এ পরিস্থিতিতে পূজারী আমাদের কি সহযোগিতা করতে পারে?'

মুচকি হাসল আজমেরী। ঃ 'এ ব্যাপারটা বুঝলে, তুমি হতে কোন প্রদেশের হাকিম।'

ঃ 'দুনিয়ার সব বুদ্ধি আমার মাথায় থাকলেও, শাহী হুকুমতের চেয়ে আপনার গোলামীকেই আমি প্রাধান্য দিতাম।'

সিন্দুক খুলল আজমেরী। এক থলি স্বর্ণ বের করে ছিয়াওখশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললঃ 'পূজারীকে দেবে। বলবে, ইরানের রাণীর এ প্রথম এনাম। সেখান থেকে আমার কাছে তোমার ফিরে আসার দরকার নেই। তোমাকে শুধু এন্দুর বলব, ফররুখ যাদের সাথে আমার প্রথম মোলাকাত হবে অগ্নিমন্ডপে। ইরানের কিসমতের ফয়সালা হয়ে গেলে প্রাণ ভরে ইরানের রাণীর কাছে এনাম নেবে।'

হাঁটু গেড়ে শাহজাদীর আচলে চুমো খেয়ে ছিয়াওখশ বললঃ 'ইরানের রাণীর মুচকি হাসির চেয়ে আর কোন এনাম আমি চাই না।'

গভীর রাত। মাদায়েনের ওমরা এবং শাহী খান্দানের অন্যান্যদের সাথে মোলাকাত শেষ করলেন ফররুখ। শয়ন কক্ষে আসতেই মেহমানখানার খাদেম পূজারীর আগমন সংবাদ জানাল তাকে। সফরের শ্রান্তি আর নিদ্রার আবেশে ফররুখ যাদের অবস্থা ছিল কাহিল। তবুও বৃদ্ধ পুজারীর সাথে দেখা করতে তিনি অস্বীকার করলেন না।

পুজারী কামরায় প্রবেশ করে কোন ভূমিকা ছাড়াই বললঃ 'এ সময় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানো উচিৎ হয়নি। চেহারা বলছে আপনি পরিশ্রান্ত, আরামের প্রয়োজন আপনার।'

ঃ 'আসলেই আমি খুব ক্লান্ত। কিন্তু বিশেষ কোন কথা থাকলে আপনি কুণ্ঠিত

হবেন না।'

ঃ 'এ নাজুক পরিস্থিতিতে আপনার আগমন ইরানের খোশ কিশমতই বলতে হবে। নতুন শাসক নির্ধারণের জিম্মা আপনাকেই ওমরারা সমর্পণ করেছেন। আপনার কাছে এ দরখাস্ত নিয়ে এসেছি, ফয়সালা করার পূর্বে পবিত্র অগ্নির কাছে সাহায্য চাইলে ভাল হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি যখন পবিত্র অগ্নির পূজা সেরে মন্ডপ থেকে বেরিয়ে আসবেন, সব দুশ্চিতা দূর হয়ে যাবে। কারো সাথে পরামর্শেরও আর প্রয়োজন হবে না। মন্ডপের দুয়ার আপনার জন্য খোলা থাকবে সারারাত। ওখানেই আপনার প্রতীক্ষা করব আমি।'

ঃ 'ভোরেই ওখানে পৌছব আমি।' বললেন ফররুখ। কিন্তু কি ভেবে স্বগত কণ্ঠে বললেনঃ 'কিন্তু ভোরে হয়ত চোখই খুলতে পারব না। শোবার পূর্বেই এ পবিত্র কাজ শেষ করলেই কি ভাল হয় না?'

পূজারীর দিকে ফিরে বললেনঃ 'ভোরের অপেক্ষায় না থেকে পুজোর কাজ রাতেই সেরে নিলে কি ভাল হয় না?'

ঃ 'আমার বিশ্বাস এরপর আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারবেন। এখন একাই আপনি ওখানে যেতে পারবেন। সকালে ভীড় থাকবে আপনার সাথে। তখন নিশ্চিন্তে প্রার্থনাও করতে পারবেন না।'

ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আপনি না এলে হয়ত এখনি শুয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন হয়ত শুলেও আর ঘুম আসবে না। আমার মনে আসলেও অনেক দুশ্চিন্তা।'

ঃ 'মন্ডপ খুব কাছে। এক্ষুণি ফিরে আসতে পারবেন।'

ঃ 'চলুন।'

পূজারীর সাথে বেরিয়ে এলেন ফররুখ। হয়রান হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আদবের সাথে কুর্নিশ করে একদিকে সরে গেল পাহারাদার। মন্ডপে প্রবেশ করে কি নিদ্রা কি শ্রান্তি কিছুই অনুভব করতে পারলেন না ফররুখ। কর্পুরের বাতিতে আলোকিত, মেশ্‌ক, আম্বর আর লোবানের খুশবুদার পথে সম্মোহিতের মত পূজারীকে অনুসরণ করলেন ফররুখ। প্রবেশ করলেন মৌ মৌ সুবাসে ভরা আলো-আঁধারীতে পূর্ণ মাঝারি গোছের এক কামরায়। সোনার শিকল ঘেরা পবিত্র আগুনের পাশে থেমে গেলেন পূজারী।

ঃ 'জনাব।' পূজারী বললঃ 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করলাম। এখন আপনি সেখানে উপস্থিত, আমাদের সকল শাসকরা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করার আগে এসে প্রার্থনা করতেন। আমাদের সাসানী প্রভু এবং তাদের সিপাহসালাররা কোন দেশ আক্রমণ করার পূর্বে বুজর্গদের আত্মা থেকে বিজয়ের সুসংবাদ হাসিল করতেন এখানে এসে। আমার বিশ্বাস, এখানে আপনার কোন প্রার্থনা নিষ্ফল হবে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, যতক্ষণ আপনার আত্মা তৃপ্ত না হবে, প্রার্থনা করতে থাকবেন। আমার বিশ্বাস, পবিত্র

অগ্নি থেকে কোন ইশারা অবশ্যই আপনি পাবেন। আপনার একাকিত্বে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি না। এ পবিত্র দায়িত্ব শেষে আমাকে আপনি দরজার বাইরেই পাবেন।'

বৃদ্ধ পূজারীর কথার চাইতে অগ্নি মন্ডপের নির্জন ও ভয়াল পরিবেশে বেশী সম্মোহিত হলেন ফররুখ। পবিত্র আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। আলতো পায়ে বেরিয়ে গেল পূজারী।

দীর্ঘদেহী এ মানুষটির যৌবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে লড়াইয়ের ময়দানে। এখন পড়ন্ত বয়স। মাথার চুল অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে প্রায়। জিন্দেগীতে এই প্রথম অজানা আর না দেখা শক্তির সামনে অনুনয় বিনয় করে এক আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু আগুনের এ আবছা আলো তার হৃদয়ের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারছিল না। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞ হলেন, অলৌকিক কোন ইশারা না পেয়ে উঠবেন না। অনেক্ষণ ধরে প্রার্থনায় রত রইলেন তিনি। বেদীর সম্মোহনী ঘ্রাণ তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগল। তন্দ্রার আবেশে জড়িয়ে এল তার চেতনা। পায়ের মৃদু আওয়াজ আর অস্পষ্ট নুপুর নিক্কন ভেসে এল তার কানে। আস্তে আস্তে সে আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। ক্রমেই যেন তা এগিয়ে আসছে। সহসা থেমে গেল সে আওয়াজ। চমকে মাথা তুললেন তিনি।

সৌন্দর্যের এক অনিন্দ্য মানস প্রতিমায় গেঁথে রইল তার দৃষ্টি। পরণে ওর রেশমী কামিজ। মাথার সোনার তাজে হিরকের চকমকি। কালো কেশের বিন্যাস জড়িয়ে আছে কোমরের নীচ পর্যন্ত। চোখে তার আঁধার রাতের সিতারার মৃদু হাসি। স্বপ্ন আর বাস্তবে তিনি পার্থক্য করতে পারলেন না অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ও যদি বলত, আগুনের লেলিহান শিখায় আমার জন্ম- তিনি বিশ্বাস করতেন। ও পরী নাকি স্বর্গীয় কোন নারী নেমে এসেছে ধরায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

বিজয়িনীর মত এগিয়ে এল ও। তার এক চিলতে মুচকি হাসি সন্দেহের পর্দা সরিয়ে দিল ফররুখের চোখ থেকে।

ঃ 'তুমি ..... তুমি কে?' দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

ঃ 'আমি ইরানের রাণী। সম্ভবতঃ তুমি ফররুখ যাদ। তুমি সেই খোশ নসীব ইনসান, আগামীকাল আমার শিরে সালতানাতের মুকুট পরানোর সৌভাগ্য যে হাসিল করবে।'

ঃ 'তুমি আজমেরী বানু?'

জওয়াব না দিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে ডানদিকে এগিয়ে গেল ও। কয়েক কদম গিয়ে চকিতে ফিরে চাইল। তার চেহারায় লেপ্টে ছিল সেই হাসি- যা দেখলে আপন পথের কথা ভুলে যায় ধ্যানমগ্ন মুনি ও ঋষি।

ঃ 'থামো।' দু'পা এগিয়ে বললেন ফররুখ যাদ। কিন্তু না থেমে হাসতে হাসতে

মন্দিরের পেছন দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

দরজা পর্যন্ত ছুটে গেলেন ফররুখ। মখমলের পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে আসল হৃদয় মাতাল করা হাসির কাকলী। কিছু বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু বাক রুদ্ধ হয়ে গেল তার। ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু এ হৃদয়গ্রাহী হাসি শিকল পরিয়ে দিল তার পায়ে।

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল হাসি। কম্পিত হাতে পর্দা তুললেন তিনি। বাইরের রাস্তার মত অন্দরমুখী এ পথও কর্পূরের আলোয় সজ্জিত। কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মোহিনী নারী।

বিহবল দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেলেন ফররুখ। আবেদন মাখা কণ্ঠে বললেনঃ 'আজমেরী, দাঁড়াও।'

মুখ ফিরিয়ে নিল আজমেরী বানু।

ঃ 'তুমি কি জানতে এ মুহূর্তে আমি এখানে থাকব? পুরোহিত আমার সাথে ঠাট্টা করেছে, এও কি হতে পারে? ইরানের রাণী! একটু আমাকে দেখো। জওয়াব দাও আমায়।'

ঃ 'যদি জানতাম আমায় দেখে এতটা অস্থির হবে, তবে এখানে আসার ভুল করতাম না।'

ঃ 'আজমেরী!' ব্যস্ত হয়ে জওয়াব দিলেন তিনি। 'তুমি কোন ভুল করোনি, আমিও পেরেশান নই।'

ঃ 'কিন্তু তোমার চেহারা বলছে আমাকে দেখে তুমি খুশী হতে পারোনি।'

ঃ 'হায়! আমার হৃদয়ের গভীরে যদি পৌছতে পারতো তোমার দৃষ্টি।'

ঃ 'হৃদয়ের অবস্থা তখনই বোঝা যাবে যখন দরবারে শোনাবে নিজের ফয়সালা।'

ঃ 'দরবারে শুধু আমার বুদ্ধির পরীক্ষা হবে।'

ঃ 'আর তোমার সন্দেহ, তোমার বুদ্ধি তোমার হৃদয়ের সহযোগী হবে না!'

ঃ 'হতে পারে কিন্তু -------'

ঃ 'কিন্তু এখন তোমার হৃদয় আমার সাথে জোড়া!' কথা কেটে আজমেরী বানু বলল।

ঃ 'না, না, এখন কি বলেছি আর কি বলতে চাইছি নিজেই জানি না।'

ঃ 'তুমি আমায় বলেছ, ইরানের রাণী, আগামী দিনের বুদ্ধি যদি আমার হৃদয়ের দুয়ারে তালা না লাগায় তবে ইরানের রাণীর মহলের দুয়ার চিরদিন আমি খোলা দেখতে চাই আমার জন্য। এবার আরাম কর গিয়ে, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

ফররুখ যাদের জওয়াবের অপেক্ষা না করেই হাঁটা দিল আজমেরী বানু। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফররুখ। হঠাৎ ছুটে গিয়ে আজমেরীর হাত চেপে

ধরলেন।

ঃ 'দাঁড়াও আজমেরী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'এ পথ চলে গেছে মহলের অন্দরে। শাহী খান্দানের কোন ব্যক্তি ছাড়া সামনে পা রাখার অনুমতি নেই কারো। তুমি যাও, আমার ভয় হচ্ছে।'

ঃ 'আমাকে?'

ঃ 'না, আমি শুধু দুশমনের গোয়েন্দাকেই ভয় পাচ্ছি। আমরা দুজন এখানে, যদি ওরা জানতে পারে, শাহপুর আর পুরান দখতকে হুশিয়ার করে দেবে। তাহলে ভেস্তে যাবে এর সবই।'

আজমেরীর চেয়ে নিজেকে শান্তনা দেওয়ার জন্য ফররুখ বললেনঃ 'আমায় কেউ সন্দেহ করলে বলব, মন্ডপ থেকে ভুল পথে বেরিয়েছি বুঝতে পারিনি, আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি, তোমার সাথে দেখা হওয়াটা দৈব ঘটনা।'

ঃ 'হয়ত তোমায় ওরা বিশ্বাস করবে, কিন্তু আমাকে নয়।'

হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আজমেরী। থেমে থেমে তিনবার আঘাত করল বন্ধ ফটকে। শিকল খোলার আওয়াজ এল। সাথে সাথে খুলে গেল কবাটের পাল্লা।

ভেতরে পা রেখেই আজমেরী আবার দ্রুত পিছিয়ে এল। ফররুখের দিকে চাইল ভয়ার্ত চোখে। নিজকে সামলানোর চেষ্টা করে বললঃ 'ওরা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের পথে আপনি বেরিয়ে যান।'

কিন্তু একচুলও নড়লেন না ফররুখ। বললেনঃ 'আমি বেঁচে থাকতে ওরা তোমার একটা পশমও নাড়াতে পারবে না।'

ফটক পেরিয়ে এল শাহপুর ও পুরানদখত। তাদের সংগে চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি। ওরা থেমে গেল চৌকাঠ পর্যন্ত এসে। কিছুক্ষণ পেরেশান হয়ে আজমেরী আর ফররুখের দিকে তাকিয়ে রইল শাহপুর ও পুরানদখত। হুকুম দেয়ার ভঙ্গীতে শাহপুর বললঃ 'আজমেরী, যাও তুমি!'

সংকোচ ঝেড়ে ঘাড় তুলে ওদের দিকে তাকালো আজমেরী। পুরানকে লক্ষ্য করে বললঃ 'এখানেও তোমাদের চর আমার অনুসরণ করছে, জানতাম না।'

ঃ 'তোমার লজ্জা থাকা উচিৎ।' রেগে বলল পুরান।

ফররুখ শাহপুরকে বললঃ 'প্রার্থনা করার জন্য এখানে এসেছিলাম আমি। অগ্নিমন্ডপে অন্য কেউ থাকবে আমার জানা ছিল না। আমাকে দেখে ও পালাচ্ছিল। সন্দেহ দূর করার জন্যই শুধু তার পিছু নিয়েছি আমি।'

ঃ 'এখন সন্দেহ দূর হয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, এখন জেনেছি ও শাহজাদী আজমেরী বানু।'

শাহপুর পুরানকে বললঃ 'তুমি আজমেরীকে নিয়ে যাও। আমি এর সাথে কথা বলছি।'

ঃ 'তোমরা যদি আমার ব্যাপারে কোন কথা বল, আমি এখানেই থাকব।' বলল আজমেরী।

ঃ 'না আপনি যান।' ফররুখ বলল। 'আমি জিম্মা নিচ্ছি, আমার সামনে আপনার ব্যাপারে কোন অপমানকর কথা হবে না। পালানোর আগে যদি নিজের নাম বলতেন, তবে আপনার পিছু নিতাম না। এ অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

ঃ 'এসো আজমেরী।' কিছুটা নরম হয়ে বলল পুরান।

তার সাথে বেরিয়ে গেল আজমেরী। সশস্ত্র সিপাইদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল শাহপুর। ফিরে গেল ওরাও।

ফররুখ যাদের দিকে তাকালো শাহপুর।

ঃ 'মহলের অন্দরে আজমেরীর হিফাজত করা হচ্ছে আমার প্রথম জিম্মা। সালতানাতের দাবীতে ও যেহেতু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, এ জিম্মা হয়ে পড়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ। ওর কোন বিপদ এলে ওমরারা আমায় ক্ষমার অযোগ্য মনে করবেন। অনেকক্ষণ যাবৎ ও ঘরে নেই। তাই পুরানকে নিয়ে তার খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

ঃ 'তখতের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার পরও চাচাত বোনের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি রাখেন, এতে আমি খুশী হয়েছি।'

ঃ 'আমার চাচাত বোন যেমনি রূপসী তেমনি অহংকারী। চাটুকার, গোলাম আর খাদেমারা তার দীলে রাণী হবার শখ পয়দা করে থাকলে, এতে আমার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। শাহী মহলের প্রতিটি পরিচারিকার দীলে শাহজাদী আর সব শাহাজাদীর দিলে রাণী হবার শখ থাকে। এ কোন নতুন কথা নয়। আমার আফসোস হচ্ছে, ওর সাথে কথা বলার কোন সুযোগ আপনি পাননি।'

কিছুটা ভেবে নিয়ে ফররুখ বললেনঃ 'আমি জানিনা আগামীকাল আপনার বোনের শিরে ইরানের তাজ পরালে আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করবে। কিন্তু আপনি প্রতিশ্রুতি দিন, কাল আপনি যদি শাসক হোন, তাকে আপনার দুশমন ভাববেন না।'

ঃ 'আমি যদি ইরানের শাসক হই আমার প্রথম কাজ হবে, আজমেরীর জন্য এমন জীবন সঙ্গী খুঁজে বের করা, তার কদর এবং মূল্য যে দিতে জানে। শুধু শাহজাদী হিসেবেই নয় বরং ইরানের সবচেয়ে সুন্দরী হওয়ার কারণেও সে তার এই মর্যাদা পাওয়ার হকদার।'

হৃদয়ের স্পন্দন সংযত করার চেষ্টা করে ফররুখ বললেনঃ 'আপনি সত্যি উদার আর উদারতাই একজন শাসকের জন্য প্রথম শর্ত।'

ফররুখের চেহারায় অর্থবোধক দৃষ্টি ছুড়ে শাহপুর বললেনঃ 'আমার এমন মনে হয়, কুদরত খোরাসানের হাকিমকে ইরানের নতুন সুলতানকে মুকুট পরাতেই নয় বরং শাহজাদী আজমেরীর জিন্দেগীর আশ্রয় হিসেবেও এখানে পাঠিয়েছেন। আমার এ ধারণা যদি ভুল না হয়, ইরানের শাসন ভার হাতে নিয়ে আমার প্রথম ঘোষণাই হবে আমার

চাচাতো বোন খোরাসানের হাকিমের ঘরের অলংকার হতে যাচ্ছে। আমি কি এ আশা করতে পারি, আজমেরীর জীবন সংগী হওয়ার দাওয়াত দিলে আপনি তা অস্বীকার করবেন না? হুকুমত পরিচালনা করার শখ হয়েছে আজমেরীর। সালতানাতের ওজিরে আজমের স্ত্রী হলেই এ শখ পুরা হতে পারে।'

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ফররুখ বললেনঃ 'এর চেয়ে বড় ইজ্জত আমার জন্যে আর কি হতে পারে?'

ঃ 'আমি জানিনা আপনার ব্যাপারে কি ওর মতামত? কিন্তু ওর অভিভাবক হিসাবে কিসরার তখতে বসলেও ওর ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। ওর যথার্থ মর্যাদা দিতে না পারলে ওমরারা ভাববে আমার প্রতিদ্বন্দী ছিল বলে আমি ওর ওপর অবিচার করেছি। আমি এমন অভিযোগ করার সুযোগ কাউকে দিতে পারিনা। আপনি ক্লান্ত, যান, এখন বিশ্রাম করুনগে।'

দুহাতে মোসাফেহা করে ফররুখ বললেনঃ 'আপনাকে একথা বলা জরুরী মনে করছি যে, এখানে আজমেরীর মোলাকাতের আশা করিনি।'

মৃদু হাসল শাহপুর।

ঃ 'আমি জানি মন্ডপের পুরোহিত আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

ঃ 'তার মানে পুরোহিতকে আজমেরীই আমার কাছে পাঠিয়েছিল?'

ঃ 'পুরোহিতের ওপর রাগ করবেন না।' হেসে জওয়াব দিল শাহপুর। 'সে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে শুধু।'

ঃ 'আপনি তাতে রাগ করেননি?'

ঃ 'না, বরং তাকে এনামের অধিকারী মনে করি। সে এ খিদমতের জিম্মা না নিলে, আমাদের মোলাকাতও হতো না।'

ঃ 'তার মানে পুরোহিতের সংবাদ পেয়ে আপনি এখানে এসেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, আজমেরীর সাথে আপনার মোলাকাতের ব্যবস্থা করেই সে আমাকে খবর দিয়েছে। কিন্তু আজমেরীকে এখন একথা জানানো উচিৎ হবে না। তাহলে আজমেরীর দেয়া এনাম থেকে সে বঞ্চিত থাকবে।'

ঃ 'কিন্তু আপনি কিভাবে জানবেন, পুরোহিত আজমেরীর কাছ থেকে এনাম হাসিল করেছে?'

ঃ 'আমি সে থলিও দেখেছি।' মুচকি হেসে জওয়াব দিল শাহপুর।

ঃ 'আজমেরীর চেয়ে দ্বিগুণ পুরস্কার তাকে আমি দিয়েছি। সম্ভবত এ কাজের ফলে আপনিও তাকে এনামের হকদার মনে করবেন।'

বিছানায় শুয়ে এ ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিলেন ফররুখ। আজমেরী বানুর অগনিত ছবি ভেসে উঠছিল তার মনে। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও সেই শিশুটির মতই হল তার

অবস্থা, বিভিন্ন খেলনা দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে যার থলি। আজমেরী তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল, যেমনি ছিল তার এ তিক্ত অনুভূতি, তেমন তিনি আনন্দিত ছিলেন যে, শাহপুরের শিরে মুকুট পরালে তার আশা পুরণ হতে পারে।

প্রভাত। সালতানাতের ওমরারা জমায়েত হতে লাগল কিসরার প্রাসাদে। এ সুরম্য অট্টালিকার প্রধান গম্বুজের বরাবর নিচেই দরবার কক্ষ। দরবারে শোভা পাচ্ছিল সোনার সিংহাসন। সামনের টেবিলে কিসরার তাজ। সিংহাসনের ওপরে ভারী শিকলে ঝুলছে মুক্তা আর হীরা সজ্জিত শামিয়ানা। মনিমানিক্য খচিত ফরাশ বিছানো মেঝেতে। রেশম আর সোনায় মোড়া পর্দায় দেয়াল সাজানো। কার্পেট আর পর্দায় পাহাড়, নদী ও বৃক্ষের অপূর্ব কারুকাজ। সিংহাসনের ডান ও বা'দিকের সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল শাহী খান্দানের শাহজাদা শাহজাদীরা। মঞ্চের নিচে সালতানাতের কর্তা ব্যক্তিরা পদাধিকার বলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট।

উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি সিংহাসনের দুই দাবীদারের প্রতি। সিংহাসনের ডানদিকের একটি আসন শূন্য। তার পাশের আসনে বসে আছে শাহপুর। বা'দিকের প্রথম আসনে পুরান দখ্‌ত। অন্য আসনে আজমেরী বানু।

আজমেরী বানু বিয়ের কণের মত সেজেগুজে চুপচাপ বসেছিল। ওর দিকে যারাই তাকাচ্ছিল, মুচকি হাসির ফুল দিয়ে ওদের সম্ভাষণ জানাচ্ছিল ও। দর্শকরা সঙ্গীদের ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, এ নির্ভীক মেয়ের ওপর থেকে ফররুখ যদি দৃষ্টি সরিয়ে না রাখেন, নিঃসন্দেহে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন তিনি।

দরবারে ঢুকলেন ফররুখ। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন সবাই। সিঁড়িতে পা রাখতেই আচানক তার নজর গেল আজমেরীর দিকে। ক্ষণিকের জন্য থেমে গেলেন তিনি। তারপর দ্রুত এগিয়ে শাহপুরের পাশের খালি আসনে বসলেন। দরবারীরা পারস্পারিক আলাপ থামিয়ে তাকিয়ে রইল মঞ্চের দিকে। ফররুখযাদ সামান্য নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ 'সম্মানিত সুধী মন্ডলী।

আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ জন্য যে, এত বড় দায়িত্ব পালনের যোগ্য আমায় ভেবেছেন। ইতিহাসের এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি আমরা। এ যুগসন্ধিক্ষণে কোন ভুল বা মামুলী কোন্দলও আমাদের জন্য ধ্বংসের দুয়ার খুলে দিতে পারে এ অনুভূতি না হলে এ জিম্মা আমি কবুল করতাম না। আমি সিংহাসনের দাবীদার কারো প্রশংসা আর কারো দূর্ণাম করব না। দুজনকে একত্রে মসনদে বসানো গেলে আমি ঘোষণা করতাম ইরানের তখতের জন্য শাহজাদা শাহপুর এবং শাহজাদী আজমেরী সমান যোগ্য। কিন্তু ইরানের প্রয়োজন একজনমাত্র শাসক। এজন্য আবার আপনারা প্রতিশ্রুতি দিন, আমার ফায়সালা আপনারা সম্মিলিত ভাবে মেনে নেবেন।'

থামলেন ফররুখ। উপস্থিত ওমরাবৃন্দ চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

ওমরাদের প্রথম সারি থেকে এক প্রবীণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেনঃ 'আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন।'

পরপর অনেকেই ফররুখের প্রতি আস্থা প্রকাশ করল।

বাহমান দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'এখানে যে সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন, তারা সম্মিলিত ভাবে আপনার ফায়সালা মেনে নেবেন, সকলের পক্ষ থেকে এ আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি।'

ফররুখ শাহপুরের হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। পুরোহিত পরিয়ে দিলেন রাজমুকুট। ফররুখ শাহানশাহের হাতে চুমো খেয়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। এবার আমি চাই ইরানের নতুন শাহানশাহকে শাহজাদী আজমেরী বানু সবার আগে মোবারকবাদ পেশ করবেন।'

আজমেরী স্তম্ভিত হয়ে ফররুখের দিকে তাকিয়েছিল। সহসা চঞ্চলতা আর পেরেশানীকে চিরায়ত মৃদু হাসির ঝলকে ঢেকে ফেললো। কম্পিত, দ্বিধা কুণ্ঠিত পদে এগিয়ে হাটু গেড়ে চুমু খেল সে শাহপুরের হাতে। তারপর পিছনে সরে এসে বসে পড়ল আবার। এরপর শাহজাদী পুরান, শাহী খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তি, সালতানাতের ওমরা এবং ফৌজি দায়িত্বশীলরা একে একে এগিয়ে সম্মান জানালেন শাহপুরকে। কিন্তু আশপাশের কোন খেয়াল নেই আজমেরী বানুর। আহত নাগিনীর মত কখনো শাহপুর কখনো ফররুখের দিকে তাকাতে লাগল ও।

দরবারের এ পর্বের কাজ শেষে শাহপুর উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বর্তমান অবস্থায় ইরানী শাসকের উপর যে কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে আমরা সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। আমাদের প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান উজিরের। ফররুখ প্রমাণ করেছেন, খোরাসানের চেয়ে মাদায়েনেই তার খেদমতের প্রয়োজন বেশী। এজন্য আমি তাকে আমার উজিরের পদে বহাল করলাম। খোরাসানের হুকুমত সোপার্দ করা হল তার সুযোগ্য শাহজাদা রুস্তমকে। মাদায়েনের জনগণ এবং ওমরারা যেন মনে না করেন, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। আমার ইচ্ছে, ফররুখকে শাহী খান্দানের সাথে সম্পৃক্ত করা। আমার চাচাত বোন আজমেরী বানু ইরানী তখতের জন্য সর্বপ্রথম আমায় স্বাগত জানিয়ে প্রশান্ত মনের পরিচয় দিয়েছে। এজন্য আমি তার শোকরিয়া আদায় করছি। আমার ইচ্ছে, আমাদের উজিরের সহধর্মিনী হিসাবে সালতানাতের কাজেও ও অংশ নিক। ফররুখের খেদমত আমাদের যেমন জরুরী তেমনি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে আমার চাচাত বোনের সহযোগিতা ও পরামর্শ তার জন্য অপরিহার্য।

আচানক উঠে দাঁড়াল আজমেরী। রাগে থরথর করে কাঁপছিল তার সারা দেহ। কিছু বলতে চাইল ও, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোলো না তার কণ্ঠ থেকে। শাহপুর তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আজমেরী, বসো। তোমার কিছু বলার দরকার নেই। পবিত্র

অগ্নিকে সাক্ষী রেখে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি, তাই পূর্ণ করব আমরা। তুমি এমন কোন কাজ করোনি যাতে কিসরার খান্দান লজ্জিত হবে। তোমার উদ্দেশ্য সালতানাতের কল্যাণ বৈ নয়। এজন্য গর্ব করতে পার তুমি। আমরা আমাদের প্রজাদের এক সপ্তাহ আনন্দ উৎসব করার অনুমতি দিচ্ছি।'

ব্যথায় মুষড়ে পড়ল আজমেরী বানু। দরবার মুলতবী করে অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন শাহপুর।

সতের

অফিসের প্রশস্ত কামরায় বসে কি যেন লিখছিলেন পারভেজ। মিয়ানদাদ কামরায় ঢুকে আদবের সাথে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে না তাকিয়েই বসতে ইশারা করলেন পারভেজ। বসে পড়ল মিয়ানদাদ। খানিক পর তার দিকে ফিরে পারভেজ বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিচ্ছি তোমাকে। তুমি জান, সপ্তাহখানেক ধরে ফররুখ আর শাহাজাদী আজমেরী বানুর বিয়ের কথা চলছে। মাদায়েনের একদল প্রভাবশালী ওমরা এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়।'

ঃ 'জনাব, ফৌজের মধ্যেও এ ব্যাপারে পেরেশানী লক্ষ্য করা গেছে। গুজব শুনছি, সিংহাসন লাভের জন্য শাহপুর ফররুখকে আজমেরী বানুর রিশতা পেশ করেছিলেন। আমার ধারনা, শাহাজাদীরও এতে ইচ্ছে ছিল।'

ঃ তোমার ধারণা ভুল। এ সম্পর্কে ও মোটেও খুশী নয়। কোন কোন আমীর মনে করেন ফররুখকে উজির বানিয়ে শাহপুর তার প্রতিদান দিয়ে ওর অসন্তুষ্টির পুরো ফায়দা লুটতে চাইছেন। শাহপুরের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ফররুখ, তেমনি মন্ত্রীত্বের পদ কবুল করে এবং তার চেয়ে আজমেরীর সাথে শাদীতে রাজি হয়ে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তার বিরোধীদের পক্ষে জনগণকে ক্ষেপানো সহজ হয়েছে যে, কিসরার বেটীর শাদী হচ্ছে শাহী খান্দানের বাইরে।

শোন, ফররুখের হিফাজতের দায়িত্ব দিতে চাই তোমাকে। শাহানশাহের কাছে কাল তিনি খোরাসান থেকে নিজের কিছু সিপাই নিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। এই নিয়ে পরামর্শ করার জন্য শাহানশাহ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি, খোরাসানের সৈন্য মাদায়েনে আনার অনুমতি ফররুখ যাদকে দেয়া হলে বিরোধিতা আরো বেড়ে যাবে। কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তার হিফাজতের জিম্মা নিতে আমি তৈরী। শাহানশাহ ফররুখের হিফাজতের দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করেছেন। সে দায়িত্ব আমি তোমাকে দিচ্ছি। মাদায়েনের কোন ওমরা অথবা শাহী খান্দানের কেউ প্রকাশ্যে সংঘর্ষ বাঁধাবার ঝুঁকি নেয়ার সাহস করবে না। তবুও সময় থাকতে সাবধান হওয়া

উচিৎ। দু'দিনের মধ্যেই নতুন আবাস স্থলে চলে যাবেন ফররুখ। যতক্ষণ পর্যন্ত মাদায়েনের অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত না হবো, তার সাথেই থাকবে তুমি।

শাহানশাহের সাথে অনেক বিতর্কের পর বিয়েতে রাজী হয়েছে আজমেরী। কিন্তু জানিনা তার মনে কি আছে। হয়ত শাহানশাহের সাথে ঝগড়ার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে ও। অথবা নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে, সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে শাহানশাহের উজিরের বিবি হিসাবে শাহী খান্দানের অন্যদের চেয়ে সম্মানিতা হয়ে থাকতে চাইছে। এও হতে পারে, বেগতিক অবস্থায় বাধ্য হয়ে দুশ্চিন্তা এবং গোস্বা লুকাতে চাইছে মুচকি হাসির আড়ালে। প্রতিশোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে সঠিক সময়ের। তার শিরা উপশিরায় বইছে সাসানি খুন। আমার মনে হয়, অবস্থা কিছুটা অনুকূলে এলে নিজের খাহেশ পূরণের জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবে ও। ফররুখ এক দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। এ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি সালতানাতের উজির হয়ে তাদের ঘাড়ে সওয়ার হবে, মাদায়েনের ওমরারা এ গ্রহণ করতে পারছে না। আজমেরী বানু কোন ষড়যন্ত্র না করলেও তিনি বেশী দিন স্বস্তির সাথে বসতে পারবেন না।'

থামলেন পারভেজ। টেবিল থেকে কাগজ তুলে মিয়ানদাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'এখানে সেসব লোকদের তালিকা আছে, গত কয়েক বছরে অতীত শাসকদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি ষড়যন্ত্রেই যারা শরীক ছিল। নামগুলি মুখস্ত করে কাগজটা পুড়িয়ে দিও। এরাই তারা, শাহপুরের পক্ষে যারা বেশী করে শ্লোগান তুলছে। কিন্তু ফররুখ যদি শাহজাদী আজমেরীকে সিংহাসনে বসাতেন, এরাই তার সমর্থকদের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করত। ফররুখের ব্যাপারে তুমি কোন বিপদের গন্ধ পাচ্ছ, ওরা যেন টের না পায়। আজমেরীকেও তোমার সন্দেহের কথা খুলে বলবে না। চোখে দেখবে, কানে শুনবে, চিন্তা করবে মস্তিষ্কে কিন্তু সংযত রাখবে জবান। তোমার ব্যাপারে এরা নিরুদ্বেগ হলে বেশী দেখতে পাবে, বেশী শুনতে পাবে, বেশী করে ভাবতে পারবে। আর বাস্তব ফায়সালা করতে পারবে সময়মতো। তোমার সাথে এমন বিশ পঁচিশ জন লোক থাকবে, যাদের মেধা, আনুগত্য এবং বাহাদুরীতে তুমি আস্থাবান। এবার যেতে পার।'

দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল মিয়ানদাদ। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে থামালেন পারভেজ। বললেননঃ 'সরুশের দূত এসেছিল রাতে। ও লিখেছে, ইয়াসমীন তোমার বোনকে খুব স্মরণ করছে। আরব বালকও ওখানে বেশ খুশীতেই আছে।'

ঃ 'ফিরে আসবে না?'

ঃ 'সরুশ লিখেছে, আমার ফৌজ যখন যুদ্ধে শরীক হবে এ অল্প বয়েসী সিপাহীও থাকবে আমার সাথে। ইরানের অভিজ্ঞ সিপাইরাও তার তৎপরতায় গর্ব অনুভব করবে।'

মহলের এক কামরায় মখমলের বিছানায় বসে আছে আজমেরী বানু। এক

চাকরাণী তার মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে আর আরেক চাকরাণী আয়না ধরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। এক খাদেমা কামরায় ঢুকে বললঃ 'ছিয়াওখশ আপনার খিদমতে হাজির হতে চাইছে।'

আজমেরীর হাতের ইশারায় চাকরাণী বেরিয়ে গেল। কামরায় প্রবেশ করল ছিয়াওখশ। মন মাতানো মুচকি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকাল শাহজাদী। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললঃ 'এখন আমার কাছে আসতে তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিৎ। শাহপুরের কোন গোয়েন্দার সন্দেহ হলে, কয়েদীর মতই হবে আমার অবস্থা।'

এগিয়ে শাহজাদীর হাতে চুমো খেলো ছিয়াওখশ। বসতে বসতে বললঃ 'শাহপুর জানেন শাহী মহলের মুহাফিজ আমার মামাতো ভাই। আমি তার কাছে যাওয়া আসা করি।'

ঃ 'মনে করো শাহপুর অথবা পুরান হঠাৎ এদিকে এলে একথা বলে কি তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারবে যে, ভুল করে মামাতো ভাইয়ের পরিবর্তে তুমি এখানে এসে পড়েছ?'

মৃদু হাসল ও।

ঃ 'আপনি ভাববেন না। তাঁদের পথে পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। যখনই ওদের কেউ মহল থেকে বেরিয়ে আপনার ঘরের পথ ধরবে, আমাকে খবর দেবে ওরা। এখান থেকে বাগান পথে মামাতো ভাইয়ের ঘরে পৌছতে আমার সময় লাগবে না। কিন্তু এ মুহূর্তে ফররুখের সাথে শাহপুরের আলাপ চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মোলাকাত শেষ না হবে গোলাম অথবা গোয়েন্দারা অন্যদিকে নজর দেবে না। আপনাকে আমি বলতে এসেছি, ওমরা আর ফৌজি সর্দারদের অধিকাংশই আমাদের সাথে। মাদায়েনে জেঁকে বসার মওকা ফররুখকে ওরা দিতে চায় না। সুযোগ পেলেই ফররুখ তার বেটা রুস্তমকে সিপাহসালারের পদ দেবে এ সংবাদে ফৌজ দারুণ উৎকণ্ঠিত। কোন অবস্থায়ই তাকে নারাজ করার ঝুঁকি নেবে না শাহপুর।'

ঃ 'একথা বলতে এখানে আসার ঝুঁকি নেয়া তোমার ঠিক হয়নি। মহলের ভেতরেও এমন লোক আছে, যারা বাইরের সব ব্যাপারই আমাকে অবহিত করে। আমি শুধু জানতে চাই, আমার পক্ষের ওমরা এবং ফৌজি অফিসাররা বিদ্রোহ করার জন্য কোন দিনটি নির্ধারণ করেছেন।'

ঃ 'বিদ্রোহ করার প্রয়োজনই হবে না। একদিন সকালে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মাদায়েনবাসী শোনবে, শাহজাদী আজমেরীর এক জানবাজ শাহপুর আর ফররুখকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

মুচকি হেসে আজমেরী বানু বললঃ 'আর আজমেরীর সে জানবাজের নাম ছিয়াওখশ!'

ঃ 'হ্যাঁ, এ দায়িত্ব আমি আমার নিজের হাতে নিয়েছি। কিন্তু আমার পথে কিছু

বাঁধা আছে। এজন্যই আজ আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি। ফররুখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের জন্য মুশকিল নয়। কিন্তু শাহপুরের মুহাফিজ ফৌজ যদি দ্রুত ময়দানে চলে আসে খুব কম লোকই আপনাকে সঙ্গ দেবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুহাফিজ ফৌজের সালার শাহপুরের একনিষ্ঠ অনুগত।'

ঃ 'পারভেজকে ভাল করেই আমি জানি। আমার বিশ্বাস, ফররুখ আর শাহপুরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে তিনি আমার বিরোধিতা করবেন না।'

ঃ 'তিনি এমন এক নওজোয়ানকে ফররুখের মুহাফিজ করেছেন, যে দারুণ বিপজ্জনক।'

ঃ 'কে সে?'

ঃ 'তার নাম মিয়ানদাদ।'

ঃ 'তুমি তাকে ভয় করো?'

বিরক্তিভরে জওয়াব দিল ছিয়াওখশঃ 'ইরানের ভাবী রাণী ছাড়া কাউকেই আমি ভয় করি না। আমি বলতে চাইছি, পারভেজের মুহাফিজ ফৌজের উৎকৃষ্ট সিপাইদের পাঠানো হয়েছে ফররুখের নতুন আবাসের হিফাজতে। মিয়ানদাদ তাদের অফিসার। আমি বুঝেছি, ফররুখের কোন বিপদের গন্ধ না পেলে ফৌজের বিশ্বস্ত অফিসারকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তার হিফাজতের জন্য পারভেজ পাঠাতেন না। সাধারণতঃ এ দায়িত্ব ফৌজের কোন মামুলী আফিসারকে দেয়াই উচিৎ ছিল।'

ঃ 'আমি বুঝতে পারছি না এতে পেরেশান হওয়ার কি আছে। বর্তমান অবস্থায় এক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, মাদায়েনবাসী ফররুখের বক্তৃতায় সন্তুষ্ট নয়। শাহপুর তাকে আমার বিয়ের লোভ দেখিয়ে সিংহাসন দখল করেছে জনগণ এতে আরো বেশী ক্ষুব্ধ। এ জন্য ফররুখের হিফাজতের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা অস্বাভাবিক নয়। শাহপুর যদি এ দায়িত্ব পারভেজকে সোপর্দ করে থাকে তবে নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি এমন লোকই নিয়োগ করবেন, বিশ্বস্ততা এবং দায়িত্ব পালনে যার উপর ভরসা করা যায়।'

ঃ 'শাহজাদী! পেরেশান আমি নই। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে, কি কি বাঁধা আছে আমাদের পথে। সে বাঁধা অতিক্রম করার জন্য কোন ধরনের তদবীর গ্রহণ করা উচিৎ। প্রথম দিনই আমি সন্দেহ করেছিলাম মুহাফিজ ফৌজ যদি তৎপর হয়ে ওঠে আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এখন পারভেজ মিয়ানদাদকে ফররুখের হিফাযতের জিম্মা দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। শাহানশাহের কিছু সিপাইয়ের সাথে আলাপ করে বুঝেছি যে, ওদের অধিকাংশই মিয়ানদাদের ইশারায় জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। পারভেজকে সে পিতৃতুল্য মনে করে। এ নওজোয়ান যতদিন থাকবে মাদায়েন, পারভেজের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। শাহপুর আর ফররুখের ব্যাপারে কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই তিনি

মিয়ানদাদকে হুশিয়ার করে দেবেন। আর সে মুহূর্তের মধ্যে ছাউনী থেকে সব কটা দল শহর এবং শাহী মহলের দিকে পাঠিয়ে দেবে।'

ঃ 'ফররুখ যাদ আর শাহপুরের পূর্বে পারভেজকেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া যায় না?'

ঃ 'এটা অবশ্য অসম্ভব নয়। যে কোন সময় পারভেজকে কাবু করতে পারি। নিজস্ব কয়েকজন গোলাম ছাড়া তার বাড়ীতে কোন পাহারাদার নেই। এ জন্য তার অফিসের কারো সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এর পরই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়বে মিয়ানদাদের সাথে। মুহাফিজ ফৌজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকগুলো তার সংগেই থাকবে। ইরানের অন্য ফৌজ থেকে কোন ভয়ের কারণ নেই। শাহপুর এবং তার কিছু সহযোগীর লাশ মাড়িয়ে সিংহাসন পর্যন্ত পৌছলে ওরা অসন্তুষ্ট হবে না বরং আমার ধারনায় খুশীই হবে। ফররুখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এ অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাবে ওরা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের অনুকূলে নয়। এর ফলে শক্তিশালী ফৌজি অফিসার সিংহাসনের দাবীদার হয়ে ময়দানে ছুটে আসতে পারে। তাই আমাদের তৎপরতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব কম সময় নিতে হবে।'

ঃ 'পারভেজ ফররুখের হিফাজতে শাহী ফৌজের এক জওয়ান আর প্রভাবশালী কতক অফিসার নিয়োগ করেছেন, ইরানের সালতানাত পাবার জন্য আমার পক্ষে কোন নওজোয়ান কি জীবন বাজী রাখতে পারে না?'

ঃ 'যে জন্য আমি পেরেশান হচ্ছি, তা হল, এ নওজোয়ান পারভেজের সুন্দরী নাতনীর জন্য পাগল পারা। সে ইস্পাহানের সবচেয়ে প্রভাবশালী রইসের কন্যা। তাকে আমি দেখেছি। শাহী ফৌজের এক অফিসার বলেছে কয়েকদিন আগে এখানেও এসেছিল ও। সকাল সন্ধ্যায় পারভেজের ঘরেই থাকত মিয়ানদাদ। সে অফিসারের ধারণা, মিয়ানদাদ সে যুবতীর স্বামী হতে যাচ্ছে। তাকে ফররুখের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হচ্ছে, কয়দিন পর তার উন্নতির পথ খুলে যাবে।'

খানিক ভেবে আজমেরী বললঃ 'এই বললে ফররুখ এখন শাহপুরের কাছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, তাকে শাহী মহলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি।'

ঃ 'মিয়ানদাদ কি আছে তার সাথে?'

ঃ 'না, মিয়ানদাদ তার সাথে ছিল না। সাধারণত ও ফররুখের নতুন আবাসের হিফাজত করে। ফররুখ কখনো শাহানশাহের কাছে এলে দশজন সশস্ত্র জওয়ান তার সাথে পাঠিয়ে দেয় ও। কিন্তু শাহপুরের কাছে রাতে যদি ফররুখ আসে, হামেশাই সে থাকে তার সঙ্গে। সিপাইদের পরিমাণ থাকে বেশী। ভোরে কিছু সময়ের জন্য ছাউনীতে যায় যাতে শাহী ফৌজের সাথে সম্পর্ক কায়েম থাকে।'

ঃ 'আমি শুধু জানতে চাই এখন সে কোথায়?'

ঃ 'সম্ভবত ফররুখের মহলে।'

হাত তালি দিল আজমেরী বানু। এক পরিচারিকা ছুটে এল। আজমেরী বললঃ 'আমার পাল্কী প্রস্তুত কর। মহলের বাইরে যাচ্ছি।'

ঃ 'এ নিছক পাগলামী। ফররুখ যাদ কি ভাববে?'

ঃ 'ফররুখের শুধু এ আফসোস হবে, আমি তার ঘরে গেলাম, অথচ অভ্যর্থনার জন্য সে হাজির ছিল না।'

ঃ 'কিন্তু শাহপুর কি মেনে নেবেন, শাদীর পূর্বেই আপনি....'

মাঝখানে কথা কেটে আজমেরী বললঃ 'শাহপুরের জন্য এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আমি ফররুখের সাথে আমার ভবিষ্যত জুড়ে দিতে রাজি হয়েছি।'

ঃ 'শাহজাদী! মিয়ানদাদকে সহযোগী বানাবার ইচ্ছা নিয়ে সেখানে গেলে আপনি নিরাশ হবেন।'

বিরক্তি ভরে আজমেরী বললঃ 'দেখবার মত তার দুটি চোখ থাকলে আমি নিরাশ হবো না।'

ঃ 'কিন্তু কি বাহানায় সেখানে যাবেন আপনি?'

ঃ 'বাহানা খোঁজা আমার কাজ। অবশ্যই সেখানে যাব আমি। তোমরা যেখানে দেখছ পর্বত আমার কাছে তা হবে খড়কুটার মতই নগন্য।'

ঃ 'কিন্তু তার কোন সন্দেহ হলে দেরী না করেই পারভেজকে হুশিয়ার করবে সে। হুকুমতের সব গোয়েন্দা তৎপর হয়ে উঠবে আমাদের বিরুদ্ধে।'

ঃ 'তার কোন সন্দেহ হবে না।'

ঃ 'কিন্তু আপনি কি বলবেন তাকে?'

ঃ 'কিছু বলার দরকার হবে না। আমি শুধু দেখতে যাচ্ছি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অথবা তাকে সহযোগী বানাবার সম্ভাবনা কদ্দুর। তার দৃষ্টিতেই এ প্রশ্নের জওয়াব আমি পেয়ে যাব। এখন তুমি যাও। চরম প্রয়োজন ছাড়া এসো না। মহলের মুহাফিজ তোমাদের তৎপরতার সংবাদ আমায় দিতে থাকবে।'

অসহায়ের মত দরজার দিকে এগিয়ে গেল ছিয়াওখশ। সামান্য থেমে চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল শাহাজাদীর দিকে। তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নীরবে।

নদীর ওপারে ফররুখের মহল। তার এক কামরায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মিয়ানদাদ। ছুটে কামরায় ঢুকল এক সিপাই। তার বাহু ধরে ঝাকুনি দিতে লাগল ও। পাশ ফিরে চোখ কচলে দ্রুত উঠে বসল মিয়ানদাদ। সিপাই বললঃ 'মাফ করুন জনাব, আমি ওদের বুঝিয়েছি, আপনি ঘুমিয়ে। রাতে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ আপনার হয় না। কিন্তু.......'

ঃ 'উজিরে আজম কি ফিরে এসেছেন?' তার কথার মাঝে প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না জনাব, তিনি আসেন নি, শাহজাদী আজমেরী বানু তশরীফ এনেছেন।'

ঃ 'কি বাজে বকছ! এদিকে এসো।'

পেরেশান হয়ে এগিয়ে এল সিপাইটি। মিয়ানদাদ তার গর্দানে হাত রেখে মুখ শুঁকতে লাগল। সিপাইটি জোর দিয়ে বললঃ 'জনাব, আমি শরাব পান করিনি, আফিমও নয়। হয় তো কোন আবেগপ্রবণ সুন্দরী আমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা কিশতিতে সওয়ার হয়ে শাহী মহলের দিক থেকেই এদিকে এসেছেন। এমন কিশতিতে সাধারণতঃ শুধু শাহজাদা আর শাহজাদীরাই ভ্রমণ করেন। কিশতির মাল্লাকেও রইসজাদার মত মনে হচ্ছে। সুন্দরীর লেবাস এবং অলংকারও শাহজাদীদের মত। সুন্দরী তো বটেই এমনকি তার খাদেমার গলায়ও ঝুলছে মুক্তার মালা। কিশতি থেকে নেমেই তিনি হুকুম দিলেনঃ 'শাহজাদী আজমেরী এ মহল পরিদর্শন করতে এসেছেন। সব গোলামরা যেন সরে যায় তার পথ থেকে।'

পাহারাদারদের তিনি বললেনঃ 'আহম্মকের মত কি দেখছ তোমরা? তোমাদের কোন অফিসার থাকলে নিয়ে এসো।'

আমি শুধু বলেছিঃ 'তিনি ঘুমিয়ে আছেন।' অমনি তেড়ে এলো খাদেমা।'

ঃ 'কিন্তু, বুঝতে পারছিনা শাহজাদী আজমেরী কেন এখানে এসেছেন?'

ঃ 'জনাব, আমিও বুঝতে পারছিনা। কিন্তু আপনি জলদি করুন।'

তাড়াতাড়ি জুতা পরে উঠে দাঁড়াল মিয়ানদাদ। আজমেরী আর তার খাদেমাকে দেখা গেল দরজার সামনে। গভীর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। আচানক নুয়ে এল তার দৃষ্টি। অভিযোগের স্বরে শাহজাদী বললঃ 'আমার নাম আজমেরী বানু। এ মহলের মুহাফিজরা সম্ভবত আমায় ভুত মনে করে।'

স্বসংকোচে গর্দান তুলল মিয়ানদাদ। ওর দীলের গভীরে বিঁধে রইল আজমেরীর মুচকি হাসি।

ঃ 'মাফ করুন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এ মহলের পাহারাদারদের জন্য আপনার আগমন অপ্রত্যাশিত। আপনি তশরীফ আনবেন আমিও জানতাম না।'

ঃ 'পাহারাদারদের ভীড় সামলাতে পারলে মহলটা খানিক দেখতে চাই। আমার মনে হয়, ফররুখ যাদ এতে আপত্তি করবেন না।'

ঃ 'এ মহল আপনার। পাহারাদারদের কোন অপরাধ হয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চইছি।'

ঃ 'তাজ্জব ব্যাপার, দিনের আলোতেও ভুত আর মানুষে পার্থক্য করতে পারেনা নাকি খোরাসানের লোকেরা।'

ঃ 'পাহারাদাররা এখানকারই। দু একজন হয়ত খোরাসানী।'

ঃ 'আর তুমি?' অপরিচিতের মত জিজ্ঞেস করলো শাহজাদী।

ঃ 'আমি খোরাসানী নই।'

একথা বলে বিমূঢ়ের মত কামরায় দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকের দিকে ফিরল মিয়ানদাদ ঃ 'তুমি কি করছ এখানে? যাও। সংগীদেরও নিয়ে যাও দেউড়ির দিকে।'

স্বসংকোচে দরজার দিকে পা বাড়াল সিপাইটি। কিন্তু তারা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল না দেখে দ্রুত সে পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল অন্য দরজা দিয়ে। হেসে উঠল আজমেরী বানু আর খাদেমা।

ঃ 'এবার নিশ্চিন্তে আপনার মহল আপনি দেখতে পারেন।' বলে একদিকে সরে যাবার চেষ্টা করল মিয়ানদাদ।

আজমেরী বললঃ 'দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ঃ 'আমিও বাইরে যাচ্ছি।'

ঃ 'বাহ! আমিও বাইরে যাচ্ছি! আরে, তুমি চলে গেলে বাড়ীটা আমাদের দেখাবে কে? শোন, তুমি কি বাড়ীটা আমাদের দেখাবে না?'

ঃ 'ভেবেছিলাম আমার উপস্থিতিতে হয়ত আপনি বিরক্ত হবেন।'

ঃ 'না, তুমি থাকবে আমাদের সাথে। এখান থেকেই শুরু করছি। তুমি কি এ কামরায় থাক!'

ঃ 'না, বাইরে মেহমানখানার সাথে আমার কামরা। যেহেতু নিচতলার চারটি কামরা খালি, দিনে এখানে বিশ্রাম করি আমি। সাধারণতঃ উজিরে আজম উপরতলায়ই অবস্থান করেন।'

আজমেরী বানু এগিয়ে কামরার ঢুকে বললঃ 'এ কামরা ইরান সালতানাতের উজিরে আজমের মহলের অংশ মনে হয় না।'

ঃ 'এখনো নিচতলার কয়েকটা কামরার কাজ শেষ হয়নি। মোলাকাতের কামরা ছাড়া আর তিনটে কামরা মাত্র ঠিক করা হয়েছে।'

ঃ 'প্রথমে সে কামরাই আমাদের দেখাও।'

ঃ 'আসুন।' বলে আগে আগে চলল মিয়ানদাদ।

ছোট কামরা তিনটি দেখে বড় দরবার কক্ষে প্রবেশ করল ওরা। কার্পেট মোড়া মেঝেতে আবলুস কাঠের দামী সব আসন দিয়ে কামরাটি সাজানো। মখমলের পর্দায় রং বেরংয়ের ছবি। প্রশস্ত জানালার কাছে বড় ফুলদানিতে তাজা ফুল সুবাস ছড়াচ্ছে। কামরার মাঝের গালিচার দিকে ইশারা করে আজমেরী বললঃ 'এ কামরার উপযুক্ত নয় এ কার্পেট। এটা অন্য কামরায় নিয়ে যাও।'

ঃ 'কালই তিনি এটি খরিদ করেছেন। দোকানী বলছিল, এর চেয়ে দামী কার্পেট মাদায়েনের বাজারে পাওয়া যায় না।'

খাদেমাকে আজমেরী বললঃ 'কিশিতি থেকে কার্পেটটা তুলে নিয়ে এসো।'

খাদেমা বেরিয়ে গেলে মিয়ানদাদের দিকে ফিরে আজমেরী বললঃ 'সব কটা কার্পেট আমার বদলাতে হবে। এ পর্দাও আমার পসন্দ নয়। তুমি আবার ফররুখের

কাছে অভিযোগ করো না আমি তাকে অপমান করতে চাইছি।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমার বিশ্বাস এ ঘরের সব মালপত্র তুলে নদীতে ফেলে দেয়ার হুকুম দিলেও তিনি রাগ করবেন না। এ বাড়ীর প্রতি আপনার খেয়াল আছে, এতে বরং তিনি খুশীই হবেন।'

ঃ 'উপরে এসো। বাকী কামরাগুলোও দেখব।'

মিয়ানদাদ খাদেমা ফিরে আসার প্রতিক্ষা করছিল। কিন্তু আজমেরী দরজার দিকে এগিয়ে গেলে সেও জলদি পা বাড়াল। দ্বিতলের সিঁড়ি ভাংতে ভাংতে হঠাৎ পিছন ফিরে চাইল আজমেরী। তার মন ভোলানো মৃদু হাসি আবারো ছোবল হানলো মিয়ানদাদের হৃদয়ের গভীরে।

ঃ 'তোমার নাম কি?' প্রশ্ন করল শাহজাদী।

ঃ 'মিয়ানদাদ।' মাথা নিচু করে জওয়াব দিল ও।

দু'জন এসে দাঁড়াল দ্বিতলের এক কামরায়। এর একটা জানালা নদীর দিকে অপরটা পাইন বাগানের দিকে। পরিশ্রান্ত হয়ে সোফায় বসতে বসতে বলল শাহজাদীঃ 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

ঃ 'আপনি খানিক বিশ্রাম করুন। নিচে গিয়ে আপনার খাদেমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

ঃ 'খাদেমাকে ডাকার দরকার নেই। ও এক বাচাল মেয়ে। কামরার এ অবস্থা দেখলে আমায় ঠাট্টা করবে।'

ঃ 'আপনার জন্য শরবত পাঠাচ্ছি।'

ঃ 'আমার পিপাসা নেই, তুমি বসো, কয়েকটা জরুরী কথা সেরে নিই।'

কুণ্ঠিত হয়ে কয়েক কদম দূরের এক আসনে বসল ও। হৃদয় কাঁপছিল তার। কিন্তু ভয়ের সাথে আনন্দও অনুভূত হচ্ছিল। কৈশোরে পরীদের যে সব কল্প কাহিনী শুনেছে ও, তার এক জীবন্ত ছবি যেন ওর সামনে বসে। নারী সৌন্দর্য সম্পর্কে ওর সমগ্র কল্পনা একীভূত হয়েছে যেন আজমেরীর মধ্যে। তার গভীর কালো চোখে একই সাথে জীবন মৃত্যুর আলো আঁধার দেখছিল ও। এক অজানা আশংকা আর অদৃশ্য পুলকের মাঝে ওর হৃদয় পিষ্ট হচ্ছিল বার বার।

ঃ 'আমি শুধু মহল দেখতেই আসিনি। আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে মহলে থাকবেন আমার জীবন সংগী, তা কদ্দুর নিরাপদ তা দেখা। প্রতিশ্রুতি দাও, দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তও গাফেল হবে না।'

ঃ 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দায়িত্বে এতটুকু অবহেলা আমি করব না।'

ঃ 'আমি জানিনা, এক বৃদ্ধ, যার ছেলের বয়স আমার চেয়ে বেশী, কতটুকু আনন্দ আমায় দিতে পারবে। তবুয়ো সালতানাতের অবস্থা দেখে এ শাদীতে রাজি হয়েছি আমি। ইরানের বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন ঝানু উজিরের প্রয়োজন। এ পদের

জন্য ফররুখের চেয়ে বেশী উপযুক্ত কেউ নেই। তার জীবন খুবই মূল্যবান। কোন বিপদ এলে সালতানাত চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আসলেও ফররুখের কোন বিপদ আছে একথা আমি বলছি না। তবুও সাবধান থাকা ভাল। কত লোক আছে তোমার কাছে?'

ঃ 'ত্রিশজন। এছাড়া আছে ফররুখ যাদের দশজন খোরাসানী গোলাম।'

ঃ 'এ বাড়ী এমন কেল্লা নয় যে ত্রিশ চল্লিশজন লোকই এর হিফাজতের জন্য যথেষ্ট।'

ঃ 'এখানে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, পাহারাদারের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের কেউ যেন অন্দরে ঢুকতে না পারে। এ জন্য সবসময় দশজন সিপাই মহলের চারপাশে মজুত থাকে। তিনি বাইরে গেলে কমপক্ষে দশজন থাকে তার সাথে। তা ছাড়া উজিরে আজমের আসা যাওয়ার পথে প্রচুর পরিমাণ শাহী গোয়েন্দা তৎপর থাকে।'

ঃ 'মহলের বাইরে তার হিফাজতের জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তা আমি জানি। কিন্তু এ বাড়ীতে নিরাপত্তার জন্য এ ক'জন লোক যথেষ্ট নয়।'

ঃ 'আপনি যদি বলতে চান আচানক কোন কমান্ডো হামলা হতে পারে, তবুও আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, শাহী মহলের চেয়ে এ বাড়ী কম নিরাপদ নয়। বিপদের সময় মুহূর্তের মধ্যে ছাউনী থেকে ফৌজ চলে আসবে। রাতে মশাল বুলন্দ করার প্রয়োজন হবে ছাদে। আর দিনে... '

হঠাৎ থেমে গেল মিয়ানদাদের জবান। ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টিতে ও চাইল আজমেরীর দিকে।

ঃ 'তুমি থামলে কেন? এতো এমন গোপন ব্যাপার নয় যা আমি বুঝবো'না। দিনে পায়রা দিয়ে কাজ করা হয়?'

লজ্জিত হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'আপনার প্রশান্তির জন্য কথাগুলো আমি বলে ফেলেছি, যা বলা উচিৎ ছিল না। আপনি না আবার আমায় দায়িত্বহীন ভাবেন।'

ওর আপাদমস্তকে দৃষ্টি রেখে আজমেরী বললঃ 'তুমি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। বিশ্বস্ততার সম্মান করি আমি। এসেই শুনলাম তুমি ঘুমিয়ে আছ। বুঝতে কষ্ট হয়নি জিম্মাদারীর চেতনা সারারাত তোমায় পেরেশান রাখে। ফররুখকে এখন আমি বলতে পারবো, মহলের চেয়ে তার মুহাফিজদের দেখেই আমি বেশী খুশী হয়েছি। তুমি কাউকে বলো না তার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি উৎকণ্ঠিত। ফররুখকে একথা বলাই যথেষ্ট যে, এ মহল দেখতে এবং তোহফা হিসেবে একটা কার্পেট পেশ করতে আমি এসেছিলাম।'

ঃ 'আপনার ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু ফররুখ যাদ শুনলে খুশী হবেন যে, আপনি তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। তাকে বলতে পার, তোমাদের সচেতন থাকার নির্দেশ আমি দিয়েছি। তোমার কোন কথায় যেন তার এ সন্দেহ না হয়, তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র

হচ্ছে।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

ঃ 'তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি সচেতন থাকব। কথা দাও, যখনি প্রয়োজন হবে নির্দ্বিধায় চলে আসবে আমার কাছে।'

ঃ 'আমি আপনার শোকর গোজারী করছি। আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় এনাম কি হতে পারে আমার জন্য।'

ঃ 'এ আমাদের প্রথম মোলাকাত। অথচ আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার যুগযুগান্তের পরিচিত। আমার বিশ্বাস, পরস্পরকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ যখন পাব আমায় পর ভাববে না তুমিও। এখানেই তো থাকবে তুমি?'

ঃ 'এখানে আমার অবস্থান সাময়িক। কাল পর্যন্ত আমার ইচ্ছে ছিল, তাড়াতাড়ি মুহাফিজ ফৌজের ছাউনীতে ফিরে যাব।'

ঃ 'আর আজ?'

ঃ 'আজ ....ভবিষ্যতে ইচ্ছে কি হবে তা এখন বলতে পারছি না। মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। চোখ খুললেই আফসোস হবে, এত শীঘ্র কেন খতম হয়ে গেল এ স্বপ্ন। আপনার ব্যাপারে আমি শুনেছি.....'

ঃ 'আমার ব্যাপারে তুমি কি শুনেছ?'

ঃ 'মাফ করুন। কি বলছি, নিজেই বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'না, তোমায় বলতে হবে।'

ঃ 'ভয় পাই, আপনি রেগে যাবেন হয়ত।'

ঃ 'না না, বলো। কথা দিচ্ছি রাগ করব না।'

স্বসংকোচে জওয়াব দিল মিয়ানদাদঃ 'আমি শুনেছি আপনি দেমাগী, চরম অহংকারী, আর সাধারণ মানুষের সাথে আপনি সহজভাবে কথা বলেন না।'

আজমেরীর চেহারায় আবার সেই মৃদু হাসির তরঙ্গ ছলকে উঠল। বললঃ 'এখন তোমার কি ধারণা?'

স্বস্তির শ্বাস নিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'এখন ভাবছি, হায়! সারা দুনিয়ার মানুষ যদি আপনার মুচকি হাসি দেখার জন্য নয়ন আর আপনার কথা শোনার জন্য কান দিতে পারতো!'

নির্মল হাসি ছড়িয়ে আজমেরী বললঃ 'তোমার এ প্রশংসার কথা মনে থাকবে আমার। এবার আমায় যেতে হচ্ছে।'

নীরবে তাকে অনুসরণ করল মিয়ানদাদ। নিচে নেমে এল ওরা। নদীর পারে মর্মর পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আজমেরী আর খাদেমার কিশতিতে সওয়ার হওয়ার দৃশ্য দেখছিল ও। কিছু দূরে চলে গেল কিশতি। হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। ফিরে এসে ও বসে পড়ল বারান্দার এক ইজিচেয়ারে। তার দৃষ্টির সামনে নাচছিল আজমেরীর ছবি।

মিষ্টি মধুর সুর গুঞ্জরণ করছিল তার কানে। অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে এমন এক দুনিয়ায় ভেসে বেড়াল ও, যে দুনিয়ায় বসন্তের কোকিল সারা বছর সুর ছড়ায়। হঠাৎ আসমান থেকে নেমে এল গভীর ছায়া। নিমিষে এ দুনিয়া ডুবে গেল ভয়ংকর আঁধারের আবর্তে। ওর মনে হচ্ছিল, রংগীন আকাশে উড়ার পরিবর্তে ও ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের গহীনে। কে যেন তার হৃদয় জাপটে ধরেছে । থেমে গেছে ওর শিরায় খুনের সন্তরণ। পালাতে চাইল ও। কিন্তু আটকে দেয়া হয়েছে তার পা দুটো। চিৎকার দিতে চাইল ও। রুদ্ধ হয়ে এলো কণ্ঠ। পরাজয়, অসহায়ত্ব আর লজ্জার অনুভূতির গহীন থেকে জেগে উঠল এক সৈনিকের প্রতিরোধ শক্তি। আজমেরীর দৃষ্টির উত্তাপে যে বিবেকের প্রাচীর গলে গিয়েছিল, আবার দাড় করালো চারপাশে। মনকে তিরস্কার করে প্রার্থনা করলঃ 'আহার মুজাদ! কিসরার বেটির হাত থেকে আমি আশ্রয় চাই।'

দুপুরে ফিরে এলেন ফররুখ। দোতালার সিঁড়িতে পা দিতেই সংকোচ মেখে মিয়ানদাদ বললঃ 'জনাব, শাহজাদী আজমেরী বানু এখানে তশরীফ এনেছিলেন।'

ঃ 'আজমেরী বানু?' নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না ফররুখ যাদ।

ঃ 'হ্যাঁ, জনাব। মহল দেখতে এসেছিলেন তিনি।'

ঃ 'এ কি করে সম্ভব!'

ঃ 'জনাব, তার আগমনে আমি হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। একজন খাদেমাকে সংগে নিয়ে তিনি এসে হাজির।'

ঃ 'আমায় সংবাদ দেয়নি কেন?'

ঃ 'তার কথায় বুঝেছি, হঠাৎ করেই এখানে আসার খেয়াল চাপে তার মনে। মহল দেখে হলরুমের জন্য বড় একটা দামী কার্পেট তোহফা হিসাবে দিয়ে গেছেন।'

আনন্দে উছলে উঠলেন ফররুখ। বললেনঃ 'কোথায় সে কার্পেট?'

ঃ 'জনাব, দরবার কক্ষে বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।'

প্রায় দৌড়েই দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন ফররুখ। দৃষ্টি ছুড়লেন মেঝেয় পাতা কার্পেটের দিকে। বসে কার্পেটে হাত স্পর্শ করে বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, সত্যি এ কার্পেট বহুত শানদার। জানিনা, কত শাহানশাহ, শাহজাদা আর শাহজাদীর পায়ের পরশ লেগেছে এতে। এ কার্পেট এখানে শোভা পায় না। উপরে আমার কামরায় পৌছে দাও। কী অবাক কান্ড! আমার বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না শাহজাদী এখানে এসেছিল। এর পূর্বে তাকে কখনো তুমি দেখেছ?'

ঃ 'না।'

ঃ 'বসো।'

বসল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আফসোস আমি ছিলাম না। তিনি আমার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?'

ঃ 'জী, আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত। তার ধারণা, এ মহল ততটা নিরাপদ নয়। কিন্তু আমি তাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছি।'

ঃ 'সত্যি ও আমায় নিয়ে চিন্তিত?'

ঃ 'জী হ্যা, তার কথায় তাই বুঝলাম। সালতানাতের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তার যেমন আগ্রহ তেমনি সালতানাতের জন্য আপনার গুরুত্বও অনুভব করেন।'

ঃ 'তাহলে ও আমার ওপর অসন্তুষ্ট নয়?'

ঃ 'সম্ভবতঃ আগেও তিনি আপনার ওপর বিরক্ত ছিলেন না।'

ঃ 'তুমি জানোনা, শাহপুরকে তখতে বসানোর দিন আমার উপর কি ক্রোধ তার ছিল। আমার মনে হয়েছিল ও আমায় ছিঁড়ে ফেলবে।'

ঃ 'জনাব, ও ছিল সিংহাসনের দাবীদার এক শাহজাদীর উষ্মা। এখন তিনি নিজের ভবিষ্যত আপনার সাথে জুড়ে দিয়েছেন।'

ঃ 'শাহপুর আর শাহজাদী পুরান বিশ্বাসই করবে না, আমার মহল দেখতে আর দামী কার্পেট উপহার দিতে আজমেরী এসেছিল। এখানো ওদের ধারণা, অনিচ্ছায় আমার সাথে শাদীতে ও রাজী হয়েছে। শাহজাদীর সাথে দেখা করার ইচ্ছা কয়েকবারই প্রকাশ করেছিলাম ওদের সামনে। কিন্তু বরাবরই ওরা এড়িয়ে গেছে। ওদের ধারণা ছিল, শাহজাদী আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। অবস্থা হয়ত এদ্দুরও গড়াতে পারে যা সংশোধনের কোন পথ থাকবে না।'

ঃ 'আমার মনে হয় এখন শাহজাদীর সাথে মোলাকাত করতে কারো পরামর্শ অথবা অনুমতি দরকার হবে না। আপনি এ গালিচার পরিবর্তে কোন বড় উপঢৌকন নিয়ে যাবেন।'

ঃ 'এ কাজ তোমাকেই আমি সোপর্দ করছি। এখনি বাজারে গিয়ে দেখ ভাল জওহরীর দোকান কোথায়। তাকে বলবে শাহজাদীর মর্যাদানুযায়ী দোকানের শ্রেষ্ঠ মুক্তার মালা আর ইয়াকুতের আংটি নিয়ে আমার এখানে যেন চলে আসে। এ উপহার নিয়ে শাহজাদীর কাছে যেতে হবে তোমায়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করবে।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিয়ানদাদের চেহারা। পেরেশান হয়ে ও বললঃ 'আপনি নিজে যাবেন না?'

ঃ 'আমি যাব আগামী কাল। তুমি পেরেশান হচ্ছ কেন? আমার বিশ্বাস, শাহাজাদীর মহল পর্যন্ত পৌছতে অসুবিধা হবে না তোমার। তোমার হাতে উপহার পাঠিয়েছি বলে ও আপত্তি করবে না। আমি তোমায় দোস্ত মনে করি, একথা তাকে বলতে পার। এখন সময় নষ্ট করো না।'

আদবের সাথে কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল মিয়ানদাদ।

সূর্যাস্তের ঘন্টা খানেক আগে ফররুখের দেয়া হার আর আংটি পরে বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়াল শাহজাদী আজমেরী বানু। তিন চার কদম দূরে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে মিয়ানদাদ। আজমেরী ফিরে তাকে নিজের হাত দেখিয়ে বললঃ 'আহ! অপূর্ব সুন্দর, মনে হয় আমার আংগুলের মাপ নিয়ে কেউ এটা তৈরী করেছে।'

ঃ 'আপনি পছন্দ করেছেন এ জন্য আমি খুশী হয়েছি। এবার আমায় এজাযত দিন।'

ঃ 'এত জলদি?'

ঃ 'তিনি আমার প্রতীক্ষায় থাকবেন। মোলাকাতের জন্য আপনি তার দরখাস্ত কবুল করেছেন, একথা শোনার জন্য তিনি বেকারার।'

ঃ 'সত্যি বলবে, সংবাদ না দিয়ে যাওয়ায় তিনি রাগ করেননি তো?'

ঃ 'না, বরং আপনার অভ্যর্থনার জন্য থাকতে পারেননি বলে আফসোস করেছেন।'

ঃ 'বসো, এখুনি আমি আসছি।'

শাহজাদী চলে গেলেন অন্য কামরায়। বসল মিয়ানদাদ। খানিক পরই স্বর্ণের কারুকার্য খচিত খঞ্জর হাতে ফিরে এলো শাহজাদী। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। শাহজাদী তাকে খঞ্জর পেশ করে বললঃ 'ফররুখের প্রথম উপহার নিয়ে আসা ব্যক্তি আমার ঘর থেকে খালি হাতে যেতে পারে না। এ খঞ্জর তোমার। ফররুখের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময়ও আমার আফসোস ছিল, তোমায় কোন তোহফা দিতে পারি নি।'

ঃ 'আমি আপনার শোকর গোজারী করছি।' খঞ্জর হাতে নিল মিয়ানদাদ।

সোনার তশতরীতে সোরাহী আর পানপাত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল এক খাদেমা। বিমূঢ়ের মত চাইতে লাগল মিয়ানদাদ। ত্রিপয়ে তশতরী রেখে দিল খাদেমা। আজমেরী নিজের হাতে সোরাহী থেকে পানপাত্র ভরে পেশ করল মিয়ানদাদকে। অনুনয়ের দৃষ্টিতে শাহজাদীর দিকে তাকাল সে। বললঃ 'শুকরিয়া। এসবের কোন প্রয়োজন নেই।'

মুচকি হাসল আজমেরী। হাতের পেয়ালায় ঠোঁট লাগিয়ে এক ঢোক শরাব মুখে নিয়ে মিয়ানদাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললঃ 'এতে বিষ ছিল না। এক ঢোক পান করেই বেহুশ হয়ে যাবে এ ভয়ও নেই আমার।'

লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে শাহজাদীর হাত থেকে পাত্র নিল মিয়ানদাদ। এক নিঃশ্বাসে তা খালি করে রেখে দিল তশতরীতে।

ঃ 'মাফ করুন।' বলল ও। 'আমি তা বলতে চাইনি। আপনার হুকুম হলে পুরো সোরাহী ....'

মৃদু হাসল শাহজাদী।

ঃ 'না, তোমায় এমন হুকুম আমি দিতে পারি না। এ শরাব এত ভাল, সোরাহীর

সবটুকু পান করলেও তোমার নেশা হবে না। গন্ধও আসবে না মুখ থেকে। যদি ফররুখের অসন্তুষ্টির ভয় কর, তবে তাকে আমি বলব। এবার তুমি যেতে পার।'

আঠার

পরের রাত। ফররুখ যাদ আর মিয়ানদাদ একই দস্তরখানে এই প্রথমবার খানা খাচ্ছিল। ফররুখ যাদ ভীষণ খুশী। কথায় কথায় দরাজ হাসিতে মেতে উঠছিলেন তিনি।

ঃ 'মিয়ানদাদ।' তিনি বললেন। 'আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত। আজমেরী বানুর ব্যাপারে তোমার ধারণা বিলকুল ঠিক। সে আমায় অবজ্ঞা করে না। তোমার ওফাদারী তাকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। সে বলেছে, মিয়ানদাদের মত ত্যাগী ব্যক্তিকে সবসময় সাথে রাখা উচিৎ। শাহপুর আজো তার কাছে যেতে আমায় নিষেধ করেছিল। তার ভয়, সে আমায় অপমান করবে। তুমি আমায় সাহস না জোগালে তার কাছে যাওয়ার সাহস হতো না আমার। আমি যেতেই নিজের হাতে আমায় শরাব পেশ করল। খানিকটা সংকোচ বোধ করলাম আমি। সে নিজেই এক ঢোক পান করে পেয়ালা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললঃ 'এর চেয়ে ভাল তোহফা তোমায় আমি পেশ করতে পারব না। একটু পান করেই দেখ, খোরাসানী আঙ্গুরের মিষ্টি আর ফুলের সৌরভ অনুভব করবে।' এক পেয়ালার পরিবর্তে দু'পেয়ালা পান করেছি, তবুও পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি আমার। শরাবে কোন নেশা ছিল না, ছিল এক ফুরফুরে আনন্দ, যা এখনো আমি অনুভব করছি। ফিরে আসছিলাম, গোলামকে দিয়ে শরাবের এক সোরাহী আমার সাথে দিয়ে শাহজাদী বললঃ 'অনেকদিন থেকে দুই সোরাহী শরাব এ জন্য রেখে দিয়েছিলাম যে, শাদীর দিন এ হবে আপনার জন্য আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট তোহাফা।' মিয়ানদাদ, খানিক পান করে দেখ। শাহজাদী বলছিল এ শরাবের বয়স আমার চেয়ে বেশী।'

ফররুখ যাদ সামনের নকশা আঁকা সোরাহী থেকে এক পেয়ালা শরাব মিয়ানদাদকে দিল। মিয়ানদাদ বলতে চাইছিলঃ 'এ শবার আমি পান করেছি।' কিন্তু জবান খোলার সাহস হলো না তার। ধীরে ধীরে পেয়ালা মুখে তুলে নিল ও। ফররুখ যাদ দ্বিতীয় পেয়ালা ভরে দিয়ে বললঃ 'শাহজাদী বলেছে, এন্তাকিয়ায় কায়সারের সঙ্গী এক গ্রীক গোলাম এ শরাব তৈরী করেছে। খসরুর এন্তাকিয়া বিজয়ের পর তাকে শাহী শরাবখানা দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। আবার তা রোমানদের অধিকারভুক্ত হলে শাহী মহলের কর্মচারী তাকে নিয়ে এসেছে মাদায়েন। মারা গেছে সে। মাদায়েনের শাহী মহলে তার তৈরী শরাবও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই দুই সোরাহী বেঁচে গেছে এজন্য

যে, শরাবখানার দায়িত্বশীল শাহজাদীকে গোপনে তা পাঠিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু সে-ই এর কদর দিতে পারবে।'

ঃ 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, এ দুষ্প্রাপ্য তোহফার ভাগ আমায় দিয়েছেন। এ শরাব আসলেও খুব ভাল।'

ঃ 'উৎকৃষ্ট শরাব দিয়ে আমি বিশ্বস্ত দোস্তদের সম্মান করি। তুমি আমার নিকটতম বন্ধু।'

ঃ 'শাহজাদী আপনার তোহফা পছন্দ করেছেন?' তাকে খুশী করতে বলল মিয়ানদাদ।

ঃ 'হ্যাঁ, সে খুব খুশী হয়েছে। আফসোস! এতদিন তার ব্যাপারে ভুলের মধ্যে ছিলাম। শাহজাদী খোরাসানের আবহাওয়া, পাহাড়, ঝর্ণা এবং ফুল ও ফল সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে। আমার মহলের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করেছে। তার সাথে ওয়াদা করেছি, বিয়ের পর কয়দিনের জন্য খোরাসান যাব। মিয়ানদাদ, আমার ইচ্ছে, শাহজাদীর জন্য খোরাসানে এবং মাদায়েনে আলীশান মহল তৈরী করব। এ মহল তার সম্মানের উপযুক্ত নয়।'

অনেকক্ষণ ধরে শাহজাদী আজমেরীর ব্যাপারে আলাপ করল ফররুখ যাদ। প্রকাশ্যে মিয়ানদাদের মনোযোগ ছিল তার কথার প্রতি, কিন্তু কখনও তার দৃষ্টি সে মহাশূন্যে ঘুরপাক খেত, যার অসীম নীলিমা ছিল আজমেরীর কল্পনায় পরিপূর্ণ। যখনি ও তাকাতো ফররুখ যাদের দিকে, তার মনে হতো এক প্রবঞ্চিত ব্যক্তির সারল্য, বোকামী আর অসহায়ত্ব তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ফররুখ, মিয়ানদাদ আপন মনে বললঃ 'আজমেরী বানু যদি তোমার এ আবেগের সম্মান করে, তার মুচকি হাসি যদি হয় শুধু তোমার জন্য, নিঃসন্দেহে তুমি এক ভাগ্যবান পুরুষ। কিন্তু এ বয়সে যদি তুমি মরীচিকাকে আবেহায়াত ভেবে থাকো, আর আজমেরী হয় সেই মেয়ে যেখানে নিবদ্ধ তোমার হৃদয় ও মন, তবে আহার মুজাদ যেন তোমার অবস্থার ওপর রহম করেন।

এক সপ্তাহ পর। জীবনের সুন্দর এক স্বপ্নের তা'বীর দেখছিলেন ফররুখ। আজমেরীর সাথে সম্পন্ন হয়েছে তার শাদীর রুসমত। বৌভাতের ব্যবস্থা হয়েছে যে শাহী বাগানে, তাকে মনে হচ্ছিল যাদুর রাজ্য।

দ্বি প্রহর। মেহমান মেজবান মিলে জমায়েত হয়েছে প্রায় তিন হাজার লোক। গান আর বাজনার তালে তালে চলছিল নাচ। পরিচারিকারা সোনার পাত্রে শরাব পেশ করছিল সবাইকে। প্রায় হাত দুয়েক উঁচু চত্বরে সাজানো হয়েছিল শাহপুরের মসনদ। তার ডানের সোনার আসনের শোভা বাড়াচ্ছিলেন ফররুখ যাদ। অন্যান্যরা মসনদের ডানে বাঁয়ে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট। গায়ক, বাদক আর নর্তকীরা যার যার আপন কাজে

মগ্ন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত এবং করদ রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন জলসায়। আসনের সারি শেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র সৈনিকেরা। লাল রংগের গাঢ় কাজ করা পোশাক পরেছিলেন শাহানশাহ। শরীরের গড়নের তুলনায় মুকুট ঈষৎ বড় মনে হচ্ছিল। বিষন্ন ক্লান্তি ফুটে উঠছিল তার চেহারায়। মহলের সে কামরার কথা স্মরণ হচ্ছিল তার- এ বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে যেখানে নিরিবিলি আরাম করতে পারবেন তিনি। পেছনে দু'জন আরমেনীয় গোলাম দুলাচ্ছিল ময়ূরের পালকের তৈরী পাখা। তবুও দম যেন আটকে আসছিল তাঁর।

গরম, ক্লান্তি অথবা পোশাকের বোঝার কোন অনুভূতিই ছিল না ফররুখের। এ মাহফিল শাদীর আনুষ্ঠানিকতার এক অংশ, এতটুকুই ছিল তার আকর্ষণ। এর পরই তো কনের সাথে পৌছে যাবেন মহলে। তিনি পর্দার দিকে তাকাচ্ছিলেন বারবার। ভারী পর্দার ফাঁকে সূর্যের সামান্য ঝলক দেখে তার মনে হচ্ছিল, অলস হয়ে পড়েছে সময়ের গতি। এর পরই তার সমগ্র চিন্তা চেতনা ঘুরপাক খেত শাহজাদীকে ঘিরে। রংগীন এ মাহফিল মিলিয়ে যেত দৃষ্টির আড়ালে। কল্পনার সে জলসায় পৌছে যেতেন তিনি, মাদায়েনের রমনীরা যেখানে জমা হয়েছে আজমেরী বানুর চারপাশে। তার অনুভূতি আর কল্পনারা হারিয়ে যেতো আনন্দ উচ্ছ্বাসের বন্যায়। তার ডানের অষ্টম আসনে বসেছিলেন পারভেজ।

তৃতীয় প্রহর। সবেমাত্র শেষ হয়েছে নাচ গানের আসর। এক দরবারী শায়ের সাসানী খান্দানের শাসকদের শানে কবিতা পড়ছে। পারভেজের পিছনের সারিগুলোয় বসা এক ফৌজি অফিসার এগিয়ে একটা চিরকুট পেশ করলো পারভেজকে। দ্রুত দৃষ্টি বুলালেন তিনি। পিছন ফিরে অফিসারের হাতের ইশারা পেয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

শামিয়ানার বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল মিয়ানদাদ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললঃ 'জনাব, এ মুহূর্তে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি কিন্তু .....'

ঃ 'ভূমিকার দরকার নেই, তোমার চেহারায় পেরেশানী দেখতে পাচ্ছি।'

ঃ 'আপনার নির্দেশ মতই জনগণকে জলসার কাছে আসতে দেইনি। কিন্তু বর কনের ফিরে যাবার জন্য বাকী পথ পরিস্কার করা খুব মুশকিল হবে। আমার মনে হয়, মাদায়েনের সব মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। নদীর পুলে পা রাখার জায়গা নেই। লোকের উপর কঠোর হতেও আপনি নিষেধ করেছেন। আমার মনে হয়, বর-কনেকে আজকে মহলে ফিরিয়ে নিতে হলে কমপক্ষে পুল খালি করার জন্য কঠোর হতে হবে আমাদের। শহর কোতওয়ালের সাথে পরামর্শ করে আপনার খিদমতে আমি হাজির হয়েছি। তিনি বলেছেন, এ শাদীতে জনতা সন্তুষ্ট নয়। পথে অবাঞ্চিত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কোতওয়ালের পরামর্শ হচ্ছে, পাল্কীর পরিবর্তে হাতির ব্যবস্থা করা হোক শাহজাদীর জন্য। লোকেরা তাকে দেখে যেন শান্তনা পায়। পনর বিশটা হাতী সামনে থাকলে স্বেচ্ছায়ই সরে যাবে জনতা।'

ঃ 'কোতওয়াল বেকুব। ও জানেনা, ভয় পাওয়া একটা হাতী একলাখ মানুষের মিছিলের চেয়ে বিপজ্জনক। মাদায়েনের লোকেরা হাতীকে ভয় পাইয়ে দিতে জানে।'

ঃ 'তাহলে আপনার হুকুম?'

মৃদু হাসলেন পারভেজ।

ঃ 'দুলহা-দুলহীনকে নিরাপদে ঘরে পৌছে দেয়া আমার দায়িত্ব। তার ব্যবস্থা করছি আমি। আজ শাহজাদীকে দেখতে পাবে না মাদায়েনবাসী। কিশতীতে করে নদীর ওপারে পৌছে দেয়া হবে তাদের। শাহজাদীর উপঢৌকন সামগ্রীও নৌকায় থাকবে। লোকদের মাহফিল থেকে দূরে রাখার কথা যখন তোমাকে ভোরে বলেছিলাম, এ সব সমস্যাই আমার সামনে ছিল।'

ঃ 'উজিরে আজম তো ভাববেন না, তার ইচ্ছে মাফিক সড়ক পথের ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি?'

ঃ 'যত শীঘ্র সম্ভব ঘরে পৌছাই উজিরে আজমের খায়েশ। বরযাত্রীদের ভীড় থেকে বাঁচতে পারায় বরং তিনি খুশীই হবেন। বিপাকে না পড়লে খোরাসান থেকে আগত মেহমানদেরও তার নিজের ওখানে রাখতেন না। এখন গিয়ে নৌকাগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখো। কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে নৌকা ঘাটে আসতে দেবে না। বরযাত্রীর চিন্তা তুমি করো না। মাঝরাত পর্যন্ত ওদের এখানে রাখতে পারব আমি। ওরা যখন শুনবে দুলহা দুলহীন ঘরে ফিরে গেছেন, নিজেরাই চলে যাবে।'

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আটজন গোলাম আর পাঁচজন পরিচারিকাকে সাথে নিয়ে বুড়ো স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল আজমেরী বানু। তার প্রথম দাবী ছিল, নিজস্ব গোলাম ছাড়া মহলের কোন পাহারাদার কেউ দেউরীর এদিকে আসতে পারবে না। মহলের পাহারাদারদের জন্য মহলের বাইরে তাবু তৈরী করার হুকুম দিলেন ফররুখ। ভিতরের হিফাজতের জিম্মা দেয়া হল শাহজাদীর গোলামদের। খোরাসান এবং দূরের বিশেষ মেহমানদের স্থান ছিল মহলের নিচ তলায়।

সংগীদেরকে অবিশ্বস্ত ভাবায় নাখোশ হল মিয়ানদাদ। কিন্তু মন ভোলানো মৃদু হাসি ছড়িয়ে আজমেরী তাকাল তার দিকে। বললঃ 'আমার বিশ্বাস, সালতানাতের উজিরের হিফাজতের জন্য কোন লশকরের দরকার নেই। এদ্দিন যারা আমার হিফাজত করেছে, তাদের অবিশ্বস্ত পাবে না আমার স্বামী। তবে একথা আমি বলছি না, এখানে তোমাদের প্রয়োজন নেই। সামান্য এক চাকুরে নয় বরং আমার স্বামীর উৎকৃষ্ট দোস্ত হিসাবেই তোমাকে আমি মনে করি। আমি কেবল এদ্দুর নিশ্চয়তা চাই, এখানেই থাকবে তুমি, প্রয়োজনের সময় ডেকে আনতে হবে না। মহলের অন্দরে তোমার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে আগের মতই। আমার গোলামরাও হস্তক্ষেপ করবে না তোমার কাজে।'

রাত। ফররুখ আর তার মেহমানরা বসেছেন দস্তরখানে। কামরায় প্রবেশ করল মিয়ানদাদ। ফররুখ যাদের কানে কানে বললঃ 'জনাব, কিশতী থেকে মালপত্র নামানো হয়েছে। রাতের বেলা কোন কিশতী মহলের কাছে থাকবে না, এ ছিল পারভেজের নির্দেশ। কিন্তু শাহজাদী হুকুম দিলেন যে, তার নিজের নৌকা ফিরে যাবে না।'

ঃ 'এ ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি আছে?'

ঃ 'জনাব, এতে আমার কি আপত্তি থাকবে। কিন্তু কিশতীর মাল্লাদের সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।'

ঃ 'এরা শাহজাদীর গোলাম, এন্দুর জানাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?'

ঃ 'জনাব, আমার কিছু সিপাইকে নদীর দিকে পাহারায় রাখার অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

ঃ 'শাহজাদী যদি তার মাল্লাদের বিশ্বস্ত মনে করেন, তোমার পেরেশান হওয়া উচিৎ নয়। নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও, আজ সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে তোমার।'

খাওয়া দাওয়া শুরু হল। খাওয়া পর এল শরাব পানের পালা। হঠাৎ তার দিকে ফিরে ফররুখ বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, শাহজাদীর নৌকার মধ্যে দুটো সোরাহীও ছিল, তা নামানো হয়েছে?'

ঃ 'জী, ওগুলো উপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

ফররুখ গোলামকে বললেনঃ 'তুমি গিয়ে শাহজাদীকে বলবে, আমার দোস্তরা আজ সাধারণ শরাব পান করবেন না। তার আপত্তি না হলে দুটোর একটা এখানে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল গোলাম। একটু নীরব থেকে মেহমানদের দিকে ফিরলেন ফররুখ।

ঃ 'আজ এমন শরাব তোমাদের পান করাব যার মর্ম জানত শুধু কাইজারের সাকী।'

শরাব এল। এর রং, ঘ্রাণ আর স্বাদ ছাড়া আলোচনার আর কোন বিষয় রই লনা ওদের। বিজয়ীর হাসি ঠোঁটে এনে ফররুখ তাকালেন মেহমানদের দিকে। মিয়ানদাদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আহার মুজাদের কসম, শাহজাদীর দেয়া সেদিনের শরাবের চেয়ে এ শরাব আরো উৎকৃষ্ট। সেদিনের শরাবের নেশা ছিল মামুলী। এটা আরো তেজী মনে হচ্ছে। আমার দোস্ত! আজ আমরা বখিলি করবো না। তোমরা আরো এক বার করে নিতে পার। কিন্তু তারচে বেশী নয়।'

দ্বিতীয় পাত্র পান করে ফররুখ মিয়ানদাদকে বললেনঃ 'কি ব্যাপার মিয়ানদাদ? দ্বিতীয় পেয়ালা নেবে না তুমি?'

ঃ 'জনাব, একটাই আমার জন্য যথেষ্ট।'

ঃ 'না, না, তোমাকে আরেক পেয়ালা নিতেই হবে। চোখে তোমার পিপাসা।'

সাকীকে ইশারা করলেন ফররুখ। সে আরেক পেয়ালা এগিয়ে দিল মিয়ানদাদের দিকে।

রক্তের সঞ্চালন দ্রুত হচ্ছিল মিয়ানদাদের শিরায়। ঝিম ঝিম করছিল মাথা। তবুও ফররুখকে খুশী করতে দ্বিতীয় জামও পান করল ও। ফররুখ যাদ অনেকক্ষণ ধরে মেহমানদের মুখে শরাবের তারিফ শুনলেন। এক গোলামকে ইশারা করলে সোরাহী নিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

দাঁড়িয়ে গেলেন ফররুখ। জড়িত কণ্ঠে বললেনঃ 'আপনারা আরাম করুন।'

ফররুখ স্খলিত পায়ে হাঁটা ধরলেন। মিয়ানদাদ তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ির কাছে গিয়ে থামলেন তিনি। মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'কি ব্যাপার মিয়ানদাদ! তোমায় পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?'

ঃ 'আপনার শরীর কেমন?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আমি বিলকুল ঠিক। তুমি যাও, মেহমানদের প্রতি খেয়াল রেখো।'

সিঁড়ি ভাংতে লাগলেন ফররুখ। আজমেরীর কামরায় এসে দেখতে পেলেন আলীশান পালংকে শুয়ে আছে আজমেরী। তার দুই চোখ নিমিলীত, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঃ 'আজমেরী!' অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন তিনি। কিন্তু জওয়াব না পেয়ে বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। গভীর ভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার সুধা ভরা মুখের দিকে। সসংকোচে হাত এগিয়ে দিলেন সামনে। শাহজাদীর মিহি চুলের অরণ্যে খেলা করতে লাগলো তার আঙ্গুলগুলো।

ঃ 'আজমেরী!' আবার ডাকলেন তিনি। কপাল পেরিয়ে থুতনিতে গিয়ে থামল তার হাত। হৃদয় কাঁপছিল তার, বেড়ে যাচ্ছিল শ্বাস প্রশ্বাস। পালংকের ওপাশে আবলুশ কাঠের তেপয়ে দেখলেন সোরাহী আর জাম পড়ে আছে। জামে কিছু শরাব এখনো অবশিষ্ট। ঝুঁকে শাহাজাদীর মুখ শুকলেন তিনি। মৃদু হেসে জাম তুলে নিলেন হাতে। এক নিঃশ্বাসে গলায় ঢেলে দিলেন সবটুকু। বসে পড়লেন বিছানায়।

ঃ 'আজমেরী! আজমেরী বানু।' আবেগ মেশানো কণ্ঠে ডাকলেন তিনি।

চোখ মেললো শাহজাদী। মুচকি হাসল। ফররুখের মনে হল গোটা কামরায় ঝরছে আলোর ফুলঝুরি। শাহজাদীকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন ফররুখ। আচানক তার মনে হল কোন পর্বত শৃঙ্গ থেকে তাকে ফেলে দেয়া হচ্ছে গভীর আবর্তে। শাহজাদীর বাহু আকড়ে ধরা তার হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে এল। অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলেন তিনি।

ঃ 'আজমেরী! আজমেরী! এ শরাব? সত্যি করে বলো কি ছিল এতে? হাত পা অবশ হয়ে আসছে আমার। সোরাহীতে সম্ভবত কিছু মিশিয়েছ তুমি।'

ঃ 'আপনি একটু বেশীই পান করেছেন।' জড়িত কণ্ঠে বলল আজমেরী।

ফররুখের প্রতিরোধ শক্তি জেগে ওঠল অকস্মাৎ। শাহজাদীর বাহু ছেড়ে গর্দান চেপে ধরার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু নিঃশেষ হয়ে এসেছে তার জীবনী শক্তি। এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে লাফ মেরে সরে গেল আজমেরী। উপুড়ে হয়ে পড়ে গেলেন ফররুখ।

ঃ 'মিয়ানদাদ! মিয়ানদাদ!' চিৎকার করে ডাকলেন তিনি। কিন্তু সে আওয়াজ হারিয়ে গেল আজমেরীর অট্টহাসিতে। হাত তালি দিল শাহজাদী। পরিচারিকারা বেরিয়ে এল পেছনের কামরা থেকে। আরেক কামরা থেকে বেরিয়ে এল এক গোলাম। শাহজাদীর ইশারায় ফররুখের বাহু ধরে ছুঁড়ে মারল পালংকের নীচে।

শাহজাদী গোলামকে প্রশ্ন করলঃ 'মিয়ানদাদ কি করছে?'

ঃ 'নদীর পারে বসে পানি ঢালছে মাথায়।'

ঃ 'আর মেহমানরা?'

ঃ 'ওরা নিজেদের কামরায় ফিরে গেছে। কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, শরাবের ক্রিয়া শুরু হয়েছে ওদের উপর।'

ঃ 'আমি ভয় পাচ্ছি মিয়ানদাদকে। হায়! এ সোরাহী থেকে তাকেও যদি এক ঢোক খাওয়াতে পারতাম! সাথীদের তো অন্দরে ডেকে আনেনি সে?'

ঃ 'না, সিঁড়ির সামনে খানিক পায়চারী করে হঠাৎ দেউড়ীর দিকে যাত্রা করেছিল। বৃক্ষের আড়াল থেকে আমরা তীর ছুড়তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আওয়াজ ভেসে এল উপর থেকে। ও ফিরে এসে আমাদের সংগীদের জিজ্ঞেস করলঃ 'আমায়তো ডাকেনি কেউ?' ওরা জওয়াবে বললঃ 'আমরা কোন আওয়াজ শুনিনি তো?' কিছুক্ষণ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার নদীর পারে গিয়ে বসেছে।'

ঃ 'ও মাথায় পানি ঢালছে, তার মানে কিছুটা সন্দেহ অবশ্যই হয়েছে?'

ঃ 'সন্দেহ না হলে ও তলোয়ার কোষমুক্ত করতো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর সম্পূর্ণ হুশ ফিরে এলেও আমাদের সঙ্গীরা নিমিষে চির নিদ্রায় শুইয়ে দেবে ওকে।'

আজমেরী রেগে বললঃ 'গর্দভ! শুধু তার একটি মাত্র আওয়াজে চোখের পলকে ওর ত্রিশজন জানবাজ মহলে ঢুকে যেতে পারে। তাছাড়া মহলে রয়েছে মেহমানরাও। শরাবের নেশা চিৎকার থেকে ওদের বিরত রাখতে পারবে না। তুমি জলদি কিশতির মাল্লাদের গিয়ে বল, মিয়ানদাদকে সাথে নিয়ে আমি আসছি।'

ঃ 'আপনি.......মিয়ানদাদকে সাথে......কিন্তু?'

মুচকি হাসল শাহজাদী।

ঃ 'বেকুব, ভয় পাচ্ছ কেন? যাও, কিশতিতে আমার হার হারিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে নৌকায় উঠলে মাল্লারা শুধু তাকে নৌকা থেকে নামতে দেবে না। তার মানে এই নয় যে, ওকে কোতল করে দেবে।'

মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল গোলাম।

নদীর শীতল পানি মাথায় ঢেলে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল মিয়ানদাদ। চত্বরে খানিক পায়চারী করে সিঁড়িতে এসে বসে পড়ল। শরাব পান করার সময় যে আশংকা ওকে পেয়ে বসেছিল, ধীরে ধীরে দূর হতে লাগল। আপন মনেই বলল ওঃ 'অবশ্যই এ শরাব খুব তেজী, হয়তো নেশাযুক্ত কিছু মেশানো হয়েছে এতে। কিন্তু তা বিষ হতে পারে না। শাহজাদীকে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। হয়তো তিনি ফররুখ যাদ এবং মেহমানদের সাথে ঠাট্টা করেছেন। তবুও এ কোন সাধারণ শরাব নয়।'

মানসিক দ্বন্দ্ব অনেকটা তার দূর হয়েছে। এর সাথে দু'চোখ ভরে নেমে আসছে ওর রাজ্যের ঘুম। ভেসে এল কারো পায়ের আওয়াজ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও।

শাহজাদী আজমেরী বানু এক পরিচারিকা আর মশালধারী দু'জন গোলামকে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণিকের জন্য নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না ও।

মৃদু হেসে শাহজাদী বললঃ 'ভেবেছিলাম নিচে ঘুমিয়ে পড়েছ। শরাবের কোন ক্রিয়া হয়নি তোমার মধ্যে। হয়ত সে সেরাহী থেকে কোন ভাগও পাওনি তুমি।'

আজমেরীর কথায় শেষ সন্দেহটুকুও দূর হয়ে গেল মিয়ানদাদের। ও বললঃ 'নদীর পানিতে মাথা চুবানোর পর কিছুটা হালকা হয়েছে মাথা। নয়তো আমি ভেবেছিলাম সম্ভবত......'

উচ্ছ্বসিত হাসি ছড়িয়ে শাহজাদী বললঃ 'তুমি ভাবছিলে কোন নতুন বিষ আমি আবিষ্কার করেছি। শোন, আমার হারটা খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো কিশতিতে পড়ে গেছে। তোমার দোস্ত পান করছে আরো এক পাত্র। মনে হচ্ছে, সারা দুনিয়ার চেয়ে নিদ্রাই এখন তার বেশী প্রিয়। কিন্তু এ হারটা আমার মৃতা মায়ের চিহ্ন। তার খোঁজ না নিলে আমার ঘুম আসবে না। তুমি আমার সাথে এস। মাল্লাদেরও তল্লাশী নিতে হবে হয়ত।'

ঃ 'জ্বী, আচ্ছা চলুন।'

মিয়ানদাদের ইশারায় এক গোলাম আগে আগে চলল মশাল তুলে। ওরা নৌকায় আরোহন করল। আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেল মাল্লারা। হারের প্রসংগ তুললেন শাহজাদী। খুঁজতে লেগে গেল ওরা। মাথা ঘুরছিল মিয়ানদাদের। তবুও শাহজাদীকে খুশী করার জন্য শরীক হল ওদের সাথে। কিছুক্ষণ পর নিরাশ হয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল ওরা।

ঃ 'একি হতে পারে না যে, মহলেই রয়ে গেছে আপনার হার?' বলল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না, নৌকায় চড়ার সময়ও হার আমার গলায় ছিল। ভাল করে দেখ। নৌকায় না পেলে মাল্লাদের তল্লাশী কর।'

ঃ 'আমি পাহারাদারদের ডেকে আনাই।' বলে কিশতি থেকে নামতে চাইল

মিয়ানদাদ। পথ আগলে দাঁড়াল এক গোলাম। সঙ্গী মাল্লারা অপেক্ষা করছিল শাহজাদীর ইশারার। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবরে পড়ে গেল ও।

চিৎকার দিয়ে শাহজাদী বললঃ 'ওকে ছেড়ে দাও। ওকে খুন করার দরকার নেই।'

পিছনে সরে গেল ওরা। এক মাল্লা ওর বাহু ধরে সোজা করে দিল। রক্ত ঝরছিল ওর কপাল থেকে। কঁকিয়ে চোখ খুলল ও। তাকাল শাহজাদীর দিকে। কাঁপা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল মৃদু আওয়াজঃ 'আজমেরী! আজমেরী বানু!' আবার বন্ধ হয়ে গেল ওর চোখ দুটো।

ঃ 'ওর মাথায় ব্যান্ডেজ করে দাও।' বলে মুখ ফিরিয়ে নিল আজমেরী।

এক গোলাম ছুটে উঠে গেল কিশতির ছাদে। মশাল উঁচু করে দোলাতে লাগল। হঠাৎ ওপারেও জ্বলে উঠল মশাল।

ঃ 'ওরা আসছে।' বলল সে।

চারজন আরোহী নিয়ে ছোট্ট একটা নৌকা এগিয়ে এল। থামল এসে শাহজাদীর কিশতীর পাশে।

ঃ 'ছিয়াওখশ, আমি এখানে।' অনুচ্চ আওয়াজে বলল শাহজাদী।

কিশতি থেকে নেমে শাহজাদীর কাছে পৌঁছল ছিয়াওখশ। বললঃ 'মহলের মুহাফিজ আপনার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ঘন্টা খানেকের মধ্যে পারভেজের বাড়ী ঘিরে ফেলবে আমাদের লোকেরা। মুহাফিজ ফৌজের ছাউনীতে ভীতি ছড়ানোর কাজ শেষ। মিয়ানদাদকে নিয়েই আমি পেরেশান ছিলাম।'

ঃ 'মিয়ানদাদকে নিয়ে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই, ওদিকে দেখো।'

মিয়ানদাদের কাছে এসে মশাল নিচু করল গোলাম। ছিয়াওখশ নুয়ে তার নাড়ী দেখে তাড়াতাড়ি খঞ্জর বের করে বললঃ 'ও এখনো জীবিত!'

ঃ 'না, না।' তার হাত ধরে ফেলল শাহজাদী। বললঃ 'ওকে খুন করার অনুমতি আমি দেবো না। প্রতিশ্রুতি দাও, হাত তুলবে না ওর গায়ে।'

ঃ 'কিন্তু এমন লোক বেঁচে থাকাতো বিপজ্জনক!'

ঃ 'এ আমার হুকুম। ওকে পাঠিয়ে দাও কয়েদখানায়। তবে ফররুখ যাদের ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার তোমাদের দিলাম।'

ঃ 'সেও এখনো জীবিত?' হয়রান হয়ে বলল ছিয়াওখশ।

ঃ 'হ্যাঁ, বেহুশ হয়ে পড়ে আছে।'

ঃ 'আর মেহমানরা?'

ঃ 'ওরা ঘুমিয়ে।'

ঃ 'তার খোরাসানী গোলাম?'

ঃ 'ওরা বাইরের তাবুতে। মিয়ানদাদের লোকেরাও ওখানে। কিন্তু ওদের

ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরী। ওরা ঘুমায়নি হয়ত, তবে এখন আর এ বাড়ীতে হামলা করার দরকার হবে না।'

ঃ 'পরিস্থিতি আমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশী অনুকূলে। এখন ফররুখ যাদ থেকে নাজাত পাওয়াই আমাদের প্রধান সমস্যা।'

ঃ 'তোমাদের বিষ যদি ভেজাল না হয় তবে তার হাত থেকে নাজাত হাসিল করেছ। বিষের অর্ধেকটা শরাবের সোরাহীতে রেখে দিয়েছিলাম। ও কয়েক ঢোক পিয়েছে ওখান থেকে। এর আগে মেহমানদের সাথে যে শরাব পান করেছে তা ওকে ভোর পর্যন্ত অজ্ঞান রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল।'

ঃ 'আমার বিষ বিশজনকে হালাক করতে যথেষ্ট। তবুও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আপনি কি আমার সাথে আসবেন?'

ঃ 'না, তুমি নিজের কাজ করো।'

কিশতি থেকে নামল ছিয়াওখশ। এক গোলামের সাথে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। সিঁড়ি টপকে হাজির হল ফররুখ যাদের কামরায়। খঞ্জর বের করল ও। চোখ বন্ধ করল পরিচারিকারা। ওরা যখন চোখ খুলল, ফররুখের লাশ তড়পাচ্ছিল ছিয়াওখশের পায়ের কাছে। আজমেরীর দেয়া কার্পেট ভিজে যাচ্ছিল তার খুনে।

এক ঘন্টা পর। শাহজাদীর গোলামরা মিয়ানদাদকে কিশতি থেকে তুলে বারান্দায় শুইয়ে দিল। শাহজাদী আর ছিয়াওখশ দাঁড়িয়ে আছে নদীর পারে। উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিয়াওখশ বললঃ 'আমি হয়রান হচ্ছি, এখনো সংগীরা আমাদের সংবাদ দেয়নি কেন?'

ঃ 'সিংহাসনের জন্য আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি, খুন হওয়ার আগে যদি পারভেজ তা টের পেয়ে থাকে আর সুযোগ পেয়ে থাকে শাহী ফৌজের ছাউনী পর্যন্ত যাবার– তবে ইরানের মাটিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না আমাদের। কিন্তু মরার জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না তোমাদের। আমার কামরায় পড়ে আছে বিষ মেশানো শরাবের সোরাহী। শাহপুর খোরাসানীদের হাতে তুলে দিতে পারবে না আমাদের।'

শান্তনা দিতে দিতে ছিয়াওখশ বললঃ 'না, না। হিম্মত হারাবেন না। আমার সংগীদের প্রতি আস্থা আছে আমার।'

নৌকা থেকে এক মাল্লা ডেকে বললঃ 'জনাব, ঐ দিকে দেখুন।'

নদীর ও পারে তাকাল ওরা। প্রথমে একটা পরে দুটা মশাল জ্বলে উঠল। আনন্দে লাফিয়ে উঠল ছিয়াওখশ।

ঃ 'রাণীয়ে আলম! আপনার এক দুশমন বিদায় নিয়েছে দুনিয়া থেকে। নদীর ওপারে আপনার ভক্তরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। কিশতিতে সওয়ার হোন। গোলামরা আপাততঃ থাকবে এখানেই।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরে ছিয়াওখশ আরো বললঃ 'তোমরাও এখানে থাকো। বাড়ীর অন্দরে কাউকে ঢুকার অনুমতি দেবে না। শুয়ে থাকা মেহমানদের শুতে দাও। কারো জ্ঞান ফিরলে আওয়াজ করার মওকা দেবে না। একটু পরেই আমাদের সমর্থনকারী মুহাফিজ ফৌজরা এখানে পৌছে যাবে। মহলের বাইরে পাহারাদারদের পক্ষে থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। সকাল হওয়ার আগেই মিয়ানদাদ সম্পর্কে নির্দেশ পেয়ে যাবে। তার জীবন বাঁচানোর ওয়াদা আমি করেছি। কিন্তু ওর জ্ঞান ফিরে এলে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে না।'

রাতের তৃতীয় প্রহর। শাহী মহলের নায়েম এবং পাহারাদাররা ফটকের বাইরে তোপ ধ্বনি করে অভ্যর্থনা জানাল আজমেরীকে। পাঁচশ সশস্ত্র ব্যক্তি মুহূর্তে ঘিরে ফেলল শাহী মহল। যেসব অনুগত অফিসার আর পাহারাদাররা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেখবর ছিল, বীরের মত মোকাবিলা করল ওরা। কিন্তু টিকতে পারল না। ওদের লাশ মাড়িয়ে এগিয়ে চলল হামলাকারীরা।

খোজা আর পরিচারিকাদের চিৎকার এবং তরবারীর ঝনঝনানীতে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন শাহপুর। হামলাকারীরা ফটক ভাংছিল তখন। পালিয়ে যাওয়ার জন্য পেছনের দরজা খুললেন তিনি। দেখলেন, তার সামনে নাংগা তলোয়ারের দেয়াল দাঁড়িয়ে।

পিছনে সরতে চাইলেন তিনি। হামলাকারীরা বেষ্টনীতে আটকে ফেলেছে ততক্ষণে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'আমি তোমাদের শাহানশাহ। আমি তোমাদের জাতীয় পতাকার মুহাফিজ। সাসানিদের তখ্‌ত ও তাজের ওয়ারিশ। আমায় তোমরা হত্যা করতে পার না! ছেড়ে দাও আমায়, আমায় বাঁচাও। সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। আমাকে দেশ থেকে বের করে দাও, কিন্তু খুন করো না।'

কামরায় প্রবেশ করল আজমেরী বানু। অস্ত্রধারীরা সরে দাঁড়াল দু'পাশে। শাহপুর চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আজমেরী! আজমেরী! আমি তোমার চাচার সন্তান! বাঁচাও! আমায় বাঁচাও! ইরানবাসীরা তোমায় ক্ষমা করবে না। ওদের রুখো! ওদের রুখো! আজমেরী! আজমেরী!'

মুহূর্তের জন্য গর্দান ঝুঁকে গেল আজমেরীর। ক্ষণিকের জন্য শাহপুরের নিরাশ দৃষ্টিতে জ্বলে উঠল আশার আলো। ছিয়াওখশের দিকে তাকাল শাহজাদী আজমেরী। ফয়সালা করার শক্তি রহিত হয়ে গেছে তার। নড়ে উঠল ছিয়াওশের হাত। সাথে সাথে উপরে উঠল হামলাকারীদের তরবারী। আচানক নেমে এল তার হাত। অন্তিম চিৎকার বেরিয়ে এল শাহপুরের মুখ থেকে। সাথে সাথেই পনর বিশটা তলোয়ার ডুবে গেল খুনের মধ্যে।

আজমেরীর সমর্থকরা মাদায়েনের ওমরা আর ফৌজের কর্তা ব্যক্তিদের জাগিয়ে এ পয়গাম দিতে লাগলঃ 'শাহপুর নিহত। তার স্থলাভিষিক্ত শাহী দরবারে আপনাদের ইন্তেজার করছেন।'

যুগের সাথে তাল মিলাতে যারা অভ্যস্ত, বিস্তারিত প্রশ্ন না করেই শাহী মহলের পথ ধরল ওরা। কে মরেছে আর কে দখল করেছে সিংহাসন সে মাথা ব্যথা নেই তাদের। বরং নতুন শাসকের নৈকট্য হাসিল করতে কেউ যেন আগে যেতে না পারে, এ চিন্তাই কেবল ওদের মগজে। ওরা যখন দেখল কিসরার তখতে রয়েছেন শাহজাদী আজমেরী বানু, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তার– এ পর্যন্ত পৌছত কোন্ পথ তিনি গ্রহণ করেছেন এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করলো না কেউ।

উনিশ

রাতের শেষ প্রহর। গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল মাহবানু। বাড়ীর আঙ্গিনায় শোরগোল করছিল গোলামরা। দরজার কড়া নাড়ল কেউ। উঠে এগিয়ে গেল ও।

ঃ 'কে?'

ঃ 'দরজা খুলুন।' বলল গোলাম।

হৃদয় কেঁপে উঠল মাহবানুর। দ্রুত দরজা খুলে দিল। দুজন গোলামের সাথে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে ফেরদৌসী। অবিন্যস্ত চুল। ভয়ে বিস্ফারিত দুই চোখ। দীল বসে গেল মাহবানুর।

ঃ 'ফেরদৌসী! এই অসময়ে? বল কি হয়েছে?'

জওয়াব দিল না বৃদ্ধা। হতবাক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাহবানুর দিকে। অকস্মাৎ কেঁপে উঠল ও। চিৎকার দিয়ে জড়িয়ে ধরল মাহবানুকে। কিছু বলার চেষ্টা করল বৃদ্ধা। কিন্তু কান্নার গমকে মিশে গেল তার আওয়াজ। মাহবানুর পেরেশানী রূপ নিল ভয়ে। চিৎকার দিতে চাইল ও, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না কণ্ঠ থেকে। অসহ্য বেদনাভারে পিষ্ট হতে লাগল তার হৃদয়। ফেরদৌসীর বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'আমায় বল! বল ফেরদৌসী কি হয়েছে?'

অনেক কষ্টে কান্না রোধ করে ফেরদৌসী বললঃ 'তিনি মরে গেছেন। বেটি আমার, আমার স্বামী ও আমাদের মুনীব নিহত হয়েছেন।'

ক্ষণিকের জন্য নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না মাহবানু। ও চিৎকার দিয়ে উঠলঃ 'আমার ভাইয়া কোথায়?'

ঃ 'আমি জানিনা। তিন দিন যাবত ও সেখানে আসতো না।'

ঃ 'তাদেরকে কে খুন করেছে?'

ঃ 'আমি জানি না। বাগানের দেয়াল ফুটো করে অন্দরে এসেছিল হত্যাকারী। অন্দরে এসেই বারান্দার সামনে দুজন পাহারাদারকে হামলা করে। নীলুর পিতা আর নানা চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নিলুর বাবার হাতে ছিল মশাল। গেটের পাশে পড়েছিল এক পাহারাদারের লাশ। অন্যজন আহত হয়ে উঠার চেষ্টা করছিল। সে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আপনারা পালিয়ে যান। দেয়াল ভেংগে দুশমন ভেতরে প্রবেশ করেছে।'

বৃক্ষের আড়াল থেকে শুরু হলো তীর বৃষ্টি। আহত হয়ে পড়ে গেল পাহারাদার দু'জন। আমি ছুটে গেলাম। কিন্তু মুনীব আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং নিজেও পড়ে গেলেন। ততোক্ষণে পিতার কাছে পৌঁছে চিৎকার জুড়ে দিল নিলুফার। আমার হাত আকড়ে ধরেছিলেন মুনীব। তিনি চিৎকার করে বললেনঃ 'নিলুফার, তুমি ভেতরে চলে যাও।'

অকস্মাৎ শনশন করে ছুটে এলো কয়েকটা তীর। আহত হয়ে পড়ে গেল নিলুফার। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুশমন। আমাকে আঘাত করার জন্য হাত তুলল একজন, কিন্তু আরেকজন তাকে বাঁধা দিল। মশাল জ্বেলে ওরা দেখতে লাগল সবাইকে। তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন মুনীবও। উঠে বসতে চাইলেন তিনি। এক ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাত করলো তার গর্দানে। তড়পাতে তড়পাতে ওখানেই মারা গেলেন তিনি। পিতার লাশের ওপর আছড়ে পড়ল নিলুফার। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শেষ হয়ে এলো তারও জীবনীশক্তি।

ভেতর থেকে ছুটে এলো অন্য গোলামরা। চোখের পলকে ওদের তিনজনকে হত্যা করল হামলাকারীরা। এগিয়ে আসা বাকী দু'জন পিছু হটে পালাতে চাইল। ওদের পিছনে ধাওয়া করল দুশমন। এক ব্যক্তি ধাওয়াকারীদের ডেকে বললোঃ 'ওদের পিছু নেয়ার দরকার নেই। ঘর থেকে বেরুলেই ওরা আমাদের সঙ্গীদের তীরের আওতায় পড়বে। এখন চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

অনেকক্ষণ বিশ্বাস হলো না ওরা চলে গেছে। যখন বুঝলাম ওরা আর ফিরে আসবে না তখন মশাল জ্বেলে আমার মেয়ে, স্বামী আর মুনীবের লাশের পাশে গেলাম। পালিয়ে যাওয়া এক গোলাম ফিরে এসে বলল, তার যে সাথী তার সাথে পালাচ্ছিল সে নিহত।'

বৃদ্ধা একটু দম নেয়ার জন্য থামলে মাহবানু প্রশ্ন করলঃ 'সে গোলামের সাথেই তুমি এসেছো এখানে?'

ঃ 'হ্যাঁ, ও আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেছে। ফররুখের মহলে তোমার ভাইয়ের সংবাদ নিতে গেছে ও। মাহবানু, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না ওরা সব মারা গেছে। অথচ নিজের চোখে সব আমি দেখেছি। এখন হয়তো শীতল হয়ে

গেছে ওদের লাশ। রাতে আমার স্বামী পারভেজকে বলছিলেনঃ 'মিয়ানদাদ খুব ব্যস্ত। এজন্য মাহবানুকে কয়েকদিনের জন্য এখানে নিয়ে এসো।'

এ কথা শুনে নীলু কী যে খুশী হয়েছিল! ও বলছিলঃ 'ভোর হলেই আব্বার সাথে আমিও যাব।'

ঃ 'কিন্তু ওরা কারা?'

ঃ 'জানিনা। তবে এদ্দুর বলতে পারি, ওরা ডাকাত নয়। আমাদের ঘর থেকে কিছুই নেয়নি ওরা। যাবার সময় এক ব্যক্তি সংগীকে বলছিলঃ 'তোমরা কি অন্ধ নাকি, তোমরা একজন মহিলাকে খুন করলে কিভাবে?'

গোলামদের দিকে ফিরল মাহবানু।

ঃ 'তোমরা ফেরদৌসীর প্রতি খেয়াল রেখো। আমার জন্য ঘোড়া তৈরী করো। আমি ভাইয়ার খোঁজে যাচ্ছি।'

ঃ 'না, এ মুহূর্তে ঘর থেকে বেরুনো আপনার ঠিক হবে না।' জওয়াব দিল এক গোলাম।

ঃ 'আমার বিশ্বাস, পারভেজের মৃত্যুর খবর পেলে তিনি এক মুহূর্তেও দেরী করবেন না। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, তার পক্ষ থেকে কোন সংবাদ না এলে আমি নিজেই যাব। এ অবস্থায় ঘর থেকে বেরুনো কোন মতেই উচিৎ হবে না আপনার।' বলল আরেকজন।

ঃ 'না, এখুনি তুমি যাও। জলদি ফিরে আসার চেষ্টা করবে। আর শোন, পারভেজের মৃত্যু নিয়ে আমার ভাই এবং ফররুখ যাদ ছাড়া কারো সাথে কথা বলো না।'

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে গোলামের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিল মাহবানু। হঠাৎ বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। গোলাম এসে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে।

ঃ 'ফররুখের মহলের বাইরে পাহারাদার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ভোরের আগে মহলের ফটক খোলা যাবে না।' পাহারাদারদের অধিকাংশই আমাকে চেনে। মিয়ানদাদের কথা জিজ্ঞেস করতেই ওরা বললঃ 'সে অন্দরে, আরাম করছে সম্ভবতঃ।' পারভেজের ঘরের পাহারাদারকেও পথে পেয়েছিলাম। তখন সেও ফিরে আসছিল।'

ঃ 'আমি বুঝতে পারছি না শাহানশাহ আর ফররুখ থাকার পরও পারভেজের ঘরে হামলা করার সাহস ওদের হল কিভাবে। তিনি ছিলেন তাদের দোস্ত।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, ভোর হলেই মাদায়েনের সমস্ত ফৌজ পারভেজের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। তার খুন বৃথা যাবে না।'

ফেরদৌসীকে বলল মাহবানুঃ 'তুমি ওদের কাউকে চিনতে পারনি?'

ঃ 'না, ওদের চেহারা ছিল নেকাবে ঢাকা।'

ঃ 'পারভেজকে খুন করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে ফৌজের বিরোধীদের সাথে ওদের সম্পর্ক থাকার কথা। প্রকৃত অবস্থা বুঝার জন্য হয়ত ভোর পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

বাকী রাতের প্রতিটি মুহূর্ত মাসের চেয়ে দীর্ঘ মনে হচ্ছিল মাহবানুর কাছে। ফেরদৌসী কখনো হামলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত, কখনো কাঁদত মাহবানুকে জড়িয়ে ধরে। পূর্বের কালো দিগন্তে যখন ভেসে উঠল ভোরের চিহ্ন, অন্য এক গোলামকে ঘোড়া দিয়ে ফররুখের মহলের দিকে রওনা করিয়ে দিল মাহবানু। সূর্যোদয়ের সময় ফিরে এল গোলাম। বে বললঃ 'অভ্যুত্থান হয়েছে মাদায়েনে। আজমেরী বানুর পক্ষে শ্লোগান তুলছে লোকেরা। বাজারের অলি গলি আর পথে ঘাটে টহল দিচ্ছে ফৌজ।'

সঠিক অবস্থা জানার জন্য নিজেই বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল মাহবানু। এমন সময় এল আদমান। আঙ্গিনায় প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলঃ 'মিয়ানদাদ কোথায়?'

অন্ধকার ঘনিয়ে এল মাহবানুর দৃষ্টির সামনে। সংযত হওয়ার চেষ্টা করল ও। বললঃ 'তিনি তো ফররুখের ঘরে ছিলেন। তুমি ওখানে যাও নি?'

ঃ 'ফররুখ নিহত হয়েছেন। মদে মাতাল মেহমান ছাড়া তার ঘরে কেউ নেই! পারভেজের ঘর হয়েই আমি এসেছি। সম্ভবত আপনি জানেন না, নিহত হয়েছেন তিনিও। সিংহাসনে বসেছে আজমেরী বানু। শাহপুরকে হত্যা করিয়েছেন তিনি।

শহরের ধর্মীয় নেতারা আজমেরীর পক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছে। ফৌজি সর্দাররা এতে সন্তুষ্ট না হলেও রাণীর কাছে সালতানাতের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার ওয়াদা করেছে তারা। যে সব অফিসার আজমেরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে, গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের। আপনার ভাই যদি কোথাও আত্মগোপন করে থাকেন, তাকে হুশিয়ার করে দিন, ফৌজ অথবা জনগণ কারো কাছেই বিদ্রোহের আশা যেন না করেন। শাহপুর, পারভেজ আর ফররুখের মৃত্যুর পর নতুন রাণীর বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস হবে না করো। শাহী মহলের অন্দরে পুরান দখত আজমেরীর সাথে টক্কর লাগাতে পারত। কিন্তু সেও কোথায় আত্মগোপন করেছে। মুহাফিজ ফৌজের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়েছে ছিয়াওখশ। সে জানে, আপনার ভাই পারভেজ আর ফররুখের জন্য জীবন দিতে পারে। এজন্য তাড়াতাড়ি ছিয়াওখশের কাছে হাজির হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ। ফররুখের মহলের যে সব পাহারাদারের সাথে আমি কথা বলেছি, ওরা বলেছে, রাতে মহলের ভিতরেই ছিল আপনার ভাই। কিন্তু এখন তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে আদমানের কথা শুনছিল মাহবানু।

ঃ 'তিনি আসন নি।' বলল ও। 'আমাদের কোন সংবাদও দেননি তিনি। কিন্তু যদি তিনি বেঁচে থাকেন, জোর করে বলতে পারি, আপন দোস্তদের হত্যাকারীর কাছে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করবেন না তিনি।'

ঃ 'আমি তার দোস্ত। আপনাকে বলতে এসেছি, মিয়ানদাদ ছাড়া আপনার জীবন

ও ইজ্জত ঝুঁকিপূর্ণ। নিশ্চয়ই তিনি আপনার কাছে আসবেন। তাকে একথা বোঝানো আপনার কর্তব্য যে, একা আপনি ইরানী হুকুমতের বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন না।'

ঃ 'কিন্তু কোথায় তিনি?'

ঃ 'হায়! যদি আমি জানতাম।'

ঃ 'ফররুখ যাদকে মৃত্যুর মুখে রেখে আমার ভাই পালিয়ে গেছে, তুমি কি এ কথা কল্পনা করতে পার?'

ঃ 'না, আমার ধারণা, হয়ত আহত হয়েছেন তিনি, নইলে নিরাশ হয়ে আশ্রয় নেয়ায় চেষ্টা করেছেন কোথাও।'

ঃ তোমার সন্দেহ হলে ঘরে খুঁজে দেখতে পার।'

অশ্রুতে ভিজে গেল আদমানের দু'চোখ। বললঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি যদি আমায় মিয়ানদাদের দুশমন ভেবে থাকেন, অনুযোগ করব না। হায়! বুক চিরে যদি আপনাকে দেখাতে পারতাম। আমি তার দোস্ত। ফৌজের হাজারো সিপাই আমার মতই তার দোস্ত। ওরা সবাই চাইছে আপনার ভাই বেঁচে থাকুন। আমার বিশ্বাস, ইরানীরা বেশীদিন এ হুকুমত বরদাশ করবে না। যার বুনিয়াদ বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুমের ওপর তা বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। খোরাসানে ফররুখের ছেলে রুস্তম বসে থাকবে না। ঝঞ্ঝার মতই ও ছুটে আসবে মাদায়েনে। আজ যারা আজমেরীকে মোবারকবাদ দিচ্ছে, তারাই সব বিপদ মুসীবতের দায়িত্ব তুলে দেবে তার ঘাড়ে। কিন্তু এ মুহূর্তে সাহস আর ধৈর্যের সাথে সে সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মিয়ানদাদ মাদায়েনে থাকলে নিশ্চয়ই কোন দোস্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাকে খুঁজব।'

জ্ঞান ফিরে এল মিয়ানদাদের। একটা প্রশস্ত কামরায় পড়ে আছে ও। বন্ধ দরোজার পাল্লার ফাঁক আর ছাদের কাছের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে আসছে ক্ষীণ আলো।

ঃ 'আমি কোথায়? তোমরা কে?' প্রশ্ন করল ও।

ঃ 'তুমি আমাদের কয়েদী।' জওয়াব দিল এক যুবক। 'এ স্থান শহর থেকে অনেক দূরে। চিৎকার করলেও কোন ফায়দা হবে না।'

ঃ 'কিন্তু কার হুকুমে আমাকে এখানে আনা হয়েছে?'

ঃ 'তোমার সাথে বেশী কথা বলার অনুমতি নেই আমাদের। শুধু এদ্দুর শোন, এখানে কেউ তোমার সাহায্যে আসবে না।'

খানিক নীরব থেকে মিয়ানদাদ বললঃ 'আমাকে একটু পানি দিতে পার?'

ঃ 'এর জন্য খানা এবং পানি নিয়ে এস।' সঙ্গীদের বলল যুবক।

দু'জন বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। একটু পরই সোরাহী ভরা পানি নিয়ে ফিরে

এল একজন। গ্লাস ভরে পানি তুলে দিল ওর হাতে। এক নিঃশ্বাসে গ্লাস শূন্য করল মিয়ানদাদ। পিপাসা কমল না ওর। পরপর আরো দু'গ্লাস পানি পান করল ও। ততক্ষণে কাঠের খাঞ্চায় রুটি, খেজুর, আর এক টুকরো পনির এনে মিয়ানদাদের সামনে দিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। খাওয়ার দিকে মন দেয়ার পরিবর্তে ও কখনো অস্ত্রধারীদের দিকে, কখনো ছোট্ট দরজা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিল।

আঙ্গিনায় বৃক্ষের ছায়ায় কয়েকটা উট জাবর কাটছিল। আরেকটু দূরে ছাপরার নীচে দেখা যাচ্ছিল কতক ঘোড়া আর গরু। আঙ্গিনার বাকী অংশ ছিল দৃষ্টির বাইরে। তবুও ছাগলের ডাক শুনে ওর আন্দাজ করতে অসুবিধা হল না, এ স্থান কয়েদখানা নয় বরং কোন জমিদারের বাড়ী। সামান্য এগিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করল ও। পাহারাদারদের অফিসার দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। বললঃ 'যদি পালানোর খেয়াল কখনো তোমার দীলে আসে, তবে মনে রাখবে উঠোনে পা দেয়ার পূর্বেই চার দিক থেকে তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হবে তোমায়। এখানে যেন তোমার কোন কষ্ট না হয় এ হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছে। আফসোস, এ মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল খাবার তোমায় আমরা দিতে পারছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার জন্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করতে পারব। এবার চারটে খেয়ে নাও। তোমার শান্তনার জন্য এদ্দুর বলতে পারি, তোমায় যিনি বন্দী করেছেন, তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।'

ঃ 'তোমরা যদি আমায় বল, ফররুখ যাদের মহল থেকে এখানে কি করে এসেছি, তোমাদের সব হুকুম আমি মেনে নেব, পালানোরও কোন চেষ্টা করব না আমি।'

সঙ্গীদের দিকে তাকাল অফিসার। সামান্য ভেবে নিয়ে বললঃ 'তোমায় শুধু এদ্দুর বলতে পারি, যারা তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে, ওরা আমাদের শুধু এতটুকু বলেছে যে, তুমি এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। তুমি পালিয়ে গেলে আমাদের সবাইকে ফাঁসীতে ঝুলানো হবে। এও তোমায় বলতে পারি, বেশী দিন এখানে থাকবে না তুমি। ওরা বলছিল, খুব শীঘ্রই তোমাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

ঃ 'এ কি কোন জমিদারের বাড়ী?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে গোলাম আর কিষাণরাই থাকে। তোমাকে বন্দী করার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের জমিদার সাধারনতঃ মাদায়েন থাকেন। এক রইস আদমীর গোলাম তোমায় এখানে রেখে গেছে। আমাদের কেউ তোমার দুশমন নয়, তুমি কে তাও আমরা জানি না।'

ঃ 'নিজের জীবন বাঁচাতে তোমাদের বিপদে ফেলবো না। যদি সে রইসের নাম বল নিরুদ্বেগ হতে পারি। সব ঘটনাই মনে হচ্ছে এক স্বপ্ন।'

ঃ 'এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার অনুমতি আমদের নেই।'

নিরাশ হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'মাদায়েন এখান থেকে কত দূরে, তা কি আমায় বলতে পারবে?'

: 'এতে তোমার কি লাভ?'

: 'কিছুই না। তাহলে বুঝতে পারতাম, কত ঘন্টা অথবা কত দিন আমি বেহুশ ছিলাম।'

মুচকি হেসে যুবক বললঃ 'মাদায়েন এখানে থেকে সাত ক্রোশ। কিন্তু তোমার সাহায্যে কেউ আসবে এ আশা নেই। তাহলে এখানে তোমায় রেখে যেতো না ওরা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মিয়ানদাদ। দামী লেবাস গায়ে জড়িয়ে প্রায় ষাট বছর বয়সী এক জমিদার হঠাৎ কামরায় হাজির হলেন। সরে দাঁড়াল অস্ত্রধারীরা। সরোষে পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ 'কয়েদীর সাথে কোন কথা বলতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছিল।'

: 'ওদের কোন অপরাধ নেই।' বলল মিয়ানদাদ। 'আমিই কথায় লাগিয়েছি ওদের। এক কয়েদীর কি এ কথা জানারও অধিকার নেই যে কে তাকে বন্দী করেছে?'

: 'তোমার সাথে কথা বলার অনুমতি ওদের ছিল না। তোমার প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াব আমি দিতে পারি। সে ব্যক্তির হুকুমেই তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, যে ইরানের নতুন রাণীর দক্ষিণ হস্ত।'

: 'ইরানের নতুন রাণী!' চমকে প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

: 'হ্যাঁ, শাহজাদী আজমেরী বানু ইরানের নতুন রাণী। তোমার ব্যাপারে তার নির্দেশ, কোন কষ্ট যেন না হয় তোমার। একটু পরই শাহী ডাক্তার তোমাকে দেখতে এখানে আসবেন। তুমি সুস্থ হলেই এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মনে হয়, মাত্র কয়েক দিনের জন্য ওরা তোমায় মাদায়েনের বাইরে রাখতে চাইছে।'

স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। সে বললঃ 'এ অসম্ভব। এমনটি কখনো হতে পারে না যে, শাহানশার সাথে গাদ্দারী করে ফররুখ যাদ আজমেরীকে তখতে বসাবে। ইরানের ফৌজ তা বরদাশত করবে না।'

: 'অভ্যুত্থানের দিন মাদায়েনের অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো আমি দেখেছি। ফররুখ এবং শাহপুর নিহত। যার নির্দেশে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, সে ছিয়াওখশ নতুন রাণীর উজীরে আজম। শাহজাদী পুরান কোথাও আত্মগোপন করেছেন।'

বেদনা ভরা কণ্ঠে মিয়ানদাদ বললঃ 'না না, এ কেমন করে হতে পারে যে, ইরানের ফৌজ শাহপুর আর ফররুখের হত্যাকারীদের আনুগত্য মেনে নেবে? কমপক্ষে শাহী ফৌজের সিপাহসালার গাদ্দারী করতে পারেন না।'

: 'সব ঘটনা তোমায় এখনো বলিনি। শাহী ফৌজের সিপাহসালারও নিহত হয়েছেন। যেসব অফিসারদের দ্বারা বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল, গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের।'

: 'না না, আপনি ভুল বলছেন। পারভেজের গায়ে হাত তোলার সাহস ইরানের কারো নেই।' অবিশ্বাস্য কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মিয়ানদাদ।

আচানক নিঃশেষ হয়ে এল তার শক্তি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। যখন হুশ ফিরল, পুরনো কার্পেটের পরিবর্তে আরামদায়ক বিছানায় শুয়েছিল সে। জমিদার ছাড়া শাহী ডাক্তারও বসেছিল তার কাছে।

দশদিন পর। সুস্থ হয়ে উঠেছে মিয়ানদাদ। কেল্লার মত এ বাড়ীর অন্দরে কয়েদী নয় বরং মেহমানের মতই ছিল তার অবস্থা। তার আরামের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিল জমিদারের গোলামরা। দিনের বেলা আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা করার স্বাধীনতা ছিল ওর। তবু ও কামরা থেকে বেরুলে ফটক বন্ধ করে দেয়া হত। সশস্ত্র পাহারাদাররা সচকিত হয়ে উঠত।

গোলামের চাইতে জমিদারের ব্যবহারে ও বেশী হয়রান ছিল। প্রতি দিন ভোরেই ওখানে আসতেন তিনি। তার প্রথম প্রশ্ন হতোঃ 'আপনার কোন কষ্ট হয়নিতো?' এরপর সাথে বসিয়ে খানা খাইয়ে শান্তনা দিয়ে বলতেনঃ 'ওরা খুব শীঘ্রই আপনাকে মাদায়েনে ডেকে পাঠাবেন। ছিয়াওখশের সাথে এখনো আমার মোলাকাত হয়নি। তিনি দারুণ ব্যস্ত। আমার মনে হয়, মাদায়েনের পরিস্থিতিতে রাণী খুব উদ্বিগ্ন। ফৌজের আনুগত্য সম্পর্কে তিনি ততটা নিশ্চিন্ত নন। তোমার ব্যাপারে তার কোন খারাপ ইচ্ছা থাকলে এতদিন তোমায় এখানে রাখতেন না।'

আবার কখনো তিনি বলতেনঃ 'আমার দুর্ভাগ্য! ছিয়াওখশকে নারাজ করতে পারছি না। নয়তো একদিনের জন্যও এখানে থাকতে তোমায় বাধ্য করতাম না। প্রতিশ্রুতি দাও, ক্ষমতা পেলে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে না।'

মিয়ানদাদ তাকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করতো। বলতোঃ 'আপনার অপারগতা আমি বুঝি।'

জমিদারের কাছ থেকে মাদায়েনের পরিস্থিতি শুনতো মিয়ানদাদ। পুরানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনো। খোরাসান না গিয়ে থাকলে শহরের আশেপাশের কোন বড় লোকের ঘরে লুকিয়ে আছে হয়ত। কেউ কেউ অবশ্য বলছে, রাণী তাকেও হত্যা করেছে। কিন্তু এ গুজব ততটা সঠিক মনে হয় না। রাণী তাকে হত্যা করিয়ে থাকলে হুকুমত এভাবে তাকে তালাশ করতো না।

কয়েকবারই বোনের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে চাইল মিয়ানদাদ। কিন্তু যুক্তির কাছে ও হার মানল, ও ভাবল, ছিয়াওখশের হুকুমে যে তাকে বন্দী রাখতে পারে, বোনের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

এগার দিন পর জমিদার তাকে সংবাদ দিলঃ 'আমার কাছে তোমার এই শেষ দিন। ছিয়াওখশের লোকেরা কাল তোমাকে মাদায়েন নিয়ে যাবে। রাণীর কাছে পেশ করা হবে তোমাকে। ছিয়াওখশের কথায় বুঝতে পেরেছি, অপরাধী হিসেবে তোমায় ওখানে নেয়া হবে না। হয়ত ফৌজের বড় কোন পদ পেয়ে যাবে। ছিয়াওখশ আর

রাণীকে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই রয়েছে তোমার সাফল্য।'

অতি কষ্টে রাগ সামলে মিয়ানদাদ বললঃ 'রাণী আর ছিয়াওখশ যদি পারভেজের হত্যাকারী হয়ে থাকে, তাদের আমি সন্তুষ্ট রাখতে পারবো না।'

ঃ 'মাদায়েনের চৌরাস্তায় যাদের ফাঁসীতে লটকানো হয়েছে তুমি কি তাদের দলে শামিল হতে চাও?'

ক্রোধে কেঁপে উঠল মিয়ানদাদ। বললঃ 'জালেমের সহযোগী হবো না আমি।'

ঃ 'কিন্তু জীবনটা খুইয়ে দিলে কারোরই কোন কাজে আসবে না। পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা পর্যন্ত তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। ঝড়ের তান্ডবে পড়লে বিশাল যে মহীরুহ, সেও উপড়ে যায়। যে ঝড়ের গতিবেগ রুখার সাধ্য নেই তোমার, তার কোলে ঝাপিয়ে পড়া কখনো উচিত নয়। তুমি কি জান, ছিয়াওখশের নির্দেশে তোমাকে এখানে না রাখলে আমার আর আমার সন্তানদের পরিণতি কি হতো? আমি এক মামুলী কৃষক। যার সারা জীবন কেটেছে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ছিয়াওখশের প্রতিবেশী। কিছুকাল থেকে তিনি নিজের জায়গীরের জিম্মাদারীও সঁপেছেন আমায়। এ হচ্ছে রাজ কর্তৃত্বের দাপট।'

ঃ 'আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অনুযোগ নেই, বরং আমার প্রতি এতটা খেয়াল রাখার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'তোমার কোন উপকার আমি করিনি। সত্যি বলতে কি, ছিয়াওখশকে যেমন ভয় করি তেমনি ভয় পাই তোমাকেও। আজ সে বিজয়ী, কাল বিজয়ী হতে পার তুমি। যদি কোন নিরপরাধ কয়েদীকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আস, তার হিফাজতের জিম্মা নিতেও অস্বীকার করতে পারব না আমি। কিন্তু আমাকে দিয়ে যদি কোন ভাল কাজ করিয়ে নাও, এ হবে আমার সৌভাগ্য। শক্তিমান যে, সে ভাবতে পারে অনেক কিছুই। কিন্তু এক অসহায়, কমজোর ইনসান শুধু নিজের জীবন, রুটি আর পোশাকের কথাই চিন্তা করতে পারে।'

ঃ 'তুমি কি চাও আমি এসব হত্যাকারীদের পায়ে পড়ি?'

ঃ 'না, আমি চাই আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করবে তুমি। পায়ে পড়ে যদি ওদের শাহরগ পর্যন্ত হাত পৌছে দিতে পার– তা কি এ অবস্থার চেয়ে ভাল নয় যে, দাঁড়ানো অথবা শূন্য হাত প্রসারিত করার পূর্বেই তোমায় ওরা নিঃশেষ করে দেবে? মিয়ানদাদ, তুমি এখনো যুবক। আমি এমন কোন দুর্ঘটনা চাইনা, যা জীবন থেকে তোমায় বিমুখ করে দেবে। শহরে গুজব রটেছে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে রুস্তম। সে দিনের অপেক্ষা কি তুমি করবে না, মাদায়েনে ওরা যখন প্রবেশ করবে, আমার মত কমজোর লোকেরা আশ্রয় পাবে তোমাদের কাছে?'

ঃ 'না, মরার আগে মরতে চাইনা আমি।'

শাহী মহলের এক কামরায় শাহজাদী আজমেরী বানুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিয়ানদাদ। সশস্ত্র পাহারাদারদের ইশারা করলেন রাণী। ওরা বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। কেবল ছিয়াওখশ দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদের কাছে।

ঃ 'ছিয়াওখশ! তুমিও যেতে পারো।' আরেক দিকে ফিরে উৎকণ্ঠা মেশানো স্বরে বললেন রাণী।

ছিয়াওখশ পেরেশান হয়ে প্রথমে রাণী পরে মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে উল্টো পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন আজমেরী বানু। তার ঠোঁটে লেপ্টে রইল বিজয়ীর হাসি। বললেনঃ 'ছিয়াওখশকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম, পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তোমায় কোন নিরাপদ স্থানে রাখতে। তাকে আরো বলেছিলাম, কোন কষ্ট যেন দেয়া না হয় তোমাকে।'

ধরা আওয়াজে মিয়ানদাদ বললঃ 'ছিয়াওখশের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আপনারও কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'না, তোমার চেহারা বলছে, শক্তি থাকলে আমার গলা টিপে দিতেও দ্বিধা করতে না। কিন্তু এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারছ না যে, আমি ইরানের রাণী। আর তোমার এমন কোন খাহেশ নেই, যা আমি পুরণ করতে পারবো না। ছিয়াওখশ জানে না, পরস্পরের কাছে আমরা কত পরিচিত। তার ধারণা, তুমি আমাদের দুশমন। যদি তুমি তার এ ভুল ধারণা দূর করতে পার, কোন বাঁধা ছাড়াই আমি তোমার মর্যাদা ও তরক্কীর পথ খুলে দিতে পারি।'

ঃ 'মাফ করুন। এখন আমি ইজ্জত আর যিল্লতের মাঝে কোন পার্থক্য করতে পারছি না। যে মহিলাকে আমি জানতাম ফররুখ যাদের স্ত্রী– তার ইশারায় জীবনও দিতে পারতাম আমি। তার ইচ্ছায় বিষ মেশানো শরাব পান করতে পারতাম। সাথে সাথে এই বলে গৌরবও অনুভব করতাম, তার কাছে এনামের কোন লোভ আমার নেই। এখন ইরানের রাণী যদি আমার জবান খোলার এজাযত দেন, প্রশ্ন করব, শাহপুর, ফররুখ আর পারভেজের হত্যাকারী কে?'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল আজমেরী বানুর চেহারা। ঠোঁট কামড়ে তিনি বললেনঃ 'শাহপুরের আসল হত্যাকারী তারাই, আমার সাথে গাদ্দারী করে যারা তাকে তখতে বসিয়েছিল। ফররুখ যাদের হত্যাকারী তারা, যারা ওজারতের লোভ দেখিয়ে আমার সাথে প্রতিজ্ঞা ভংগ করার জন্য তাকে বাধ্য করেছে। পারভেজকে বাঁচাতে পারিনি বলে আমার আফসোস হচ্ছে। আমার শক্তি থাকলে চেষ্টা করতাম তোমার মত তাকেও কয়দিন নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে। কিন্তু তিনি আমার দুশমনদের সাথে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। তার বেঁচে থাকাটা আমার জন্য বিপজ্জনক হতে পারতো। পারভেজের সাথে তোমার সম্পর্কের কথা আমি জানি। তুমি সুপুরুষ এবং নওজোয়ান। আমি মনে

করি, মৃত্যু পথের পথিকদের সংগী হতে চাইবে না তুমি। তুমি ইরানের সৈনিক। ইরানের রাণীর প্রয়োজন আছে তোমার মত সৈনিকের। মিয়ানদাদ! আমার দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের জওয়াব দাও, ইরানের তাজ তোমার হাতে দিয়ে যদি বলা হয় তোমার ধারনায় এর প্রাপক কে– কি জওয়াব তুমি দিতে? বলো, আমি কি এর উপযুক্ত নই।'

কিছু বলতে চাইছিল মিয়ানদাদ। কিন্তু শাহজাদীর মুচকি হাসি যেন মোহর এঁটে দিয়েছে তার ঠোঁটে।

ঃ 'ঘর থেকে বেরিয়ে লশকরকে খবর দেয়ার সুযোগ যদি পারভেজ পেতেন, তবে মাদায়েন চরম বরবাদী আর ধ্বংসের সমুখীন হতো। এ অবস্থায় তার জীবন বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তোমার অবস্থা আমার চেয়ে ভিন্ন। তুমি ইচ্ছে করলে কোন ঝুঁকি ছাড়াই হাজার হাজার জওয়ানকে ধ্বংসের পথ থেকে ফেরাতে পার। শাহী লশকরের কয়েকজন অফিসার আত্মগোপন করেছে। আমি শুনেছি, মাদায়েনবাসীকে ওরা বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করছে। শাহী ফৌজের নেতৃত্ব ছিয়াওখশকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেও বিদ্রোহীদের শান্ত করতে পারেনি। কেউ প্রচার করেছে, পারভেজের মত নিহত হয়েছো তুমিও। প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল, তুমি আমায় সমর্থন করলে শাহী ফৌজের নেতৃত্ব তোমায় সোপর্দ করব। সামান্য ক'জন বিদ্রোহীকে ভয় পাইনা আমি। ইচ্ছে করলে দু'দিনের মধ্যেই ওদের গ্রেফতারও করা যায়। কিন্তু আমি তাদের আস্থা এবং সমর্থন হাসিল করতে চাই। এ জন্য তোমার সহযোগিতা জরুরী। মিয়ানদাদ, আমার বিশ্বাস, তুমি নিরাশ করবে না আমায়।

বিদ্রোহীরা পুরান দখতের সাথে মিলেছে। কোন গোপন কেন্দ্র থেকে হুকুমতের তখত ওল্টানোর ষড়যন্ত্র করছে ওরা। আমাদের গোয়েন্দারা এখন পর্যন্ত ওদের খুঁজে পায়নি। কিন্তু তোমার পক্ষে তা অসম্ভব নয়। আমার ইচ্ছে, কয়েক দিনের জন্য তুমি আত্মগোপন কর। বিদ্রোহী অফিসারদের সাথে সম্পর্কে কায়েম করে পুরানের গোপন কেন্দ্র খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। পুরানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে তোমার প্রথম এনাম হবে ফৌজের নেতৃত্ব। এরপর ইরানের রাণীর পক্ষে সম্ভব তোমার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করব আমি।'

ঃ 'সম্ভবতঃ ইরানের রাণী এখনো আমার একটা খাহেশ পুরা করতে পারেন। তা হচ্ছে, ঘরে গিয়ে দেখব বোনটা এখানো বেঁচে আছে কিনা?'

আচানক নিষ্প্রভ হয়ে গেল আজমেরীর চোখের জ্যোতি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, তুমি কয়েদী নও। যেখানে ইচ্ছে তুমি যেতে পার?'

ঃ 'আমি আপনার শোকর গোজারী করছি।'

যাবার জন্য ঘুরল মিয়ানদাদ। আজমেরী বললেনঃ 'থামো! ঘরে গিয়ে পেরেশানী

ছাড়া কিছুই পাবে না তুমি।'

হৃদয় বসে গেল মিয়ানদাদের। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শাহজাদীর দিকে তাকিয়ে ও চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আমার বোন!'

ঃ 'ও ঘরে নেই। হায়! যদি জানতাম ও কোথায়! বিপ্লবের দু'দিন পর ও বাড়ী থেকে গায়েব হয়ে গেছে। তোমার গোলামরাও তার সাথেই আত্মগোপন করেছে হয়ত। ওখানে ছিল এক বৃদ্ধা খাদেমা। হয়ত মৃতা ভেবে ছেড়ে গেছে ওরা। নিশ্চল পড়েছিল সে। ডাক্তারদের চেষ্টায় কিছু সময়ের জন্য হুশ ফিরেছিল। বাকশক্তি রহিত ছিল ওর। তোমার বোন সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জওয়াব ও দিতে পারেনি। ঘটনা শুনেই শাহী ডাক্তারকে তোমাদের ওখানে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারেনি তাকে। হায়! দু'দিন আগে যদি তোমার বোনের সংবাদ নিতাম! কিন্তু তোমার বোন এখানে থাকে তা আমি জানতাম না। ঘটনাচক্রেই পুরান দখতের সঙ্গী অফিসারদের খুঁজতে গিয়ে গোয়েন্দারা ওখানে পৌচেছে। যদি ওদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পার, তোমার বোনকে খুঁজে বের করা মুশকিল হবে না। পারভেজের মত তুমিও নিহত, প্রথম দিনই ওরা তা প্রচার করেছে। একথা বিশ্বাস করে তোমার বোন যদি পুরান দখতের কাছে পৌছে গিয়ে থাকে, আমি তাজ্জব হবো না।'

স্তম্ভিত হয়ে ও তাকিয়ে রইল আজমেরী বানুর দিকে। তার ক্রোধ, পেরেশানী এবার রূপান্তরিত হল ভয়ে। চিৎকার দিতে চাইল ও, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না তার। মসনদ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন আজমেরী বানু। নুয়ে এল মিয়ানদাদের দৃষ্টি। হালকা সুবাসের সাথে আজমেরীর পোশাকের মৃদু আওয়াজ অনুভব করতে লাগল ও।

ঃ 'মিয়ানদাদ, বিশ্বাস করো আমায়। আমি তোমার দুশমন নই।'

রাগে, বেদনায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আমার দিকে তাকাও মিয়ানদাদ!' বলেই ওর কাঁধে হাত রাখলেন শাহজাদী।

ক্রোধে কাঁপছিল মিয়ানদাদ। আচানক ঘাড় তুললো ও। এক ঝটকায় সরিয়ে দিল আজমেরী বানুর হাত। খানিক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন। রাণীর মৃদু হাসি পরিণত হলো উৎকট পেরেশনীতে। মিয়ানদাদের ভয় রূপান্তরিত হল ঘৃণায়। কাঁপা আওয়াজে সে বললঃ 'আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কথা সঠিক হলে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

আশান্বিতা হয়ে আজমেরী বললেনঃ 'বলো, কোন কথা তোমায় আমি গোপন করবো না।'

ঃ 'পারভেজের গোলামদের সাথে কেমন ব্যবহার আপনি করেছেন?'

ঃ 'বাধা না দিলে একটা আঁচড়ও লাগত না ওদের গায়ে। আফসোস! ওদের বোকামীর ফলে কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।'

ঃ 'আপনাকে এক বৃদ্ধা খাদেমা, তার স্বামী এবং কন্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করছি।'

ঃ 'আমি শুনেছি, এক বুড়ো এবং তার যুবতী মেয়ে হঠাৎ তীরের আওতায় এসে মারা গেছে।'

হৃদয় বসে গেল মিয়ানদাদের। স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আজমেরী বানুর দিকে। ওর দুচোখে জ্বলে উঠল ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন।

ঃ 'তুমি সে মেয়েটাকে চেন? শুনেছি ও অসাধারণ রূপসী ছিল।'

চিৎকার দিয়ে উঠল মিয়ানদাদ।

ঃ 'হ্যাঁ, তাকে আমি চিনি। তার চোখে জীবনের যে আলো আমি দেখেছি, আমার দৃষ্টি থেকে তা মুছে যাবে না কখনো। হায়! তাকে যদি বলতে পারতাম, ইরান সালতানাতের চেয়ে তোমার অশ্রু আমার কাছে বেশী মূল্যবান।'

ঃ 'সে মেয়ের জন্যই প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায় পারভেজের ঘরে আসতে তুমি– এ সংবাদ তাহলে অমূলক নয়।'

ঃ 'ও যখন বেঁচে ছিল, তাকে নিয়ে ভাবতেও লজ্জা হত আমার। কিন্তু এখন মাদায়েনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়েও ঘোষণা করতে পারি– তার গায়ের প্রতিটি পশম ইরানের দাম্ভিক শাহজাদীদের চেয়েও দামী ছিল।'

মিয়ানদাদের চোখে টলমল করছিল অশ্রু রাশি।

ক্ষণিকের জন্য আজমেরী বানুর হৃদয় থেকে হারিয়ে গেল ক্ষমতা ও দম্ভের ভাবধারা। চিরন্তন এক নারীতে পরিণত হলেন তিনি। বললেনঃ 'আমি দুঃখিত মিয়ানদাদ। আমি জানতাম না তুমি তার প্রতি এত দুর্বল।'

মিয়ানদাদের মনে হল তার মাথায় আগুনের মশাল ঠেসে ধরেছে কেউ। ক্রোধে চিৎকার দিয়ে ও বললঃ 'আমার কমজোরী সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু জালেমদের কাছে অনুকম্পা ভিক্ষা চাইব না। ডাকাত আর হন্তারকদের সঙ্গ আমি দেব না। আমি জানি, এ পর্দার পেছনে তোমাদের জল্লাদ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডাকতে পার। এখন আমি পালানোর চেষ্টাও করব না।'

কথার চেয়ে মিয়ানদাদের দৃষ্টিতে প্রভাবিত হয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলেন শাহজাদী। চেহারায় হাসি ফুটানোর চেষ্টা করে বললেনঃ 'আসলেও তুমি পাগল। কিন্তু বোনের ব্যাপারে কি চিন্তা করেছ?'

মিয়ানদাদের মনে হল স্তব্ধ হয়ে গেছে তার শিরার রক্ত চলাচল। হতভম্বের মত ও তাকিয়ে রইল। হাত তালি দিলেন রাণী। সাথে সাথে আটজন সশস্ত্র ব্যক্তি নিয়ে কামরায় ঢুকল ছিয়াওখশ। মিয়ানদাদকে ঘিরে ফেলল ওরা। শাহজাদী বললেনঃ 'এ বেকুবকে ভাবার সময় দিতে হবে। ওকে নিয়ে যাও।'

নাংগা তলোয়ারের পাহারায় কামরা থেকে বেরুচ্ছিল মিয়ানদাদ। আজমেরী বানু ডাকলেনঃ 'ছিয়াওখশ, দাঁড়াও।'

ফিরে তার দিকে তাকাল ছিয়াওখশ। শাহজাদী এগিয়ে বললঃ 'ওকে কয়েদ করে রাখার হুকুম দিয়েছি। কিন্তু কঠোর ব্যবহার করবে না। আমার বিশ্বাস, দু'একদিনের মধ্যেই ও ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রতিবাদের স্বরে ছিয়াওখশ বললঃ 'এত কথার পরও ওর মাথা ঠিক হবার আশা রাখেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, এমন তিক্ত ব্যবহার না করলে ওকে আমি বিপজ্জনক মনে করতাম। এখন ওর অবস্থা এক আহত বাঘের মত। এ আঘাত সেরে গেলে জীবনের প্রতি এতটা বিতৃষ্ণা থাকবে না।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম! এদের বাঁচিয়ে রাখাও বিপদজনক। কমপক্ষে মহলের অন্দরে কয়েদ রাখা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না। শহরের কয়েদখানায় রাখতে আপনার আপত্তি হলে আমায় সঁপে দিন। আমার ঘরের গোপন কুঠুরীতে রাখব ওকে।'

ঃ 'এত বড় ঝুঁকি নিয়েছি আমরা, এখন এসব ছোটখাট বিপদের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তোমার বাড়ীর কোন অংশই আমাদের মহলের নিচের কয়েদখানা থেকে নিরাপদ নয়।'

কয়েদখানার একাকীত্বে তিন সপ্তাহ কেটে গেছে মিয়ানদাদের। বাইরের কোন অবস্থা জানতো না ও। তবে খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না। মাটির নিচের বন্ধ কামরা ছিল এত অন্ধকার, দিনেও প্রদীপ ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। লৌহফটক খুলত সকাল সন্ধ্যা। সশস্ত্র পাহারাদারের হিফাজতে ঘর সাফ করা, খাদ্য সামগ্রী পৌছানো এবং প্রদীপে তেল দিয়ে চলে যেত শাহী গোলাম। আরাম আয়েশের জন্য পরিচ্ছন্ন বিছানা দেয়া হল তাকে। কয়েকদিন পর ও বুঝতে পারল, আজমেরী বানু পরীক্ষা নিচ্ছেন তার। তিনি ভেবেছেন, বন্দীত্বের নিঃসঙ্গতায় অসহায়ত্বের শিকার হয়ে বশ মানতে বাধ্য হবে ও। আর তাই কারো সাথে কথা বলার চেষ্টা করত না সে। দু'দিন খাবারও ছোঁয়নি। বাইরের অবস্থা সম্পর্কে পেরেশান হয়ে পাহারাদারের সাথে আলাপ করতে চেয়েছে ও। কিন্তু কোন প্রশ্নের জওয়াব পায়নি। পাহারাদার নীরবে আসতো কামরায়, বাসী খাবার তুলে ফিরে যেত ও নতুন খাবার রেখে। লৌহ কবাট রুদ্ধ হয়ে গেলে নিজেকে শাসাত মিয়ানদাদ।

ঃ 'আমি আসলেও পাগল। আজমেরী বানুর সাথে তিক্ত ব্যবহার করা উচিৎ হয়নি। কয়েদখানায় থেকে বোনের কোন উপকার তো করতে পারব না। একটু সংযত হলে তিনি তো আমাকে মুক্তি দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মুক্ত হয়ে কোন আশ্রয় খুঁজে নেওয়া আমার জন্য মুশকিল হতোনা। এখন আমি জানিনা কি হচ্ছে মহলের বাইরে। আমার একটা পথই বাকী। রাণীকে আনুগত্যের ধোকা দিয়ে আজাদ হওয়ার চেষ্টা করা।'

আবার নিজের এ দুর্বলতায় লজ্জিত হত ও। নিজকে বোঝানোর চেষ্টা করত। ঃ 'মিয়ানদাদ, কোববাদের বেটা তুমি। সে জালেমের সামনে শির নোয়াবে না তুমি, যার হাত রঙীন হয়েছে পারভেজ আর নীলুর খুনে।' বোনকে নিয়ে ভাবলে বার বার ওর মনে প্রশ্ন জাগতঃ 'কে সেই বৃদ্ধা?' যার মৃত্যুর কথা বলেছিলেন রাণী, তাহলে কি সে ফেরদৌসী! স্বামী আর কন্যার লাশ রেখে পারভেজের ঘর থেকে মাহবানুর কাছে পৌছেছিল? সে মাহবানুকে খবরদার করে থাকলে, ইস্পাহান ছাড়া আর কোথায় ও যেতে পারে?'

বিশদিনের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার পর পাহারাদারকে ও বললঃ 'দারোগার সাথে আমি দেখা করতে চাই।'

কোন জওয়াব না দিয়ে ফিরে গেল পাহারাদার। খানিক পর খুলে গেল বন্ধ কবাট। অন্দরে প্রবেশ করে দারোগা বললেনঃ 'আমায় স্মরণ করেছিলেন?'

পরাজিত কণ্ঠে ও বললঃ 'হ্যাঁ, আমায় রাণীর কাছে নিয়ে চলো।'

ঃ 'রাণী এখানে নেই।'

ঃ 'কোথায় গেছেন?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল ও।

ঃ 'মাফ করুন, এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারব না। কিন্তু আমার লোকেরা আপনার সেবায় ত্রুটি করে থাকলে তা দূর করতে পারি।'

ঃ 'আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু রাণীর সাথে দেখা করতে চাইছি আমি।'

ঃ 'তিনি এলে আপনার দরখাস্ত তার খেদমতে পেশ করব।'

বেরিয়ে গেল দারোগা। দ্বার রুদ্ধ করে দিল পাহারাদার।

আরো আটদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাল মিয়ানদাদ। আধো ঘুমে বিছানায় পড়েছিল রাতে। খুলে গেল কামরার দরজা। মহলের দারোগা দু'জন সিপাই নিয়ে ভেতরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মিয়ানদাদ। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল দারোগার দিকে।

ঃ 'রাণীর সাথে মোলাকাতের জন্য প্রস্তুত হোন।'

ঃ 'এখন?'

ঃ 'হ্যাঁ, এখন।'

দরজার দিকে চাইলেন দারোগা। কয়েক মিনিট হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদ। দরজার বাইরে শোনা গেল কারো পায়ের আওয়াজ। দু'জন মশালধারী এবার দরজার বাইরে এসে থেমে গেল। ফিরে মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে দারোগা বললেনঃ 'মালাকায়ে আলম তশরীফ আনছেন।'

কেন যেন বিশ্বাস করতে পারল না মিয়ানদাদ। এক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল দরজার দিকে।

আজমেরী বানু এগিয়ে এলেন। মুহূর্তকাল থেমে মিয়ানদাদকে দেখে নিয়ে

এগিয়ে মিয়ানদাদের চেয়ে দু'কদম দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবিন্যস্ত তার চুল। বিবর্ণ চেহারা। দৃষ্টিতে তাঁর বিজলীর ঝলকের পরিবর্তে বর্ষার মেঘমালার বিষন্নতা। এর পরও তার সৌন্দর্য আর আকর্ষণে পার্থক্য হয়নি কোন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারপাশের কোন অনুভূতি রইল না ওর। সব অনুভূতিরা যেন হারিয়ে গেল আজমেরী বানুর উদাস দৃষ্টিতে। ও যখন স্বাভাবিক হল, দারোগা আর তার সংগীরা ততোক্ষণে ফিরে গেছে।

ঠোঁটে বেদনাভরা মৃদু হাসি টেনে আজমেরী বানু বললেনঃ 'আশ্চর্য! নিজের ছায়া দেখে যেখানে ভয় পাওয়ার কথা, নাংগা তলোয়ারের পাহারা ছাড়াই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই শান্তনাটুকু পাচ্ছি, ওরা এখানে পৌছলে শত ঘৃণার পরও আমার জন্য ঢাল হবে তুমি। কয়েকদিন আগেও কে বলতে পারতো শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার সমর্থন করার প্রতিজ্ঞা যারা করেছিল আজ তারাই দুশমন হবে আমার। আর এ অবস্থায় তোমার কাছে আমি আসবো? মিয়ানদাদ! আমার মাথা ঠিক নেই। সবগুলো ঘটনা স্বপ্ন মনে হচ্ছে। বলো, আমায় কি করতে হবে।'

ঃ 'আমি এক কয়েদী, এর চেয়ে বেশী কিছু আমি জানি না। বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি বেখবর।' অসহায় ভঙ্গিতে বলল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আমি পরাজিত। ফৌজের অফিসাররা মিশে গেছে দুশমনের সাথে। আমার পক্ষের লশকর লড়াই শুরু হতেই ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে। এখন মাদায়েনের দিকে এগিয়ে আসছে রুস্তম। এখান থেকে দু'মঞ্জিল দূরে ওদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করবে ছিয়াওখশ। কিন্তু তারওতো সৈন্য প্রয়োজন। ময়দান থেকে যারা পালিয়ে এসেছে, আবার ওদের জমায়েত করা যায়। ওমরা আর ধর্মীয় গুরুরা খোরাসানীদের হাতে শহর বরবাদ হোক তা চাইবেন না। তবে, শুধু কয়েক ঘন্টা রুস্তমকে মাদায়েন থেকে দূরে রাখতে পারলে আমাদের বিজয় নিশ্চিত। ফেরারী সিপাইদের ময়দানের দিকে ঠেলে দেবে মাদায়েনবাসী। আমি এখানে পৌছেই শাহী ফৌজের পাঁচ হাজার সওয়ারকে ছিয়াওখশের সাহায্যে এগিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছি। বাকী দলগুলো পাঠাতে চাই তোমার নেতৃত্বে।'

ঃ 'আমার নেতৃত্বে?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, তুমি হিম্মত নিয়ে কাজ করলে ভোর পর্যন্ত মাদায়েনের গোটা লশকর জমা হবে তোমার পাশে। মিয়ানদাদ! এখন কথা বলার সময় নেই, এসো আমার সাথে।'

মিয়ানদাদের হাত ধরলেন আজমেরী। ওরা বেরিয়ে এল কয়েদখানা থেকে। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল মশালধারী এবং মহলের দারোগা। ওরা হাঁটা দিল আগে আগে। মন্ত্রমুগ্ধের মত আজমেরীর সাথে সুড়ংপথ এবং সিঁড়ি ভাঙল মিয়ানদাদ। আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে ওরা পৌছল মহলের প্রশস্ত এক কামরায়। ক্লান্তিতে বসে পড়ে মিয়ানদাদকে বললেন আজমেরীঃ 'আমি দারুণ ক্লান্ত। এক মুহূর্তও বিশ্রাম না করে তিন

মঞ্জিলে সফর করেছি আজ। উফ! খানিক যদি বিশ্রাম করতে পারতাম!'

ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন তিনি।

ঃ 'তুমি কি দেখছো?' চোখ খুলে বললেন মহলের দারোগাকে। 'মিয়ানদাদ তোমাদের কয়েদী নয়। আর যদি আমি বেঁচে থাকতে পারি, তবে ইরানের তামাম লশকরের নেতৃত্ব থাকবে ওর হাতে। তুমি যাও। দরবারীরা জমায়েত হলে আমায় খবর দেবে। আর শোন, মিয়ানদাদের জন্য ভাল অস্ত্র এবং ঘোড়ার প্রয়োজন।'

ছুটে বেরিয়ে গেল দারোগা। আশান্বিতা হয়ে মিয়ানদাদের দিকে চাইলেন রাণী।

ঃ 'অস্ত্রপাতির দরকার নেই আমার। আমার প্রতি একটু ইহসান করুন। আবার আমায় সেই কুঠুরিতে পাঠিয়ে দিন।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল রাণীর চেহারা। বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, আমায় নিরাশ করো না। আজ তোমাকে ভীষণ প্রয়োজন আমার। তার চেয়ে বেশী ইরানের। খোরাসানী পশুরা মাদায়েন কব্জা করুক তা তুমিও পছন্দ করবে না। তোমাকে এ আশ্বাস আমি দিতে পারি, তুমি মুহাফিজ লশকর নিয়ে যখন শহরে টহল দেবে, মুহূর্তে মাদায়েনের পুরা লশকর জমায়েত হবে তোমার পাশে। পুরান দখতের প্ররোচনায় ফৌজ নিয়ে আসছে রুস্তম। শহরের আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। আমার বিশ্বাস, জনগণ শহর রক্ষায় কোমর বেঁধে দাঁড়ালে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে সরাসরি রুস্তমের সাহায্য করার সাহস ও করবে না। কবিলার সর্দার এবং দক্ষিণ সীমান্তের চৌকিগুলোর সালারদের নিজ নিজ লশকর নিয়ে মাদায়েন পৌছার হুকুম দিয়েছি আমি। ওদের আসা পর্যন্ত দুশমনকে শহরের বাইরে রাখতে পারলেই আমরা সফল। আমার দুর্ভাগ্য, ছিয়াওখশের পরামর্শ শুনিনি। রুস্তমকে বাঁধা দেয়ার জন্য সে লশকরকেই যথেষ্ট ভেবেছি, যাদের নেতারা দুশমনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তবুও হতাশার কারণ নেই। খানিক পরই শহরের ওমরা এবং ধর্মীয় গুরুরা এখানে জমায়েত হবে। যখন ওদের আমি বলব, মাদায়েনের হিফাজতের জিম্মা তুমি কবুল করেছ, ওরা তোমায় স্বাগত জানাবে।'

ঃ 'এ জিম্মাদারীর উপযুক্ত আমি নই। যদি হতামও তবুও আমার জওয়াব হতো, এ লড়াই থেকে দূরে থাকতে চাই আমি।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আজমেরী। মাথা টিপে ধরে বসে পড়লেন আবার। ঝিম মেরে বসে রইলেন কতক্ষণ। সহসা মিয়ানদাদের দিকে তাকালেন তিনি। দুশ্চিন্তা আর গোস্বা নয়, তার চোখে ফুটে উঠল নির্ভেজাল অনুনয়।

ঃ 'মিয়ানদাদ!' ধরা আওয়াজে বললেন তিনি, 'তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা।'

কোন জওয়াব দিল না মিয়ানদাদ। উঠে দাঁড়ালেন আজমেরী বানু। কম্পিত পদে এগিয়ে এলেন মিয়ানদাদের দিকে। আচানক নিঃশেষ হয়ে এল তার শক্তি। ফরাশে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

মিয়ানদাদের মনে হল তার শিরা উপশিরায় স্তব্ধ হয়ে গেছে রক্ত চলাচল। ও এগিয়ে শক্ত হাতে তুলে নিল রাণীকে। আলগোছে শুইয়ে দিল বিছানায়। হাটু গেড়ে বসে ঝাকাতে লাগল তাকে।

ঃ 'শাহজাদী! শাহজাদী!' অস্ফুট স্বরে ডাকল ও। এর পর জোরে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'কেউ আছেন?'

কয়েকজন খোজা এবং চাকরাণী ছুটে এল। পিছে সরে গেল মিয়ানদাদ। এক চাকরাণী রাণীর নাড়ী পরীক্ষা করে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ডাক্তার ডাকো। মালাকায়ে আলম অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

রাণীর সেবিকাদেরকে শাহী ডাক্তার বললঃ 'মালাকায়ে আলমের বিশ্রামের প্রয়োজন অষুধের চেয়ে বেশী। খুব শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে পাবেন তিনি। এর পরই যেন শুয়ে পড়েন।'

ঃ 'দরবার বসানোর হুকুম দিয়েছেন রাণী।' বলল এক গোলাম। 'আজ রাতে বিশ্রাম নেয়ার প্রশ্নই আসে না।'

রাণীকে তুলে অন্য কামরায় নিয়ে গেল চাকরাণীরা। মিয়ানদাদের দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না কেউ। কিছুক্ষণ কামরায় পায়চারী করল ও। বসল গালিচার উপর। দু'জন পাহারাদার এসে নতুন লেবাস, বর্ম আর তলোয়ার রেখে চলে গেল।

আবার পায়চারী শুরু করল মিয়ানদাদ। আচানক তার মনে হলঃ 'আমি লেবাস পাল্টে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি না?' সাথে সাথেই বেড়ে গেল ওর হৃদস্পন্দন।

আবার ও ভাবলঃ 'আমি সমর্থন করতে পারি না রাণীকে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এখানে থাকাও ঠিক নয়। জ্ঞান ফিরলেই আমার দিকে নজর দেবেন রাণী। তার হুকুম তামিল না করলে তৈরী হবেন আমায় হত্যা করতে, কিন্তু আমি কি পারব সে হুকুম অস্বীকার করতে? দ্বিতীয় বার এ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমার উচিৎ হবে না। আমি এক কয়েদী। পালানোর চেষ্টা করা আমার জন্য ফরজ। কেউ আমায় বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে বলবো রাণীর হুকুম তামীল করছি আমি। না, সময় নষ্ট করা যাবে না।'

দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল মিয়ানদাদ। বর্ম পরে তরবারী বাঁধছিল কোমরে, চাকরাণী এসে বললঃ 'রাণী আপনাকে স্মরণ করছেন।'

বসে গেল তার হৃদয়। হতোদ্যম হয়ে পরিচারিকার অনুগমন করল ও। বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন আজমেরী বানু। মুচকি হাসলেন মিয়ানদাদকে দেখে।

ঃ 'আমার বিশ্বাস ছিল, আমায় ছেড়ে তুমি যাবে না।'

ঃ 'আমায় অতটা বিশ্বাস করবেন না!' ভাঙ্গা হৃদয়ে জওয়াব দিল মিয়ানদাদ।

ঃ 'এসব কথার সময় এখন নয়। তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করিনি এজন্য আমি লজ্জিত। তবুও আমার একীন, ভুলের সংশোধন আমি করতে পারবো। চরম হতাশা

আর অসহায়ত্বে তুমি ছিলে আমার শেষ অবলম্বন, কখনো তা আমি ভুলব না।'

এক-গোলাম কামরায় ঢুকে বললঃ 'মালাকায়ে আলম! আপনার কদমবুসির অনুমতি চাইছেন দারোগা।'

ঃ 'তাকে বলো, এখুনি আমি আসছি।'

বেরিয়ে গেল গোলাম। মিয়ানদাদকে বললেন আজমেরীঃ 'দরবারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। তুমিও আমার সাথে চলো। ওমরাদের সামনে তোমার নতুন পদের ঘোষণা করব।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম।' চাকরাণী বলল। 'ডাক্তার বলেছেন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'না, আমি বিলকুল ঠিক। আমার তাজ নিয়ে এস। মাদায়েনের হিফাজতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আমার ঘুম আসবে না।'

কামরায় প্রবেশ করল দারোগা। কুর্নিশ করে বললঃ 'মালাকায়ে আলম, এ অপরাধের জন্য মাফ চাইছি। কিন্তু অবস্থা এমন ....।'

ঃ 'পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি বেখবর নই।' তার কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন রাণী। আমি জানি দরবারে আমার প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। তুমি গিয়ে ঘোষণা কর, আমি আসছি।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম, আসনগুলো সব শূন্য। দূতরা ঘর থেকে বের করেছে যাদের, রাস্তা থেকে ফিরে গেছে ওরা।'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন রাণীঃ 'কি বলছ তুমি?'

ঃ 'মালাকায়ে আলম, দূত খবর এনেছে, বাজারে, অলিগলিতে শ্লোগান তুলছে লোকেরা। আমাদের পরাজয়ের খবর তারা পেয়েছে। শহরময় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, পুরান দখত মাদায়েন আছেন।'

ঃ 'মিথ্যা। ও শহরে থাকলে এতদিনে গ্রেফতার হয়ে যেত।'

ঃ 'হয়তো শহরের বাইরে কোথাও তিনি লুকিয়ে। কিন্তু মিছিল হচ্ছে তার পক্ষেই।'

হতাশ হয়ে বসে পড়লেন আজমেরী বানু। দুর্বল কণ্ঠে বললেনঃ 'শহরের ফটক বন্ধ করার হুকুম আমি দিয়েছিলাম। ভেবেছি পরাজয় সম্পর্কে বেখবর থাকবে জনগণ। আমরা প্রস্তুতির মওকা পাব। আমাদের দুশমনরা আমাদের চেয়ে তৎপর। গাদ্দারদের দূত কি আমাদের পূর্বেই এখানে পৌঁছেছিল? তবে কি এসব গাদ্দারদের সমর্থন করবে মাদায়েনের লোকেরা? ইরানকে যারা বিক্রি করতে চায় রুস্তমের হাতে? মিয়ানদাদ, নিজের লশকরের ছাউনীতে পৌঁছার চেষ্টা কর তুমি? ওদের হুকুম দাও শহরের বিক্ষুব্ধ জনতার আস্থা ফিরিয়ে আনতে।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম!' বলল দারোগা। 'সংবাদ বেরিয়েছে, ফৌজের সিপাইরা জনতার সাথে মিশে আপনার বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছে। মুহাফিজ ফৌজের কতক

অফিসারকে ওদের নেতৃত্ব করতে দেখা গেছে।'

দেউড়ী পথে শোনা গেল লোকদের হৈ-হুল্লা আর শোরগোল। নিঃশব্দে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। শহর কোতওয়াল এবং শাহী মহলের মুহাফিজ দলের দু'জন অফিসার হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল অন্দরে। কোন ভূমিকা ছাড়াই শহর কোতওয়াল বললঃ 'মালাকায়ে আলম, জনতার মিছিল মহলের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের বিশ পঁচিশ জন হালাক আর কয়েকজন আহত হয়েছে। মুহাফিজ ফৌজের কাছে সাহায্য চেয়েছি আমি। কিন্তু ছাউনী শূন্য, পালিয়ে গিয়েছে নয় নিহত হয়েছে আপনার ওফাদাররা। বিদ্রোহী সিপাইরা বন্ধ করে দিয়েছে শহরের উত্তর প্রান্ত। আমি বলতে এসেছি, শাহী মহল বিপদের সম্মুখীন।'

তিরস্কারের স্বরে রাণী বললেনঃ 'এ কাহিনী শোনাতে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। এখন যাও। শহরের অবস্থা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে আমাকে জানাবে। নাগরিকদের বেশে শহরে ছড়িয়ে যেতে বল আমাদের লোকদের। খোরাসানীদের বিজয়ে ওদের কি বিপদ হবে লোকদেরকে যেন তা বুঝিয়ে বলে। তোমাদের মধ্যে কোন জানবাজ পুরান দখতকে কোতল করতে পারলে, তার ওজন পরিমান স্বর্ণ এনাম পাবে।'

আদবের সাথে সালাম করে বেরিয়ে গেল কোতওয়াল। ফৌজি অফিসারদের দিকে ফিরলেন রাণী।

ঃ 'বাইরের পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ নেই। মাদায়েনের লোকদের আমি চিনি। আজ আমার বিরুদ্ধে এক হয়েছে। কাল শ্লোগান তুলবে দুশমনদের বিরুদ্ধে। খোরাসানীরা এলে কি বিপদ হবে, এটুকু শুধু বোঝাতে হবে ওদের। আমাদের গোয়েন্দারা দায়িত্ব পুরো করে থাকলে, শহরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে আগামী কালই। শাহী মহলের হিফাজত হচ্ছে তোমাদের প্রথম এবং শেষ জিম্মা। যাও, দায়িত্ব পালন করগে।'

বেরিয়ে গেল অফিসার। সাথে মহলের দারোগাও। চাকর চাকরাণীরাও বেরিয়ে গেল রাণীর হাতের ইশারায়। মিয়ানদাদকে তিনি বললেনঃ 'তোমায় এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠাচ্ছি। রাতের মধ্যেই ছিয়াওখশের কাছে পৌছার চেষ্টা করো। আমার কাছে যে সওয়াররা এসেছে ওরা একজন যাবে তোমার সাথে। ছিয়াওখশকে বলবে দুশমনকে বাঁধা দেয়ার পরিবর্তে ফিরে আসবে মাদায়েন।'

এর চেয়ে বেশী কিছু চাইছিল না মিয়ানদাদ। কোন বাহানায় মহলের চৌহদ্দি থেকে বেরোনোর মওকা পেলেই হয়। মনে মনে ফয়সালা করেছে ও, পালাতে পারলে রাণীর কাছে থাকার চেয়ে কয়েদখানাও শ্রেয়।

ঃ 'আমি প্রস্তুত।' নির্দ্বিধায় জওয়াব দিল ও।

হাতের আংটি খুলে রাণী বললেনঃ 'ছিয়াওখশ তোমায় সন্দেহ করতে পারে।

আমার আংটি দেখলে নিশ্চিন্ত হবে ও।'

আংটিটা পকেটে রেখে দিল মিয়ানদাদ।

ঃ 'তোমার জন্য তাজাদম ঘোড়া তৈরী করার হুকুম দিয়েছি। চলো দরজা পর্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিই। না, দাঁড়াও, এক্ষুণি আমি আসছি।'

সামনের কামরায় চলে গেলেন রাণী। ফিরে এলেন শরাবের জাম হাতে।

ঃ 'তোমার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ আর চোখে দেখছি নিদ্রায় আবেশ। এক জাম পান করলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদ। শাহজাদী নিজে এক ঢোক নিয়ে বললেনঃ 'এ ঐ শরাব নয়।'

জাম হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সবটা শেষ করল মিয়ানদাদ।

কামরা থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। ওর হাত ধরে রেখেছিলেন রাণী। স্থানে স্থানে প্রদীপ সাজানো। করিডোর আর মর্মরের তৈরী পথ পেরোল ওরা। প্রবেশ করল মহলের ভেতরের বাগানে। মনমাতানো দৃশ্য উপহার দিচ্ছিল অষ্টমীর চাঁদ। আচানক থেমে মিয়ানদাদের দিকে তাকালেন রাণী।

ঃ 'মিয়ানদাদ! যে কিশতীর সওয়ার আমি, তাতে আরোহন করার জন্য পয়দা হয়েছে আরো ক'জন সওয়ার। মাদায়েনের বাইরে গিয়ে যদি বোঝ, পেছনে রেখে এসেছ এক ডুবন্ত জাহাজ, তখন পেছন ফিরে দেখার জন্য যদি তোমার মন না চায়, কোন অনুযোগ আমি করব না। কিন্তু জোর করে বলতে পারি, শাহজাদী না হলে, অথবা ইরানের রাণী হবার শখ দীলে পয়দা না হলে, তোমার সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছুই চাইতাম না আমি।'

অনিরুদ্ধ কান্নার গমকে মিশে গেল আজমেরী বানুর শেষ কথাগুলো। ইরানের রাণী এক নারী, এই প্রথমবার অনুভব করল মিয়ানদাদ। ঘৃণার পরিবর্তে ওর হৃদয়ে জেগে উঠল করুণা। বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'রাণী!' আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

অনুযোগের স্বরে রাণী বললেনঃ 'আমার নাম আজমেরী বানু। তুমি ফিরে এলে অন্য কোন নাম তোমার মুখে শুনতে চাইব না আমি। জলদি ফিরে আসবে তো?'

ঃ 'হায় যদি জানতাম।' জওয়াব দিল মিয়ানদাদ। 'এখন কথা বলার সময় নেই। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভাল নেই। আপনি গিয়ে বিশ্রাম করলে ভাল হয় না?'

ঃ 'না, তোমাকে বিদায় দিয়ে চার দেয়ালের মাঝে আমি চক্কর দেব। তুমি ভেবো না, আমি বিলকুল সুস্থ, চলো।' বলেই তার কাঁধে হাত রাখলেন রাণী।

দেউড়ীর একটু দূর থেকে ভেসে এল মানুষের ডাক চিৎকার। আজমেরী বানু বললেনঃ 'ওরা আসছে। এদিকেই আসছে!'

দরজার সামনে সশস্ত্র পাহারাদারদের মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা শুনতে লাগল মিছিলকারীদের শ্লোগান। মহলের দারোগা বুরুজের সিঁড়ি থেকে এগিয়ে এসে বললঃ

'মালাকায়ে আলম! ঘোড়া প্রস্তুত। কিন্তু দরজা যে খুলতে পারছি না।'

ঃ 'পূর্ব অথবা পশ্চিমের ফটক দিয়ে ওকে বের করার চেষ্টা কর।'

ঃ 'ওখানেও একই অবস্থা। এখন ফটক খোলা যাবে না। তাঁকে সুড়ং পথ বের করে দিন।'

ঃ 'আমি দেখতে চাই।' রাণী এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। মিয়ানদাদ এবং দারোগা অনুসরণ করল তাকে। রাণী বুরুজে উঠে দৃষ্টি বুলালেন বাইরে। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মানুষের মিছিল আর মিছিল।

কিছুক্ষণ ওরা শ্লোগাল শুনল দাঁড়িয়ে। মিয়ানদাদ বললঃ 'দরজার পাশের পাঁচিল টপকে বেরোতে পারব আমি। একটা রশি হলেই চলবে। মহল থেকে বেরিয়েই ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারব আশা করি।'

ঃ 'বিক্ষোভ হচ্ছে সর্বত্র।' বলল দারোগা। 'গোটা মহল অবরোধ করে রেখেছে ওরা। কোন মতে বেরোতে পারলে শহরেও বিক্ষোভের সম্মুখীন হবেন আপনি।'

ঃ 'না, মিয়ানদাদ! এ পরিস্থিতিতে আমায় ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না।' বললেন রাণী। 'মিছিলকারীরা মহলে হামলা করছে, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এসো আমার সাথে, গোপন পথে আমরা দু'জনই বেরোতে পারব।'

কম্পিত হাতে মিয়ানদাদের হাত ধরলেন রাণী। দারোগাকে বললেনঃ 'ভোর পর্যন্ত মিছিলকারীদেরকে দরজার বাইরে রাখতে পারলে আমরা হয়ত বাঁচতে পারি। পাহারাদারদের শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করো। বলবে, বিরাট ফৌজ আসছে আমাদের সাহায্যে। বিক্ষোভ এগিয়ে এলে তীর চালাবে তোমরা। কিন্তু কোন অবস্থায়ই ওদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।'

ঃ 'আমিও এদের সাথে থাকলে ভাল হয় না?'

ঃ 'না, আমার সাথে চলো তুমি। আরো অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

রাণীর সাথে হাঁটা দিল মিয়ানদাদ। সিঁড়ি পেরোতে গিয়ে ও অনুভব করল রাণীর পা কাঁপছে। কম্পিত পদে কয়েক কদম এগিয়ে আচম্বিত নিঃশেষ হয়ে এল তার শক্তি। অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাচ্ছিল, মজবুত হাতে ধরে ফেলল মিয়ানদাদ। রাণীকে পাজা কোলা করে ছুটে এগিয়ে গেল। দেউড়ীর দরজার দুজন পাহারাদার অনুসরণ করল তাদের।

একুশ

জ্ঞান যখন ফিরল, দেখল বিছানায় শুয়ে আছে শাহজাদী আজমেরী বানু। খোজা গোলাম এবং চাকরাণীরা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো ডাক্তার এবং মিয়ানদাদ বিছানার পাশে চেয়ারে বসা। চারদিকে চোখ ঘুরালেন রাণী। তার দৃষ্টিরা থমকে

দাঁড়ালো মিয়ানদাদের উপর।

ঃ 'যদি জানতাম জ্ঞান ফিরলেই ছুটবেন, পলকের জন্যও নড়তাম না এখানে থেকে।' অনুযোগের স্বরে বলল ডাক্তার।

ঃ 'কতক্ষণ ধরে আমি বেহুশ?'

ঃ 'ভোর হয়ে এল প্রায়। ঘুমের অষুধ দিয়েছিলাম, এখনো আপনার ঘুম পুরা হয়নি। কমপক্ষে আরো একবেলা ঘুমুতে হবে।'

ঃ 'তুমি আসলেও বেকুব।' বললেন রাণী। 'চির নিদ্রার জন্য কোন দাওয়া নেই তোমার কাছে? দুশমনের আগমন পর্যন্ত আমায় অজ্ঞান রাখতে পারলে, ওরা তোমায় বহুত বড় এনামের যোগ্য মনে করতো।'

পেরেশান হয়ে মিয়ানদাদের দিকে চাইতে লাগলেন ডাক্তার।

চিৎকার দিয়ে আজমেরী বানু বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, তুমি খামোশ কেন? এ বেকুবকে কেন বলছ না, ওরা মহলে প্রবেশ করলেই ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমায় জাগানোর চেষ্টা কেন তুমি করনি?'

ঃ 'আপনার বিশ্রাম জরুরী, আমিও তা অনুভব করেছি।'

ঃ 'ওরা কি ফিরে গেছে?'

ঃ 'না, এখনো মহলে হামলা করার চেষ্টা করেনি।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম, ওর ভয় ছিল, জ্ঞান ফিরলে এক মুহূর্তও আরামে বসবেন না আপনি। তার পরামর্শেই ঘুমের অষুধ দিয়েছি।' বলল ডাক্তার।

হয়রান হয়ে মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে রাণী বললেনঃ 'তুমি জান, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু নিকটতর হচ্ছি আমাদের?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি, ফেরার হওয়ার কোন পথ নেই আমাদের। আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাহারাদাররা পাঁচিলের কাছেও ঘেষতে দেয়নি আমায়।'

ঃ 'আমায় ঘুমে রেখে তুমি যেতে চাইছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমার ধারণা, বাইরে যেতে পারলে হয়ত ....' বাক্য শেষ করতে পারল না মিয়ানদাদ। গলায় আটকে গেল তার আওয়াজ।

ঃ 'তুমি যাও।' বুড়ো ডাক্তারকে বললেন রাণী। অনিচ্ছা, সত্ত্বেও কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

ঃ 'তোমরা দরজার বাইরে দাঁড়াও।' গোলামদেরকে রাণী বললেন, 'কোন পাহারাদার এদিকে এলে বলবে, আমি বিশ্রাম করছি।'

হুকুম তামীল করল ওরা।

ঃ 'অনুমতি পেলে বাইরে যাবার ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত।' বলল মিয়ানদাদ। 'ধরা পড়লেও লোকদের এদ্দুর বললেই হবে যে, আমি আপনার কয়েদী ছিলাম।'

ঃ 'বাইরে যাবার কোন ঝুঁকি তোমায় নিতে হবে না। ডাক্তারকে ঘুমের ঔষধ দেয়ার পরামর্শ না দিলে এতক্ষণে আমরা থাকতাম বহু দূরে। এখনো শেষ পথ রুদ্ধ হয়নি। মহলের বাইরের লোকদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য শুধু লেবাস পরিবর্তন করতে হবে। পাশের কামরায় খানিক অপেক্ষা কর, আমি আসছি।'

পাশের কামরায় চলে গেল মিয়ানদাদ। ও যখন পেরেশান হয়ে পায়চারী করছিল, সৈনিকের পোশাক পরে কামরায় প্রবেশ করলেন রাণী। এক বুড়ো খোজা আর দু'জন গোলাম তার সাথে। ছোট্ট সিন্দুক আর কাপড়ের বোঝা বইছিল গোলামরা। খোজার এক হাতে মশাল অন্য হাতে মস্ত এক চাবি।

ঃ 'আপনি আমার সাথে যাবেন?' মিয়ানদাদ বলল।

ঃ 'আমি শুধু মহল থেকে বেরোতে চাইছি। এরপর কোথায় যাব তা ভাবা তোমার কাজ।'

ঃ 'ছিয়াওখশকে খবর দিতে বলেছিলেন আমায়। আপনাকে সাথে নিয়ে অত দূর সফর করা সম্ভব হবে না।'

ঃ 'বাইরের পরিস্থিতি দেখলে ছিয়াওখশের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না হয়ত। তখন তাদের হেফাজতের পরিবর্তে বাঁচাতে চাইবে আমার জীবন। মিয়ানদাদ! এখন কথা বলার সময় নেই। শহরের ভেতরে কি বাইরে কোথায় আশ্রয় পাবো, সে ফয়সালা হবে পরে। এ মুহূর্তে এখান থেকে বেরোনোই বড় সমস্যা। হয়ত জনতা কাঁধে করে ফিরিয়ে আনবে আমায়। এমনও হতে পারে, আমি পিষে যাব ওদের পায়ের চাপে। তা যাই হোক, এ শান্তনা আমার হবে, অবশ্যই তুমি আছ আমার সাথে।'

রাণীর ইশারায় খোজা এগিয়ে গেল। মিয়ানদাদ ভাবল, মহলের বাইরে গেলেই পৃথক হয়ে যাবে দুজনের পথ। প্রশস্ত তিনটে কামরা পেরিয়ে তালা দেয়া কামরার সামনে থামল ওরা। খোজা তালা খুলে দিল। ওরা ঢুকল সে কামরায়। কক্ষের কোণে সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেংগে ওরা প্রবেশ করল মাটির নীচের এক কামরায়। উপরের মত এ কামরাও প্রশস্ত। তবুও কার্পেট, কুরসী আর মখমলের ফরাশে জমে থাকা শেওলায় বুঝা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকে কামরাটা অব্যবহৃত। খোজার ইশারায় এক গোলাম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল লোহার সিন্দুক। কার্পেটের নিচে ভেসে উঠল সিঁড়ি মুখ। খোজা সিঁড়িতে প্রদীপ জ্বেলে দিল হাতের মশাল দিয়ে।

ঃ 'এর সামনে যাবার প্রয়োজন নেই তোমাদের।' খোজাকে বললেন রাণী। 'আমরা চলে গেলে দ্রুত পথ বন্ধ করে ফিরে যাবে। কিন্তু আমি নেই, মহলের কোন পাহারাদার যেন এ সন্দেহ করতে না পারে। জবান সংযত রাখতে বলবে নওকরদের।'

ঃ 'আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন। সুড়ংগের শেষে পাবেন লোহার চাকতি। চাকতি ঘুরালেই খুলে যাবে পুরনো অগ্নিমন্ডপের দুয়ার।'

হয়রান হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'পুরনো অগ্নিমন্ডপ তো শহরের বাইরে!'

ঃ 'হ্যাঁ,' বললেন রাণী। 'তা শহরের বাইরে। মাদায়েনবাসীরা মহল থেকে বেরুলেই আমাদের হত্যা করবে, এখন এ পেরেশানী নেই তোমার।'

ঃ 'কিন্তু তাতো অনেক দূরে। আপনি ......?'

ঃ 'আমার চিন্তা করো না। তোমার সাথে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সফর করতে পারি।'

ঃ 'চলো।'

এগিয়ে গেল মশালধারী। সিঁড়ি ভেংগে সুড়ংয়ে প্রবেশ করল ওরা। দেয়াল আর ছাদ থেকে পানি ঝরছিল। এগিয়ে চলল ওরা হাটু পানি ভেংগে। মিয়ানদাদের বাহু ধরলেন রাণী।

মিয়ানদাদ বললঃ 'সুড়ং যথেষ্ট গভীর। সামনে পানি আরো বেশী হতে পারে। আপনি কি নিশ্চিত, আমরা পুরানো অগ্নি মন্ডপের কাছে পৌছতে পারব।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত! তার কারণ, পুরান দখত এ পথে পালিয়েছে এজন্য নয়, বরং আমি নিজেই এ সুড়ং পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার বদ কিসমত, অভ্যুত্থানের আগে এ খোজার সাথে আলাপ করতে পারিনি। নয়তো পুরান দখত পালানোর মওকা পেতো না।'

ঃ 'শাহপুর এ পথের সংবাদ জানতেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু ও থাকত মহলের অন্য অংশে। পুরান ছিল তার চেয়ে বেশী হুশিয়ার। যে কামরায় আমায় দেখেছো, ও শুয়ে ছিল সেখানে। পাহারাদারদের ডাক চিৎকার শুনেই পালিয়ে গেছে ও। মহলের অন্দরে দু'দিন তাকে খুঁজেছি। খোজাকে গ্রেফতার করে তার জীবন বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিলে সে সুড়ংয়ের সন্ধান দেয় আমাকে।'

নীরবে চলল ওরা কিছুক্ষণ।

ঃ 'এ কি হতে পারে না যে, তার সঙ্গীরা সুড়ংয়ের মুখে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছে?'

কেঁপে উঠলেন রাণী। বিষন্ন কন্ঠে বললেনঃ 'মিয়ানদাদ, এমন কথা বলো না। আমরা পালানোর চেষ্টা করব এ ধারণাও তার আসবে না। আর সুড়ংয়ের দরজা শুধু ভেতর থেকেই খোলা যায়।'

ঃ 'দরজা ভেংগেও তো ওরা অন্দরে আসতে পারে?'

ঃ 'না, আমার এক গোলাম থাকে সেখানে। তবলা বাজিয়ে ও খবরদার করতে পারবে আমাদের। তবলার আওয়াজ সুড়ংয়ে ভয়ংকর গরগর শব্দ সৃষ্টি করে।'

ঃ 'তাহলে কোন দিন পালাতে হবে এ সন্দেহ আপনার ছিল?'

ঃ 'না। তবুও সিংহাসনের জন্য জীবন বাজি রাখার পর প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকা প্রয়োজন বোধ করেছি। অগ্নিমন্ডপের পূজারীদেরও পরিবর্তন করেছি। পুরান

দখতকে নিয়ে ততটা দুশ্চিন্তা নেই। ও মাদায়েনে প্রবেশ করে থাকলেও এখন হয়ত বিক্ষোভকারীদের সাথে।'

চুপচাপ আরো কিছু দূর এগিয়ে গেল ওরা। সুড়ংয়ের পানিও কমে আসছে। ভয় ও ক্লান্তিতে কাঁপছিল আজমেরী বানুর পা। কাহিল হয়ে পড়লেন তিনি। প্রশস্ত হয়ে এল সংকীর্ণ সুড়ং। মস্তবড় তালার পাশে এক কাফ্রী গোলাম। ঘুমিয়ে আছে ইষৎ উঁচু চত্বরে। আর একধাপ সিঁড়ির পরই শেষ হয়েছে সুড়ং পথ।

রাণীর পায়ের গুতোয় গোলাম জেগে উঠল। ধরফরিয়ে বসে ভয়ার্ত চোখে চাইতে লাগল রাণীর দিকে।

ঃ 'দরজা খুলে দাও। বাইরে যাচ্ছি আমরা।' রাণী বললেন।

পনর বিশ ধাপ সিঁড়ি টপকে প্রাচীরে আটকানো লোহার চাকতির কাছে থামল ও। অসুরের শক্তি নিয়ে চাকতি ঘোরাতে লাগল গোলাম। গরগর শব্দ হল প্রাচীরের নিচে। ভারী দরজা ধীর ধীরে উপরে উঠতে লাগল। প্রাচীরের মাঝে তৈরী হল চলাফেরা করার মত রাস্তা। রাণীর ইশারায় মশাল নিভিয়ে নিচে রেখে দিল আরেক গোলাম। ওরা প্রবেশ করল কামরায়। কক্ষের মাঝখানটায় আগুন জ্বলছিল। ধীরে ধীরে পাথরের ভারী দরজা নেমে এল।

পবিত্র আগুনের পাশে রৌপ্য মন্ডপের বাইরে বসেছিল এক পূজারী। তার পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল ওরা। কিন্তু পূজারী ছিল ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। টের পেল না তাই। প্রশস্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। প্রবশ করল জনহীন করিডোরে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে রাণী বললেনঃ 'এবার নদীর দিকে কোন কিশতি খুঁজে দেখ।'

কেটে পড়ার তালে ছিল মিয়ানদাদ। মনে মনে বাহনা খুঁজছিল সেও। বললঃ 'আপনি ধীরে ধীরে আসুন। ততোক্ষণে আমি কিশতি খুঁজে নিচ্ছি।'

ঃ 'না, না।' মিয়ানদাদের আরো কাছে সরে এসে বললেন রাণী। 'নদী বেশী দূরে নয়। এখনি ওখানে পৌছতে পারব আমরা।'

মিয়ানদাদ বলতে চাইছিলঃ 'এ বেদীর পর চিরদিনের জন্য আমাদের পথ পৃথক হয়ে যাবে। পারভেজ আর নীলুফারের হত্যার প্রতিশোধ হয়ত তোমার কাছ থেকে নিতে পারব না। কিন্তু তোমায় সঙ্গ দেয়া চরম অপরাধ। আমার ওয়াদারী ইরানের সাথে। তুমি ইরানের দুশমন। আমার বোনের প্রতিটি চুলের জন্য তোমার মত হাজারো নারীকে আমি কোরবান করতে পারি।' কিন্তু ফয়সালা শক্তি লোপ পেয়েছিল তার। নিজের বোকামী আর অসহায়ত্বের উপর নিজেরই করুণা হচ্ছিল বারবার।

ঃ 'চলো মিয়ানদাদ। কি ভাবছো তুমি?'

নীরবে হাঁটা দিল ও। প্রশস্ত বাগান পেরিয়ে বিশাল আঙ্গিনায় পা রাখল ওরা। সহসা বৃক্ষের আড়াল থেকে ভেসে এল কারো পায়ের আওয়াজ। থেমে গেল ওরা। ঘনবৃক্ষের আড়াল থেকে আওয়াজ ভেসে এল ঃ 'দাঁড়াও। তোমরা আমাদের তীরের

আওতায়। পালানোর সব পথ তোমাদের রুদ্ধ।'

আট ব্যক্তি বেরিয়ে এল বৃক্ষের আড়াল থেকে।

মিয়ানদাদের হাত ছেড়ে স্তম্ভিত আজমেরী বানু কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'মিয়ানদাদ আমাকে বাঁচাও ....।'

নারী কণ্ঠ ভেসে এল পেছন থেকে।

ঃ 'এখন কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।'

ঃ 'পুরান দখত!' চমকে উঠলেন তিনি। সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মিয়ানদাদ। তার সামনে সংগীন তাক করে আছে আট ব্যক্তি। ডান দিক থেকে তিন জন এগিয়ে এল নাংগা তলোয়ার উঁচিয়ে। পিছন ফিরে চাইল ও। পুরান দখতের সাথে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন অস্ত্রধারী।

ঃ 'দাঁড়াও।' দুহাত উঁচু করে বলল ও। 'আমি রাণীর সাথী নই। মিয়ানদাদ আমার নাম। যদি আমায় গ্রেফতার করতে চাও, বাঁধা দেব না।' তলোয়ার ফেলে দিল মিয়ানদাদ।

পুরান দখত বললঃ 'তুমি ফররুখ যাদের মুহাফেজ ছিলে?'

ঃ 'আমায় বন্দী করেছিল আজমেরী বানু।'

ঃ 'আমায় ধোঁকা দিতে পারবে না। তোমার কথা শেষ হয়েছে?'

ঃ 'সত্যি বলছি আমি পালাতে চাইছিলাম। কিন্তু মহলের চার দেয়াল থেকে বেরোবার কোন পথ ছিল না। গোলামরা এর সাক্ষী। মহলের ভূতল কক্ষে ফেলে রাখা হয়েছিল আমায়।'

ঃ 'তোমার সত্য মিথ্যার ফয়সালা করবে ফররুখের বেটা। ওকে গ্রেফতার কর।' অস্ত্রধারীদের বলল পুরান দখত।

ঃ 'শাহজাদী।' চেঁচিয়ে বলল মিয়ানদাদ। 'আমি নিরপরাধ। সাফাই পেশ করার মওকা পেলে আপনাকে আমি নিশ্চিন্ত করব। সে রাতে নেশাযুক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছিল আমাদের। ফররুখ যাদের মেহমানরাই তার সাক্ষী। এর পরই মাথায় আঘাত পেয়ে আমি বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। মাথায় রয়েছে এখনো যখমের চিহ্ন।'

ঃ 'তোমার সে খোরাসানীরা এখন রুস্তমের কাছে। তার ধারণা, ওদের অজ্ঞান করা এবং ফররুখের হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রে তুমিও শরীক ছিলে। গ্রেফতারের সময় আজমেরীর সাথে তোমায় পেয়েছি, এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কি প্রয়োজন?'

ঃ 'কিন্তু আমি তো বন্দী ছিলাম। মহলে নেয়ার পূর্বে মাদায়েনের কয়েক ক্রোশ দূরে আমায় রাখা হয়েছিল। আমার একটা বোন আছে, সে কোথায় আজো তা জানি না। তাকে খুঁজতে যে কোন উসিলায় বেরোতে চাইছিলাম আমি। পালাবার সময় আজ যখন আমায় সাথে আসতে বলল আজমেরী, এ আশা নিয়েই তার সাথে বেরিয়েছি, মহল থেকে বেরোতে পারলেই আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে।'

অবজ্ঞার সাথে পুরান বললঃ 'ফররুখ, পারভেজ আর শাহপুরের সাথে গাদ্দারী করেছ তুমি। যে অসহায় নারী তোমায় শেষ আশ্রয় ভেবেছে, এখন গাদ্দারী করছ তার সাথেও। তোমার বদ কিসমত, আজমেরীর ব্যাপারে আমার ধারনাই ঠিক হল। ঠিক সময়ই তার পালাবার পথ রুদ্ধ করেছিলাম আমি।'

ঃ 'পবত্রি আগুনের সামনে শপথ করে বলতে পারি, আমি বেকসুর। পারভেজ ছিলেন আমার কল্যাণকামী। ইস্পাহান থেকে তার জামাতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।'

ঃ 'কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। তুমি সশস্ত্র, অথচ আজমেরীর সঙ্গ ছাড়তে পারনি, একথা মানতে প্রস্তুত নই আমি।'

ঃ 'সে রাণীকে আমি ঘৃণা করতাম, যার হাত রংগীন হয়েছিল আমার দোস্তদের খুনে। কিন্তু যে অসহায় নারী বেহুশ হয়ে পড়ে আছে আপনার সামনে, তাকে আমি ঘৃণার যোগ্য মনে করি না।'

ঃ 'ওকে তুমি ঘৃণার যোগ্য মনে কর না। কিন্তু তুমি কি জান, সে রাতে ধরা পড়লে কি করা হতো আমায়?'

সিপাইদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'কি দেখছ তোমরা? একে নিয়ে যাও। পালানোর চেষ্টা করলে গর্দান উড়িয়ে দিও। আজমেরীকে নিয়ে যাও অগ্নিমন্দিরে। তার পাহারায় চারজনই যথেষ্ট। মহল কব্জা করতে পারলেই গোপন পথে তাকে অন্দরে নিয়ে যাব।'

মিয়ানদাদকে ঘিরে ধরল সিপাইরা। পুরান দখত সওয়ার হল ঘোড়ায়।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই শাহী মহল কব্জা করল পুরান দখত। যে ভূতল কয়েদখানায় কয়েকদিন কাটিয়েছিল মিয়ানদাদ, শাহজাদী আজমেরী বানু সেখানে পড়েছিল। একদিন পরই মাদায়েনে সংবাদ রটল, রুস্তমের হাতে পরাজিত হয়ে গ্রেফতার হয়েছে ছিয়াওখশ। পরদিন বিজয়ের নাকাড়া বাজিয়ে রুস্তম শহরে প্রবেশ করলে পথে ফুল বিছিয়ে দিল জনগণ। পুরান এবং মাদায়েনের পদস্থ কর্মচারীরা মহলের দরজায় অভ্যর্থনা জানাল রুস্তমকে। পুরানের মসনদে আরোহনের অভিষেক পালিত হল। বন্দী করা হল আজমেরীর সমর্থকদের। সূর্যাস্তের পূর্বেই ছিয়াওখশ, দারোগা এবং কোতওয়াল ছাড়াও আরো তিরিশ ব্যক্তিকে ঝুলানো হল ফাঁসীতে। এদের মধ্যে বাইশজন সামরিক অফিসার, শেষ পর্যন্ত যারা ছিয়াওখশের সাথে ছিল। অন্যরা সেসব নওকর এবং গোলাম, আজমেরীর ছত্রছায়ায় যারা শাহী মহলের সব কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করছিল।

খোজার সর্দার জীবন বাঁচাল একথা বলে যে, আজমেরী পালানোর সাথে সাথেই মহলের মুহাফিজ এবং পাহারাদারদের আমি খবরদার করেছি। এ সংবাদ শুনে ওরা দারগাকে পাঁচিল থেকে নিচে ফেলে খুলে দিয়েছিল মহলের দরজা। দু'দিনের মধ্যেই

প্রায় পঁচিশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পাঠানো হল কয়েদখানায়।

সিংহাসনে বসেই পুরান দখত রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা বানিয়ে দিল রুস্তমকে। সে ছিল উজিরে আজম এবং সিপাহসালার। দরবারে তার সোনার কুরসী ছিল রাণীর পাশে। কয়েদীদের ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য কায়েম করা হল বিশেষ আদালত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল রুস্তমের এখতিয়ারে। পিতার হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও ফয়সালা করত সে। কেবল আজমেরীর ব্যাপারে ফয়সালার ব্যাপার তার এখতিয়ারে ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন শাহী খান্দানের, কিসরার তখতেও বসেছিলেন কদিন। তার বিচার শুধু নতুন রাণী পুরান দখতই করতে পারেন।

পুরান দখতের ক্ষমতা গ্রহণের তিনদিন পর। দরবারে হাজির করা হল শাহজাদী আজমেরী বানু। রাণী প্রশ্ন করলেনঃ 'আজমেরী, নিজের কোন সাফাই পেশ করবে?'

মাথা তুলল শাহজাদী আজমেরী বানু। অসম্মতি জানাল মাথা নেড়ে।

ঃ 'নিজের অপরাধ স্বীকার করছ?'

শাহজাদী আজমেরী বানু নীরব।

ঃ 'এ কথা কি সত্যি নয়, ইরানের সিংহাসন কব্জা করার ষড়যন্ত্র করে ফয়রুখ, পারভেজ এবং শাহপুরকে কোতল করতে ছিয়াওখশের সাহায্য নিয়েছিলে?'

নিস্পলক চোখে পুরানের দিকে তাকিয়ে রইল আজমেরী। সেখান থেকে দৃষ্টি ছুটে গেল রাণীর ডানে বসা এক সুঠামদেহী যুবকের দিকে।

ঃ 'ইরানের রাণী হওয়ার খায়েশ যদি অপরাধ হয়, তুমিও তো সে অপরাধে শরীক।' বললেন আজমেরী। 'স্বীকার করি, বাজিতে হেরে গেছি আমি। হায়! যদি ভাষা থাকত ইরানের সিংহাসনের, জওয়াব দিত কে তাতে বসার উপযুক্ত। আর কে বসলে লজ্জা পায় ও।'

নীরবতা ছেয়ে গেল দরবার কক্ষে। জিহবায় শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে পুরান দখত বললেনঃ 'তুমি হন্তা। তোমার সঙ্গীরা সাক্ষী দিয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। তোমর শাস্তির ঘোষণা শোনাতে বেশী কথা বলতে চাই না। তোমায় এখানে ডেকেছি, হয়তো তোমার জবানবন্দীতে নিরপরাধীর জীবন বেঁচে যেতে পারে। এ কথা কি সত্য, ফররুখ যাদকে কোতল করার পূর্বে, তার হিফাজতের জিম্মা যে নওজোয়ানকে সোপর্দ করা হয়েছিল, তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে! মিয়ানদাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি আমি।'

আশার ঝিলিক খেলে গেল আজমেরীর চোখে।

ঃ 'ও কি এখনো জীবিত!'

ঃ 'তার জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে তোমার জবানবন্দীর ওপর। ফররুখকে হত্যা করার সময় ও অজ্ঞান এবং আহত ছিল একথা কি সত্যি?'

ঃ 'যদি বল তার সাথে বেইনসাফী করবে না, তাহলে জওয়াব দিতে পারি।'

ঃ 'ইরানের রাণী অপরাধীর সাথে কোন ওয়াদা করবেন না।' বলল রুস্তম। 'সে

তোমার সাথে ষড়যন্ত্রে শরীক না থাকলেও দায়িত্বে অবহেলার কারণে চরম শাস্তির যোগ্য।'

আজমেরী পুরানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমি জানি পুরান, কত অসহায় তুমি। তবুও তোমার প্রশ্নের জওয়াব আমি দেব। ফররুখ যেমনি অজ্ঞান অবস্থায় নিহত হয়েছে, মিয়ানদাদও তেমনি অজ্ঞান অবস্থায় আহত হয়ে গ্রেফতার হয়েছে। একই মশকের শরাব পান করেছিল দু'জন।'

ঃ 'মালাকায়ে আলম।' দাঁড়িয়ে বলল রুস্তম। 'আমার পিতার হত্যা ষড়যন্ত্রে শরীক না থাকলেও বড় জোর ফাঁসির শাস্তি মওকুফ করা যেতে পারে। কিন্তু গাফলতি আর দায়িত্বহীনতার সাজা অবশ্যই সে পাবে। আমরা শুধু ভাবব, কোন ধরনের কয়েদখানা তার উপযুক্ত। কিন্তু এমন এক অপরাধীর সমস্যা আমাদের সামনে, কোন শাস্তিই যার জন্য কঠিন নয়।'

ঃ 'ওকে নিয়ে যাও।' বললেন পুরান।

ঃ 'জানি মৃত্যুদন্ডের ফয়সালা করেছ আমাদের জন্য। তবুও তোমার মুখেই শুনতে চাই সে ফয়সালা।' আজমেরী বলল।

ঃ 'একে নিয়ে যাও।' কর্কশ কণ্ঠে বললেন পুরান দখত।

এগিয়ে এল দু'জন সিপাহী। এক ঝটকায় ওদের হাত সরিয়ে আজমেরী চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'আমি জানি পুরান, জীবনে আর কখনো তোমায় দেখব না। কিন্তু আমার একটা নসীহত মনে রেখো, নেকড়ে কখনো ভেড়ার রাখাল হতে পারে না। ইরানের ভবিষ্যত এক বিপজ্জনক ব্যক্তির হাতে দিয়েছ তুমি। নিজের আসন থেকে উঠে তোমায় সিংহাসন থেকে সরিয়ে ফাঁসির আসনে বসাতে দেরী হবে না ফররুখের বেটার।'

রেগে গেল রুস্তম। কিন্তু পুরানের হাতের ইশারা নির্বাক করে দিল তাকে।

আজমেরীকে পুরান বললেনঃ 'আজমেরী, বেঁচেই থাকবে তুমি। কিন্তু দ্বিতীয় বার আমায় দেখতে পাবে না কখনো। তোমার পটলচেরা যে চোখ দুটো ছিল তোমার সেরা অস্ত্র, সুর্য ডোবার আগেই তুলে নেয়া হবে সে দুটো চোখ।'

নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শাহজাদী আজমেরী বানু। চেঁচিয়ে বলল ঃ 'না, না, পুরান দখত! বোন আমার! আমায় দেশ থেকে বের করে দাও। কোতল কর আমায়। ফাঁসিতে ঝুলতে আমি তৈরী। কিন্তু জুলুম করো না আমার উপর।'

ঃ 'তোমার চোখ দুটোই ইরানের ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। আমি কেবল সে বিপদকে রুখতে চাইছি।'

পেছনের দরজার দিকে হাঁটা দিল পুরান দখত।

ঃ 'দাঁড়াও পুরান। রহম কর আমার উপর।'

ভারী পর্দার আড়ালে গোপনে অশ্রু মুছছিল পুরান দখত। সিপাইরা রুস্তমের ইশারায় হাত ধরল আজমেরী বানুর, বাঁধা দিল না ও।

শাহপুরের মৃত্যুতে উদ্ভূত ইরানের পরিস্থিতি ছিল ইসলামী লশকরের অগ্রাভিযানের অনুকূল। সাহায্যের জন্য আবু বকর ছিদ্দিকের (রাঃ) খিদমতে লিখলেন মুসান্না বিন হারেসা (রাঃ)। নিজে এগিয়ে চললেন মাদায়েনের দিকে। ইরানীদের জন্য তার এ হামলা ছিল অনভিপ্রেত। মুসান্না জানতেন, মদিনা থেকে বড় ধরণের কোন সাহায্য তিনি পাবেন না। তিনি জানতেন, ইরানের অবস্থা যেমনি অনুকূলে নিজের অবস্থা তেমনি প্রতিকূল। কিন্তু এগিয়ে যাবার ফায়সালা করেছেন এমন এক ব্যক্তি, যার সৈনিক জীবন প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকেও হাসিল করেছে ইপ্সিত ফল। তিনি আরো জানতেন, এ বিশৃঙ্খল অবস্থায়ও লাখ লাখ সিপাই ময়দানে হাজির করতে পারবে ইরান। কিন্তু চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সম্ভার নেই তার কাছে। বিজিত এলাকাগুলো কব্জায় রাখার জন্য দুশমনকে প্রতি মুহূর্তে এ অনুভূতি দিতে হবে যে, অবস্থার পরিবর্তনে মুসলমানদের দৃঢ়তা আর সাহসিকতায় কোন পার্থক্য হয়নি।

যে লড়াইয়ের সূচনা করেছিল বাহরাইনের মুষ্টিমেয় মুজাহিদ, তার মূলনীতি ছিল, হামলার মওকা না দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুশমনকে বাধ্য করা। ঝড়ের বেগে চড়াও হল ওরা মাদায়েন। ফিরতি পথে ফৌজের স্বল্পতার দরুণ আরো এক মঞ্জিল যেতে না পারায় ওদের আফসোস হচ্ছিল। অন্য দিকে প্রশান্তি ছিল, পারস্যবাসী হীরা আক্রমণ না করে রাজধানী রক্ষায়ই নিয়োজিত থাকবে বেশ ক'দিন।

হীরা থেকে ফিরে মদিনার সাহায্যের অপেক্ষা করতে লাগলেন মুসান্না (রাঃ)। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের পর যে সব ধর্মচ্যুত কবিলাগুলো তওবা করেছে, ওদের ফৌজে ভর্তি করার অনুমতি চাইছি। হযরত ছিদ্দিক (রাঃ) তখনো জওয়াব দেননি, ইরানে এল নতুন ইনকিলাব। ইরানের নতুন রাণী এমন এক নওজোয়ানের হাতে রাজনৈতিক আর সামরিক ক্ষমতা অর্পন করেছেন, সবার কাছে যিনি সমভাবে সমাদৃত। রুস্তমের তৎপরতার কিছু সংবাদও পেলেন মুসান্না (রাঃ)। পেরেশানী বেড়ে গেল তার।

এক সন্ধ্যায় তিনি সাথীদের ডেকে বললেনঃ 'পরিস্থিতি প্রতিকূলে যাচ্ছে আমাদের।' প্রভাতে হযরত ছিদ্দিকে আকবরের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য মদিনার পথ ধরলেন তিনি।

বাহরাইনের দৃঢ়চেতা মুজাহিদ মৃত্যু পথযাত্রী খলিফার মুখোমুখী হলেন। দৃঢ়তা, ঈমান এবং আন্তরিকতার সমুদ্র ঢেউ খেলছিল তার দৃষ্টিতে। তাঁর হৃদয়ের রোশনী কাফেলায়ে হিজাযকে দেখিয়েছিল অনারবের বিশালতায় নতুন পথ ও নতুন মঞ্জিল।

হযরত ছিদ্দিকে আকবর যখন জিন্দেগীর সফর খতম করছিলেন আর স্থলাভিষিক্ত করছিলেন হযরত ওমর (রাঃ) কে মুসান্না বিন হারেসা তখন পৌছলেন মদিনায়। এ অবস্থায় খলিফার সাথে কোন কথা বলতে পারবেন এ আশা তার ছিল না।

রাস্তায় যাদের সাথে আলাপ হয়েছে তাঁরা কেবল খলিফার অসুস্থতা ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের ব্যক্তিত্ব এবং সিরিয়ার মহান বিজয়ের কথাই বলছিলেন। এ জন্য খলিফার ঘরের দরজায় পৌঁছে তাকে এক নজর দেখা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা মুসান্নার দীলে ছিল না। কিন্তু হযরত ছিদ্দিকে আকবর তাকে দেখেই উঠে বসলেন। আচানক তার মনে হল, তার হৃদয়ের কোন কথা খলিফার কাছে গোপন নয়। মুসান্নার সাথে মোসাফেহা করে তাকে কাছে বসালেন তিনি। নিশ্চিন্তে বালিশে হেলান দিয়ে বললেনঃ 'আমার অসুস্থতায় তুমি অস্থির হয়ো না। বল কি খবর নিয়ে এলে? তোমার সব কথা শুনতে চাই আমি।'

সংকোচ ঝেড়ে শুরু করলেন মুসান্না (রাঃ)। ইরানের অবস্থা বললেন অতি সংক্ষেপে। কিন্তু হযরত আবু বকরের প্রশ্নে সাহস বাড়ল তার। বিস্তারিত ভাবে বলতে লাগলেন ইরানের অবস্থা। রণক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলেন খলিফার সামনে। উপস্থিত সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে খলিফা বললেনঃ 'ওমর বিন খাত্তাবকে ডাকো।'

মুসলিম মিল্লাতের মহান নেতার শেষ নসীহত শুনছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)। খলিফা বলছিলেনঃ 'আজ সন্ধ্যার আগেই যদি আমার জীবনের সফর শেষ হয়ে যায় তবে কালই মুসান্নাকে রওনা করিয়ে দেবে।'

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। সহসা খলিফার দৃষ্টির সামনে নেমে এল মৃত্যুর পর্দা। চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন। যার সাতাইশ মাসের খিলাফতের প্রতিটি দিন, প্রতিটি লহমা ছিল মানবতার উন্নতির অগণিত কাহিনীতে ভরা। আমিরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাবের প্রথম কর্তব্য ছিল প্রথম খলিফার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা। মসজিদে নববীর চত্বরেই পতাকা গেড়ে দিলেন তিনি। মুজাহিদদের আহবান করলেন ওখানে জমায়েত হতে। কিন্তু মুজাহিদদের বেশীর ভাগ ছিল সিরিয়ার রণ ক্ষেত্রে। যারা এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এমন সব প্রখ্যাত সাহাবী, মদিনায় যাদের প্রয়োজন ছিল বেশী।

মদিনাবাসী খলিফাকে পরামর্শ দিলেন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করার পূর্বে গোটা সিরিয়া বিজয় করা উচিৎ। এ রণক্ষেত্র থেকে অবসর পেলে ইরানের দিকে এগিয়ে যেতে ওদের দেরী হবে না। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) মহামান্য খলিফা আবু বকরের হুকুম তামীল করতে সামান্যতম ত্রুটিও বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। নিকট অতীতের অসংখ্য উদাহরণ ছিল তার দৃষ্টির সামনে। মহানবীর তিরোধানের পর মদিনা আক্রমণের ভয় ছিল প্রকট। তবু, সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে মুসলিম লশকরকে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়েছিলেন সিদ্দিকে আকবর। তাঁর প্রথম এবং চূড়ান্ত যুক্তি ছিল, কোন বড় বিপদও রাসূলের হুকুম পালন থেকে আমায় বিরত রাখতে পারবে না। তার সেই দৃঢ়তা নিয়েই হযরত ওমর জিহাদের দাওয়াত দিতে লাগলেন মদিনাবাসীকে। ইরানে অভিযান পাঠানোর জন্য তার বড় যুক্তি ছিল, এ আবু বকরের (রাঃ) অন্তিম ইচ্ছা।

বক্তৃতা শেষ করলেন আমিরুল মুমিনীন। তাকালেন মুসান্না বিন হারেসার দিকে।
ঃ 'মুসান্না, তুমি কিছু বলবে?'

দাঁড়ালেন মুসান্না। দৃষ্টি ফেরালেন চারদিকে। হেজাযের কাফেলাকে যিনি মাদায়েনের পথ দেখাতে এসেছিলেন, মদিনার মসজিদে গুঞ্জরিত হল সে নকীবের আওয়াজ। তিনি বললেনঃ 'আমি ইসলামের একজন সাধারণ খাদেম। এখানে রয়েছেন বদর ও হোনাইনের জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মহানবীর বিশিষ্ট সাহাবাগণ। তাঁদের সামনে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করার কথাও আমি ভাবতে পারি না। আমি শুধু বলব, ইরানের বর্তমান অবস্থা ও হাল হকিকত। এ মুহূর্তেই আমাদের অভিযান পরিচালনা করা উচিৎ, না কি ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে এ ফয়সালার ভার বুযর্গদের উপর। আপনারা যদি আমায় সঙ্গ দিতে রাজি হন, তা হবে আমার খোশ কিসমত। নয়তো একাই রওয়ানা হব আমি। আমার হিম্মত আর সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাব। আমার একীন, ইরান অভিযানের গুরুত্ব অনুধান করতে সময় লাগবে না আপনাদের।'

একটু থেমে ইরানের অতীত লড়াইয়ের আলোকে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা শুরু করলেন তিনি। ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ হতে লাগল তাঁর আওয়াজ। শ্রোতাদের মনে হতে লাগল, এক শান্ত নদী আচানক প্রবাহিত হয়ে দরিয়ার রূপ লাভ করেছে। সে দেশের মানচিত্র তুলে ধরছিলেন মুসান্না, যার নদী-নালা আর মরু-মাঠ হাতের রেখার মতই পরিষ্কার ছিল তার কাছে। সে সব বিদ্রোহ আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি, যার কারণে সালতানাতের অভ্যন্তর হয়ে পড়েছিল দুর্বল, ফাঁকা। ইরানে লড়াই মুলতবী করে মাদায়েনের হুকুমতকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলে কি বিপদ আসতে পারে তাও তিনি বললেন।

'সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী' উপসংহারে তিনি বললেন। 'আমি জানিনা কতজন স্বেচ্ছাসেবক আপনারা আমায় দিতে পারবেন। তবুও এ আশ্বাস আপনাদের দিচ্ছি, আল্লার দ্বীনের আওয়াজ বুলন্দ করার যে লড়াই শুরু করেছি তা অব্যাহত থাকবে। মাদায়েনের পথে সে মুজাহিদদের সাথী হওয়ার দাওয়াত দেব আমি, যাদের প্রথম হামলায়ই ইরান সালতানাতের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। প্রতিরোধ মূলক লড়াই ছাড়া আর কিছু ভাবার মওকা দুশমনকে আমি দেব না। আপনাদের বলতে এসেছি, রুস্তমের নেতৃত্বে এসে তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে ইরানের অবস্থা। রাষ্ট্রের সকল সচেতন শক্তি জমা হচ্ছে তার পাশে। কবিলার সর্দার, সামন্ত প্রভু, এবং মাজুসী ঠাকুরদের দলে ভিড়াতে পারলে সৈন্যদের শৃংখলাবদ্ধ করতে তার দেরী হবে না। ইরানী লশকর সংহত হলে তাদের প্রথম টার্গেট হবে, যারা ইরাকে ইলামের পতাকা ধরে রেখেছেন তাঁরা। এ সুযোগ তাদের দিলে কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর পর যে কাফেলা এখান থেকে রওয়ানা হবে, দজলা ফোরাতের উপত্যকায় আপনাদের পথ পানে চেয়ে থাকা মুজাহিদদের পরিবর্তে দেখবেন তাদের কবর। সে কবরগুলোই বলবে, এ পথই চলে

গেছে মাদায়েনের দিকে।'

বক্তৃতা শেষ করলেন মুসান্না (রাঃ)। তায়েফের রইস আবু ওবায়েদ বিন সফফি (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ 'আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আমি জিহাদের জন্য পেশ করছি। আমার কবিলার প্রতিটি লোক থাকবে আমার সাথে।'

এর পরই চার দিকে থেকে মুসান্নার সাহায্যে উচ্চকিত হতে লাগল আওয়াজ। তার সাথে যেতে তৈরী হলেন কয়েক হাজার মুজাহিদ। নেতৃত্বের প্রশ্নে মদিনাবাসীদের ইচ্ছে ছিল, কোন আনসার অথবা মুহাজির সাহাবীকে নেতৃত্ব দেয়া হোক। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ 'জিহাদের দাওয়াতে প্রথম লাব্বাইক বলেছে আবু ওবায়েদ। এ জন্য লষ্করের নেতৃত্ব তাকেই সমর্পণ করছি।'

মৃদু মৃদু হাসছিলেন মুসান্না (রাঃ)। 'ব্যক্তি থেকে নেতৃত্বের উদ্দেশ্যই মুখ্য' মর্দে মুজাহিদের হৃদয়ের এ সত্যই ফুটে উঠল তার সে অনাবিল হাসিতে।

ঃ 'মুসান্না!' খলিফা বললেন। 'এখন এখানে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই তোমার। আজই রওয়ানা হয়ে যাও তুমি। শীঘ্রই আবু ওবায়েদ তোমার সাথে গিয়ে মিশবে।'

ঘন্টা খানেক পর মদিনা থেকে হীরার পথ ধরলেন মুসান্না বিন হারেসা। সন্ধ্যার আগেই কবিলার সর্দারদের জন্য খলিফার ফরমান জারী হল, ধর্মচ্যুতদের মধ্যে যারা তওবা করে জিহাদে অংশ নিতে চায়, পুরনো বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য শিথিল করা হল।

হীরা পৌছেই মুসান্না (রাঃ) সংবাদ পেলেন, নুরসীর নেতৃত্বে দজলা ফোরাতের মাঝে 'কসকরে' পৌছেছে ইরানী ফৌজ। আরেক দল ফোরাতের তীর ঘেঁষে হীরার দিকে এগিয়ে আসছে জাবানের নেতৃত্বে। আবু ওবায়েদের আগমন পর্যন্ত পিছন দিকটা নিরাপদ রাখতে চাইছিলেন মুসান্না (রাঃ)। হীরা থেকে ছাউনী তুলে মরু এলাকার 'খাফফানে' ছাউনী ফেলে আবু ওবায়েদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা হলেন আবু ওবায়েদ। পথে বিভিন্ন মঞ্জিলে কবিলার স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুতি নিল। এ লষ্কর যখন খাফফান পৌছল, চার হাজারের স্থলে মুজাহিদদের পরিমাণ হল দশ হাজার।

হীরা খালি করে মরুর দিকে পিছিয়ে গেছে মুসলমানরা, মাদায়েনবাসী এ জন্য ছিল উল্লসিত। তাদের বিশ্বাস ছিল, নুরসী এবং জাবানের ফৌজ ইরাক সীমান্ত থেকে ওদের সম্পূর্ণ রূপে না তাড়িয়ে অভিযান থামাবে না।

মাদায়েনের কয়েদখানায় পড়েছিল মিয়ানদাদ। দুঃসহ যাতনা আর অসহনীয় দুশ্চিন্তা নিঃশেষ করে দিয়েছিল তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি। বন্দীত্বের প্রাথমিক দিনগুলি তার কেটেছে এক সংকীর্ণ কুঠুরীতে। এখন তাকে সরিয়ে আনা হয়েছে ঈষৎ

প্রশস্ত কামরায়। সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে এখানে তার খাওয়া পরাও খানিকটা উন্নত ছিল।

কোন পাহারাদারের কাছ থেকে বাইরের অবস্থা জানার চেষ্টা এখন পর্যন্ত করেনি ও। জুলুম আর অসহায়ত্বের অনুভূতি মোহর মেরে দিয়েছিল তার ঠোঁটে। নতুন কামরায় তাকে আনা হয়েছিল রাতের বেলা। গবাক্ষে দাঁড়িয়ে ও প্রথমবার উপভোগ করল সিতারার মুচকি হাসি। সে রাতে অনেক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসেনি তার। ও যখন ঘুম থেকে উঠল, পাহারাদারকে দেখতে পেল সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উঠে বসল ও। একজন ওর সামনে রাখল খাবারের খাঞ্চা।

ঃ 'আজ আপনি অনেক ঘুমিয়েছেন।' বলল সে।

কোন জওয়াব দিল না ও। লৌহ কবাট বন্ধ করে ফিরে গেল পাহারাদার।

খাঞ্চার খাবারে খানিক বাড়াবাড়ি দেখল মিয়ানদাদ। আচম্বিত কেঁপে উঠল তার গোটা দেহ। ও জানত, মৃত্যুদন্ডের ফয়সালা হয় যে সব কয়েদীদের, তাদেরকেই দেয়া হয় এমনতরো খাবার। 'এ আমার শেষ খানা' মনে মনে বলল ও। দৃষ্টির সামনে সে দেখতে পেল মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকা। কম্পিত পদে উঠে দাঁড়াল ও। আঁকড়ে ধরল গরাদের শিক।

ঃ 'না, না, এ হতেই পারে না। আমি বাঁচতে চাই, নিপীড়িত, অপমানিত আর অসহায় হয়েও বেঁচে থাকতে চাই আমি। আমি নিরাপরাধ, ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে না।'

জানালা থেকে সরে আবার চিৎকার করতে লাগল দরজার পাশে এসে। যখন কান্নার গমকে মিশে গেল ওর চিৎকার, কবাট ভাংগার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশ হয়ে এল হাত দুটো, ছুটে আসা পাহারাদারদের চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে। খুলে গেল কামরায় দরজা। কয়েদখানার দারোগা চারজন সশস্ত্র পাহারাদার নিয়ে প্রবেশ করলেন কামরায়।

ঃ 'কি হয়েছে?' দারোগা প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জানতে চাই, আর কতক্ষণ আমি জিন্দা থাকব।' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মিয়ানদাদ। 'ফাঁসীতে ঝুলানোর জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করেছ!'

পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে দারোগা বললেনঃ 'তোমরা বেরিয়ে কবাট বন্ধ করে দাও।'

হুকুম তামিল করল ওরা।

ঃ 'তুমি ছিলে এক অন্ধকার কুঠরীতে।' মিয়ানদাদকে বললেন দারোগা। 'তখন তোমার ধৈর্য আর সাহস দেখে আশ্চর্য হতাম আমি। এখন আমরা শাহী মেহমানের মত ব্যবহার করছি তোমার সাথে, আর তুমি আহত বাচ্চার মত চিৎকার করছ। তোমায় ফাঁসী দেয়া হবে, এমন ধারণা এল কেন তোমার মনে?'

ঃ 'এ কি আমার শেষ খানা নয়?' খাবারের দিকে ইশারা করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না, যদি পাহারাদাররা তোমার সাথে ঠাট্টা করে থাকে তবে তোমার সামনেই পিটিয়ে তাদের চামড়া তুলে নেব।'

কম্পিত হাতে তার বাহু ধরে মিয়ানদাদ বললঃ 'পাহারাদাররা কিছুই আমায় বলেনি। কিন্তু যদি আমার কিসমতের ফয়সালা হয়েই থাকে তা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত।'

ঃ 'তোমায় মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে না, এ নিশ্চয়তা দিতে পারি। ভবিষ্যতে সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহারও তোমার সাথে করা হবে না। রুস্তমের পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে তুমি শরীক নও, সে এখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত। শাহী মহলের গোলাম এবং খোজারা আজমেরী বানুর বর্ণনা স্বীকার করেছে।'

মিয়ানদাদ চমকিত হয়ে বললঃ 'তিনি এখনো জীবিত?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ তার জিন্দেগী। তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

ঃ 'তিনি কি বন্দিনী?' ধরা গলায় প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না। চোখ তুলে নেয়ার পর তার মস্তিষ্ক এমন ছিল না যে, তাকে কয়েদ করে রাখতে হবে। রাণী পুরান দখত তাকে তার পুরাতন মহলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনেছি, তোমায়ও তিনি ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু রুস্তম জেদ ধরেছিল তোমাকে কয়েদখানায় রাখতে। কাল ভোরে রাণীর পক্ষ থেকে তোমার আরামের ব্যবস্থা করার হুকুম পেয়েছি। এখন নির্দ্বিধায় খেতে পার। আফসোস, রাতে তোমার কাছে আসতে পারিনি। তোমার চীৎকার না শুনলেও আজ দুপুরের মধ্যে তোমার কাছে আসতাম।'

ঃ 'কতদিন আমি এখানে থাকব?'

ঃ 'আমি জানি না। হুকুমতের রশি এখন রুস্তমের হাতে। সে তোমায় কোতল করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরান দখতের হস্তক্ষেপে রক্ষা পেয়েছে তোমার জীবন। তোমার গাফলতিতে তার পিতা নিহত হয়েছেন একথা ভুলতে সে রাজী নয়।'

ঃ 'রুস্তমের কাছে একটা দরখাস্ত লিখার অনুমতি তুমি আমায় দেবে?'

ঃ ' হ্যাঁ, তা দিতে পারি। কিন্তু এখন তার দরকার নেই। বড়জোড় এদ্দুর লিখতে পারো যে, ছিয়াওখশ আর আজমেরী বানুর সাথে ষড়যন্ত্রে তুমি শরীক ছিলে না। কিন্তু একথা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তোমার পক্ষে মহলের এবং ছিয়াওখশের কর্মচারীই নয় বরং সে জমিদারও সাক্ষ্য দিয়েছে, ছিয়াওখশের হুকুমে যে তোমায় আটক করে রেখেছিল।'

ঃ 'তিনি কি গ্রেফতার হয়েছেন?'

ঃ 'তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু তার জবানবন্দী শুনে তাকে ছেড়ে দিয়েছে রুস্তম। আমার বিশ্বাস, তোমাকেও বেশীদিন বন্দী করে রাখবে না সে। রাণী

ছাড়া কয়েদখানার বাইরেও তোমার কিছু কল্যাণকামী রয়েছেন। তোমায় ওরা ভুলবেন না। যে কোন মুহূর্তে রুস্তমকে ওরা প্রভাবিত করতে পারেন। আপাততঃ নীরব থাকাতেই তোমার কল্যাণ।'

ঃ 'বুঝতে পারছিনা, আমি নিরপরাধ বুঝা সত্বেও রাণীর মর্জির বিরুদ্ধে রুস্তম কিভাবে আমায় বন্দী করে রাখতে পারেন।'

ঃ 'রাণী জানেন, তার সিংহাসনের সব ভার এখন রুস্তমের কাঁধে। এ জন্যেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেন না।'

ঃ 'তুমি যে বলছিলে রাণী ছাড়াও আরো কেউ আমার কল্যাণকামী, ওরা কারা?'

ঃ 'ওরা তোমার দোস্ত। তাদের মধ্যে এক যুবককেই শুধু আমি চিনি। কিন্তু এখন তার নাম প্রকাশ করতে পারছি না। ও এলে তোমার কাছে পৌছে যাবে। তোমায় কথা দিচ্ছি, যতদিন এখানে থাকবে, তুমি যে বন্দী তা অনুভব করতে দেব না তোমাকে। আমার সাধ্যের মধ্যে তোমার কোন খায়েশও অপূর্ণ থাকবে না।'

ঃ 'এ মুহূর্তে আমার একটাই খায়েশ। হায়, যদি তুমি তা পূর্ণ করতে পারতে! আমার বোনের খবর জানতে চাই আমি। মাহবানু তার নাম। কোথাও আত্মগোপন করে আছে ও। যদি মাদায়েনে না থাকে তবে ইস্পাহানে পারভেজের জামাতার কাছে পৌছে গেছে। তার খবর দিতে পারলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

ঃ 'সরুশকে আমি চিনি। তোমার বোনের খোঁজ নেব আমি, তবে এক শর্তে।'

ঃ 'এক কয়েদী যদি তোমার কোন শর্ত পূরণ করতে পারে, তবে অস্বীকার করব না আমি।'

স্মিত হেসে দারোগা বললঃ 'ভবিষ্যতে গরাদের শিকগুলো ভাংগার চেষ্টা করবে না। আর মুক্তি পেলে এক সপ্তাহ সংকীর্ণ কুঠুরীতে রাখার জন্য আমায় শাস্তি দেবে না। এবার নিশ্চিন্তে খেয়ে নাও।'

দরজার দিকে পা বাড়াল দারোগা। আবার মিয়ানদাদের দিকে ফিরে বললঃ 'মিয়ানদাদ, তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না আমি। ইরানের রাণী যদি তোমায় ভুলে না যায়, তবে কোন দিন হয়ত এ কয়েদখানা থেকে বেরুবে। পরদিন লস্করের কোন ছাউনীতে আয়োজন চলতে থাকবে তোমার অভ্যার্থনার। মনে রেখো, কয়েদখানায় বন্দী হয় উজীর অথবা সিপাহসালার।'

এ মোলাকাতের পর মিয়ানদাদের মনোবেদনা প্রশমিত হয়ে এল কিছুটা। পরদিন দারোগা এসে যখন বলল, 'তোমার বোনের খোঁজে এক বিশ্বস্ত লোককে আমি ইস্পাহান পাঠিয়েছি,' তার আঁধার দুনিয়ায় জ্বলে উঠল আশার আলো। এরপর থেকে দারোগা প্রতিদিন আসত তার কাছে। তার বদৌলতে বাইরের অবস্থা মাদায়েনের জনগণের চেয়ে বেশী জানতে পেতো মিয়ানদাদ।

বিশ দিন পর। দারোগা এসে সুসংবাদ দিল যে, ইস্পাহানে মাহবানুর খোঁজ পাওয়া গেছে। মাদায়েন থেকে পালিয়ে সরুশের ওখানে পৌছেছে ও।

ঃ 'ওরা কি জানে আমি বন্দী!' প্রশ্ন করল মিয়ানদাদ।

ঃ 'না, দূতকে শুধু তোমার বোনের খোঁজ নিতেই বলেছিলাম। তোমার ব্যাপারে তাকে কিছুই বলিনি। আমি তাকে বলেছিলাম, সরুশের কাছে নিজে না গিয়ে অন্য কারো দ্বারা মাহবানুর সংবাদ নিও। ইস্পাহানে গিয়েই সে এক মহিলার সাহায্য নিয়েছিল। দূত তোমার কোন কথা বললেই হয়ত সরুশ সর্বাগ্রে অনুসন্ধান শুরু করত। তার সামান্যতম অসাবধানতাও বিপদ বয়ে আনত আমার জন্য। নিরাশ হয়ো না, সময় এলে সংবাদ তাকে পাঠাব। কিছুদিনের মধ্যে সেও মাদায়েন এসে যেতে পারে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি চলছে মাদায়েনে। সরুশ এলে তার কাছে তোমার অবস্থা গোপন থাকবে না।'

জাবান আর নূরসীর নেতৃত্বে ইরানী ফৌজ একমাস পরই রওয়ানা করেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কোন নতুন খবর পেলেই মিয়ানদাদের কাছে ছুটে আসত দারোগা। লশকরের অগ্রগতির অবস্থা জানিয়ে প্রশ্ন করতঃ 'এখনো কি তোমার ধারণা, জওয়াবী হামলা মুসলমানরা করবে?'

ঃ 'হ্যাঁ, এ ধারণা এখনো আছে আমার।' জওয়াব দিত মিয়ানদাদ।

এক সন্ধ্যায় হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় ঢুকল দারোগা। বললঃ 'মিয়ানদাদ, ভুল তোমার ধারণা। মোকাবেলা করবে না মুসলমানরা। মরুপ্রান্তের শেষ ছাউনী ছাড়া গোটা ইরাক খালি করে দিয়েছে জাবান। নুরসীর লশকর পৌছেছে কসকর। কদিন পর শুনবে দু'লশকরই বিশাল মরুতে পরাজিত দুশমনের পিছু ধাওয়া করছে।'

ঃ 'নুরসীর লশকরের অপেক্ষা না করেই যদি নদী পেরিয়ে থাকে জাবান, তবে তুমি এক লোমহর্ষক খবর শোনার জন্য তৈরী থেকো।'

ঃ 'তুমি এখনো ভাবছ মুসলমানরা আমাদের মোকাবিলা করবে?'

ঃ 'মুসান্না বিন হারেসা যদি বেঁচে থাকে তবে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, দেরী না করেই জওয়াবী হামলা করবে সে। জাবানের জন্য এ হামলা হবে যেমনি প্রচন্ড তেমনি আকস্মিক। আমাদের দু'লশকরকে জমায়েত হতে দেবে না ওরা। ওরা ইরাক খালি করে দিয়েছে এজন্য তুমি সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি ভাবছি, সমগ্র শক্তি একত্র করেছে ওরা। সে বিপজ্জনক স্থানেই পৌছেছে জাবান।'

সত্য হল মিয়ানদাদের সন্দেহ। দারোগার সাথে কথা হয়েছে একঘন্টাও যায়নি, দ্রুতগামী অশ্বারোহী দল প্রবেশ করল মাদায়েন। একটু পরই সে দলের সালার রুস্তমকে বলছিলঃ 'জাবানকে পরাজিত করে আবু ওবায়েদের লশকর কসকরের দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে।'

স্তম্ভিত হয়ে রুস্তম দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বললঃ 'জাবান নিজে এ সংবাদ নিয়ে এলে তার চামড়া আমি তুলে নিতাম।'

ঃ 'জনাব, দুশমনের হামলা ছিল এত আকস্মিক, প্রস্তুতও হতে পারিনি আমরা। সূর্যাস্তের কয়েক ঘন্টা আগে মাত্র আমরা খবর পেয়েছিলাম খাফফানের ছাউনী খালি করে ফেলেছে দুশমন। মরুর দিকে তাদের রোখ। সিপাহসালার ভেবেছিলেন, ইরাক ছেড়ে ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ ছিল তাদের চাল। তখনি তা আমরা টের পেয়েছি, যখন ওরা আমাদের ছাউনী থেকে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে।'

রাগে ঠোঁট কামড়ে রুস্তম বললঃ 'এ কথা কেন বলছ না, দুশমন পিছিয়ে যাচ্ছে শুনে সারারাত উৎসবে মেতেছিলে তোমরা। ওরা যখন প্রবেশ করছিল ছাউনীতে, তোমরা তখন মদে মাতাল।'

ঃ 'জনাব, সিপাহসালারের হুকুম ছিল ভোরে মার্চ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত থেকো। রাতে পালিয়ে যাওয়া দুশমনের পিছু নেয়ার দরকার নেই। ইরাক সীমান্তের কোথাও ওরা ছাউনী ফেলার চেষ্টা করলে দিনের আলোতেই ওদের আমরা সাফ করে ফেলতে পারব। কিন্তু যখন আমরা মার্চ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ওরা তখন আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে।'

ঃ 'আর ওদের দেখেই তোমরা ছুটে পালালে?'

ঃ 'জনাব, 'পরাজয়' শব্দের স্থানে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করব না। কিন্তু আমরা ভীরু, কাপুরুষ, দুশমনের সালার এ অপবাদ দিতে পারবে না।'

ঃ 'দুশমনের সংখ্যা কি আমাদের চেয়ে বেশী ছিল?' গর্জে উঠল রুস্তম।

ঃ 'না।' আনত শিরে জওয়াব দিল অফিসার।

ঃ 'তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল কি তাদের অস্ত্র সম্ভার?'

ঃ 'না, বরং তাদের অধিকাংশই ছিল বর্মহীন।'

ঃ 'তবে তোমাদের পরাজয়ের কারণ তোমাদের সালারের অযোগ্যতা আর বোকামী ও ভীরুতা ছাড়া আর কি হতে পারে?'

ঃ 'জনাব, এমন দুশমনের সম্মুখীন হয়েছি আমরা, যুদ্ধের সব নীতিমালা এবং জয় পরাজয়ের ব্যাপারে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে দিয়েছে যারা। আমরা লড়ছি কেবল বিজয়ের আশা নিয়ে। শুধু বিজয়ই নয়, মৃত্যুও যেন তাদের জন্য এক বড় এনাম। জনাব, উন্মত্ত ঝড় বিশাল পর্বতমালাও রুখতে পারে না।'

ধমকে উঠল রস্তমঃ 'তুমি প্রভাবিত করতে চাইছ আমায়?'

ঃ 'আফসোস।' নিরুদ্বেগ জওয়াব দিল অফিসার। 'আমি কোন সুখবর নিয়ে আসিনি। তথাপি আমায় বলা হয়েছিল, এক দূরদর্শী এবং সত্যপ্রিয় ব্যক্তির কাছে যাচ্ছি আমি। তিক্ত বাস্তবকে আমি যেন মনোরম শব্দের চাদরে ঢাকার চেষ্টা না করি।'

ঃ 'তোমার নাম কি?' ইষৎ মোলায়েম স্বরে বলল রুস্তম।

ঃ 'আদমান।'

ঃ 'আরেকটু সফর করতে পারবে?'

ঃ 'আমার প্রয়োজন শুধু তাজাদম ঘোড়া।'

মৃদু হাসল রুস্তম।

ঃ 'উৎকৃষ্ট ঘোড়া পাবে তুমি আমার আস্তাবল থেকে। তা হবে তোমার এনাম। এখনি কসকর রওনা হয়ে যাও। নুরসীকে বলবে, যে কোন মূল্যেই হোক দুশমনকে যেন এগুবার সুযোগ না দেয়। তার সাহায্যে জালিনুসের নেতৃত্বে দশ হাজার সিপাই পাঠাচ্ছি আমি।'

'নুরসীর নেতৃত্বাধীন যে লশকর কসকরের কাছে খুরমা বীথিতে জমায়েত হচ্ছিল, মুসলমানদের হাতে ওরা পরাজিত হয়েছে– দিন কয়েক পর মাদায়েনে পৌছল এ সংবাদ। জালিনুসের নেতৃত্বে দশ হাজার সিপাই বারসিমার কাছে থেমে গেছে। নুরসীর পরাজিত সিপাইরাও জমা হচ্ছে ওখানে।' এ অবিশ্বাস্য সংবাদের তিনদিন পর মাদায়েনবাসী শুনছিল, নুরসীর মত জালিনুসকেও পরাজিত করেছে আবু ওবায়েদ। অবশিষ্ট লশকর নিয়ে মাদায়েনের দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি।

আরো এক সপ্তাহ পর। পুরানের দরবারে গর্জন করছিল রুস্তম।

ঃ 'হীরা কব্জা করেছে ওরা। ফোরাত উপকূলের শস্যশ্যামল এলাকা আমাদের জন্য হয়ে পড়েছে বিপদাপন্ন। আরবরা পিছ পা হওয়ায় যেসব কবিলা ভয়ে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল, আমাদের দিক থেকে নিরাশ হয়ে এখন তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। বাহরাইনের এক পরিচয়হীন ব্যক্তি আমাদের উপর হামলা করবে, দু'বছর আগে কোন ইরানী তা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু যে লড়াইকে শুরুতে বিদ্রুপ করতে তোমরা, তাই এখন আমাদের জন্য বড় জাতীয় সমস্যা। সিরিয়ায় রোমানদের পতাকা যারা ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে, তাদের আমরা দুর্বল ভাবতে পারি না। যে ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছে আমাদের অভিজ্ঞ তিনজন সালার, তাদের আমি সে বিশাল লশকরের প্রথম দল মনে করি, একই সময় যারা রোম এবং ইরান সালতানাতের সাথে টক্কর লাগানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে। কিন্তু তোমাদের বলতে পারি, সে সময়ের প্রতীক্ষা আমি করবনা, সিরিয়ার রণ ক্ষেত্রের লড়াই শেষ করে যখন ইরানে নিয়োগ করবে ওরা সর্বশক্তি। আমাদের পক্ষ থেকে জওয়াবী হামলা করার উপযুক্ত সময় এখনই। তোমাদের সিপাহসালারদের বড় ভুল ছিল, প্রতিরোধমূলক লড়াইকেই যথেষ্ট ভেবেছিল ওরা। ওরা ভেবেছিল, ইরানী সম্পদের প্রাচুর্যের ভয় ওদের পিছু হটতে বাধ্য করবে। এর ফলে আরবদের মন থেকে তোমাদের ভয় চলে গেছে। আরবদেরকে মরুভূমির দিকে হাকিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সবুজ প্রান্তর আর সুন্দর শহরগুলোর পথ দেখিয়েছ তোমরা।

তোমাদের ব্যক্তিস্বার্থ, ষড়যন্ত্র, ভীরুতা আর বোকামীর কারণে ধূলায় মিশে গেছে ইরানের হাজার বছরের ঐতিহ্য। আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, ইরানের সীমান্ত থেকে আরবদের হটিয়ে দেয়া। এ দায়িত্ব আমিই পালন করব। সকল সুবার সামন্ত প্রভু, জমিদার এবং কবিলার সর্দারদের এ পয়গাম পাঠিয়েছি, দেরী না করে নিজ নিজ ফৌজ পাঠিয়ে দিতে। আমি ঘোষণা করছি, এ হুকুম তামীল করতে সামান্যতম দুর্বলতাও বরদাশত করা হবে না। আশা করি অল্প ক'দিনের মধ্যেই এক বিরাট লশকর জমায়েত হবে মাদায়েন। ওদের নেতৃত্ব দেয়া হবে এমন ব্যক্তিকে, যার ফৌজি অভিজ্ঞতা, সাহস আর বিশ্বস্ততায় ইরানীরা আশ্বস্ত। এখানে রয়েছেন ফৌজের অভিজ্ঞ সালাররা। এ মহান জিম্মা কে বহন করবে, এর ফয়সালার ভার আমি তাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।'

ফৌজি সর্দাররা চাইতে লাগলেন পরস্পরের দিকে। ওদের দৃষ্টি খুঁজে নিল এমন এক সুঠামদেহীকে, যার চেহারা থেকে ঝরে পড়ছিল প্রবীণের গাম্ভীর্য আর যৌবনের দীপ্তি।

ঃ 'এ জিম্মাদারীর উপযুক্ত বাহমান ছাড়া আর কেউ নন।' বলল এক সর্দার। গোটা দরবার থেকে আওয়াজ উঠতে লাগল বাহমানের পক্ষে। রুস্তম হাত তুললে নীরব হয়ে গেল দরবার।

ঃ 'বাহমান।' রুস্তম বলল। 'তোমার যোগ্যতা আর তোমার শানদার অতীত আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল না। তোমার সঙ্গীদের পরামর্শ না নিলেও তোমাকে ছাড়া কাউকে খুঁজে নিত না আমার দৃষ্টি। এ অভিযানের দায়িত্ব আমি তোমায় সমর্পণ করছি।'

কোন এক দুপুরে কয়েদখানার দারোগা প্রবেশ করল মিয়ানদাদের কামরায়। বললঃ 'সরুশের সাথে আমি দেখা করেছি। তোমার খবর শুনে তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তোমার মুক্তির ব্যাপারে তিনি কি ভাবছেন তা আমায় বলেননি। আমার বিশ্বাস, সময় মত নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নেবেন তিনি। যার গাফলতিতে ফররুখ যাদ নিহত হয়েছেন তার সাথে তার হৃদ্যতা আছে, আপাততঃ রুস্তমকে বুঝতে দিতে চান না তিনি। তোমার বোনের ব্যাপারে বললেন, 'ও ভাল আছে। তাকে আমার মেয়েরে মতই মনে করি।' তুমি নিরাশ হয়ো না। এ আমাদের শেষ মোলাকাত নয়। তার কথায় বুঝলাম মাদায়েন আসবেন তিনি। হুকুমত তাকে পারভেজের মহল সোপর্দ করেছে।'

ঃ 'ওখানেই তিনি অবস্থান করছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, তবে নিজস্ব সিপাইদের ছাউনীতে রেখে এসেছিলেন। আমাদের লশকর ইরাকে রওনা করবে পরশু। নিজের ফৌজ রওনা করিয়ে ইস্পাহান চলে যাবেন তিনি। রুস্তম তাকে বলেছেন, এ বয়সে রণক্ষেত্রে না গিয়ে ইস্পাহান থেকে নতুন লশকর ভর্তি করতে।'

ঃ 'ওখানে কোন আরব বালক দেখেছিলে?'

ঃ 'আমরা যখন কথা বলছিলাম, পনর ষোল বছরের এক প্রাণবন্ত বালক এসেছিল। আরব নয় বরং তাকে মনে হচ্ছিল কোন ইরানী আমীরজাদা। মনে হয়েছে, ও সরুশের কোন আত্মীয়। তবে চেহারায় অল্প বয়েসী বালক এবং দেহের গড়নে এক নওজোয়ান মনে হচ্ছিল তাকে।'

ঃ 'তার কপালে কি যখমের চিহ্ন ছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু সে কে?'

ঃ 'ও ......ও আমার এক ছোট্ট দোস্ত।'

ঃ 'তুমি কোন পয়গাম দিতে চাইলে তাকে খুঁজতে পারি।'

ঃ 'না।' বিষন্ন কণ্ঠে বলল মিয়ানদাদ। 'আমার এ অত্যাচারিত আর অসহায় অবস্থা ওর না জানাই ভাল।'

তেইশ

তিন হাজার অশ্বারোহী এবং তিনশো হাতী নিয়ে মাদায়েন থেকে বেরুল বাহমান। ইরানের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছিল লশকরের সামনে। পারস্যবাসী জয়ের মূল ভাবত একে।

বাবেলের কাছে ফোরাত পারে আরব আর অনারবের লশকর ছাউনী ফেলল। দূত মারফত আবু ওবায়েদকে বাহমান জানালঃ 'নদী পেরিয়ে তোমরা আসবে না আমরা আসব?'

ইসলামী লশকরের অভিজ্ঞ সালাররা আবু ওবায়েদকে বোঝাতে চাইলেন, আমরা নদী না পেরিয়ে ওদের সে সুযোগ দিলে ভাল হয়। ফৌজের স্বল্পতার কারণে পেছন দিকটা নিরাপদ রাখতে চাইছিলেন তারা। কিন্তু আবু ওবায়েদের বিবেক দুশমনের সামনে দুর্বলতা প্রদর্শনের অনুমতি দিল না। তিনি বললেনঃ 'ওদের চেয়ে তোমরা কি মৃত্যুকে বেশী ভয় পাও?' নীরব হয়ে গেলেন তারা।

নৌকার পুল তৈরী হল। সেনাপতির সাথে যারা ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, নদী পেরোতে সবার আগে রইলেন তাঁরা। মুসলমানরা নদীর ওপারে পা রাখা মাত্র, এগোতে লাগল ইরানী ফৌজ। সংকীর্ণ ময়দান হয়ে গেল আরো সংকীর্ণ। দুশমনের তীরের আওতায় পড়ল সামনের সারিগুলি। দুশমনের বেষ্টনীর কারণে ডান ও বামের অশ্বারোহীদের নড়বার জায়গাও রইল না। শেষ দলটি এখনো পুল পেরোয়নি, প্রচন্ড হামলা করল দুশমন।

তিনশো হাতীর গলায় ঝুলানো ঘন্টার ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি হল। হাতীগুলো এগিয়ে এল শুঁড় উঁচিয়ে। সাথে সাথে উচ্চকিত হল অসংখ্য কাড়ানাকারা আর বাদ্যের

আওয়াজ। এ পর্যন্ত এত হাতীর সামনে পড়েনি মুসলমানরা। হাওদায় বসে তীর বৃষ্টি করছিল ওরা। ভয়ে শৃংখলাহীন হয়ে যাচ্ছিল ঘোড়াগুলি। মূল বাহিনীর সারিগুলো ভেঙ্গে যেতে লাগল। ডান ও বামের অশ্বারোহীদের ওপর তীব্র হল ইরানীদের হামলা। ময়দান এত সংকীর্ণ হয়ে পড়ল যে, ওরা দাঁড়ানোর স্থানটুকুও পাচ্ছিল না ঠিকমত। উচ্চ কণ্ঠে আবু ওবায়েদ বললেনঃ 'যারা আল্লাহর নামে জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত আমার সঙ্গে এসো।'

তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। একটা হাতীকে হামলা করলেন দ্রুত। হাওদার রশি কেটে ছুঁড়ে ফেললেন এক দিকে। বাহাদুর নেতার অনুসরণ করল মুসলিম ফৌজ। কয়েকটা হাতী জখম করে হাওদা ফেলে দিয়ে উল্টো ওদের হাকিয়ে দিল দুশমন সারির দিকে। ভয় পেয়ে হাতীগুলো দুশমনের ডানে বায়ে পাগলের মত ছুটে তছনছ করে দিল ওদের সামনের সারিগুলি। কিন্তু এতেও লড়াইয়ের গতি পাল্টালো না।

পর্বতের মত একটা শাদা হাতী বৃংহন শব্দে শুঁড় উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। ভয়ে অন্য হাতীরাও কাছে ঘেঁষছিল না তার। 'আল্লাহু আকবার' বলে তার ওপর হামলা করলেন আবু ওবায়েদ। তরবারীর প্রথম আঘাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হাতীর শুঁড়। চোখের পলকে এ ভয়ংকর জানোয়ার উল্টোমুখী হয়ে পিষে ফেলতে লাগল ইরানীদের সারিগুলি। কিন্তু আবারও সংগঠিত হয়ে বিশাল ইরানী ফৌজ হামলা করল মুসলমানদের ওপর।

লড়াইয়ের শুরুতেই আবু ওবায়েদ বলেছিলেন, আমার শাহাদাতের পর আমার কবিলার অমুক অমুক ব্যক্তি পর পর নেতৃত্ব নেবে লশকরের। তিনি মাটিতে পড়ে যেতেই তার কবিলায় এক নওজোয়ান নিশান তুলে নিলেন। আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন তিনিও। পতাকা ধারণ করলেন আরেক মুজাহিদ। আবু ওবায়েদ লস্করের আমীর হওয়ার জন্য যাদের বলেছিলেন, পর পর শহীদ হয়ে গেলেন সে সাতজন। এসময় প্রলয়ের মুখোমুখী ছিল মুসলমানরা। আবু ওবায়েদের সাতজন স্থলাভিষিক্ত শহীদ হলে পুলের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল ওরা। পিছনের সারিগুলোকে পুল পার হওয়ার সুযোগ দিয়ার জন্য দুশমনকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করছিল প্রথম সারিগুলো। বুলন্দ হলো করো কণ্ঠঃ 'মুজাহিদ! নেতার মত জীবন দাও অথবা বিজয় হাসিল কর। বিজয় অথবা শাহাদাত ছাড়া কোন পথ নেই তোমাদের।'

চারদিক থেকে যখন এগিয়ে এল মৃত্যুর বিভীষিকা, মধ্য বাহিনীতে পৌছে গেলেন মুসান্না। ডান ও বামের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। পতাকা হাতে নিয়ে দরাজ কণ্ঠে বললেনঃ 'জিন্দাদীল দ্বীনি ভাইয়েরা! নিজেকে ধ্বংস করোনা। পুলের কাছে পৌছা পর্যন্ত তোমাদের হিফাজত করব আমি।'

অল্প ক'জন জানবাজ নিয়ে বাহরাইনের শের দাঁড়িয়ে রইলেন পাহাড়ের মত অনড় হয়ে। হাজার হাজার ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমান নদীর উত্তাল তরঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল যখন,

তখনও তার হিম্মত ছিল অটল। হাতীর বৃংহন শব্দ যখন তার চার পাশে, দুশমনের নেযার আঘাতে তার বর্ম ভেঙ্গে যখন ঢুকে যাচ্ছিল বুকে, রক্তে ভিজে উঠছিল লেবাস, তখনও তিনি নির্বিকার দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুল মেরামত করে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে নদী পেরোতে লাগলেন মুসলমানরা। আমীরে লশকরের সাথে যে এগারজন সব শেষে পুল পার হচ্ছিলেন, হাসান ছিল তাদের সাথে।

কেটে দেয়া হল পুলের রশি। পরাজিত লশকর জমা হতে লাগলো নেতার চার পাশে। তাদের মুখে ছিল সে সব শহীদদের স্মরণ, জসরের ময়দানে বিক্ষিপ্ত পড়েছিল যাদের লাশ। ফোরাতের উম্মত্ত তরঙ্গ যাদের কেড়ে নিয়েছিল, তাদের জন্য কাঁদছিল ওদের হৃদয়গুলো। ইরাকের বিগত সবগুলো লড়াইয়ের চেয়ে এ যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশী। শহীদ হয়েছিলেন চার হাজারেরও অধিক মুজাহিদ। আবু ওবায়েদের সাথে যারা এসেছিল, পরাজয়ের আশংকায় তাদের প্রায় দু'হাজার ফিরে গেল।

পড়ন্ত বেলা। মুসান্নার চিঠি নিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে মদিনার দিকে ছুটল দূত। কেউ রওনা হল ইরাকের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন কবিলার সর্দারদের কাছে– এ মুহূর্তে যাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা যাচ্ছিল। সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক পর অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে মর্দমার সীমান্ত ছাউনীর পথ ধরলেন মুসান্না।

দুশমন ফৌজের তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন তিনি। ওরা তাঁকে সংবাদ পাঠালঃ 'সামনে না বেড়ে ফিরে যাচ্ছে বাহমান। জাবান এবং মর্দানশার নেতৃত্বে লশকরের একটা অংশ আমাদের পিছু নেয়ার চেষ্টা করছে।'

এদিকে এলিশে কবিলার কাছে পাঠানো পয়গামের সাহসিকতাপূর্ণ জওয়াব পেলেন তিনি। মর্দমা থেকে তিনি এলিশ পৌছলেন। এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, বাহমান আচানক কেন মাদায়েন ফিরে গেছে। মাদায়েনের একদল প্রভাবশালী ওমরা ফিরোজানের নেতৃত্বে রুস্তমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রুস্তমের দূত তখনই পৌছেছিল বাহমানের কাছে, জসরের লড়াই যখন চূড়ান্ত। মাদায়েনের নতুন অভ্যুত্থানের ফলে সে সব দোদুল্যমান কবিলাগুলোও সমর্থন করল মুসলমানদের, ইতিপূর্বে যারা ইরানীদের শক্তি দেখে মুসলমানদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কয়দিন পর। জাবান আর মর্দানশার মোকাবিলার জন্য এগিয়ে এলেন মুসান্না। এলিশের কবিলাগুলোর বিরাট অংশ সংগী হ'ল তার। অল্পেই জাবান আর মর্দানশার লশকরকে চরমভাবে পরাজিত করলেন তিনি।

লড়াই শেষে হাসানকে ডেকে পাঠালেন মুসান্না। বললেনঃ 'এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠাচ্ছি তোমায়। ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আমাদের জানা উচিৎ। আজ রাতেই রওয়ানা করবে তুমি। হীরা পৌছে কিছু বিশ্বস্ত লোকের সহযোগিতা পাবে।

তাদের মাধ্যমে ইরানের নতুন খবর সংগ্রহ করতে পারবে। দুশমনের গতিবিধির কোন বিশেষ সংবাদ পেলে শীঘ্রই ফিরে আসবে। তুমি সফর করবে ইরানী অফিসারের বেশে। দু'দিনের মধ্যে এখান থেকে রওনা হব আমিও। খাফ্ফানের কাছে এলিশের চেয়ে মরুভূমি নিকটে এমন এক স্থানে হবে আমার অবস্থান।'

সূর্য ডোবার খানিক পূর্বে হাসানের তাবুতে প্রবেশ করল কাউস। ভয়ার্ত চোখে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। অভিমানের স্বরে বললঃ 'আপনি মাদায়েন যাচ্ছেন এ কথা আমায় বলেননি কেন? আমার সাহায্য ছাড়া ওদের আপনি খুঁজে পাবেন, এ কথাইবা ভাবলেন কি করে?'

স্মিত হেসে হাসান বললঃ 'আমি মাদায়েন গেলে তুমি অবশ্যই থাকতে আমার সাথে। এখনো সময় আসেনি ওখানে যাবার।'

ঃ 'কিন্তু এ লেবাস?'

ঃ 'ইরানীরা শুধু মাদায়েনেই থাকে না। ওদের সাম্রাজ্য আরো বিশাল।'

ঃ 'কিন্তু এ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহরেই আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে। আপনাকে এ পোশাকে সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু কোন সন্দেহ আমায় করবে না।'

ঃ 'তোমায় প্রয়োজন হলে অবশ্যই সাথে নিয়ে যেতাম।'

ঃ 'আপনি কি কোন বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছেন?'

ঃ 'না, খুব শীঘ্রই ফিরে আসব। কোন কারণে আমার দেরী হলে ডেকে পাঠাব তোমায়।'

তাবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার চড়ে বসল হাসান।

কাদেসিয়া এবং খাফফানের মাঝে সাবাখে ছাউনী ফেলেছিল মুসান্নার লশকর। মরুচারী কবিলাগুলো দারুণ আগ্রহ নিয়ে জমায়েত হচ্ছিল তাঁর ঝান্ডার নিচে। বনু তাগলুব আর বনু নমরের খৃষ্টান সর্দাররাও কবিলার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ওখানে আসছিল। খলিফার পক্ষ থেকেও আশাব্যঞ্জক পয়গাম পেলেন তিনি। জরির বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে বনু বজিলার লশকর রওয়ানা হয়েছে তার সাহায্যে। জসরের লড়াই থেকে ফিরে যাওয়া মুজাহিদরাও এর সাথে আসছেন। জসরের ময়দানে যে আঘাত পেয়েছিলেন মুসান্না, তখনো তা শুকায়নি। কিন্তু দৈহিক কষ্টের উপর বিজয়ী হয়েছিল তার মনোবল, সাহস আর দৃঢ়তা।

একদিনের ঘটনা। ডাক্তার ব্যান্ডেজ বাঁধছেন তার ক্ষতে, চারপাশে জমায়েত হওয়া সালারদের উপদেশ দিচ্ছেন তিনি। বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটু পর তাবুতে প্রবেশ করল হাসান। পেরেশান হয়ে চাইতে লাগল তার দিকে।

ঃ 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।' বললেন মুসান্না। 'বলো হাসান, কি সংবাদ নিয়ে এসেছ?'

ঃ 'রুস্তম আর ফিরোজের মধ্যে সন্ধি হয়েছে। দু'জন ভাগ করে নিয়েছে

হুকুমতের দায়িত্ব। বাহমানের পরিবর্তে মেহরানের নেতৃত্বে তৈরী হচ্ছে ইরানী ফৌজ। হীরায় এ সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।'

এক নওজোয়ানকে মুসান্না বললেনঃ 'এখনি রওয়ানা হও তুমি। জরিরের লস্করের দেখা পাবে মদিনার পথে। আমার পক্ষ থেকে তাকে বলবে, খুব শীঘ্র যেন পৌছে যান। 'বুইবে' তাদের জন্য অপেক্ষা করব আমি। তোমরা মরুজার রোখ করো।'

অন্য সালারদের বললেনঃ 'নারী এবং শিশুদের ওখান থেকে তিন মঞ্জিল দূরে নিয়ে যাবে। তাহলে ইরাক সীমান্ত থেকে ওরা যেমনি থাকবে দূরে, তেমনি থাকবে নিরাপদ।'

ব্যান্ডেজ শেষ করে ডাক্তার বললেনঃ 'আপনার যখমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। কমপক্ষে দু'সপ্তাহ ঘোড়ার সওয়ার না হতে পরামর্শ দিচ্ছি আমি।'

ঃ 'দুশমনের অগ্রাভিযান ঠেকানোর জিম্মা নিতে পারলে তোমার পরামর্শ আমি মানতে পারি।' বললেন মুসান্না।

সালারদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'বুইব, আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল। গোটা লশকরকে এক ঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত দেখতে চাই।'

কয়েকদিন পর। বুইবের ময়দানে ছাউনী ফেললেন মুসান্না। জরির বিন আবদুল্লাহর লশকর সহ তার সিপাইয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দশ হাজার। ফোরাতের অপর পারে জমায়েত হচ্ছিল ইরানী ফৌজ।

একদিন মেহরানের পয়গাম নিয়ে দূত এল মুসান্নার কাছেঃ 'নদী পেরোনোর মওকা দেবে আমাদের, না তোমরা আমাদের দিকে আসবে?'

ঃ 'তোমাদের সিপাহসালারকে বলবে, নদীর এপারে আমরা তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।' দূতকে বললেন মুসান্না।

ফিরে যাচ্ছিল দূত।

ঃ 'দাড়াও'। বললেন তিনি। 'আমার পক্ষ থেকে মেহরানকে এ শান্ত্বনা দিতে পার, দুশমনকে আমরা কল্যাণের পথ দেখাই, অন্যায়ে তাদের অনুসরণ করি না। তোমরা যখন পুল পার হবে, আমাদের ফৌজ থাকবে এক মাইল দূরে। ইরানের শেষ সিপাইটি পুল পার হয়ে সারি বেঁধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তৎপর হবে না আমাদের লশকর।'

চব্বিশ

নদী পেরিয়ে এল মেহরানের লশকর। তিন ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে এল ওরা। দু'দলের মাঝে দুরত্বের ব্যবধান কমে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। দিগন্তের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ইরানীদের সারি। কাড়ানাকারা, বৃংহন শব্দ আর এগিয়ে আসা হাতীর

গলায় ঝুলানো ঘন্টার আওয়াজে মাটি কাঁপছিল। বিনা বাঁধায় নদী পার হয়ে কাতার বন্দী হবার মওকা কেন দিয়েছে মুসলমানরা, এ নিয়ে হয়রান ছিল অসংখ্য ইরানী সিপাই। মুসলমানরা যখন ওদের সামনে কল্পনাহীন নিরুদ্বেগ ও প্রশান্তির পরিচয় দিচ্ছিল, ওদের পেরেশানী তখন রূপ নিচ্ছিল ভয়ে।

বিদ্যুৎগতি ঘোড়ায় চড়ে লশকরের সারিগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন মুসান্না (রাঃ)। তাঁর হুকুম ছিলঃ 'আমি তিনবার তাকবীর বললে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে তোমরা। হামলা করবে চতুর্থ তকবীরে।' শিশাঢালা প্রাচীরের মত অটল দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা। দুশমনের সয়লাব যখন মাথার ওপর তখনো নিরুদ্বেগ অবস্থা ছিল তাদের।

মাত্র প্রথম তকবীর বলেছেন মুসান্না, ইরানী ফৌজের একটা অংশ বনু আজলের সারিগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুসান্নার নির্দেশে এক অশ্বারোহী বনু আজলের অশ্বারোহীদেরকে বুলন্দ আওয়াজে বললেনঃ 'আমীরে লশকর সালাম দিয়েছেন তোমাদের। তার অনুরোধ, মুসলমানদের আজ লজ্জিত করো না।'

কতগুলো কণ্ঠ বুলন্দ হল এক সাথেঃ 'না, আমরা আর অমনটি করব না।'

হামলাকারীদের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তারা।

একটু পরই লড়াই শুরু হল। এগিয়ে হামলা করতে লাগল ইরানীরা। মুসলমানরা দুশমনকে কোথাও পিছু ঠেলছিল, আক্রমণের তীব্রতায় নিজেরা পিছু হটছিল কোথাও। হাতীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আরব অশ্বারোহীরা সহজেই সরতে পারত এদিক ওদিক। হাতী এগিয়ে এলে রাস্তার দু'পাশে সরে যেত ওরা। আচানক ডান অথবা বাম দিক হয়ে হাতীর পিছন থেকে দুশমনের উপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। ইরানী লশকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে যাওয়া হাতীকে নেযা উঁচিয়ে খোলা ময়দানের দিকে নিয়ে যেত আরব অশ্বারোহীরা। তীর ও নেযার আঘাতে আহত হাওদা শূন্য কতক হাতী পালাচ্ছিল খোলা প্রান্তরের দিকে। কতক আবার উল্টোমুখো হয়ে পিষে ফেলছিল ইরানীদের সারিগুলো।

ধূলো মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল দুপুরের সূর্য। দু'দলই পেরেশান হয়ে মোকাবিলা করছিল এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির। মুজাহিদ বাহিনীর সম্মুখভাগ থেকে ভেসে এল মুসান্না বিন হারিসার উদাত্ত কণ্ঠ ঃ 'মুজাহিদ, আমার পিছনে এসো।'

আমীরে লশকরের আহবানে দুশমন সারি দলিত মথিত আর ছিন্নভিন্ন করে তাদের মূলে গিয়ে পৌঁছল ওরা। বকর বিন ওয়ায়েলের জানবাজদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুসান্নার ছোট ভাই মাসুদ। দুশমন সারি চিরে লশকর থেকে এগিয়ে গেল সে। আঘাতে আঘাতে নিঃশেষ হয়ে এল তার শক্তি। এক মুজাহিদ নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল তাকে। সংগীরা ঘিরে দাঁড়ালো তার চার পাশে। অন্তিম মুহূর্তে চিৎকার দিয়ে সে বললঃ 'বনু বকরের বংশধরেরা! নিশান উঁচু রাখো। আল্লাহ তোমাদের শির উঁচু রাখবেন।'

অনুজকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখলেন আমীরে লশকর। 'ইন্নালিল্লাহ' বলে সঙ্গীদের বললেনঃ 'মুজাহিদ! এগিয়ে যাও। আল্লাহর সাহায্য তোমাদের পথ পানে তাকিয়ে আছে।'

নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শক্রর ব্যূহ ভেদ করে দুশমনের পেছনে গিয়ে উঠল ওরা। মুসান্নার নিকটে এসে চিৎকার দিয়ে এক অশ্বারোহী বললঃ 'অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। দুশমনের ডান বাঁয়ের দল আমাদেরকে লশকর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এগিয়ে আসছে। না এগিয়ে বরং পিছু হটে পতাকার হিফাজত করা উচিৎ আমাদের।'

ঃ 'না।' দৃঢ়তার সাথে বললেন তিনি। 'পতাকা এগিয়ে নেয়াই আমাদের দায়িত্ব।'

উপর্যুপরী হামলা চালিয়ে দুশমনের পিছনের সারিগুলি ছিন্নভিন্ন করে দিল মুসলমানরা। মুসান্নার নির্দেশে একদল নদীর দিকে এগিয়ে ভেঙ্গে দিল নৌকার পুল। একটু আগে মেহরানের যে বিশেষ দল মুসলমানদের ধাওয়া খেয়ে সরে গিয়েছিল ডানদিকে, ডান বাঁয়ের দলগুলোর সাহায্যে মাঝে এসে পৌছল তারা। পুল ভেঙ্গে যাওয়ায় ওরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা পাল্টা হামলা করলে আবার ছিন্নভিন্ন হতে লাগল ওদের সারি। মুসলমানদের বাকী লশকর প্রচন্ড হামলা করল অপরদিক থেকে। লাশের স্তুপ বানিয়ে এসে মিশল মুসান্নার সাথে। নমর আর তাগলুবের স্বেচ্ছাকর্মীরা হামলা করল মেহরানের মুহাফিজ লশকরে। ডানে সরে আসতে লাগল ওরা।

প্রচন্ড লড়াই চলছিল ধূলি মেঘের আড়ালে। দোস্ত দুশমন পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এক নওজোয়ানের শ্যান দৃষ্টি অনেকক্ষণ যাবত খুঁজছিল মেহরানকে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল সে। ইরানী সিপাহসালারের মাথার উপর গিয়ে পৌছল মুহূর্তে। চোখের পলকে মেহরানের রক্তাক্ত লাশ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তার ঘোড়ায় উঠে বসলো নওজোয়ান।

এবার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল বুইবের লড়াই। ইরানী সিপাহসালার নিহত, কোন ক্ষতি ছাড়াই স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের পরাজিত করার ইচ্ছে নিয়ে লড়াই শুরু করেছিল ওরা। কিন্তু এখন বিজয়ের চেয়ে জীবন বাঁচানোই বড় হয়ে দেখা দিল ওদের সামনে। সরে গিয়ে ওরা কাতারবন্দী হবার চেষ্টা করত কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত মুসলমানদের উপর্যুপরী হামলায়। হতাশা, নৈরাশ্য আর কেন্দ্রচ্যুতির ভয় পিছু হটতে বাধ্য করল ওদের।

পড়ন্ত বিকেল। ইরানীদের লাশের স্তুপ পড়ে ছিল বুইবের ময়দানে। পিছু হটা ইরানী ফৌজের প্রতিটি কদম উঠছিল সীমাহীন ধ্বংসের দিকে। রাতের আঁধারে পালাবার মওকা পাবে, এ আশায় নদীর পারে জমা হওয়ার চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু মুসান্নার

শেষ আঘাত ভেঙ্গে দিল ওদের বিশৃংখল সারিগুলো। নদী পার হওয়া ছাড়া যাদের কোন-পথ ছিল না তারা লাফিয়ে পড়ল পানিতে। পেছনে তীর বৃষ্টির ভয় সত্ত্বেও সামনে উত্তাল তরঙ্গ দেখে নদীতে ঝাঁপ দেয়ার হিম্মত যাদের হল না, নদীর তীর ঘেঁষে পালাতে লাগল ডানে বাঁয়ে। কিন্তু কয়েক মাইল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল আরব অশ্বারোহীরা। রাত যখন কাল চাদর বিছিয়ে দিল, জংগী কয়েদী ছাড়াও দুশমনের ঘোড়া এবং হাতী হাকিয়ে ফিরে আসছিল তারা।

মুসান্নার কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল এক অশ্বারোহী। বললঃ 'আপনার জন্য হাসানের পয়গাম নিয়ে এসেছি আমি।'

ঃ 'ও কোথায়?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন মুসান্না।

ঃ 'দুশমনের অবস্থা জানতে চলে গেছেন নদীর ওপারে।'

আশ্বস্ত হয়ে মুসান্না বললেনঃ 'আমিতো ওকে আহতদের মাঝে খুঁজছিলাম। ও কখন নদী পেরিয়েছে?'

ঃ 'সূর্য ডোবার ঘন্টা খানিক পর ফিরছিলাম আমরা। ছাউনী তখন প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। হঠাৎ নদী পেরোবার ফয়সালা করল ও। আমরা সাথে যেতে চাইলে ও বলল, এ অভিযানে ভাল সাঁতারু প্রয়োজন। এ বলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পার, ও নদীর ওপারে পৌছেছে।'

ঃ 'ও ভাল সাঁতারু, নদীর পারে দুশমনের কোন বাঁধা না পেয়ে থাকলে, তাকে নিয়ে পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। কয়েক ক্রোশ দুশমনকে ধাওয়া করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কিন্তু ক্লান্তির কোন ছাপ ছিল না ওর মধ্যে। এক যায়গায় হঠাৎ দুশমন পাল্টা হামলা করল আমাদের। চোখের পলকে তিন জন হলেন শহীদ, পাঁচজন আহত। আমরা যখন ওদের কাবু করে ফেলেছি, পাশের ঘন জংগল থেকে বেরিয়ে এল একটা আহত হাতী। হাসানের নেযার প্রথম আঘাতই ফিরিয়ে দিল তার গতি।'

ঃ 'গল্প করতে হবে না তোমায়। তার হিম্মত এবং বাহাদুরী সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশীই জানি আমি।' বললেন মুসান্না।

এ গৌরবময় বিজয়ের পর কয়েকদিন পর্যন্ত বিশ্রামের কোন ফুসরত ছিল না মুজাহিদদের মধ্যে। শহীদদের কবর খোড়া আর আহতদের ব্যান্ডেজ করেই সময় কাটল ওদের। মুসলমানদের মত আহত ইরানীদেরও একত্র করা হল। শহীদদের জানাজা শেষে মুসান্না এবং মুয়ান্না নওজোয়ান ভাই মাসুদকে কবরে রাখলেন। অশ্রু সংবরণ করতে পারল না মুজাহিদরা। কবরের উপর মাটি ছড়ানো হচ্ছিল যখন, শাইবানী কবিলার এক মুজাহিদ মুসান্নার কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'আপনার ভাই ছিল এক বাহাদুর। আপনার বেদনায় আমরা সমভাবে ব্যথিত।'

আর সব লাশগুলোর দিকে ইশারা করে মুসান্না বললেনঃ 'ওরা সবাই ছিল আমার

ভাই। মাসুদের মতই বীরত্বের সাথে জীবন দিয়েছে ওরা।'

ঃ 'শহীদদের খুন বৃথা যায়নি।' বলল একজন। 'প্রতিটি মুসলমানের পরিবর্তে কমপক্ষে দশটা ইরানীকে কোতল করেছি আমরা।'

ঃ 'প্রথমেই পুলের রশি কেটে দিলে দুপুরের পূর্বেই খতম হয়ে যেত লড়াই।'

ঃ 'পুল ভেংগে দেয়া এমন কোন গৌরবজনক কাজ নয়। দুশমনকে পালাবার সুযোগ দিতে চাইছিলাম আমরা। পুল ভেংগে দেয়ায় ময়দানে থাকতে ওরা বাধ্য হয়েছে। আমাদের লড়াই ইরানের জনতার বিরুদ্ধে নয়, আমাদের লড়াই সে সব শাসকদের বিরুদ্ধে, যারা জুলুম অত্যাচারে ভরে দিয়েছে আল্লাহর জমিন। মনে রেখো, ইরানে কিসরার শাসনের অবসান হলে, মুসলিম লশকরের প্রথম সারিতে থাকবে এরাই। তখন তাদের নিয়ে গর্ব করবে তোমরা। এদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুইবের বিজয়কে মনে করবে নিজেদের বিজয়।'

সংগীদের সাথে কথা বলছিলেন মুসান্না। নদীর পারে টহলরত এক পাহারাদার এসে বললঃ 'জনাব, হাসান এসে গেছেন।'

খানিক পর আমীরে লশকরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসান বলছিলঃ 'জনাব, দুশমনের ছাউনী শূন্য। সম্ভবত ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া দুশমন ওখানে থামেনি। ওদের পিছু পিছু পালিয়ে গেছে ছাউনীর মুহাফিজরাও। সূর্য উঠার পূর্বেই পুল মেরামত করে আমরা নদী পেরোতে পারি।'

আসমানের দিকে তাকিয়ে মুসান্না (রাঃ) বললেনঃ 'এখন সেহরীর সময়। ইনশাআল্লাহ রোজা রেখেই নদী পেরোবার চেষ্টা করব আমরা।'

বুইবের লড়াইয়ে যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল ইরানীরা, এতে মুসলমানদের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোন আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। রমজানের দিনগুলোতে ইসলামী লশকরের তৎপরতা দজলা ফোরাতের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। জসরের লড়াইয়ের ফলে যেসব কবিলা ইরাকে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাশ ছিল, তাদের বিশ্বাস পুনর্বহাল করতে তৎপর ছিলেন তারা।

একদিন ভোরবেলা চিঠি লিখছিলেন মুসান্না। তাঁর সামনে কয়েকটা মানচিত্র। তাবুতে প্রবেশ করল হাসান। আমীর লশকরের ইশারা পেয়ে পাশে এসে বসল। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখানো শেষ করে মানচিত্র গুটিয়ে হাসানের দিকে ফিরলেন মুসান্না।

ঃ 'হাসান, আজ রমজানের শেষ দিন। পাঁচদিনের মধ্যেই এখান থেকে মার্চ করব আমরা। মেসোপটেমিয়ার লোকদের সাহসী পয়গাম আমি পেয়েছি। নিজের এলাকায় ইরানীদের জুলুমের হাত গুড়িয়ে দেয়ার জন্য অনেক কবিলা সরাসরি আমাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ মুহূর্তে ইরানীরা জওয়াবী হামলার প্রস্তুতি নেবে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। বুইবের জংগে যে আঘাত ইরানীরা খেয়েছে, তা শুকাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

আমি অনুভব করছি, বুইবের লড়াই ইরান আরবের চূড়ান্ত লড়াইয়ের ভূমিকা মাত্র। এবার চরম প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে আসবে ওরা। আমার ইচ্ছে, মাদায়েন পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি অবহিত করবে আমায়। আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে পয়গাম পাঠিয়েছি। ইরানের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য বড় ধরনের সাহায্য চেয়েছি তার কাছে। আমার বিশ্বাস, তিনি আমায় নিরাশ করবেন না। সিরিয়ার শানদার বিজয়গুলোর পর এ মুহূর্তে আমরা কোন বিপদে পড়লে, সেখানকার অতিরিক্ত লশকর খলিফা এখানে পাঠিয়ে দেবেন, এ আশা আমার আছে। ইরাক সীমান্তের আশপাশের মরুচারী বেদুইন কবিলারাও আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে আমাদের সাহায্য করবে। জসরের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না আর কোন ময়দানে। মাদায়েন থেকে এগিয়ে আসা ফৌজের সঠিক সংখ্যা জানা হবে আমাদের প্রথম কাজ। যাতে অবস্থা এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা তৈরী করতে পারি। বুইবের পরাজয় যদি ইরানীদের মাঝে বিভেদের সৃষ্টি করে তাহলে খুব শীঘ্রই হয়ত মাদায়েনের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছব আমরা। এমনও হতে পারে, আগের চেয়ে সংগঠিত এবং শৃংখলাবদ্ধ হয়ে ওরা জওয়াবী হামলা করবে। কোন নিরাপদ স্থানে ছাউনী ফেলে সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। আজই সূর্য ডোবার পর তুমি রওনা করো। পরিমাণ মত রাহা খরচ নিয়ে যাও। ইরানী অফিসারের বেশ না নিয়ে মামুলী সিপাই হিসাবে সেখানে প্রবেশ করা তোমার জন্য সহজ হবে।'

কিছুক্ষণ পর নিজের তাবুতে বসে কাউসকে হাসান বলছিলঃ 'কাউস মাদায়েন যাচ্ছি আমি।'

পঁচিশ

শীতের শুরু। পর্বত চূড়ায় দেখা যাচ্ছে হালকা বরফের চাদর। উত্তরের হিমেল হাওয়ায় ঝরে পড়ছিল আঙ্গুরলতা আর নাশপাতির শুকনো পাতা। সন্ধ্যা। ইস্পাহান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সরুশের কেল্লার মত সুরক্ষিত বাড়ীর এক কামরায় মুখোমুখী বসেছিল ইয়াসমীন আর মাহবানু। খাদেমা দরজায় মাথা বাড়িয়ে বললঃ 'সোহেল এসেছে।'

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল ইয়াসমীন।

ঃ 'আব্বাজান আসেন নি?'

ঃ 'না, সোহেল বলল তিনি আরো কয়েকদিন মাদায়েন থাকবেন।'

ঃ 'ওকে এখানে নিয়ে এস।' বলল মাহবানু।

ফিরে গেল খাদেমা।

ইয়াসমীন মাহবানুকে বললঃ 'আব্বাজান কেন ওখানে থেকে গেলেন? খুব শীঘ্র আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছিলেন! তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আমি পেরেশান।'

ঃ 'অত উতলা হয়োনা। তিনি কেন আসেননি এখুনি আমরা জানতে পারব।' বলল ইয়াসমীন।

একটু পরই কামরায় প্রবেশ করল সোহেল। কয়েক কদম দূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে গেল ও। পরাজয় আর ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠছিল তার উদাস চেহারায়। পকেট থেকে চিঠি বের করে এগিয়ে ইয়াসমীনের হাতে দিয়ে বললঃ 'আপনার আব্বাজানের ইচ্ছা আপনি মাদায়েন চলে যান। এই তার চিঠি।'

চিঠি খুলে পড়তে লাগল ইয়াসমীন।

ঃ 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন সোহেল? বসো।'

সসংকোচে বসল ও। চিঠি পড়া শেষে মাহবানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ইয়াসমীন বললঃ 'আব্বাজান আমাদের দুজনকেই মাদায়েন ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। তিনি লিখেছেন, অসুস্থতার কারণে সফর করতে পারেন নি।'

সোহেলের দিকে ফিরে বললঃ 'সোহেল, খোদার দিকে চেয়ে সত্যি করে বল তিনি কেমন আছেন? জসরের লড়াইয়ের পর তিনি লিখেছিলেন, আমি সামান্য আহত হয়েছি। আবার লিখেছেন, মাদায়েনের পরিস্থিতি এমন, কয়েকদিন আমি বাড়ী আসতে পারছি না। এরপর সংবাদ পেয়েছি, নিজের লশকর মেহরানের ফৌজের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজে লড়াইয়ে অংশ নিতে পারবেন না। এই সেদিন মাহবানুকে বলেছিলাম তাঁর শরীর ভাল থাকলে কোন অবস্থায়ই লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে থাকতেন না। বুইবের লড়াই থেকে ফিরে আসা সিপাইরা আমায় এই বলে শান্তনা দেয়ায় চেষ্টা করেছে যে, তার যখম শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের কথায় মনে হয়েছিল কি যেন আমার কাছে গোপন করছে। সোহেল তুমি নীরব কেন? বল তিনি কেমন আছেন?'

ঃ 'তার শরীর ভাল নেই একথা সত্যি। কিন্তু বুইবের যুদ্ধে শরীক না হওয়ার কারণ, লড়াইয়ের ময়দানের চেয়ে মাদায়েনেই তার খেদমত জরুরী মনে করেছেন ওমরারা। তিনি না থাকলে রুস্তম আর ফিরোজানের ঝগড়া গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নিত। ওদের মাঝে সমঝোতা তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। বুইবে আমাদের লশকরের পরাজয়ের পর এক নতুন বিপদ সৃষ্টি হয়েছিল। জনতা আর ওমরারা শ্লোগান দিচ্ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের হুকুমত এক দুর্বল নারীর হাতে থাকা ঠিক নয়।

ইয়াজদগিরদের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি শুরু হল ইরানে। রুস্তম আর ফিরোজান আপনার আব্বাকে এসে বলল, ইয়াজদগির্দের অভিষেক পর্যন্ত আপনাকে মাদায়েনে থাকতে হবে। সম্ভবত তাকে মাদায়েনে কোন বড় জিম্মাদারী দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'সত্যি করে বল, তিনি তো বেশী অসুস্থ নন। তুমি তাকে হাঁটতে দেখেছ?'

ঃ 'আমার অনুযোগ হচ্ছে তিনি বিশ্রাম করেন না। সকালে রুস্তমের সাথে তো দুপুরে যান ফিরোজানের কাছে। মাদায়েনের অপর ওমরাদের সাথে মোলাকাত চলতে থাকে মাঝরাত পর্যন্ত। ডাক্তার বলেছেন, কয়েকদিন বিশ্রাম করলে তার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার একটাই জওয়াবঃ 'ইরানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আমার আরাম নসীব হবে না।'

ঃ 'আমি অনতিবিলম্বে মাদায়েন পৌছতে চাই। ক্লান্ত না থাকলে এখুনি রওয়ানা হতাম।' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'আমার কয়েকজন সাথী নিজেদের বাড়ী গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে আসবে ওরা। পরশু ভোরে আমরা রওয়ানা করতে পারব।'

মাহবানুর দিকে তাকিয়ে ও বললঃ 'আপনার জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি। আপনার ভাই সম্বন্ধে জেনেছি, তিনি বন্দী।'

ঃ 'কোথায়?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করল মাহবানু।

ঃ 'মাদায়েনে। রুস্তমের হুকুমে তাকে বন্দী করা হয়েছে।'

ঃ 'আব্বাজান তার মুক্তির কোন চেষ্টা করেননি?' অশ্রুভেজা চোখে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'তিনি বলেন, তার মুক্তির প্রস্তাব রুস্তমের সামনে পেশ করার সময় এখনো আসেনি। তবুও তার বিশ্বাস, ইরানের নতুন শাহানশাহর প্রথম হুকুম হবে মিয়ানদাদের মুক্তির ব্যাপারে।'

মাহবানুর চোখে চিকচিক করছিল অশ্রুবিন্দু। কান্না রোধ করে ও বললঃ 'আমার ভাই পালিয়ে যাননি, এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু কোন্ অপরাধে তাকে বন্দী করেছে রুস্তম?'

ঃ 'আমি জানি না। ইয়াসমীনের আব্বা তখনই তার কথা বললেন, যখন ঘোড়ায় আমি সওয়ার হচ্ছিলাম। আমি তার গ্রেফতারীর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এখন কথা বলার সময় নয়। তুমি তার বোনকে শান্তনা দিয়ে বলবে, খুব শীঘ্র ও মুক্তি পেয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। এক সময় স্তব্ধতা ভেংগে ইয়াসমীন বললঃ 'বুইবে আমাদের পরাজয়ের খবর প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারিনি। মাহবানু বলত, ওদের সিপাহসালার মুসান্না বিন হারেসা হলে, এর চেয়ে কঠিন খবর শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। কিন্তু ওর কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে বুইবের পরাজয়।'

এক টুকরো উদাস হাসি ফুটে উঠল সোহেলের ঠোঁটে। বললঃ 'আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা পরাজিত হয়েছি। বেশীর ভাগ ফৌজ আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে।'

ঃ 'দুশমনরা সংখ্যায় কম ছিল একথা কি সত্যি!'

ঃ 'আমি নিজে হাজির না থাকলে কেউ যদি বলত ওরা বার কি তের হাজারের চেয়ে বেশী নয়, এবং ইরানী সিপাইদের পড়ে থাকা লাশ ওদের লশকরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী, তবে তার টুটি চেপে ধরতাম আমি। ওরা মানুষ নয়, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমাদের হাতীগুলো। নেযা আর তরবারীর প্রাচীর ভেদ করে পৌছেছিল আমাদের পেছনে। দজলা ফোরাতের উত্তাল তরঙ্গ আমি দেখেছি, কিন্তু এ সয়লাব ছিল তার চেয়ে ভয়ংকর।

সুর্যোদয় থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত বুইবের ময়দানের সব ঘটনাকে মনে হয় এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। আমাদের লশকরের যে পাঁচশো অশ্বারোহী গিয়েছিল এখান থেকে, ফিরে এসেছে মাত্র চৌষট্টিজন। তাও বিশজনের মত আহত। আমার বেঁচে থাকাটা এক অলৌকিক ঘটনা। আমরা পালাচ্ছিলাম ময়দান থেকে, দুশমনের একটা দল ছিল আমাদের পিছনে। আচানক পাল্টা হামলা করে কয়েকজনকে হত্যা করলাম আমরা। কিন্তু দুশমনের জওয়াবী হামলা ছিল এত প্রচন্ড, সঙ্গীরা দাঁড়াতে পারলো না। জীবন বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। হঠাৎ কাঁদামাটিতে ঢুকে গেল আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটো। ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। অনেকক্ষণ কিছুই বলতে পারলাম না। জ্ঞান যখন ফিরল, আমার গর্দানে ছোয়ানো এক অশ্বারোহীর নেযা। তার হাতের মৃদু ঝাঁকুনি চির নিদ্রায় শুইয়ে দিতে পারত আমায়। অশ্বারোহীর দিকে নয়, আমি তাকিয়ে ছিলাম নেযার খুন রাঙ্গা ফলার দিকে। কোন অজ্ঞাত কারণে নেযা অন্যদিকে সরিয়ে ও বললঃ 'কে তুমি?'

ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকালাম আমি। হঠাৎ নেযা জমিনে গেড়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল ও। আমার ওপর ঝুঁকে বললঃ 'তুমি আহত? ভয় নেই, হাতিয়ার যারা ছেড়ে দেয় তাদের আমরা হত্যা করি না।'

তার আওয়াজ থেকে ক্রোধের পরিবর্তে ভয় প্রকাশ পাচ্ছিল। ঘোড়া থেকে পড়ার সময় শিরস্ত্রাণ হারিয়েছিলাম আমি। আমার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো ও এক দিকে সরিয়ে দিল নিজের হাতে। আমার মনে হলো হত্যা করার পূর্বে আমার হৃদয়ে জীবনের আশা জাগাতে চাইছে ও। অথবা দেখছে, আমায় গোলাম বানালে কতটুকু কাজে আসব। আমি খঞ্জর বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার দৃষ্টি আটকে গেল তার চেহারায়। হিম্মত হারিয়ে ফেললাম আমি।

ঃ 'তোমার নাম কি?' প্রশ্ন করল সে।

কিন্তু আমার জওয়াব দেবার পূর্বে পাশের ঘন জঙ্গল থেকে এগিয়ে এল একটা আহত হাতী। নিমিষে ঘোড়ায় সওয়ার হল সে। নেযা তুলে হামলা করল হাতীকে। শুরে বিঁধলো নেযা। তার বিদুৎগতি ঘোড়া পাশ কেটে সরে গেল একদিকে। ঘুরে হাতীটা ধাওয়া করল তাকে। ও চলে গেল খোলা ময়দানের দিকে। উঠে ছুটলাম আমি। নদীর পারে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বর্ম খুলে দরিয়ায় ঝাপিয়ে পড়লাম। মাঝ নদীতে পৌছে

দেখলাম আমার সংগীদের ধাওয়াকারীরা ফিরে যাচ্ছে। আমি যখন নদীর এপারে– সন্ধ্যা তখন বিছিয়ে দিচ্ছিল আঁধারের পর্দা।'

ঃ 'তার মানে সে অশ্বারোহী তোমায় বাঁচানোর চেষ্টা করেছে?'

ঃ 'আমার মনে হয়, হাতী হামলা না করলে আমাকে ও নিশ্চিত খুন করত।'

ঃ 'আর খঞ্জর বের করতে গিয়ে তার চেহারা দেখে তুমি হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিলে!'

ঃ 'হ্যা, তার আওয়াজও আমায় প্রভাবিত করেছিল।'

ঃ 'কিন্তু এর কারণ?'

ঃ 'হৃদয়কে যদি ধোকা দিতে পারতাম যে আমার ভাই মুসলিম লশকরে শামিল হয়েছে, তাহলে সে ব্যক্তিকে দেখে এবং তার আওয়াজ শুনে বে-এখতিয়ার তাকে জড়িয়ে ধরা উচিৎ ছিল।'

এতক্ষণ নীরবে ওদের কথা শুনছিল মাহবানু। বার বার চেহারার রং বদলে যাচ্ছিল তার। সোহেল যখন তার দিকে ফিরল, দুহাতে মুখ ঢেকে ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে লাগল ও।

ঃ 'বোন, একটু সাহসী হোন। বুইবের যুদ্ধই আমাদের শেষ লড়াই নয়। বিপজ্জনক দুশমনকে দুর্বল মনে করার শাস্তি আমরা পেয়েছি। এবার গোটা ইরান দুশমনের মোকাবিলায় উঠে দাঁড়াবে। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ আমরা অবশ্যই নেব।'

ঘাড় তুলল মাহবানু। অশ্রুভেজা চোখে তাকাল সোহেলের দিকে। কাঁপা আওয়াজে বললঃ 'যার নেযা তোমার গর্দানের নিকটে এসে থেমে গিয়েছিল, যার চেহারা আর আওয়াজ ছিল তোমার ভাইয়ের মত, যে তোমার কপালে দেখছিল যখমের নিশানা– তোমায় বাঁচাতে যে আহত হাতীকে হামলা করেছিল, এত কিছুর পর ও বুঝছনা কে-ও?'

ঃ 'হায়, যদি জানতাম কে-সে! আমার ভাইয়ের চেয়ে আলাদা ছিল না তার চেহারা ও আওয়াজ। হয়ত এ ছিল আমার কল্পনা। এরপরও বার বার আমার মনে হয়, হায়! সহসা হাতী হামলা না করলে ভালভাবে দেখে নিতাম তাকে। সে মুহূর্ত এখন এক দুস্বপ্ন মনে হচ্ছে। হয়ত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ভাল ভাবে জ্ঞান ফেরেনি আমার। এক মুসলমান কোতল না করে কেন আমায় বাঁচানোর চেষ্টা করল এ প্রশ্নের কোন জওয়াব আমার কাছে নেই।'

মাহবানুর চোখে বইছিল অশ্রুর বন্যা। ব্যথাতুর কণ্ঠে ও বললঃ 'ও তোমার ভাই, সোহেল। কিন্তু সে জানত না তুমি জীবিত।'

সোহেলের স্তম্ভিত দুটো চোখ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাহবানুর দিকে।

ঃ 'তার মানে সোহেলের ভাই এখনো বেঁচে আছে আর শামিল হয়েছে মুসলমানদের দলে?' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'হ্যাঁ।' অশ্রু মুছতে মুছতে জওয়াব দিল মাহবানু। 'ও জীবিত এবং মুসলমান হয়েছে ও এ কথা আমি ও মিয়ানদাদ ছাড়া আর কেউ জানে না। হায়! তার দুশমনী যদি লড়াইয়ের ময়দান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত!'

মাহবানুর দিকে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল সোহেল আর ইয়াসমীন। চাপা কান্না ছাড়া খানিক কিছুই শোনা গেল না।

সোহেলের দিকে ফিরে মাহবানু বললঃ 'সোহেল, আমার ভাইকে ক্ষমা করো। পরিস্থিতি তাকে মজলুম বানিয়েছে। আমিও ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।'

সোহেলের দৃষ্টিতে মিয়ানদাদ আর মাহবানু ছিল সব ভুলের উর্ধে। অতি কষ্টে সে উচ্চারণ করলঃ 'আপনি বলেছিলেন, নদী পার হওয়ার সময় কোন মুসলমান আপনাদের পিছু নিয়েছিল, তিনি কি আমার ভাই হতে পারেন? যদি তাই হয়, তবে বলতে পারি, আপনার পিতার হত্যাকারীর নাম আমার মুখে আর শুনবেন না।'

ঃ 'সোহেল, ও আমার পিতার হত্যাকারী নয়।'

ঃ 'কিন্তু তিনি আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তার অবস্থা কি হয়েছিল তখন, আমার বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি কষ্ট পাব ভেবে আপনি সব গোপন করেছেন। আপনার এক ফোটা অশ্রুর চেয়ে ব্যথাতুর আমার কাছে আর কিছুই নয়।'

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'আমার অশ্রু ছিল সে মানুষটার জন্য, যে বড় রহমদীল, অত্যন্ত ভাল। সোহেল, তোমার ভাইকে নিয়ে তুমি গর্ব করতে পার। আমিও জানি, সে আমার ভাই এবং পিতার দুশমন হয়ে আসেনি। এজন্য আমি দারুণ লজ্জিত।'

হঠাৎ দুশ্চিন্তার কাল মেঘ সরে গেল সোহেলের চেহারা থেকে। আবেগ ভরে ও বললঃ 'বোন, পুরো কাহিনী আমায় বলুন।'

ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'এখন আর কোন কথা তোমায় গোপন করব না। কথা দাও ঘৃণা করবে না আমায়!'

স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত রেখে ইয়াসমীন বললঃ 'যে তোমায় ঘৃণা করে, দুনিয়ার তার চেয়ে বদনসীব আদমী আর কে আছে?'

সংক্ষেপে পুরো কাহিনী তুলে ধরল মাহবানু। কাহিনী শেষ হলে মেহমানখানায় চলে গেল সোহেল। ইসয়ামীনের অগণিত প্রশ্নের জওয়াবে অতীত ঘটনা বলতে লাগল মাহবানু।

কয়েক দিন পর। এক পড়ন্ত বিকেলে দজলার পুল পেরোল সোহেল ও তার সংগীরা। শহরে প্রবেশ করল ওরা। ইয়াজদগির্দ মাদায়েন পৌছেছেন এ সংবাদ পথেই ওরা পেয়েছে। ওমরারা রাণী পুরানের কাছ থেকে রাজমুকুট নিয়ে পরিয়ে দিয়েছে তাকে।

ইয়াসমীনের দুশ্চিন্তা ছিল পিতাকে নিয়ে। দু'দিনেই ওরা অতিক্রম করল চার মঞ্জিল পথ। সুন্দর বাজার আর গলি পেরিয়ে পারভেজের মহলের কাছে পৌছল ওরা।

দেউড়ীর ফটক বন্ধ দেখে দীল বসে গেল ইয়াসমীনের। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল সোহেল। ভারী দরজায় করাঘাত করে বলল ঃ 'দরজা খোল।'

শিকলের ঝনঝন শব্দ ভেসে এল অন্দর থেকে। দরজা খুলে বেদনা মাখা দৃষ্টিতে চাইল এক পাহারাদার।

ঃ 'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল সোহেল। 'ফটক বন্ধ রেখেছ কেন? মুনীব কোথায়?'

বৃদ্ধ গোলাম বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'কেন, তোমরা সংবাদ পাওনি? সেদিনইতো দু'ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

ঃ 'কাদের?'

সোহেলের প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে গোলাম ইয়াসমীনকে বললঃ 'আপনার আব্বাজান বিদায় হয়ে গেছেন।'

তাড়াতাড়ি ইয়াসমীনের বাহু ধরে ফেলল মাহবানু। বিমূঢ়ের মত ও দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। চিৎকার দিয়ে জড়িয়ে ধরল মাহবানুকে।

বিশাল এক কামরায় ফুফিয়ে কাঁদছিল ইয়াসমীন। বুড়ো গোলাম সোহেলের সাথে দরজায় দাঁড়িয়ে বললঃ 'আপনাকে বিদায় দেয়ার পর তার শরীর সুস্থতার দিকে যাচ্ছিল। ডাক্তারও বলল এখন আর কোন ভয় নেই। কিন্তু পঞ্চম দিনের মাঝ রাতে তিনি আওয়াজ দিলেন। ছুটে তার কামরায় এলাম। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন তিনি। একজনকে ডাক্তারের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ডাক্তার আসার আগেই ঠান্ডা হয়ে এল তার শরীর। তখনই দু'জনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইস্পাহান। তাদের পৌছার পূর্বেই হয়ত রওয়ানা হয়েছিলেন আপনারা। এত জলদি চলে আসবেন এ আমার ধারণার বাইরে।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সোহেল।

ঃ 'বসো সোহেল।' বলল মাহবানু।

চেয়ার টেনে বসল ও। থেমে থেমে কাঁদছিল ইসয়ামীন। কখনো তার ফোপানি রূপ নিত হালকা চিৎকারে। অশ্রুর বন্যা বইছিল চোখ থেকে।

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল সোহেলের অন্তর। শান্তনা দিতে চাইলো সে, কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও জানা কথাগুলো মুখে আনতে পারলো না। নিজের অশ্রু মুছে মাহবানু বললঃ 'বোনটি আমার। ধৈর্য ছাড়া আমাদের আর কোন সম্বল নেই।'

শোনা গেল ইয়াসমীনের বিলাপ ধ্বনিঃ 'মাহবানু! দুনিয়ায় আমার আর কেউ রইল না। আমি এখন কোথায় যাব? কি করব?'

সোহেল আর সইতে পারল না। বললঃ 'বোন, আমি আপনার ভাই।'

ঃ 'বেটি।' বুড়ো গোলাম বলল। 'মুনীবের মৃতুর খবর শুনে রুস্তম আর ফিরোজান এখানে এসেছিল। আমায় শান্তনা দিয়ে বলল, তোমার প্রতি ওরা খেয়াল রাখবে।'

বেলা দ্বিপ্রহর। ফৌজি ছাউনী পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসছিল রুস্তম। সাথে চারজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। বাড়ীর কাছে পৌছতেই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল মাহবানু। ঘোড়ার লাগাম ধরে বললঃ 'ফররুখ যাদের বেটা। আমার কথা না শুনে যেতে পারবে না।'

চাবুক উঠাল রুস্তম। কিন্তু ওর চেহারায় দৃষ্টি পড়তেই নামিয়ে নিল হাত। ফটক থেকে ছুটে এল দুজন পাহারাদার। রুস্তমের পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করল মাহবানুকে। কিন্তু ঘোড়ার লাগাম ছাড়ল না ও। রুস্তম পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'দাঁড়াও।'

একদিকে সরে গেল পাহারাদররা।

ঃ 'কে তুমি?' মাহবানুকে প্রশ্ন করল রুস্তম।

ঃ 'আমি মিয়ানদাদের বোন। তিনবার আপনার দরজায় আমি ধর্ণা দিয়েছি। কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি পাহারাদাররা।'

ঃ 'কোন অজ্ঞাত মহিলার সাথে কথা বলার সময় নেই আমার, এ কথা ওরা জানে। মিয়ানদাদ কে?'

ঃ 'সে এক নিরাপরাধ কয়েদী।'

একটু গরম হয়ে রুস্তম বললঃ 'প্রতিটি কয়েদীর বোন তার ভাইকে নিস্পাপ মনে করে।'

ঃ 'আমার ভাই ছিলেন আপনার পিতার দেহরক্ষী।'

মাহবানুর এ কথায় রুস্তমের মনে ভাবান্তর এল। রক্ষীদেরকে বললঃ 'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

একটু পর। দামী আসবাবপত্রে সাজানো এক প্রশস্ত কামরায় রুস্তমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাহবানু। রুস্তম বললঃ 'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে পরে আলাপ করব। আগে বল সে যে বন্দী কিভাবে তা জানতে পারলে?'

ঃ 'এক বোন তার ভাইয়ের মুসীবত সম্পর্কে বেখবর থাকে না। সরুশ আমায় জানিয়েছে, আপনার হুকুমে তাকে বন্দী করা হয়েছে।'

ঃ 'সরুশ জানল কিভাবে?'

ঃ 'তিনি বেঁচে থাকলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন।'

ঃ 'কিভাবে সরুশের সাথে আপনার পরিচয়?'

ঃ 'তিনি পারভেজের জামাতা। পারভেজ ছিলেন আমার পিতার দোস্ত। নিজের মেয়ের মতন আমায় স্নেহ করতেন।'

ঃ 'তোমার ভাইয়ের কারণে আমার পিতা নিহত হয়েছেন, তার অপরাধ শুধু

এতটুকুই নয়, তার গাফলতি এবং দায়িত্বহীনতার কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল সমগ্র ইরান। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে ষড়যন্ত্রে সফল হতো না আজমেরী বানু। তাকে শুধু কয়েদ করা হয়েছে, এতো তার সৌভাগ্য। হয়তো তার মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিৎ ছিল। সুন্দরী নারীর চোখের অশ্রু আমি পছন্দ করি না। ভেবো না, এ অশ্রুতে তোমার ভাইয়ের অপরাধ মুছে যাবে।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল মাহবানুর চেহারা।

ঃ 'আমার ভাই আপনার পিতার চেয়ে বেশী হুশিয়ার এবং অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাকেই যদি ধোকা দিতে পারে আজমেরী বানু, আমার ভাইকে তো বোকা বানানো আরো সহজ। কারো বিবি হত্যাকারীদের হোতা হলে কে তাকে বাঁচাতে পারে? সব ঘটনা আমি জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমার ভাই নিরপরাধ।'

ঃ 'তুমি ভাব এক বোনের মন নিয়ে। আমার বদকিসমত, ইরানের সিপাহসালার হিসেবে চিন্তা করতে হয় আমায়। তার হাজারো অপরাধ তুমি ঢেকে দিতে পার কিন্তু সাধারণ ভুলও ক্ষমা করতে পারি না আমি।'

ঃ 'আপনার পিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি, এজন্য তাকে আপনি ক্ষমার অযোগ্য ভাবেন, কিন্তু ইরানের সে সব আমীর ওমরাদের আপনি কি সাজা দেবেন, যারা তাকে বৃদ্ধ বয়সে অহংকারী ও উচ্চাভিলাষী এক সুন্দরী শাহজাদীকে শাদী করার লোভ জাগিয়েছিল মনে?'

ঃ 'ওদের কেউ যদি আমার পিতার হিফাজতের জিম্মা নিত, আর আমি শোনতাম, মদে মাতাল ছিল ওরা হামলার সময়, তার সাথেও এমন ব্যবহারই করতাম আমি। ফররুখ যাদ আমার পিতাই ছিলেন না তিনি ইরানের উজিরও ছিলেন। সম্ভবতঃ এ দিকটা এখনো ভাবনি।'

ঃ 'এ সালতানাতের ওপর কি আমার খান্দানের কোন অধিকার নেই, যার জন্য যুগ যুগ ধরে কোরবানী দিয়েছে এর বংশধরেরা।'

ঃ 'এমন কোন কোরবানী, যার প্রতিদান তোমার খান্দানকে দেয়া হয়নি, বলতে চাইলে শোনার জন্য আমি প্রস্তুত।'

বেদনাভরা কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'আমার দাদা ছিলেন সে সব সিপাইদের সাথে, ইরানী নিশান যারা নিয়ে গিয়েছিলেন এন্তাকিয়ার দুয়ার পর্যন্ত। রোম উপসাগরের উপকুল পর্যন্ত গিয়েছিল যে লশকর, তার প্রথম সারিতে ছিলেন আমার পিতা। আমার ভাই ছিলেন সে জানবাজদের সংগী, আরমিয়ার ময়দানে যারা সিনা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল রোমানদের সামনে। হায়, ইরানের মাটি কথা বলতে পারলে আপনি জানতেন, যে খান্দানের শেষ প্রদীপটুকু নিভিয়ে দিতে তৎপর আপনি, কি ছিল তাদের কোরবানী?'

ঃ 'আর কিছু বলবে তুমি?'

মাহবানুর চোখ থেকে ঝরছিল অশ্রুর ফোয়ারা। খানিক চুপ থেকে কণ্ঠ সংযত

করে বললঃ 'আমি অনেক কিছুই বলতে চাই, কিন্তু তার সময় আসেনি এখনো।'

ঃ 'তোমার ভাইয়ের কোন সাহায্য আমি করতে পারব না। এ ছাড়া অন্য কোন খাহেশ থাকলে পুরো করতে পারি।'

ঃ 'আমার ভাইয়ের নালিশ সে অদৃশ্য শক্তির হাতে সোপর্দ করছি, নিরাশার আঁধারে যিনি দেখান আশার আলো। যেদিন পারস্যবাসী দেশের মাটি থেকে অশ্রুর বিনিময় চাইতে পারবে, যে দিন ন্যায় ইন্‌সাফের দুয়ারে থাকবে না নাংগা তলোয়ারের পাহারা, সে দিনের অপেক্ষায় থাকব আমি।'

বিরক্ত হয়ে রুস্তম বললঃ 'এসব কথা কোথায় শিখেছ তুমি?'

ঃ 'আমি জানিনা। দুনিয়ায় যারা আমার চেয়ে বেশী মজলুম, হয়তো চরম আঁধারে ঘুরপাক খাওয়ার পরও তারা আলো পাবার আকাংখা করেছিল। আপনার সামনে তাদের কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র।'

ঃ 'তোমার নাম?'

ঃ 'এক অসহায় বালিকার নামে কি প্রয়োজন আপনার?'

ঃ 'হয়ত অসহায়ত্ব কমাতে তোমায় সাহায্য করতে পারব।'

ঃ 'যতদিন আমার ভাই থাকবে কয়েদী, এ অনুভূতি কমবে না আমার।'

ঃ 'কোন মিথ্যে আশায় তোমায় ভুলিয়ে রাখব না। তাকে ভুলে যাও। এরপর ভেবে দেখব কি করতে পারি তোমার জন্য।'

মাথা তুলল মাহবানু। বললঃ 'একটা উপকার আপনি করতে পারেন?'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'মিয়ানদাদের বোন অত্যাচারের কাহিনী বলার জন্য এসেছিল আপনার কাছে, অনুগ্রহ করে কাউকে এ কথা বলবেন না।'

দরজার দিকে ফিরল মাহবানু।

ঃ 'দাঁড়াও।' গর্জে উঠল রুস্তম।

ফিরে চাইল মাহবানু।

ঃ 'তুমি কোথায় থাক?'

ঃ 'সে কথায় আপনার প্রয়োজন নেই। আমাকে দিয়ে ইরানের কোন ক্ষতি হবে যদি ভেবে থাকেন, এখান থেকেই আমি কয়েদখানায় যেতে প্রস্তুত। আমার পিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই আপনার সিপাইদের।'

হঠাৎ ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল রুস্তমের।

ঃ 'বেকুব মেয়ে, কি ভাবছ আমায়?'

ঃ 'এ স্থান এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়ায় উপযুক্ত নয়।'

বেরিয়ে গেল মাহবানু। ক্লান্তিতে বসে পড়ল রুস্তম। হাত তালি দিল সে। কামরায় প্রবেশ করল এক অফিসার।

ঃ 'এ মেয়েকে অনুসরণ কর, দেখবে ও কোথায় থাকে। দেখো, অনুসরণ করছ, ও যেন বুঝতে না পারে।'

বেরিয়ে গেল অফিসার। অশ্রুভেজা চোখে মহল থেকে বেরিয়ে এল মাহবানু। প্রায় দুশ' কদম দূরে সড়কের মোড়ে সোহেল তার অপেক্ষা করছিল । ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলঃ 'কি বলল রুস্তম?'

বেদনার্ত ভাষার জওয়াব দিল মাহবানুঃ 'কিছুই না। হায়, যদি না যেতাম তার কাছে!'

হাঁটা দিল দু'জন।

ঃ 'আপনার নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। আমার বিশ্বাস, রুস্তমের চেয়ে ইয়াজদগির্দ রহমদীল হবেন।'

ঃ 'ইয়াসমীনের পিতা বেঁচে থাকলে ইয়াজদগির্দের দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম আমি। কিন্তু এখন কোন পথই নজরে আসছে না।'

দু'জনই নীরবে চলল কিছুক্ষণ। সোহেল ঘাড় ফিরিয়ে বললঃ 'রুস্তমের মহল থেকেই এক ব্যক্তি আমাদের পিছু নিয়েছে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন। আমি এখুনি বুঝতে পারব।'

গতি বাড়িয়ে দিল মাহবানু। আবার পিছন ফিরে চাইল সোহেল। পেছনের লোকটির গতিও বেড়ে গেছে।

ঃ 'আমার সামনে চল তুমি। সামনের গলি মুখে থেমে যাবে।'

হুকুম তামীল করল সোহেল। গলির মুখে এক বৃক্ষের নীচে দাঁড়াল ও। অনুসরণকারী অফিসার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে।

ঃ 'এবার ফিরে চল।' বলল মাহবানু।

আবার চৌরাস্তায় ফিরে এল ওরা। অফিসারও ফিরে তাদের অনুরসণ করতে লাগল। আচানক থেকে গেল মাহবানু। অফিসার নিকটে এলে তার দিকে গজবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললঃ 'অপমানিত হওয়ার জন্য আমাদের পেছনে আসার দরকার নেই। তুমি গিয়ে রুস্তমকে বলতে পার, মিয়ানদাদের বোন পারভেজের বাড়ীতে থাকে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বেরোল না অফিসারের মুখ থেকে। সে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত মিশে গেল মানুষের ভীড়ে।

দ্বিপ্রহর। বিছানায় শুয়ে আছে মাহবানু। সোহেল ছুটে কামরায় প্রবেশ করে বললঃ 'কাউস এসেছে।'

উঠে বসল মাহবানু।

ঃ 'কে? আমাদের গোলাম?'

ঃ 'জ্বী! নদীর পুল পেরোবার সময় আমায় ডাকল। প্রথমটায় আমি চিনতে

পারিনি তাকে। আমার নাম জিজ্ঞেস করলে মনে হল সে আমার পরিচিত। কয়েকদিন ধরে নাকি আমাদের খুঁজছে ও।'

ঃ 'কোথায় সে?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল মাহবানু।

ঃ 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।'

ছুটে বেরিয়ে এল মাহবানু। চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। মুখে মৃদু হাসি। ও তাকিয়ে রইল বুড়ো গোলামের দিকে, যাকে সে ডাকত চাচা বলে।

ঃ 'আবার তোমায় দেখব এ আশা আমার ছিল না। কবে এসেছ?'

ঃ 'বেটি! কয়েকদিন থেকেই তোমাদের খুঁজছি। একদিন দেখি পুল পার হচ্ছে সোহেল। কিন্তু ও ঘোড়ায় সওয়ার থাকায় থামাতে পারিনি। কয়েকদিন ধরে মাদায়েন এবং বহরাশিরের অলিগলি খুঁজছি। পরে ভাবলাম, একমাত্র নদীর পুলই এমন স্থান, কোন পরিচিত ব্যক্তিকে যেখানে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আজ আমার সৌভাগ্যই বলতে হয়, সোহেলের সাথে দেখা হয়ে গেল। নয়তো ফিরে যাবারই ইচ্ছে ছিল।'

ঃ 'এখন কোথাও যেতে পারবে না তুমি।'

ঃ 'বেটি, মিয়ানদাদের ব্যাপারে সোহেল যে খবর আমায় শুনিয়েছে তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। হায়, এখানে থেকে যদি তার কোন সাহায্য করতে পারতাম!'

ঃ 'এসো, সুস্থিরে বসে কথা বলি।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। মাহবানু আর সোহেলের পীড়াপীড়িতে এক কুরসীতে বসল কাউস। নিজের অতীত শুনিয়ে গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করল মাহবানু।

ঃ 'কয়েক মাস ধরে ওখানে আমি যাইনি।' জওয়াব দিল কাউস। 'শুনেছি ওখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। একবার এলাকা খালি করে দিল মুসলমানরা। ইরানী লশকর সে সব আরবদের সাথে দারুণ নির্মম ব্যবহার করল, অতীত লড়াইগুলোতে যারা সাহায্য করেছে মুসলমানদের। আবার এলাকা কব্জা করে নিয়েছে মুসলমানরা। কিন্তু যেতে পারিনি আমি।'

জওয়াব না দিয়ে সোহেলের দিকে তাকিয়ে কাউস বললঃ 'বেটা, কিছু মনে না করলে অল্পক্ষণের জন্য একটু বাইরে যাও। মাহবানুর সাথে একাকী কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

পেরেশান হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল।

ঃ 'আমি হাসানের কথা বলছি। ও তোমার দুশমন ছিল না। মিয়ানদাদের কাছে আমায় এ পয়গাম দিয়ে ও পাঠিয়েছিল যে, তোমরা ফিরে এলে এলাকা তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। দুর্ভাগ্য, তার ব্যাপারে মিয়ানদাদ ভুল ধারণা করে বসে আছে। ও এলাকা ছেড়ে চলে গেলে অনেক কষ্টে আমি তার দেখা পেয়েছি। তোমরা যখন নদী পার হচ্ছিলে কোন খারাপ নিয়তে ও তোমাদের পিছু নেয়নি। সে তার আমীরে লশকরের কাছ থেকে তোমার পিতার জন্য নিয়ে এসেছিল গোটা এলাকার সর্দারীর

প্রস্তাব। কিন্তু মিয়ানদাদ ভেবেছিল, হয়ত তাকেই গ্রেফতার করতে আসছে ও।'

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'হাসানের সাফাই তোমায় গাইতে হবে না। আমি জানি ও আমাদের দুশমন ছিল না। দুনিয়ায় কারো সাথেই খারাপ ব্যবহার করতে পারে না ও।'

ঃ 'বেটি, যদি আমি বলি গ্রাম ছেড়ে তার কাছেই চলে গিয়েছিলাম আমি, কি ভাববে তুমি?'

ঃ 'আমি মনে করব তুমি আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান।'

ঃ 'যদি বলি আমি মুসলমান হয়েছি?'

ঃ 'তবুও মনে করব সে আলো তুমি দেখেছ, যার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে ইরানের অসংখ্য কবিলা। সোহেলের উপস্থিতিতেও এ কথা বলতে পারতে। সে জানে, তার ভাই মুসলিম লশকরে শামিল হয়েছে। বুইবের ময়দানে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

ঃ 'হাসানও আমায় বলেছে এ কথা। কিন্তু সোহেল তাকে চিনতে পেরেছে এ ধারণা তার ছিল না।'

ঃ 'তুমি সোহেলের জন্য এসে থাকলে আমি তাকে বাঁধা দেব না।'

মাথা নত করে খানিক চিন্তা করল কাউস। মাহবানুর দিকে তাকিয়ে বললঃ 'বেটি, মনে কর হাসান নিজেই যদি এখানে এসে পড়ে, কি ব্যবহার করবে তার সাথে?'

হঠাৎ নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল মাহবানুর।

ঃ 'ও যদি অসুস্থ হয় সেবা করব, যদি আহত হয়ে আমার কাছে আসে, আশ্রয় দেবার সময় ভাবব না দুনিয়ার তামাম পাশব শক্তি তার পিছু নিয়েছে কি না। কিন্তু এক বিজয়ীকে স্বাগত জানানো হয়ত আমার সাধ্যের বাইরে।'

ঃ 'মনে কর, এ মুহূর্তে আমার স্থানে যদি ও এসে দাঁড়াতো, কি ভাবতে?'

অশ্রুতে ভরে গেল মাহবানুর দু'চোখ। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললঃ 'ভাবতাম আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু একথা বারবার কেন জিজ্ঞেস করছো? তুমি তো জান, তাকে আমি ঘৃণা করতে পারব না।'

ঃ 'তুমি দেখতে চাও তাকে?'

আচানক শরীরের সব রক্ত এসে জমা হল মাহবানুর চেহারায়। কম্পিত, দ্বিধাকুণ্ঠিত আওয়াজে বললঃ 'কোথায় ও?'

ঃ 'ও এখানেই বেটি, আমার সাথেই এসেছে। তাকে দেখতে চাইলে আজ সন্ধ্যায় অথবা কাল ভোরে নদীর পারে চলে যেও। পুলের কাছে তোমাদের অপেক্ষা করব আমি। কিন্তু লেবাস পড়বে এমন, লোকেরা যাতে তোমাদের দিকে নজর না দেয়।'

ভয়ার্ত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'আমার জন্য মাদায়েন আসার ঝুঁকি নেয়া তার ঠিক হয়নি। তুমি জান না, ধরা পড়লে কি ব্যবহার ওর সাথে করা হবে।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু ও তোমার জন্যই এখানে আসেনি। তোমাকে খবর দিতেও

বলেনি আমায়। ও শুধু জানতে চেয়েছে তোমরা ভাল আছ কিনা। আমি এ বিশ্বাস নিয়ে তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবে না। এবার আমায় অনুমতি দাও। ও আমার ফিরে যাবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকবে।'

ঃ 'তুমি না বলছিলে, কয়েকদিন থেকে আমাদের খুঁজছ? এ কয়দিন কোথায় ছিল ও?'

ঃ 'এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার অনুমতি নেই আমার। মাদায়েনে ও বেকার ছিল না এ মুহূর্তে এদ্দুর জানাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এখন তার কাজ শেষ হয়েছে। কাল সূর্য ডোবার পর এখান থেকে রওনা করবে ও।'

ঃ 'তার মানে আজ সোহেলের সাথে তোমার দেখা না হলে আমাদের খবর না নিয়েই চলে যেত ও?'

ঃ হ্যাঁ বেটি। এও এক অপারগতা। ও এখানে বেশী সময় থাকতে পারছে না। কিন্তু আমি জানি তোমাদের ব্যাপারে ও কত পেরেশান। আজ সোহেলকে না পেলে, তোমাদের জন্য আমায় থাকতে হত। আমি মিয়ানদাদের বাড়ীরও খোঁজ পেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ ছিল না ওখানে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুধু এতদুর জেনেছি, শাহপুর আর উজির নিহত হবার পর মিয়ানদাদ আত্মগোপন করেছে। তারপর তোমরাও গায়েব হয়ে গেছ ওখান থেকে।'

ঃ 'আমরা ওখানে থাকলে ও কি আমাদের কাছে আসত?'

ঃ 'না, সে জানে, মিয়ানদাদ তাকে সইতে পারে না। ও শুধু জানতে চাইছিল তোমরা কেমন আছ।'

ঃ 'এখন তুমি থাকবে না আমাদের কাছে?'

ঃ 'যদি হাসান অনুমতি দেয়।'

ঃ 'আজ সূর্য ডোবার সময় নদীর পারে যাব আমি। সোহেল থাকবে আমার সাথে। সত্যি করে বল, মাদায়েনে তো তার কোন বিপদ নেই!'

ঃ 'ও এক সিপাই। সিপাইয়ের কোন অভিযানই বিপদ মুক্ত নয়। তবে তোমার পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। ও যেমন বাহাদুর, তেমনি সাবধানী। এবার আমায় এযাজত দাও।'

দু'জনই বেরিয়ে এল কামরা থেকে। সোহেল পায়চারী করছিল বারান্দায়।

ঃ 'সোহেল, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো।' বলল মাহবানু।

ঃ 'তিনি আমাদের কাছে থাকবেন না?'

ঃ 'না, শহরে তার অনেক কাজ।'

সূর্যাস্তের সময় সোহেলকে সাথে নিয়ে নদীর পুলের কাছে পৌছল মাহবানু। দারুণ ভীড়। পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল ও। মাছের ঝাঁকা মাথায়

এগিয়ে এল এক জেলে।

ঃ 'মাছ নেবেন আপামনি?'

কাউসের আওয়াজে ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক চাইতে লাগল মাহবানু। মাহবানুর কাছে এসে মাথার টুকরী নামিয়ে কাউস বললঃ 'এ মাছগুলি একটু ছোট। আপনাকে আমি বড় মাছও দিতে পারি। বড় মাছ নিতে হলে আমাদের নৌকা পর্যন্ত যেতে হবে আপনাকে।'

ঃ 'চলো।'

ঝাঁকা মাথায় তুলে ওদের আগে আগে চলল কাউস। ভীড় থেকে একটু দূরে এসে মাহবানু প্রশ্ন করল ঃ 'ও কোথায়?'

ঃ 'আমাদের নৌকা এখান থেকে একটু দূরে।'

ঃ তোমাদের নৌকা?'

ঃ 'হ্যাঁ, মাদায়েন এসেই একটা নৌকা এবং কয়েকটা জাল কিনেছিলাম আমরা। এখন আমরা চমৎকার জেলে। একটা ছোট ঘরও ভাড়া নিয়েছি জেলে পাড়ায়। ওখানে শুধু আমাদের গোলামরাই থাকে। সাধারণত নৌকায় থাকতেই পছন্দ করে হাসান।'

ঃ 'তোমরা আরো গোলাম সাথে নিয়ে এসেছ?'

ঃ 'না, এখান থেকে চারজন অভিজ্ঞ মাছ শিকারীকে রেখেছি।'

প্রায় মাইলখানেক পথ এগিয়ে গেল ওরা। সাঁঝের আবছা আলোয় দেখতে পেল একটা নৌকা। পাশে হাসান দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ও। সোহেলকে তুলে জড়িয়ে ধরল বুকের সাথে। মাহবানুর দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আপনি নৌকায় উঠুন।'

নৌকায় উঠে বসল ও। হাসান আর কাউস লগি ঠেলে কিনার থেকে সরিয়ে নিল নৌকা। নোঙ্গর ফেলে খেজুরপাতার তৈরী ছইয়ের নীচে এসে বসল হাসান। প্রদীপের আবছা আলোয় ওরা নীরবে তাকিয়ে রইল একে অপরের দিকে।

নীরবতা ভেংগে হাসান বললঃ 'পাড় থেকে এখানটা অনেক নিরাপদ। আপনি এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। কাউস এসে যখন বলল, মিয়ানদাদের ঘর শূন্য, নিরাশ হয়েছিলাম। আপনি এত বিপদের মধ্যে আছেন ভাবিনি। মিয়ানদাদের গ্রেফতারীর কারণ কি?'

কান্না জড়ানো কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'সব কথাই আমি বলব। তার পূর্বে জানতে চাই, আপনি কি ভাইয়াকে ক্ষমা করতে পারবেন?'

ঃ 'সে দিনগুলোর কথা আমি কিভাবে ভুলব বলুন, যখন আমি ছিলাম আহত, দুশমন ধাওয়া করেছিল আমায়, আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি আপনাদেরই ঘরে।'

ঃ 'কিন্তু ও যে সোহেলের ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল আপনাকে। গ্রেফতার

হওয়ার কয়েকদিন আগে কাউসের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা আমাকে বলেছে ও।'

ঃ 'এও তো হতে পারে, সোহেলকে সে তার থেকে দূরে রাখতে চায়নি। আপনাকে এ আশ্বাস দিচ্ছি, এ মুহূর্তে ও এখানে থাকলে সোহেলের সাথে ভাইয়ের মত ব্যবহার করার কারণে আমি তার শুকরিয়া আদায় করতাম। আফসোস, এ মুহূর্তে তার কোন সাহায্য করতে পারছি না আমি। তবু আমার মনে হয়, দ্বিতীয় বার আমাদের মোলাকাত হলে আপনার চোখে অশ্রু থাকবে না। আজ আপনার কাছে আমারই যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু ভয় ছিল, কারো সন্দেহ হলে যদি ধরা পড়ি, নতুন মুসীবতের সম্মুখীন হবেন আপনি।'

ঃ 'আমার পিতার নিকটতম দোস্ত এবং মিয়ানদাদের কল্যাণকামীর ঘরেই আমি থাকি। তার নাতনী বোনের মত মনে করে আমায়। তার গোলামরাও যদি আপনার সম্পর্কে জানতে পারে, মুখ খুলবে না।'

আজমেরী বানুর সিংহাসন লাভ এবং মিয়ানদাদের আত্মগোপনের কাহিনী সংক্ষেপে বলল মাহবানু। ও নীরব হলে হাসান বললঃ 'মানুষ মানুষের খোদা হয়ে বসলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রতিটি রাতের পরে আসে দিন, এ কুদরতের এক অমোঘ নিয়ম। সে প্রভাতের সুসংবাদ তোমায় দিতে পারি, যার আলোয় নাজাতের পথ দেখবে বঞ্চিত মানবতা। দ্বিতীয়বার যখন আসব, আমার সাথে থাকবে মানুষের সেই কাফেলা, আল্লাহর জমিনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করার জন্য যাদের তিনি নির্বাচিত করেছেন। তাদের আগমনে ধুলায় লুটিয়ে পড়বে জুলুমের প্রাসাদ। খুলে যাবে কয়েদখানার বন্ধ দুয়ারগুলো।'

ঃ 'বুইবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইরানে প্রবেশের সকল পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ ভুল ধারণায় থাকা আপনাদের ঠিক হবে না।'

ঃ 'ইরানের শক্তি সম্পর্কে আমরা সচেতন। তার চেয়ে বেশী সচেতন আমাদের উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর।'

ঃ 'আপনি কি জানেন ইয়াজদর্গিদের ঝান্ডার নীচে সমগ্র ইরান জমায়েত হচ্ছে?'

ঃ 'এর চেয়ে বেশী আমি জানি।'

ঃ 'আগামী কালই আপনি যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'সোহেলের ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কি?'

ঃ 'সোহেল আমার ভাই ঠিক, তবু ও নিজের ফয়সালা নিজে করলেই কি ভাল হয় না?'

সোহেল কখনো মাহবানু আবার কখনো হাসানের দিকে তাকাচ্ছিল।

ঃ 'সোহেল! ভাইয়ের সাথে যেতে চাইলে তোমায় বাঁধা দেব না।'

ঃ 'কিন্তু আপনি?' বিষন্ন কন্ঠে বলল ও।

ঃ 'আমার কোন বিপদ এলে এখানে থেকেও আমার কোন উপকার তুমি করতে পারবে না। আগামী লড়াইগুলোতে দুশমন হিসেবে ভাইয়ের মোকাবিলা করবে তুমি, বর্তমান পরিস্থিতিতে মিয়ানদাদও হয়তো তা পছন্দ করবে না।'

ঃ 'ভাইজান।' হাসানকে বললও। 'জানতাম না আপনি মুসলমান হয়েছেন। বুইবের ময়দানে সন্দেহ হয়েছিল, আপনি চিনতে পেরেই হয়ত জীবিত ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাকে। আমায় সাথে নিয়ে যাবেন?'

ঃ হ্যাঁ।' তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে বলল হাসান।

ঃ 'এবার আমার একটাই দরখাস্ত, মাদায়েনে কাজ শেষ হয়ে থাকলে এক মুহূর্তও দেরী করবেন না।' বলল মাহবানু।

ঃ 'আপনার এ পরামর্শ আমি ফেলতে পারি না। কাল ভোরেই রওনা করব। কাউস, এখন এর কাছে থাকবে তুমি। এক যুবক সংগী পেয়েছি আমি। লোকালয়ের বাইরে আমি ছেড়ে যাব কিশতি। সকালে জেলেদের বলবে, রাতে কিশতির রশি কেউ কেটে দিয়েছিল। যে টাকা বেঁচে গেছে আমার কাছে, তা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।'

ঃ 'সফরের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হলে আমি দিতে পারি।'

ঃ 'না, গরীবদের মত পায়দল সফর করাই আমার জন্য সুবিধাজনক। আসুন, আপনাকে বাড়ী রেখে আসি।'

হাসান ও কাউস নৌকা পাড়ে নিয়ে এল।

ঃ 'কাউস।' হাসান বলল। 'তুমি এখানেই থেকো। ওদের বাড়ী পৌছে দিয়েই ফিরে আসব আমি।'

পারভেজের বাড়ী। হাসান আর সোহেলকে বিদায় দিচ্ছিল মাহবানু।

ঃ 'ইয়াসমীন আপা কি ভাববেন আমায়?' বলল সোহেল।

ঃ 'তাকে নিয়ে ভাবনা নেই। আমি বুঝিয়ে বলব ওকে।'

ঃ 'আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসব আমরা।' বলল হাসান।

ঃ 'আমি আপনার পথের দিকে তাকিয়ে থাকব চিরদিন। যদি কোন কারণে পালাতে হয়, ইস্পাহানে সরুশের বাড়ী হবে আমার শেষ আশ্রয়। এখন দেরী করবেন না, যান আপনি। খোদা হাফেজ।'

ঃ 'চলো সোহেল।' সোহেলের হাত ধরে বলল হাসান।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ওরা। মাহবানু দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তাদের গমন পথের দিকে।

রাত। হীরা ও জিকারের মাঝামাঝি ইসলামী লশকরের ছাউনীতে প্রবেশ করল হাসান ও সোহেল। ভাইকে এক সালারের কাছে রেখে মুসান্না বিন হারেসার তাবুর দিকে পা বাড়াল হাসান।

ঃ 'আমীরে লশকর ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডাক্তার বলেছেন তার বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না ঘটে।' পাহারাদার বলল তাকে। 'কোন জরুরী কথা হলে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করুন। তিনি পাশের তাবুতে।'

মিনিট দুয়েক পর মুয়ান্না বিন হারেসার তাবুতে গিয়ে হাজির হল হাসান। মুয়ান্না দাঁড়িয়ে মোসাফেহা করে বললেনঃ 'কবে এসেছ তুমি?'

ঃ 'এই মাত্র। আমীরে লশকরকে সংবাদ দেয়া জরুরী।'

ঃ 'তাঁর শরীর ভাল নেই। ঔষধ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কোন জরুরী খবর না হলে তাকে জাগানো ঠিক হবে না।'

ঃ 'তিনি কি বেশী অসুস্থ?'

ঃ 'গত কয়েক সপ্তাহের দৌড়ঝাঁপে তাঁর যখমের কষ্ট বেড়ে গেছে। ডাক্তার সব সময়ই বলছেন, কয়দিন বিশ্রাম নিলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার অভিযানের মুহূর্তগুলোতে বিশ্রাম করার সুযোগ হয়নি তার। যখমের ব্যথার সাথে এখন জ্বরও এসে যায়। ডাক্তারের আজকের ঔষধ সেবনের ফলে এশা পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাদায়েনের পরিস্থিতির আলোকে দ্রুত কোন অভিযানের জন্য তোমার পরামর্শ হলে তাঁকে জাগিয়ে দেয়া যেতে পারে।'

ঃ 'না, থাক, তাকে জাগানোর প্রয়োজন নেই। দুশমনের পক্ষ থেকে আশু হামলার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি শুধু সিপাহসালারের খিদমতে হাজিরা দিতে চাচ্ছিলাম।'

ঃ 'বসো।'

বসল হাসান। অনেকক্ষণ আলাপ চলল দু'জনের মধ্যে।

পরদিন সকালে মুসান্নার সামনে হাজির হল হাসান। বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন তিনি। হাতের ইশারায় তাকে বসতে বললেন।

ঃ 'কখন এসেছ তুমি?'

ঃ 'রাতে, এখন কেমন বোধ করছেন?'

ঃ 'আমি ভাল, মাদায়েনের অবস্থা বলো।'

ঃ 'বড় ধরনের লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে মাদায়েনে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রোমানদের বিরুদ্ধে কিসরার বিজয়ের প্রাথমিক সময়গুলো ছাড়া ইরানীরা কখনো এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। ইরানে খবর রটেছে, আগামী লড়াইয়ে রুস্তম নিজেই ময়দানে হাজির হবে। যদিও আমাদের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি এক করার অবস্থা ইরানের

ছিল না, কিন্তু ইয়াজদগির্দ এখন সে শূন্যতা দূর করে দিয়েছে। তখতের কোন দাবীদার তার সামনে আসার সাহস করবে না। ফৌজের নেতৃত্ব রুস্তমকে দেয়া হলে তার প্রথম চেষ্টা হবে ইরানের একজন সিপাইও যেন ময়দান থেকে দূরে না থাকতে পারে। তবুও এখুনি কোন পদক্ষেপের সম্ভাবনা ওদের পক্ষ থেকে নেই।'

ঃ 'দজলার পাড় পর্যন্ত পৌছে আমরা ফিরে এসেছি। আমার কাছে আরো কিছু ফৌজ থাকলে আজ মাদায়েন থাকতাম আমি।'

ঃ 'শুনেছি আপনাকে আশাব্যঞ্জক পয়গাম পাঠিয়েছেন আমীরুল মুমেনীন।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমার আবেদনের জওয়াবে খলিফা লিখেছেন, তিনি সাহায্য পাঠাচ্ছেন খুব শীঘ্র। হায়, মদিনার লশকরের জন্য যদি অপেক্ষা করতে পারতাম! আমীরুল মুমিনের খিদমতে আরো একজন দূত পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছে, তুমিও আজ রওনা করে তার সাথে মিলবে। মদিনা থেকে কোন লশকর যদি এখনো পাঠানো না হয়ে থাকে, খলিফার খিদমতে আমার পক্ষ থেকে আরজ করবে যে, দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি তাঁর পাঠানো লশকরের পথ চেয়ে আছি। আর পথে লশকরের দেখা পেলে ফিরে এসো। আমি জিকারে তোমাদের প্রতীক্ষা করব। খলিফার সামনে ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে তুমি, এজন্যই তোমায় পাঠাতে চাই। যাও, এবার তৈরী হয়ে নাও।'

হাসানের হৃদয়ে জমা কত কথা! দৃঢ়চেতা নেতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইছিল ও। পরামর্শ দিতে চাইছিল বিশ্রামের। ও বলতে চাচ্ছিল, ইরানের বিজয় নিয়ে যে স্বপ্ন আপনি দেখতেন, বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে তা। দীর্ঘ সময় ধরে নেতার সান্নিধ্যে বসে তার মুখের কথা শুনতে চাইছিল ও। কিন্তু তার পেরেশান দৃষ্টি বলছিলঃ 'আমার দোস্ত! আমি জানি কি বলতে চাইছ তুমি। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার যে সময় নেই।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল হাসান। বেরিয়ে যাবার আগে ফিরে চাইল।

ঃ 'কিছু বলবে?' মুসান্না বললেন। এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'আমার দোস্ত, আমায় নিয়ে পেরেশান হয়ো না। জিকারে পৌছে বিশ্রামের সময় পেলে ডাক্তারের পরামর্শ মত কাজ করব। এ রাজপথে এগিয়ে চলা কাফেলা স্তব্ধ হয়ে যাবে– এমনটি ভাবা কখনো উচিৎ নয়। আমি সেই কাফেলার নকীব, যারা দেখেছে মাদায়েনের পথ। শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত যদি আমি তোমাদের সাথে থাকতে না পারি, আমার আত্মা অবশ্যই এই ভেবে প্রশান্তি লাভ করবে যে, আমার পর তোমাদের নেতা এ জিম্মা বহনের অধিকযোগ্য হবেন। মাদায়েন ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে তার দৃষ্টি নতুন নতুন ময়দানের বিশালতায়, পেছনে আসা মুসাফিরদের জন্য তার পদচিহ্ন হবে আলোকবর্তিকা। ভেবোনা, এবার যাও।'

দু'হাতে মোসাফেহা করে হাসান বললঃ 'আপনার হাত গরম লাগছে। কষ্ট তো

খুব বেশী নয়?'

ঃ 'আমার কোন কোন সাথী বোঝাতে চাইছে, আমার মাকসাদের চেয়ে আমার জীবনটা দামী, এই শুধু আমার কষ্ট। হাসান, ইরাকে এমন কোন ময়দান ছিল না, যেখানে পা রেখে শাহাদাতের তামান্না আমি করিনি।'

নিঃশব্দে এ ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে রইল হাসান। আবেগে উথলে উঠা অশ্রুতে ভারী হয়ে এল তার চোখের পর্দা। তাবু থেকে বেরিয়ে এল ও। মনে মনে বার বার আওড়াতে লাগলঃ 'বন্ধু আমার। ভাই আমার! আমার নেতা! আল্লাহ তোমায় মদদ করুন।'

একটু দূরে তীরন্দাজী অনুশীলন করছিল এক মুজাহিদ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সোহেল। হাসান কাছে গিয়ে ডাকল তাকে। ছুটে এল ও।

ঃ 'সোহেল, আমি মদিনা যাচ্ছি।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'এখুনি। কিন্তু লশকরের সাথে পথে দেখা হলে ফিরে আসব।'

ঃ 'আমায় সাথে নেবেন না?'

ঃ 'না। এক দোস্তের কাছে রেখে যাব তোমায়, আমার সাথে এসো।'

উদাসীনতা ছেয়ে গেল সোহেলের চেহারায়। এগিয়ে চলল দু'জন।

ঃ 'ভাইজান, তিনি কে?' প্রশ্ন করল সোহেল।

ঃ 'আমর আসেম বিন তমিমী। অনেক কিছু তার কাছে শিখতে পারবে তুমি।'

নেযা অনুশীলনের ময়দানে আমর তমিমীর কাছে হাজির হল ওরা। ইরানের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে হাসান বললঃ 'আসেম, মদিনা যাচ্ছি আমি। ও আমার ভাই, ওকে সিপাই হিসেবে গড়তে পারলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। মাদায়েনে ফৌজি ট্রেনিং নিয়েছে ও। আশা করি ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির শান্তনাপ্রদ জওয়াব ও দিতে পারবে।'

ঃ 'ও মাদায়েন ছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু এর অতীত কাহিনী বলার সময় আমার নেই। সিপাহসালারের হুকুম, আমি যেন এখুনি রওয়ানা করি।'

ঃ 'ঠিক আছে, আপনি যান। তবে একটা প্রশ্ন, দুশমনের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য কতদিন লাগবে আমাদের?'

ঃ 'আমার ধারণা ভুল না হলে দুশমনের অগ্রাভিযানের পূর্বেই আমাদের কাছে পৌছবে মদিনার লশকর।' হাঁটা দিল হাসান।

খানিক পর। ছাউনী থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হল হাসান। সোহেল তখন নেযার অনুশীলনে বিভোর।

জিকার। প্রচন্ড জ্বর নিয়ে তাবুতে শুয়ে আছেন মুসান্না বিন হারেসা। পাশে ক'জন ফৌজি সালার। তাবুর বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটু পরেই ভেতরে প্রবেশ করল হাসান। মুসান্নার মূর্চ্ছিত চেহারা ঝলকে উঠল আচানক। উঠে বসলেন তিনি।

ঃ 'জনাব, মদিনার লশকর আসছে।' হাসান বলল। 'সে লশকরের আমীর সালাম দিয়ে বলেছেন, খুব শীঘ্রই এসে পৌছবেন তিনি।'

ঃ 'আমীর কে?'

ঃ 'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। আমীরুল মু'মিনীন নিজেই লশকরের নেতৃত্ব দিতে চাইছিলেন। কিন্তু সাহাবাদের পরামর্শ ছিল, এ পরিস্থিতিতে মদিনার বাইরে যাওয়া আপনার ঠিক হবে না। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সে সব সম্মানিত সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম, মহানবীর সময় যারা ইসলাম এবং কুফরীর লড়াইয়ে শরীক হয়েছিলেন। তাকে নিয়ে একটা কথা মশহুর হয়ে আছে, ইসলামের জন্য তার তুনীর থেকেই প্রথম তীর বেরিয়েছিল।'

বালিশে মাথা রাখতে রাখতে মুসান্না বললেনঃ 'তাকে নিয়ে বহু কথাই আমি শুনেছি। হায়, যদি তাকে দেখতে পেতাম। কত ফৌজ আছে তার সাথে?'

ঃ 'চার হাজার সওয়ার নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়েছেন তিনি। কিন্তু তার ধারণা, ইরান পৌছার পূর্বেই কয়েক গুণ বেড়ে যাবে লশকর। পথের সব কবিলাকে তার সাথে শামিল হওয়ার হুকুম পাঠিয়েছেন খলিফা। নতুন করে ফৌজে ভর্তি করা হচ্ছে মদিনায়ও। 'সিরাকে' এসে অতিরিক্ত ফৌজের জন্য তিনি যাত্রা বিরতি করবেন। তিনি আশা করছেন, সিরিয়ার লশকরের একটা অংশও তাঁর সাথে যোগ দেবে।'

ঃ 'ইরানের জংগী প্রস্তুতিতে যারা পেরেশান, সে সব কবিলাকে এবার বিজয়ের সুসংবাদ দিতে পার।' ভাইকে বললেন মুসান্না। 'তাদের বলবে, ইসলামী লশকরের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছি আমি। বনু বকরের কাছে যাও। আমার পক্ষ থেকে তাদের এ পয়গাম দেবে যে, ইরানের গোয়েন্দাদের কথা শুনে যেন ঘাবড়ে না যায়।'

আসেম বিন ওমর তমিমী বললেনঃ অনুমতি হলে মুসান্নার পরিবর্তে কবিলাগুলোর কাছে আমি যেতে চাই।'

ঃ 'না।' দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দিলেন মুসান্না। 'তোমার কথা শুনবে না বনু বকর। তাছাড়া ছাউনীতেও তোমার দরকার।'

প্রবীণ সর্দার বশীর বিন খাসাসিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি।

ঃ 'বশীর, আমি জানি না, এক ঘন্টা, এক প্রহর, অথবা একদিন পর কি হবে আমার অবস্থা। এ জন্য আমি আমার জিম্মাদারী সমর্পন করতে চাই তোমায়।'

সবাই স্তব্ধ হয়ে কখনো মুসান্না আবার কখনো বশীরের দিকে তাকাতে লাগল।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বশীর বললেনঃ 'আপনার তাবু পাহারা দেয়াকেও সৌভাগ্য

মনে করব আমি, কিন্তু ভয় হয় ......।'

ঃ 'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস না আসা পর্যন্ত জিকারের ছাউনীর হিফাজত করতে হবে তোমায়। আমার তাবু ছাউনীর বাইরে নয়। এবার গিয়ে তলোয়ার তেজ করতে বল মুজাহিদদের। আসেম! সংগীদের বল, প্রস্তুতির এ সময়টুকু যেন নষ্ট না করে।'

একজন একজন করে তাবু থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। কিন্তু হাসান ঠাঁয় বসে রইল। তার দিকে তাকিয়ে মুসান্না বললেনঃ 'হাসান, তুমি পরিশ্রান্ত। যাও, আরাম করোগে।'

কিছু বলতে চাইল হাসান। কিন্তু দেখল চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন মুসান্না। আলতো পায়ে হাসান বেরিয়ে গেল তাবু থেকে।

তাবুর পেছন দিকের পর্দা তুলে এগিয়ে এলেন মুসান্না বিন হারেসার বিবি সালমা। বসলেন স্বামীর পাশে। মুসান্না নিঃশব্দে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

ঃ 'সালমা!' বললেন তিনি। 'আমি বিশ্রাম করি না, এ অনুযোগ আর করতে পারবে না। আমার দায়িত্ব আমি বশীরকে সমর্পন করেছি। আমি এবার প্রাণ ভরে বিশ্রাম নিতে পারব। ভেবেছিলাম বিশ্রাম করব মাদায়েনে পৌছে। কিন্তু মাদায়েন যে এখনো অনেক দূরে। তোমার মনে আছে, যখন বলেছিলাম ইরানের বিরুদ্ধে আমি লড়াই শুরু করতে যাচ্ছি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তোমার খান্দানের মুরুব্বীরা। এখন সে স্বপ্ন আমার সত্য হতে যাচ্ছে। শুনেছ, আমিরুল মুমিনীন নিজেই লশকরের নেতৃত্ব দিতে চাইছিলেন। সাহাবাদের পরামর্শে সে রায় বদলেছেন তিনি। নিজে না এসে পাঠাচ্ছেন এমন এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে, যিনি এর উপযুক্ত।'

ঃ 'আমি শুধু জানি, জিন্দেগীতে এমন কোন লহমা আসেনি যা আপনি বলেছেন অথচ আমি বিশ্বাস করিনি!'

ঃ 'কখনো আমার পথ রোধ করার চেষ্টা করনি এ জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'আমি জানতাম, খোদার পথে লড়াই করা ছাড়া আর কিছুই আপনি পছন্দ করেন না। এ কঠিন পথে আপনি আমায় সঙ্গীনি হওয়ার উপযুক্ত মনে করেছেন, এ আমার গর্ব।'

অনেকক্ষণ স্ত্রীর সাথে আলাপ করলেন হযরত মুসান্না। এক সময় চোখ বন্ধ করলেন তিনি। একটু পরই তাবুতে প্রবেশ করল ডাক্তার। মুসান্নার (রাঃ) দু'ঠোঁট মেশানো। দ্রুত হয়ে আসছিল নিঃশ্বাস। অস্বস্তিতে চোখ খুলে পাশ ফিরলেন তিনি। খানিক ঔষধ মুখে নিলেন ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে। কিন্তু তার চেহারা বলছিল, জিন্দেগীর অন্তিম সময়ে পৌছে গেছেন তিনি। শেষ রাত পর্যন্ত চলল জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। জিকারের ছাউনীতে শোনা যাচ্ছিল ফজরের আজান। শেষ বার তিনি চোখ খুললেন।

কালিমা শাহাদাত পড়লেন কয়েকবার। এর পর নীরব হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

সালাবা। মদিনা থেকে আট মঞ্জিল দূরে। এখানে এসেই মুসান্না বিন হারেসার তিরোধানের খবর শুনলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। বশীর বিন খাসাসিয়াকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন, মুসান্নার পরিরারবর্গ এবং মুজাহিদদের নিয়ে 'সিরাফ' চলে এসো। ক'দিন পর 'জিকারের কাফেলা যখন 'সিরাফ' পৌছল, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ছাউনীর বাইরে তাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। শহীদদের স্ত্রী এবং এতীম বাচ্চাদের তাবুর ভেতরে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন তিনি। মুসান্নার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে নিজে বসলেন তাবুর সামনে এক প্রশস্ত শামিয়ানার নিচে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন তাদের সাথে।

আসেম বিন আমর তমিমী, বশীর বিন খাসাসিয়া এবং অন্য কয়েক জনের সাথে কথা বলে মুয়ান্নার দিকে ফিরলেন তিনি।

ঃ 'মুয়ান্না, তোমার এ মহান ভাইয়ের সাথে প্রতিটি লড়াইতেই শরীক ছিলে তুমি। আমাদের এ প্রশ্নের জওয়াব তুমিই হয়ত ভাল দিতে পারবে, আমাদের জন্য মাদায়েনে পৌছার সহজ পথ কোনটি? আর তোমার ভাই বেঁচে থাকলে কি পরামর্শ আমায় দিতেন?'

ঃ 'এ প্রশ্নের জওয়াবের জন্য অনুমানের সাহায্য নিতে হবে না আমায়। অসুস্থতার সময় যে উপদেশ আমায় দিয়েছিলেন তিনি, আমার মনে এখনো সযত্নে তা রক্ষিত। প্রায়ই তিনি বলতেন, ইরানের কোন এলাকা দখল করা আমাদের লক্ষ্য হলে তা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ইরানের উপর পরিপূর্ণ বিজয় হাসিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ওদের ফৌজি শক্তি নির্মূল করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। আজ হোক, কাল হোক এক চূড়ান্ত লড়াই হবে ইরানীদের সাথে। ইয়াজদগির্দের ক্ষমতা দখলের পর দ্রুত একত্রিত হচ্ছে ওরা। আমাদের জংগী সরঞ্জাম এত নয় যা দিয়ে বুইবের বিজয় থেকে ফায়দা লুটতে পারি। এমনো সময় ছিল, মাদায়েন জয় করার জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র অতিরিক্ত দশ হাজার ফৌজ। ওদের সম্পূর্ণ পরাজিত না করে এগিয়ে যাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। কোন অবস্থায়ই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। ওদের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য এমন ময়দান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, যার পেছন দিকে থাকবে পাহাড় অথবা মরু ময়দান।'

ঃ 'এর সাথে আমি সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি যাচাই করার পরই সিদ্ধান্ত নিতে পারি, চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত হবে কোন স্থান। মুসান্নার বিবিকে আমার পক্ষ থেকে এ পয়গাম দাও যে, স্বামী বেঁচে থাকতে তিনি যে সম্মান এবং মর্যাদায় ছিলেন, এখনো তেমনটিই আছেন।'

দু সপ্তাহ পর। আমীরুল মুমিনীনের দূত পৌছল প্রভাতে। তার সাথে মো..কাত

করেই লশকরের সর্দারদের সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বললেনঃ 'কাদেসিয়া পৌঁছে দুশমনের জন্য প্রতীক্ষা করার হুকুম পাঠিয়েছেন খলিফা।'

আমীরে লশকরের ইশারায় মুয়ান্না যখন কাদেসিয়ার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, শ্রোতাদের মনে হচ্ছিল সমগ্র ইরাক আমীরুল মুমিনীনের নখদর্পনে। যদি মুসান্না বিন হারেসা বেঁচে থাকতেন, হক-বাতিলের এ প্রচন্ড লড়াইয়ের জন্য কাদেসিয়া ছাড়া অন্য কোন ময়দান হয়তো তিনিও বেছে নিতেন না।

আটাশ

মাদায়েন থেকে শুরু করে দজলা ও ফোরাতের মাঝে সবগুলো শহর ফৌজি ছাউনীর রূপ নিয়েছিল। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে লড়াই থেকে দূরে থাকতে চাইছিল রুস্তম। কারণ সে ছিল জ্যোতিষ। তার দৃষ্টিতে সিতারার চাল ছিল ইরানের প্রতিকূলে। ইরানের অন্য জ্যেতিষরাও ইরানের আগাম বিপদ সম্পর্কে তাকে হুশিয়ার করেছিল।

অভিযান পরিচালনার কথা যখন ওমরারা বলত, সে ওদের একথা বলে থামিয়ে দিত যে, নিশ্চিন্তে প্রস্তুতি নেব আমরা। এতে হয়ত নদী পার হয়ে আসবে মুসলমানরা, আর না হয় রসদের স্বল্পতার কারণে ফিরে যাবে। দু অবস্থায়ই ফায়দা হবে আমাদের। আমাদের জংগী প্রস্তুতি দেখে ওরা যদি ভয় পেয়ে যায়, ফোরাতের ও পারের জংগী কবিলারা তাদের বিপক্ষে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়বার ইরানের দিকে পা বাড়াবার সাহস হবে না ওদের। আর নদী পেরোবার মত বোকামী যদি করে, আমাদের চেষ্টা হবে, ওদের একটা সিপাইও যেন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে না পারে।'

এ যুক্তির সাথে একমত ছিল ফৌজি সর্দাররা। সালারের পক্ষে ওরা বলত, দজলা ফোরাতের মাঝখানটা ইরানী সিংহের আবাস। স্বেচ্ছায় সে আবাসে ওরা প্রবেশ করলে বাইরে ওদের পিছু নেয়ার কি প্রয়োজন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঝুঁকি নেয়ার পক্ষে ছিলেন না ইয়াজদগির্দও। কাদেসিয়ায় জমায়েত হওয়া দুশমনের পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতীক্ষায় থাকলেন তিনি।

এ পরিস্থিতি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের জন্যও ছিল অবাঞ্ছিত। বসন্তের মওসুমে মদিনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন তিনি। সিরাফে অবস্থান করলেন কয়েক মাস। সেখান থেকে এসে ছাউনী ফেললেন কাদেসিয়ায়।

প্রায় মাস খানেক দুশমনের কোন তৎপরতার সংবাদ এল না। রসদের ঘাটতি দেখা দিল মুসলিম ফৌজে। মুসান্নার সাথে ইরাক অভিযানে যারা শরীক ছিলেন, তাদের পাঠিয়ে দিলেন হযরত সা'দ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছাউনী থেকে বেরিয়ে যেতেন তারা। খাদ্য

দ্রব্য আর পশু ছিনিয়ে আনতেন দুশমনের কাছ থেকে। প্রথম দিকে এসব তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল রসদ জোগাড় করা। ধীরে ধীরে এ তৎপরতা নিয়মিত হামলার রূপ নিল। কয়দিন পর হীরার কোন বস্তি অথবা কোন শহর মুসলমানের এ হামলা থেকে নিরাপদ ছিল না। হীরা থেকে সামনে নদী পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে এ ঝটিকা বাহিনী ইরানীদের বস্তি এবং চৌকি বরবাদ করে করে পৌছল ফেরাজ পর্যন্ত।

স্থানীয় বাসিন্দাদের এক প্রতিনিধি দল পৌছল মাদায়েন। ইয়াজদর্গিদের কাছে ওরা ফরিয়াদ করলঃ 'জনাব, ইরানী ফৌজ তৎপর না হলে মুসলিম ভীতি ছেয়ে যাবে সমগ্র ইরানে। ইরান থেকে নিরাশ হয়ে ওদের সঙ্গ দিতে লোকেরা বাধ্য হবে।'

সামন্ত প্রভু, জমিদার এবং ফৌজি চৌকির মুহাফিজরাও দ্রুত সাহায্যের জন্য আবেদন করছিল ইয়াজদর্গিদের। দারুণ উৎকণ্ঠায় ছেয়ে গেল মাদায়েন। ওরা এবং ধর্মীয় নেতারা দাবী করছিল রুস্তমকে খুব শীঘ্রই যেন অভিযানের হুকুম দেয়া হয়। রুস্তমকে ডেকে পাঠালেন ইয়াজদর্গিদ। বললেনঃ 'কাল সূর্য ডোবার পূর্বেই শুনতে চাই, কাদেসিয়ার পথে প্রথম মঞ্জিল অতিক্রম করেছে আমাদের ফৌজ।'

বিবর্ণ হয়ে গেল রুস্তমের চেহারা। বললঃ 'আলামপনাহ! আপনার হুকুম অমান্য করার সাধ্য নেই আমার। আজই রওয়ানা করবে মাদায়েনের লশকর। কিন্তু ....'

ঃ 'কিন্তু কি?' রেগে বললেন সম্রাট।

আবেদন ঝরা কণ্ঠে রুস্তম বললঃ 'আলীজাহ, আমার উচিৎ সিংহাসনের পাশে থাকা। লশকরকে 'সাবাত' পৌছে দিয়ে আমি ফিরে আসব এ অনুমতি দিন আমায়। লড়াইয়ের ময়দানে ফৌজের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনাপতি রয়েছেন। জালিনুস, হরমুজান, ফিরুজান অথবা বাহমানকে এ দায়িত্ব দিতে চাই আমি।'

ঝাঝাল কণ্ঠে ইয়াজদর্গিদ বললেনঃ 'কি ভাবে ভাবলে তোমার তুলনায় ওরা দুশমনের নেযার সামনে সিনা ফুলিয়ে দাঁড়াবে?'

রুস্তম বললঃ 'আলীজাহ, আমি ভীরু নই। কিন্তু ফৌজের সাহস অটুট রাখার জন্য পিছনে থাকা জরুরী আমার। কাদেসিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া সিপাইদের এ প্রশান্তি থাকা দরকার যে, আমাদের রাজধানী নিরাপদ, প্রয়োজনে সাহায্য পেতে পারি। মাদায়েনে বেকার থাকব না আমি। এক হাজার অশ্বারোহী পাঠানোর দরকার হলে আগের দিনই ভর্তি করব চার হাজার। দুশমনকে দেখাব যে পরিমান ফৌজ পাঠিয়েছি, তার চেয়ে বেশী ট্রেনিং নিচ্ছে মাদায়েনের ছাউনীতে।'

অবজ্ঞার হাসি হেসে সম্রাট বললেনঃ 'এমন কোন সিপাহসালারের কথা শুনিনি, লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে থেকে যে দুশমনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। তুমি বললে, আমরা কিছুদিন নীরব থাকলে সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে নিজেই ফিরে যাবে দুশমন। আরো বললে, নদী পেরোলেই ওদের পিষে ফেলবে। কিন্তু অবস্থা এ...

দাঁড়িয়েছে, ওরা ছাউনী ফেলে বসে আছে কাদেসিয়ায়। ওদের অশ্বারোহীরা আমাদের শস্য শ্যামল এলাকা বরবাদ করে দিচ্ছে নির্বিঘ্নে। রসদের কোন কমতি ওদের নেই। কয়েক মাসের সম্পদ জমা রেখেছে ওরা। তোমার বুদ্ধিতে আরো কিছু সময় ওরা পেলে সাহায্য পেতেও কোন মুশকিল হবে না। সিরিয়ায় রোমানদের পরাজিত করে ইরানের পথ ধরতে ওদের দেরী হবে না মোটেই। তখন সমগ্র ইরানবাসীকে ছাউনীতে একত্রিত করেও হয়তো ওদের ভয় দেখাতে পারবে না। তোমার সংবাদ মতে কাদেসিয়ায় ওরা ত্রিশ হাজারের বেশী নয়। মাদায়েনেই ষাট হাজার অশ্বারোহী জমা করেছ তুমি। সাবাতে ষাট হাজার এবং পথের অন্যান্য চৌকিগুলোতে এ পরিমাণ সিপাই তোমার প্রতীক্ষা করছে। তাহলে কয়েক মাস থেকে দুশমনের মোকাবিলা করতে কেন টালবাহানা করছ তুমি? শুনেছি নক্ষত্রের ইলম তোমার আছে। জ্যোতিষ নয়, ইরানের প্রয়োজন এক সেনাপতির।'

ক্রোধ সংবরণ করে রুস্তম বললঃ 'আলীজাহ, জ্যোতিষ হওয়া দোষের নয়। সিতারার ইলম আমায় কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছে, এ সন্দেহ পয়দা হয়েছে আপনার মনে। ভাবছেন, জীবনের মায়ায় আমার অনুগত্য আর ওফাদারীতে পার্থক্য এসেছে। আমি প্রমাণ করব, গোলামের সাথে আপনি ইনসাফ করেননি। আজই রওয়ানা হব আমি।'

ইয়াজদগির্দ কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বললেনঃ 'তোমায় সন্দেহ করিনি আমি। এত তাড়াহুড়া করারও দরকার নেই। একদিনে কিছু আসে যায় না। কাল ভোরে ছাউনী থেকে তোমাদের বিদায় জানানোর জন্য আমি তৈরী থাকব।'

ষাট হাজার অশ্বারোহী নিয়ে মাদায়েন থেকে বের হল রুস্তম। সামনে জংগী হাতী। পেছনে রসদ বোঝাই উট ও খচ্চরের সারি। সাবাতে পৌছল ফৌজ। যেসব অভিজ্ঞ জেনারেলরা রোমান এবং মুসলমানদের সাথে কয়েকটা লড়াইতে শরীক ছিল, নিজ নিজ লশকর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অভ্যর্থনার জন্য।

সাবাতে ছাউনী ফেলল রুস্তম। প্রকাশ্যেই চলতে লাগল অভিযানের প্রস্তুতি। কিন্তু তার মন সায় দিচ্ছিল না। কারণ, মাদায়েন থেকে যে সব প্রখ্যাত জ্যোতিষ এসেছিল তাদের সাথে, ওরা তখনও বলছিল, গ্রহ এখনো তার প্রতিকূলে। একদিন সে শুনল, মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দল কিসরার সাথে আলাপ করার জন্য মাদায়েন যাত্রা করেছে। এই প্রথম সে অনুভব করল, দেবতা আহার মুজাদ তার দোয়া কবুল করেছেন। কিন্তু খানিক পরই তার সংগীরা তাকে পরামর্শ দিলঃ 'অস্থির মেজাজের তরুণ শাসকের বোকামীর পরিণাম থেকে ইরানকে বাঁচাতে হলে আপনার মাদায়েন পৌছা জরুরী।'

দরবারে সে নির্ভীক এবং মার্জিত ব্যক্তিদের দেখছিলেন ইয়াজদগির্দ, যাদের দীলে খোদা ছাড়া আর কারো ভয় ছিল না। তাদের শিরে ছিল না জওহরের কারুকার্যময় মুকুট, গায়ে ছিল না রেশমের জুব্বা, তবুও তাদের চেহারায় ছিল প্রশান্তি আর ভয়শূন্যতা, এর পূর্বে যা কখনো দেখেননি ইরানের ক্ষমতাগর্বী সম্রাট। তারা অহংকারী ছিলেন না, কিন্তু সাদাসিধে লেবাসের আড়ালে লুকানো সুঠাম বাহুর শক্তি সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তাদের নির্ভীক দৃষ্টিরা সে মহান জাতির দৃঢ়তা আর একীনের প্রতিনিধিত্ব করছিল, মানুষের প্রভূত্বকে যারা আল্লাহর জমিনে সহ্য করে না। এরা ছিলেন চৌদ্দজন। সাতজন ছিলেন বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। পেটা শরীর। মরুচারী বেদুইনদের সবগুলো বিশেষত্ব ছিল এদের মধ্যে। বাকীদের চেহারা ছিল আরব কবিলাগুলোর বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিবিম্ব। উৎকণ্ঠা মেশানো জড়তা নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ইয়াজদর্গিদ। দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্ন করলেনঃ 'কোড়াকে কি বল তোমরা।'

ঃ 'সুত'। জওয়াব দিলেন নোমান বিন মাকরান। 'সুত' কে "সুখত" ভেবে তিনি চিৎকার করে বললেনঃ 'পারেস বাস সুখতন্দ।' 'পারস্য ধ্বংস হয়ে গেছে।'

মাদায়েনের ওমরা এবং মজুসী পূজারীদের ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। কিন্তু এ অহংকারী তরুণ শাহানশাহের সামনে কিছু বলার সাহস হল না কারো।

ঃ 'তোমরা এ মুলুকে এসেছ কেন?' প্রশ্ন করলেন শাহানশাহ্।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মহানবীর আবির্ভাব এবং দ্বীনের শিক্ষা তুলে ধরে নোমান বিন মাকরান বললেনঃ 'সে দ্বীনের প্রচারক আমরা, মুর্খতা আর গোমরাহীর আঁধার থেকে যে নাজাতের পথ দেখিয়েছে আমাদের। যদি তোমরা আমাদের দাওয়াত গ্রহণ কর, ফিরে যাব। তোমাদের পথ দেখানোর জন্য রেখে যাব আল্লাহর কিতাব। যতদিন এর ওপর আমল করবে, তোমাদের হুকুমতে হস্তক্ষেপ আমরা করব না। যদি ইসলামের দাওয়াত কবুল না কর, তাহলে "জিজিয়া" কর দেবে। অন্যথায় আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে তরবারী।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল ইাজদগির্দের চেহারা। হুংকার দিয়ে তিনি বললেনঃ 'তোমাদের চেয়ে বর্বর এবং নিঃস্ব কওম আমি আর দেখিনি। তোমরা কখনো বিদ্রোহ করলে এখান থেকে হুকুম পাঠাতাম জমিদারদের। তোমাদের চামড়া ওরা তুলে নিত। ইরানে আরবদের স্মরণ করা হয় দু'নামে। ব্যবসায়ী এবং ভিক্ষুক। জানোয়ারের গোশত ছিল তোমাদের খাদ্য। লবনাক্ত পানি পান করতে তোমরা। পরতে উটের শক্ত পশমের তৈরী লেবাস। এখন ইরানের মিষ্টি পানির স্বাদ পেয়েছ। পছন্দ হয়েছে এ জমিনের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় যদি এসে থাক, তবে, ক্ষমাই শুধু করব না বরং খাদ্যে বোঝাই করে দিতে প্রস্তুত তোমাদের উটগুলো। কিন্তু মনে রেখ, আমাদের উদারতার সম্মান না রাখলে কোন শক্তিই আমাদের গজব আর প্রতিশোধ থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবে

না।'

অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল দরবারে। বিজয়ীর দৃষ্টিতে ওমরাদের দিকে চাইতে লাগলেন ইয়জদগির্দ। আচানক মুগীরা বিন শোবা উঠে দাঁড়ালেন। বললেনঃ 'অহংকারী বাদশাহ! এরা আরবের শরীফ লোক। শরীফ লোকেরা এমন কথার জওয়াব দেন না। কিন্তু তোমার প্রতিটি কথার জওয়াব আমি দিতে পারি। এরা থাকবে তার সাক্ষী। আমাদের অতীত সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তার সবটাই সত্যি। আমরা ছিলাম বর্বর এবং গোমরা। ভাল মন্দের কোন পার্থক্য ছিল না আমাদের। পান করতাম একে অপরের খুন। জিন্দা করব দিতাম মেয়েদের। আমাদের অসহায়ত্বে দয়া হল আল্লাহর। নবী (সঃ) কে পাঠালেন আমাদের হেদায়েতের জন্য। দ্বীনে হকের সাথে আমাদের পরিচিত করালেন তিনি। তিনি যা বলতেন, যা করতেন, খোদার হুকুমে করতেন। সারা দুনিয়ায় খোদার দ্বীন ছড়িয়ে দিতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ দ্বীন যে কবুল করবে সে আমাদের ভাই। আমাদের মতই তার অধিকার। যারা ইসলাম কবুল না করে জিজিয়া দেবে, ওরা থাকবে আমাদের আশ্রয়ে। এ দুটোর একটাও যারা মানবে না, তাদের জন্য রয়েছে আমাদের তলোয়ার।'

হুংকার দিয়ে উঠলেন ইয়াজদর্গিদ। বললেনঃ 'দূতকে কোতল করা বৈধ হলে জিন্দা ছেড়ে দিতাম না তোমাদের।'

ঃ 'মৃত্যু ভয় থাকলে এখানে আমরা আসতাম না।' জওয়াব দিলেন মুগীরা।

হতবাক হয়ে দরবারীরা দেখতে লাগল বাদশার ক্রোধ বিবর্ণ চেহারা। মসনদের পাশে সশস্ত্র পাহারারত এক বলিষ্ঠ নওজোয়ানকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন তিনি। কানে কানে কি যেন বললেন তাকে। দ্রুত বেরিয়ে গেল পাহারাদার। খানিক নীরব থেকে প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ 'তোমরা তো বড়ই নাদান। কিন্তু তোমাদের এ দৈন্যতায় আফসোস হচ্ছে আমার। ঠিক আছে, এমন তোহফা তোমাদের দেব, যা তোমাদেরই উপযুক্ত।'

দূতরা চাইতে লাগলেন পরস্পরের দিকে। একটু পর মাটি ভরা টুকরী তাদের সামনে রেখে দিল গোলামরা। ইয়াজদগির্দ নির্দেশ দিলেনঃ 'যে ব্যক্তি নিজকে বেশী সম্মানিত মনে করে, এ মাটি তুলে দাও তার কাঁধে। এরপর হাঁকিয়ে দাও মাদায়নের বাইরে।'

দরবারীদের ঠোঁটে দেখা গেল মুচকি হাসি। আচানক এগিয়ে এলেন আসেম বিন আমর। মাটি ভরা টুকরী কাঁধে নিতে নিতে বললেনঃ 'এদের সবার চেয়ে সম্মানিত আমি।'

সভাসদদের মৃদু হাসি রূপ নিল অট্টহাসিতে। সংগীদের নিয়ে হাঁটা দিলেন আসেম। দর্শকদের মনে হচ্ছিল মাটিকে ওরা ফুল মনে করছে। কিসরার দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন তারা। ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে।

মাটি ভরা টুকরী ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আসেম বললেনঃ 'ইয়াজদগির্দ ইরানের মাটি দিয়েছে আমাদের। সা'দের জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপহার আর কি হতে পারে! এবার এখান থেকে বেরোনো চেষ্টা করা দরকার।' বলেই ঘোড়া হাকালেন তিনি।

এক ঘন্টা পর। মহলের এক কামরায় সে সব মোসাহেবদের মাঝে বসেছিলেন ইয়াজদগির্দ, সব শাহানশাহের প্রতিটি কাজকেই প্রশংসা দিয়ে যারা ঢেকে রাখে। বাদশাহর বুদ্ধিমত্তায় পঞ্চমুখ হল ওরা। যার কারণে মাটি ভরা টুকরী কাঁধে ফিরে গেছে সা'দের দুত। কামরায় প্রবেশ করল রুস্তম। থেমে গেল চাটুকার এবং জী-হুজুরদের অট্টহাসি।

ঃ 'আলীজাহ।' কুর্ণিশ করে বলল রুস্তম। 'আপনার এজাযত ছাড়াই হাজির হয়েছি এ জন্য ক্ষমা প্রার্থী। মুসলমাদের প্রতিনিধিদলের সংবাদ আমি পেয়েছি। আফসোস, সঠিক সময়ে আসতে পারিনি।'

ঃ 'এখানে আসার কোন দরকার ছিল না তোমার।'

ঃ 'আলীজাহ, আজই আমি ফিরে যাব।'

ঃ 'সে ভিক্ষুকদের সাথে কি ব্যবহার করেছি জান তুমি?'

ঃ 'না আলীজাহ, কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, এত শীঘ্র ফিরে গেল ওরা?'

ঃ 'তুমি এরে চয়ে বেশী আশ্চর্য হবে, ওরা যখন দরবার থেকে বেরিয়েছে, তাদের এক সম্মানিত ব্যক্তির কাঁধে ছিল মাটি ভরা টুকরী।'

ঃ 'মাটি ভরা টুকরী?'

ঃ 'হ্যাঁ, বুদ্দুরা ইরানের মাটিকেও উপহার মনে করেছে। আফ্‌সোস, ওদের সবাইকে এক, এক টুকরী দিতে পারিনি।'

স্মিত হাসলেন ইয়াজদগির্দ। উপস্থিত লোকদের অট্টহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল কামরা।

অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল রুস্তমের চেহারা। চিৎকার দিয়ে সে বললঃ 'আলীজাহ, আমাদের দুশমনকে আপনি মাটি দিয়েছেন?'

ঃ 'আমি কি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি?'

ঃ 'আলামপনা, এ ভাল করেন নি!' পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল রুস্তম।

বাইরে নেমে মুহাফিজ অশ্বারোহীদের সে বললঃ 'দুশমনের দূত এখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে মাটির টুকরী। তোমরা ওদের ধাওয়া কর। ছিনিয়ে আনবে মাটি ভরা টুকরী।'

ঃ 'মাটি ভরা টুকরী?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করল এক সালার।

খেঁকিয়ে উঠল রুস্তমঃ 'গর্দভ, সময় নষ্ট করো না। ওরা বেশী দূর যায়নি এখনো। বাড়ীতে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব আমি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল অশ্বারোহীরা। দিনের তৃতীয় প্রহরে ফিরে এসে রুস্তমকে বললঃ 'সা'দের দূতকে খুঁজে পাইনি আমরা।'

সন্ধ্যা। পাইনবাগানে পায়চারী করছিল মাহবানু আর ইয়াসমীন। গোলাম দৌড়ে এসে বললঃ 'সিপাহসালার রুস্তম এসেছেন। তার রথ দাঁড়িয়ে আছে দেউড়ীর বাইরে। তিনি বলেছেন, মিয়ানদাদের বোনের সাথে আমি দেখা করতে চাই। অনুমতি হলে ফটক খুলে দেব।'

পাংশু হয়ে গেল মাহবানুর চেহারা। ও প্রশ্ন করলঃ 'আমি এখানে, তুমি কি তাকে বলে দিয়েছ?'

ঃ 'বলার প্রয়োজন হয়নি। আপনি এখানে থাকেন, জানেন তিনি। তার এক সংগী দরজার কড়া নেড়ে বলল, মিয়ানদাদের বোনকে বল সিপাহসালার তার সাথে দেখা করতে চাইছেন। তার সাথে কথা না বলে দৌড়ে চলে এসেছি আমি। আপনার অনুমতি পেলে ফটক খুলে দেব।'

ঃ 'সে নিজে তোমার সাথে কোন কথা বলেনি?'

ঃ 'না, ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রথ। দরজার ছিদ্র পথে তাকে আমি দেখেছি।'

ঃ 'তোমার কি বিশ্বাস, সে-ই রুস্তম।' প্রশ্ন করল ইয়াসমীন।

ঃ 'হ্যাঁ, তাকে আমি চিনি।'

ঃ 'তার সাথে কত লোক আছে?' মাহবানুর প্রশ্ন।

ঃ 'তার সাথে মাত্র দুজন অশ্বারোহী।'

ইয়াসমীনের দিকে তাকাল মাহবানু। মিনতি ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠ থেকেঃ 'ইয়াসমীন, তার সাথে আমি কথা বলব না।'

ঃ 'কিন্তু সে ইরানের সিপাহসালার।'

ঃ 'তুমি তাকে বলে দাও, আমি অসুস্থ। না, বরং তাকে বল আমি কোন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছি। তোমার সাথে বাড়াবাড়ি করার সাহস করবে না সে। নানা এবং তোমার পিতাকে সে জানে।'

ঃ 'হয়ত তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছে।'

ঃ 'এতদিন পর হঠাৎ আমার প্রতি দয়া এলে ভাইজান তার সাথে থাকা উচিৎ ছিল। তার সামনে দ্বিতীয়বার অনুকম্পা প্রার্থনা করব না। আমি লুকুচ্ছি। তুমি তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো।'

গোলামের দিকে ফিরল মাহবানু। ঃ 'কি দেখছ তুমি। তাকে ইয়াসমীনের কাছে নিয়ে এসো। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে শুধু বলবে, সে এখানে নেই।'

ফিরে গেল গোলাম। ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানু, সে ইরানের সিপাহসালার।

আমাদের ঘর তল্লাশী করলে তো বাঁধা দিতে পারব না।'

ঃ 'ঘরে তল্লাশী চালালে তোমার নিষেধ করতে হবে না। ঘরেই আসব না আমি।'

ছুটে পাঁচিলের পাশে এক আনার বৃক্ষের আড়ালে লুকাল মাহবানু। খানিক পর রুস্তম এসে দাঁড়াল ইয়াসমীনের সামনে।

ঃ 'আপনি সরুশের কন্যা?'

ঃ 'জ্বী হ্যা?'

ঃ 'মাফ করুন, আপনার গোলাম বড় বেতমিজ।'

ঃ 'যদি জানতাম ইরানের সিপাহসালারের পদধূলি পড়বে এখানে, দরজার পাহারায় এক শিক্ষিত, ভদ্র ব্যক্তিকে রাখতাম। সে রকম গোলাম আছে আমাদের। বাজারে গেছে সে। হয়ত পাহারাদারকে ফটক বন্ধ রাখার তাগিদ দিয়ে গেছে।'

ঃ 'মিয়ানদাদের বোন কোথায়?'

ঃ 'ও তো মাদায়েনে আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছে। আসুন, ভেতরে তশরীফ রাখুন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রুস্তম জওয়াব দিলঃ 'আমি দারুণ ব্যস্ত। কিন্তু ও এখানে নেই আপনি নিশ্চিত?'

ঃ 'বিশ্বাস না হলে ঘরে তল্লাশী চালাতে পারেন।'

ঃ 'আমি তো কোন অপরাধীর খোঁজে আসিনি।'

ঃ 'ওকে কোন খবর দিতে চাইলে খুঁজে পাবার চেষ্টা করব। ক'দিন পরই হয়ত ও ফিরে আসবে।'

ঃ 'লড়াইয়ে যাচ্ছি আমি। অতীতে ওর ভাইকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাইনি। বিজয় শেষে ফিরে এলে কিছু কয়েদীকে মুক্ত করাই হবে আমার প্রথম কাজ। সে তালিকায় মিয়ানদাদ অবশ্যই থাকবে।'

একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ইয়াসমীনের চেহারায়। ধীরে ধীরে দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রু। বললঃ 'মাহবানুর ভাই বেকসুর। আপনারও প্রয়োজন এক ভাল সিপাই। যুদ্ধের ময়দানে ওফাদারীর প্রমাণ দেয়ার সুযোগ কি তাকে দিতে পারেন না?'

ঃ 'বিজয়ের আনন্দে তার অপরাধ ভুলে যেতে পারি হয়ত। বাকী শাস্তিও মওকুফ করে দিতে পারি। কিন্তু কয়েদ থেকে বের করে কোন দায়িত্ব দেয়া সম্ভব নয়।'

বসে গেল ইয়াসমীনের দীল। একটু থেমে রুস্তম বললঃ 'মিয়ানদাদকে মুক্ত করা হলে তার কারণ হবে, সে ঐ বালিকার ভাই, যার চোখের অশ্রু আমি সইতে পারি না। তাকে এ পয়গামও দিতে পার, লড়াই থেকে সোজা আসব তারই কাছে। আমাদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল যেন না থাকে এ চেষ্টা আমি করব।'

আশায় ভর করে ইয়াসমীন বললঃ 'তাকে কি আমি এ খোশ খবর দিতে পারি যে, লড়াই থেকে এসে তার ভাইকে আপনি অবশ্যই মুক্ত করবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ' যদি মনে করি মিয়ানদাদকে মুক্ত করলে ঘৃণার প্রাচীর উঠে যাবে আমাদের মাঝ থেকে, তবে জিন্দেগীর গুরুত্বপূর্ণ মুলনীতি পাল্টে দিতে আমি প্রস্তুত। মাহবানুকে বলতে পারেন, যাই হোক ভবিষ্যতের পরিস্থিতি, আমার দৃষ্টির আড়ালে থাকার প্রয়োজন হবে না ওর। রুদ্ধ দ্বারের কড়া নাড়াকে পছন্দ করিনা আমি।'

বুক ভরা আবেদন নিয়ে ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানুকে ক্ষমা করুন। ও এক বোনের পেরেশানী নিয়েই আপনার কাছে গিয়েছিল। হয়ত অশালীন ব্যবহার ও করেছে। তার ভাইয়ের উপকার করলে তাকে অকৃতজ্ঞ পাবেন না।'

ঃ 'তুমি তাকে এ পয়গাম দিতে পার, লড়াই থেকে এসে অশ্রুর পরিবর্তে তার ঠোঁটে দেখতে চাই মুচকি হাসি। হয়ত আবদার না করে ও আমায় হুকুম দিতে পারবে। তোমার নাম কি?'

ঃ 'ইয়াসমীন।' অশ্রু ভেজা কণ্ঠে বলল ও।

ঃ 'কাঁদছ তুমি? তোমাদের শান্তনার জন্য আমার এখানে আসাই কি যথেষ্ট নয়? মাহবানুকে গিয়ে বল, লড়াইয়ের ময়দান থেকে কয়েদখানায়ই তার ভাই নিরাপদে রয়েছে। ওখানে তার কোন কষ্ট হচ্ছে না। কথা দিচ্ছি, লড়াই থেকে ফিরে যখন এ ঘরের দিকে পা বাড়াব, ও থাকবে আমার সাথে।'

ঃ 'ইচ্ছে করলে ময়দানে যাওয়ার আগেও তাকে মুক্ত করতে পারেন।'

ঃ 'তাকে আবার ফৌজে শামিল করে নিলেই কেবল তা সম্ভব। তার জন্যই যদি হয় তোমার অশ্রু, লড়াইয়ের ময়দানের পরিবর্তে কয়েদখানার দিকে তাকিয়ে তার প্রতীক্ষা করলেই ভাল হবে। আজই আমায় সাবাত ফিরে যেতে হচ্ছে। যারা আমার সাথে কাদেসিয়া যাবে, তাদের মধ্যে হাজারো ব্যক্তি আর কোনদিন ফিরে আসবে না মাদায়েন। এরপরও তুমি এবং তার বোন যদি চাও কয়েদ থেকে ও ময়দানে চলে যাক, তাতেও আমি প্রস্তুত।'

পেরেশান হয়ে ইয়াসমীন বললঃ 'আপনাকে আমি বাধ্য করব না, লড়াইয়ের পর তাকে ছেড়ে দেবেন এ কথা দিলে তারই প্রতীক্ষায় থাকব আমরা।'

ঃ 'জানতাম না, এক দায়িত্বহীন ব্যক্তির জীবন পারভেজের নাতনী আর সরুশের বেটির কাছে এত প্রিয়।'

আচানক ইয়াসমীনের খেয়াল হল, ইরানের সিপাহসালারের সাথে কথা বলতে ও সাবধান হয়নি। কিছু বলতে চাইল ও। কিন্তু মুচকি হেসে টাঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল রুস্তম।

কতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ও। ছুটে এগিয়ে গেল আনার বৃক্ষের দিকে।

ঃ 'মাহবানু, মাহবানু লুকানোর দরকার ছিল না তোমার। রুস্তম কথা দিয়েছে লড়াই থেকে ফিরেই তোমার ভাইকে মুক্ত করবে।'

বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ আবার ঝাপসা হয়ে গেল।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ ছিল ইসলাম ও কুফরের এক প্রচন্ড লড়াই। আরব আজমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়েছিলেন এ লড়াইয়ে। জয় পরাজয় সম্পর্কে তারা ছিলেন পূর্ণ সচেতন। এ ছিল সে নাজুক পরিবর্তন, যেখান থেকে শতাব্দীর জন্য ঘুরে গেছে মানবতার ইতিহাসের গতি।

প্রায় ত্রিশ হাজার মুজাহিদ সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে পৌছে ছিল কাদেসিয়া প্রান্তরে। তার সাথে ছিলেন এমন সত্তুর জন সাহাবী, মহানবীর সাথে জঙ্গে বদরে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন যারা। তিনশজন ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা। মক্কা বিজয়ের সময় যারা হাজির ছিলেন, তাদের পরিমাণও ছিল অনুরূপ। ইসলামের বিজয় এবং নিজের জন্য শাহাদাত ছাড়া আর কোন আরজু এঁদের দীলে ছিল না। এরা ছিলেন সে রাজপথের দূর্লভ কাফেলা, যারা পেয়েছিলেন আল্লাহর কুদরতি সাহায্য।

এ লড়াইয়ের জন্য আমীরুল মুমিনীনের এতটা আগ্রহ ছিল, মদিনা থেকে কাদেসিয়া পর্যন্ত প্রতিটি মনজিলে চৌকি বসিয়েছিলেন তিনি। আমীরে লশকর প্রতিটি মনজিলে স্থানীয় কবিলার মুজাহিদদের দেখতে পেত তার প্রতীক্ষারত। ইরাক সীমান্তে প্রবেশ করে হযরত সা'দের দূত দৈনিক দুবার তৎপরতার সংবাদ জানাতো খলিফাকে। অবস্থার আলোকে লশকরের অভিযান, রসদ যোগান দেয়া, সিপাইদের ট্রেনিং, সালার নকীব এবং পতাকাধারীদের নিয়োগ এবং যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পেয়ে শ্রোতাদের মনে হত, তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন। সমগ্র আরবের হিম্মত এবং সাহসের প্রতিভূ ছিল এ লশকর। তাদের সাথে ছিল অনলবর্ষী বক্তা এবং বিপ্লবী কবি। যাদের অগ্নিময় ভাষায় টগবগ করত মুজাহিদদের খুন। কুদরত যাদেরকে মুনীব-ভৃত্য এবং জালিম-মজলুমের দুনিয়ায় ন্যায়-ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের পতাকা বুলন্দ করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, এ ত্রিশ হাজার মানুষ দৈহিক, আত্মিক, এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে ছিল সে মিল্লাতের সুষমা। এদের অতীতের পথ অতিক্রম করেছে বদর-হোনাইনের প্রান্তর। দজলা-ফোরাতের সামনের বিশালতায় তারা সে মঞ্জিলের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছিল, যেখানে ছিল দৃঢ়তা আর বিশ্বাসের আলো। কাদেসিয়া ছিল সে পথের ফটক, অনাগত ভবিষ্যতের বিজয়গুলো যেখানে অপেক্ষা করছিল তাদেরই জন্য। অনারবদের কাছে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল এ লশকর।

শাহী দরবারের সঙ্গী এবং জ্বী হুজুরদের তিরস্কার করে সাবাত ফিরে এলো রুস্তম। তার সন্দেহ এবার গাঢ় হল যে, গ্রহের প্রভাব ইরানের প্রতিকূলে। ইয়াজদগির্দ মুসলিম সিপাহসালারকে মাটি পাঠিয়ে দিয়েছে, এতে জ্যোতিষরাও কম পেরেশান ছিল না। বিভিন্ন অজুহাতে কাদেসিয়ার অভিযান মুলতবী করার চেষ্টা করল ওরা। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাবাতে ষাট হাজার অশ্বারোহী এবং একশো জংগী হাতীর অবস্থান মামুলী

ছিল না। আশপাশের এলাকা বরবাদ করে দিচ্ছিল এ লশকর। হাতী ঘোড়ার ময়লা ঢেকে ফেলছিল শস্যভরা ক্ষেত। আশপাশের কোন বস্তি, কোন ঘর সিপাইদের লুটপাট থেকে নিরাপদ ছিল না। কাদেসিয়ার পথের অন্য সব চৌকির অবস্থাও ছিল অনুরূপ, যেখানে রুস্তমের জন্য প্রতীক্ষা করছিল কিসরার ফৌজ।

গরীব অসহায় কৃষকরা অভিযোগ করছিল জমিদারের কাছে। জমিদার ঘরবাড়ী ছেড়ে ফরিয়াদ করছিল মাদায়েনের অলিগলিতে। এ পরিস্থিতি বেশী দিন বরদাশত করতে পারলেন না ইয়াজদগির্দ। অগ্রাভিযানের কঠোর নির্দেশ দিলেন তিনি রুস্তমকে।

অগত্যা সাবাতের দিকে যাত্রা করল রুস্তম। পথের মঞ্জিলে মঞ্জিলে নতুন সিপাই ও সালাররা শামিল হল তার সাথে। ষাট হাজার সিপাইয়ের মূল বাহিনী ছিল রুস্তমের নেতৃত্বে। সম্মুখে একশো জংগী হাতীর বহর। চল্লিশ হাজার সিপাইয়ের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল জালিনুসের হাতে। এদের সাথেও ছিল বিশটা হাতী। বায়ে ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং পচাঁত্তরটা হাতীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল মেহরান। সমপরিমাণ অশ্বারোহী এবং জংগী হাতী নিয়ে চলছিল হরমুজান। সমগ্র লশকরের সাহায্যে ছিল ত্রিশটি হাতী নিয়ে বিশ হাজার সিপাই। ফৌজের পেছনে রসদ সামান বোঝাই উট ও খচ্চরের সারি। বিরাণ ক্ষেত আর উজার বস্তি ছেড়ে এগিয়ে গেল অগুণিত ফৌজ। বাবেলের কয়েক ক্রোশ দূর দিয়ে নদী পেরোল ওরা। হীরা দলিত মথিত করে 'নহরে আতিকের' পাড়ে এসে থামল। ছাউনী ফেলল কাদেসিয়ার সামনে।

ইসলামী লশকরের পেছনে ছিল শাহপুরের পরিখা। পশ্চিমে সরে হীরা পেরিয়ে ফোরাতে গিয়ে মিশেছে এর একটা অংশ। খন্দকের পেছনে পর্বতমালা আর মরুপ্রান্তর, দক্ষিণ দিকে সরে আরবের বিশালতায় যা হারিয়ে গেছে।

ডানে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল কাদায় ভরা দুর্গম ঝিল সমূহ। সামনে নহর। গভীর ও প্রশস্ত। ওপারেই রুস্তমের ছাউনী। তারো আগে বয়ে যাচ্ছে ফোরাত নদী।

দু'দলের ছাউনীই ছিল নিরাপদ অবস্থানে। নহর আর পরিখার মাঝে বিরাট ময়দান নিজেদের নড়াচড়ার জন্য মুক্ত রাখতে চাইছিল মুসলমানরা। এ জন্য তাঁরা প্রথমেই লড়াই শুরু করতে চায়নি। রুস্তমের তাড়াহুড়া না করার কারণ, প্রথম থেকেই সে দূরে থাকতে চাইছিল লড়াই থেকে। তার ধারণা ছিল, কয়েক সপ্তাহ, অথবা কয়েক দিন পর রসদের ঘাটতি কাদেসিয়ার ময়দান ছাড়তে বাধ্য করবে মুসলমানদের। কিন্তু হযরত স'াদ নদী পার হতে বাধ্য করতে চাইলেন তাদের। তিনি আবার শুরু করলেন সে তৎপরতা, যার কারণে মাদায়েন এবং সাবাত থেকে এগিয়ে আসতে হয়েছে তাদের।

মুসলমানদের ঝটিকা বাহিনী মারপিট করে পৌঁছে যেত ইরানের উপকূলে। কখনো নদী পেরিয়ে ঢুকে যেত দুশমন ছাউনীতে। নহরের পুল ছিল মুসলমানদের কব্জায়। এতে ফায়দা তুলতে লাগল তারা। এসব তৎপরতা রুস্তমের দিনের আরাম এবং

রাতের ঘুম হারাম করে দিল। লড়াই শুরু করার জন্য যে সব হুকুম পেতে লাগল সে তাতে লড়াই থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফৌজকে হামলার জন্য তৈরী হতে নির্দেশ দিল রুস্তম। একই সাথে পয়গাম পাঠাল হযরত সা'দের কাছেঃ 'সন্ধি আলোচনার জন্য আপনার একজন বিশস্ত লোকের সাথে মোলাকাত করতে চাই।'

এ প্রস্তাব কবুল করলেন হযরত সা'দ। রবি বিন আমেরকে দিলেন এ দায়িত্ব।

পরদিন ঘোড়া ছুটিয়ে ইরানী ছাউনীতে প্রবেশ করল রবি বিন আমর। কুওৎ এবং শান শওকত প্রদর্শনের নির্দেশ লশকরকে দিয়ে রেখেছিল রুস্তম। রবির পথে দাঁড়ানো ছিল হাতী, অশ্বারোহী এবং পদাতিকের সারি। ছাউনীর মাঝখানে প্রকান্ড শামিয়ানা, রেশমের পর্দা আর মুক্তার ঝালরে সাজানো। শামিয়ানার মাঝে রুস্তমের সোনার কুরসী। কুরসীর উপরের চাদোয়ায় ঝুলছিল হীরা এবং মুক্তার ঝালর। মূল্যবান কার্পেট মোড়া মেঝে। ফরাশের উপর সাজানো দামী পাশ বালিশ। তাতে সোনালী কাজ করা রেশমী কাপড়ের গেলাফ। রুস্তমের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ দু'জন নওজোয়ান। ঝলমল করছিল তাদের শিরস্ত্রাণ আর বর্ম।

এ ছিল এক বিশাল সালতানাতের সাজ সরঞ্জামের উন্মুক্ত প্রদর্শনী। রবি বিন আমেরকে এসব দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছিল রুস্তম। কিন্তু দৃপ্ত পদে এগিয়ে এলেন তিনি। হা হয়ে গেল দর্শকরা। তার পরনে খসখসে মোটা লেবাস, যা একজন সাধারণ ইরানী সিপাইয়ের লেবাসের চেয়েও নিকৃষ্ট। পুরানো ভাংগা খাপে আবদ্ধ তলোয়ার। ঘোড়া ছুটিয়ে ইরানী লশকরের ব্যূহ ভেদ করে শামিয়ানার কাছে পৌছে ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। নেযা দিয়ে কার্পেট ছিদ্র করে আটকে দিলেন ঘোড়ার লাগাম। আসনের সামনে নেযা গেড়ে বসে পড়লেন রুস্তমের সামনে।

হতভম্ভ হয়ে গেল দরবারীরা। নীরবতা নেমে এল কক্ষে। রবিকে ধরে আসন থেকে নামিয়ে দিতে চাইল রুস্তমের মুহাফিজ ফৌজ। ছিনিয়ে নিতে চাইল তার হাতিয়ার। তিনি বললেনঃ 'যেচে পড়ে আসিনি তোমাদের কাছে, এসেছি তোমাদের দাওয়াতে। মানুষের খোদা হয়ে বসবে তোমরা, আমরা হাত জোড় করে দাঁড়াবো তার সামনে, আমাদের ধর্ম এর অনুমতি কাউকে দেয়নি। এখানে বসেছি, তোমাদের ভাল না লাগলে ফিরে যাব।'

লোকদের নিষেধ করল রুস্তম। নিজে সরে এল আসন থেকে। ঠোঁট কামড়ে বসে রইল দরবারীরা। কিন্তু রুস্তমের উপস্থিতিতে মুখ খোলার সাহস হল না কারো।

ঃ 'আমাদের দেশে কেন এসেছ তোমরা?' প্রশ্ন করল রুস্তম।

ঃ 'এ জমিন আল্লাহর, সৃষ্টির নয়। সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মাকসাদ। খোদার দ্বীন যদি তোমরা কবুল কর, এদেশ এবং এদেশের ধন সম্পদে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলে 'জিজিয়া' কর দিতে হবে তোমাদের। এতেও যদি আপত্তি কর, তবে ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব,

যতক্ষণ না বিজয় আসবে, অথবা পৌছব বেহেশতে।'

ঃ 'ভেবেছিলাম ইরানের লশকর দেখার পর এ সুখ-চিন্তা থাকবে না তোমাদের।'

ঃ 'ইরানী লশকর দেখে আমাদের জিহাদের শখ আরো বেড়ে গেছে।'

ঃ 'তোমাদের শর্তের ব্যাপারে সালতানাতের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে চাই।' বলল রুস্তম।

ঃ 'পরামর্শ করতে পার, কিন্তু শর্তের কোন পরিবর্তন হবে না।' একথা বলেই রবি বিন আমের দাঁড়িয়ে নেযা তুলে নিলেন।

শামিয়ানা থেকে যখন বেরোচ্ছিলেন, এক ইরানী অফিসার বললঃ 'ইরান জয় করার স্বপ্ন দেখছ এ তরবারী দিয়ে?'

ঃ 'তুমি শুধু কোষ দেখেছ তলোয়ার দেখনি।'

আচানক তিনি নিস্কোষিত করলেন তরবারী। বিদ্যুৎ খেলে গেল দর্শকদের চোখে।

এক সিপাই এগিয়ে ঢাল পেশ করে বললঃ 'জংগের ময়দানে ঝলকের চেয়ে তলোয়ারের ক্ষমতা দেখা হয় বেশী। এ ঢালটা কাটতে পারবে?'

স্মিত হাসলেন রবি। বিদ্যুতের চমক খেলে গেল, চোখের পলকে ঢালের কাটা খন্ড গিয়ে ফরাশে পড়ল। আরো দুজন নওজোয়ান পরপর এগিয়ে দিল ঢাল। রবির তলোয়ারের আঘাতে কেটে গেল সে দুটোও। এগিয়ে ঘোড়ার লাগাম তুলে নিলেন তিনি। লাফ মেরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বললেনঃ 'লড়াইয়ের ময়দানে তোমাদের আমরা নিরাশ করব না।'

পরদিন। রুস্তমের দাওয়াতে হযরত সা'দ রবির পরিবর্তে দূত হিসেবে পাঠালেন হুজাইফা বিন মুহসিনকে। রুস্তমের দরবারে রবির চেয়ে ভিন্ন হল না তার কথাবার্তাও। তৃতীয় দিন রুস্তমের অনুরোধে মুগীরা বিন শোবাকে পাঠিয়ে দিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। এবারও নিরাশ হল রুস্তম।

বিজয়ীর মত রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন মুগীরা। খানিক আলাপ হল তাদের মধ্যে। তাঁর দুঃসাহস আর হিম্মত অসহ্য লাগল রুস্তমের। আরবদের বিদ্রুপ করে সে বলল ঃ'ইরানের জংগী সরঞ্জামের কথা তুমি জান। দেখেছ আমাদের লশকরের পরিমাণ। যখন ইচ্ছে, তোমাদের এ সামান্য ফৌজ মিছমার করে দিতে পারি। এত শক্তিশালী হয়েও রহমদীল আর উদার হতে চাই আমরা। আমি অনুভব করছি, তোমরা নাংগা, ভুখা। লজ্জা ঢাকার কাপড় আর ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্য ইরান দিতে পারে তোমাদের। যদি তোমরা ফিরে যাও, অতীত তিক্ততা ভুলে তোমাদের সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।'

ঃ 'আমাদের ফিরে যাবার জন্য একটাই পথ– ইসলাম কবুল কর অথবা জিজিয়া দাও।'

ধমকে উঠল রুস্তম ঃ 'তুমি কি ধারণা কর, লড়াইয়ের পর বেঁচে থাকবে তোমরা?'

ঃ 'আমরা শুধু জানি, যে শহীদ হবে, সে পাবে জান্নাত। বেঁচে থাকবে যারা, ওরা হবে গাজী।' নিশ্চিন্তে জওয়াব দিলেন মুগীরা।

ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল রুস্তমের। গর্জে উঠল সেঃ 'তোমরা মৃত্যু কামনা করছো, কথা দিচ্ছি কাল সূর্য ডোবা পর্যন্ত কাদেসিয়ার ময়দানে তোমাদের লাশ ছাড়া কিছুই থাকবে না।'

ঘোড়ায় আরোহন হয়ে ইসলামী লশকরের পথ ধরলেন মুগীরা। ফৌজি সরদারদের রুস্তম বললঃ 'হায়, তোমাদের কেউ যদি বলতে পারত, জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে ওরা এত বেশী ভালবাসে কেন?'

ঃ 'জনাব'। এক সর্দার দাঁড়িয়ে বলল, 'পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।' এ আজনবী বুদ্দুর কথায় আপনি প্রভাবিত হবেন না। আপনার সামনে এ দুঃসাহস দেখানোর কারণ, দূত হওয়াতে কোন শাস্তির ভয় ওদের ছিল না।'

ঃ 'আমার শুধু ভয়, আত্মনিবেদিত এ লোকগুলোকে ক্ষুদ্র অথবা কমজোর মনে করার বোকামী করছো তোমরা।'

ফৌজকে তৈরী হওয়ার হুকুম দিল রুস্তম। পয়গাম পাঠাল হযরত সা'দের কাছেঃ 'তোমরা আমাদের দিকে আসবে, না পুল পেরোবার মওকা দেবে আমাদের?'

দূত ফিরে এসে বললঃ 'নহর পার হবে না ওরা। পুলের ব্যাপারে বলছে, নিজ শক্তিতে যা আমরা কব্জা করেছি তা ফিরিয়ে দেব না।'

নহরে বাঁধ দেয়ার হুকুম দিল রুস্তম। হাজার হাজার লোক মিলে রাতের মধ্যে নহরে তৈরী করল প্রশস্ত রাস্তা। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এগিয়ে গেল রুস্তমের লশকর। দুপুরের পূর্বেই ওপারে মুসলমানদের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়াল ওরা।

এ লড়াই নিয়ে অসম্ভব পেরেশান ছিলেন ইয়াজদগির্দ। মাদায়েনের মহল থেকে কাদেসিয়ার ময়দান পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের সারি। পরস্পরের কথা শুনতে পায়, এদ্দুর দুরত্ব ছিল ওদের মাঝে। প্রত্যক্ষদর্শীর আওয়াজ পথে দাঁড়ানো লোকদের মাধ্যমে সরাসরি পৌছে যেত কিসরার কান পর্যন্ত।

জরিদার লৌহবর্ম পরেছিল রুস্তম। মাথায় ঝলমলে শিরস্ত্রাণ, টগবগে ঘোড়ায় চড়ে লশকরের সারিগুলো চক্কর দিয়ে মূলবাহিনীর কাছে ফিরে এল সে। থামল সোনার কুরসীর পাশে রাখা জাতীয় পতাকার নীচে। বললঃ 'আজ দুশমনকে নাস্তানাবুদ করে দেব আমরা।'

মুহাফিজ ফৌজের এক নওজোয়ান বললঃ 'হ্যাঁ, যদি খোদার ইচ্ছে হয়।'

ঃ 'খোদা না চাইলেও হবে।' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল রুস্তম।

সব ময়দানে প্রথম সারিতে থাকতেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। সৈনিক জীবনের এ কঠিন পরীক্ষার সময় তিনি শ্বাতী এবং ফোঁড়ার কষ্টে চলাফিরা এবং ঘোড়ায় চড়তে পারছিলেন না। কাদেসিয়ার ময়দানে যখন শুরু হচ্ছিল আরব আজমের চূড়ান্ত লড়াই, এই মহাপ্রাণ কিছুতে ঠেস না দিয়ে দাঁড়াতে অথবা বসতে পারতেন না। মুসলিম ছাউনীর পাশে পুরনো এক বাড়ীর ছাদে বালিশে হেলান দিয়ে দেখছিলেন তিনি ময়দানের অবস্থা।

ময়দানে খালিদ বিন আরতাকাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করলেন তিনি। তার পয়গাম পৌছানোর জন্য মহলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত নকীব।

সীমাহীন প্রশান্তি নিয়ে জোহর আদায় করলেন মুজাহিদরা। আমীরে লশকরের হুকুমে দুশমনের সামনেই দাঁড়ালেন কাঁতার বেঁধে। সুললিত কণ্ঠে কোরানে পাক তেলাওয়াত করলেন ক্বারীরা। কবিরা আগুন ঝরা কবিতা এবং বক্তারা অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে ইসলামী লশকরে সৃষ্টি করল এক বিপ্লবী জোশ ও জেহাদী জযবা।

তিনবার তকবীর বললেন হযরত সা'দ। আগ-পিছের সকল সারি থেকে নকীবেরা বুলন্দ করল তকবীর ধ্বনি। সিপাহসালার চতুর্থবার তকবীর বলতেই শুরু হল লড়াই। প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য ময়দানে নামল দু'দল। ইসলামী লশকর থেকে গালিব বিন আবদুল্লাহ আল আসাদী, ওমর বিন মা'দিকারব এবং আসেম বিন আমর তমিমী এগিয়ে এলেন। তিন পালোয়ান বেরিয়ে এল ইরানী লশকর থেকে। গালিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হল শাহজাদা হরমুজ। তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে নেযা উঁচিয়ে ধেয়ে এল সে। প্রথম আঘাতেই যখমী হয়ে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ল হরমুজ। আবার উঠার চেষ্টা করছিল, গালিব ঘুরে তার সিনায় রাখলেন নেযার অগ্রভাগ। দু'হাত উপরে তুলে উঠে দাঁড়াল হরমুজ। তাকে হত্যা না করে হাঁকিয়ে নিজের লশকরে নিয়ে এলেন গালিব।

ইরানী লশকরের শ্রেষ্ঠ বীর ছিল আমর মাদিকারবের প্রতিদ্বন্দ্বী। গায়ে রেশমী জুব্বা। সোনার বেল্ট এবং হাতে সোনার চুরি পরে ময়দানে এল সে। তার প্রথম তীর আমর মাদিকারবের বর্মে আটকে রইল। ময়দানে ধূলির ঝড় তুলে এগিয়ে গেলেন মুসলিম শাহসওয়ার। তীর ফেরালেন ঢাল দিয়ে। ইরানী পালোয়ানের কোমর পেঁচিয়ে উপরে তুলে সজোরে আছাড় মারলেন মাটিতে। চোখের পলকে তলোয়ারের এক ঘায় তাকে পৌছে দিলেন মৃত্যুর দুয়ারে।

আসেম বিন আমর তমিমীর খ্যাতি পৌছে ছিল কিসরার প্রাসাদ পর্যন্ত। রণসংগীত গাইতে গাইতে ময়দানে বেরিয়ে এলেন তিনি। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল প্রতিদ্বন্দ্বী। দুশমনের প্রথম সারি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন তাকে। ফিরতেই দেখলেন এক ইরানী খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রুস্তমের খাদ্য সামগ্রী। ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে পৌছলেন আসেম। পালিয়ে গেল ইরানী। খচ্চর হাকিয়ে তিনি নিয়ে এলেন লশকরের কাছে।

পর পর দু'দলের আরো কয়েকজন বাহাদুর ময়দানে এল কিন্তু ব্যক্তিগত বাহাদুরীতে মুসলমানদের পাল্লা ভারী দেখে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল রুস্তমের, সে 'আম-লড়াইয়ের' হুকুম দিল লশকরকে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে ছাদে বসেই লড়াইয়ের অবস্থা দেখছিলেন হযরত সা'দ। শারীরিক কষ্টের কারণে কখনো বুকের নীচে বালিশ রেখে উপুড় হতেন তিনি। কখনো বসতেন হেলান দিয়ে। নতুন হুকুম দেয়ার দরকার হলে কাগজে লিখে ছুঁড়ে মারতেন নিচে অপেক্ষমান নকীবদের দিকে। লশকরের বিভিন্ন সর্দাররা ঘোষকদের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছিল তার সে নির্দেশ।

লড়াইয়ের শুরুতে বীর বিক্রমে এগিয়ে গেল বনু বজিলার শাহসওয়াররা। বরবাদ করে দিল তারা দুশমন সারি। কিন্তু একটু পরই তাদের সামনে হাতীর প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিল ইরানীরা। মুহূর্তে যুদ্ধের পট পাল্টে দিল ওরা। পাহাড়ের মত হাতীগুলো দেখে পিছু হটতে লাগল আরবদের ঘোড়া। বজিলার অশ্বারোহীরা ঘোড়া থেকে নেমে হাতীর পথ আটকাতে চাইল, কিন্তু সম্ভব হল না। হযরত সা'দ আসাদ কবিলার অশ্বারোহীদের হুকুম দিলেন তাদের সাহায্য করতে। আল্লাহু আকবার বলে ওরা টুটে পড়ল হাতীর উপর। তাদের নেযা আর বর্শা থামিয়ে দিল হাতীগুলোর গতি। কিন্তু একটু পরই আরেকদল হাতী এগিয়ে এল সামনে। বনু বজিলা এবং বনু আসাদের জানবাজরা তখন বিপজ্জনক অবস্থায়। বনু তমীমকে হযরত সা'দ নির্দেশ দিলেন বনু আসাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে। বদলে গেল যুদ্ধের গতি। মুসান্না বিন হারেসার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন হযরত সা'দ। তার কাছে বসেছিলেন তিনি। হযরত সা'দের চেয়ে তিনিও কম পেরেশান ছিলেন না। বনু আসাদের মুজাহিদদের দুশমনের হাতী ধাওয়া করছে দেখে বারবার তিনি বলছিলেনঃ 'আফসোস, মুসান্না আজ নেই।'

লড়াইয়ের অবস্থা এবং নিজের কষ্টের কারণে প্রথম থেকেই যথেষ্ট পেরেশান ছিলেন হযরত সা'দ। রেগে সালমার মুখে আচম্বিত চড় কষলেন। কিন্তু ভয় পেলেন না এ নির্ভীক মহিলা। স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললেনঃ 'এ বুজদীলী, এ অহমিকা!'

লজ্জায় নুয়ে এল হযরত স'াদের দৃষ্টি। ঘামে ভিজে উঠল কপাল। বললেনঃ 'সালমা, তুমিও যদি আমার অসুস্থতা না বোঝ, অন্যেরা বুঝবে কি ভাবে?'

বনু তমীম আসেম বিন ওমরের নেতৃত্বে পৌছল বনু আসাদের সাহায্যে। তীর বৃষ্টি আর নেযার আঘাতে হাতীর মুখ ফিরিয়ে দিল তারা। উল্টে দিল হাওদা। দুর হল হযরত সা'দের পেরেশানী আর সালমার দুঃখ। তার কণ্ঠ থেকে বের হল মুজাহিদদের প্রশংসাধ্বনি।

হাতী সরিয়ে মুসলমানদের আবেগ উচ্ছ্বাস চরমে পৌছল। এক সালার নিজের পতাকা অন্য সালারের আগে এবং এক কবিলার রইস নিজেদের যুবকদের অন্য কবিলার জওয়ানদের সামনে দেখতে চাইলেন। নকীব ও কবিরা লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল

তাদের। আর ওরা, ডানে, বাঁয়ে এবং সম্মুখে এগিয়ে হামলা করতে লাগল।

লশকরের আধিক্য এবং সাজ সরঞ্জামের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও, আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালাতে লাগল ইরানীরা। তারা ভেবেছিল, ত্রিশ হাজার সিপাইয়ের হিম্মত টিকবে না বেশীক্ষণ। অন্তিম আঘাতের সময় তাজাদম অশ্বারোহীদের ময়দানে নিয়ে আসবে। লড়াইয়ের দীর্ঘ সূত্রিতায় ওরা পেরেশান ছিল না। এক সারি ভেংগে গেলে দু সারি এসে দাঁড়াত। এক সিপাই পড়ে গেল ওখানে পৌছত চারজন তাজাদম সিপাই।

কাদেসিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ঢেকে যাচ্ছিল রাতের আঁধারে। কিন্তু লড়াইয়ের প্রচন্ডতা কমলো না মোটেও। যখন গাঢ় আঁধারে ঢেকে গেলে ময়দান, শত্রু মিত্র পার্থক্য করা হয়ে উঠল দুষ্কর, ধীরে ধীরে কমে এল লড়াইয়ের তীব্রতা, এক সময় খামোশ হয়ে গেল সমগ্র ময়দান।

হযরত সা'দের নির্দেশে ময়দানের পাশেই দাফন করা হল শহীদদের লাশ। নারী, শিশু আর আহতদের পাঠিয়ে দেয়া হল 'গরীবের ছাউনিতে।'

প্রভাত। ফজরের নামাজ শেষে মহলের ছাদে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের পাশে জমায়েত হতে লাগলেন লশকরের সর্দাররা। সিঁড়ি ভেংগে ছাদে পৌছল হাসান। তাকে দেখেই সিপাহসালারকে মুয়ান্না বললেনঃ 'ইয়া আমীর! হাসান এসে গেছে। দুশমনের সঠিক খবর এবার আমরা পাব।'

এগিয়ে গেল হাসান। পথে দাঁড়ানো সবাই এদিক ওদিক সরে তার পথ করে দিল।

তাকে দেখেই হযরত সা'দ প্রশ্ন করলেনঃ 'দুশমন ছাউনীতে গিয়েছিলে তুমি?'

ঃ 'জ্বী, রাতে লড়াই খতম হতেই ওখানে পৌছেছিলাম আমি।'

ঃ 'ফিরেছ কখন?'

ঃ 'এইমাত্র। আমাদের পাহারাদারের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভোরের প্রতীক্ষা করতে না হলে নামাজের পূর্বেই পৌছতে পারতাম।'

ঃ 'ইরানীর লেবাসে ওখানে গিয়েছিলে?'

ঃ 'রাতে এক ইরানীর জুব্বা এবং শিরস্ত্রাণই যথেষ্ট ছিল আমার জন্য। এক যখমীকে কাঁধে তুলে নিলাম আমি। ফেরার সময় পাহারাদার বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। ওদের ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম আমি। পাহারাদার যখন তীর চালাতে চাইল, আমি তখন অনেক দূরে।'

ঃ 'কি সংবাদ নিয়ে এসেছ?'

দুশমনের যদ্দুর ক্ষতি হয়েছে, সাহায্য পৌছেছে তার চেয়ে বেশী। অবশ্য সাহস ও মনোবল অনেকটা কমে গেছে ওদের। আজ কোন হাতী ময়দানে নামাতে পারছে না, এ জন্যই ওরা বেশী পেরেশান। তাছাড়া একটা হাতীরও হাওদা নেই। খুব তাড়াহুড়া

করলেও দুপুরের আগে নতুন হাওদা তৈরী করতে পারবে না।'

ঃ 'আমার সন্দেহ ছিল ভোরের আজান শুনেই ওরা হামলা করবে।'

ঃ 'আমার ধারণা সূর্যোদয়ের দু-এক ঘন্টা পর ময়দানে আসতে পারে। এখনো খানা খায়নি ওরা।'

আরো কিছু প্রশ্ন ছিল হযরত সা'দের মনে। কিন্তু এক নওজোয়ান ছাউনীর পেছনে পাহাড়ের টিলার দিকে ইশারা করে বললঃ 'সম্ভবত সিরিয়া অথবা মদিনা থেকে কোন দূত আসছে।'

একত্রে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল শাহপুরের খন্দকের সামনের টিলার উপর। উঁচু পর্বতের সাথে মিশেছে এর পাহাড় শ্রেণী। দিগন্তে ধূলির মেঘ তুলে এগিয়ে আসছে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী। তার শিরস্ত্রাণ, ঢাল ও বর্ম রোদের আলোয় চিকচিক করছে। উপত্যকার আড়ালে চলে গেল ও। আবার দেখা গেল সামনের টিলায়। নিচে নামল অশ্বারোহী। পুল পেরিয়ে চকিতে থামল পাহারাদারদের কাছে। আবার দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে এগিয়ে এল মহলের দিকে।

ঃ 'এ অশ্বারোহী কা'কা ছাড়া আর কেউ নয়।' চিৎকার দিয়ে বলল আসেম বিন ওমর।

মহলের কাছে পৌছে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন কা'কা। ছুটে গেলেন সিঁড়ির দিকে। মুহূর্তে সিঁড়ি টপকে হাজির হলেন হযরত সা'দের সামনে।

ঃ 'ইয়া আমীর। সিরিয়ার মুজাহিদদের পক্ষ থেকে সাহায্যের সওগাত নিয়ে এসেছি আমি। আবু ওবাইদ বিন জাররাহ্ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। হাশিম বিন ওকবার নেতৃত্বে দু'হাজার মুজাহিদ আগামীকালই এখানে পৌছে যাবে।'

ঃ 'কিন্তু .... তুমি একা এসেছ?'

ঃ 'না, আমার পেছনে আসছে এক হাজার জানবাজ। খানিক পরই পৌছে যাবে ওরা। লড়াই শুরু হওয়ার পরই ছোট ছোট দলে ওরা বেরিয়ে আসবে। বাকী পাঁচ হাজার পৌছবে আগামী দিন। আফসোস, একদিন পূর্বে আপনার খিদমতে হাজির হতে পারিনি।'

ঃ 'তুমি একদিন আগে হাজির হলে এতটা অসুস্থতা অনুভব করতাম না।'

হযরত সা'দ টেনে নিলেন ময়দানের নকশা। সিপাইদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে লাগলেন সালারদের। হাতীর প্রসঙ্গ এলে আসেমের দিকে ফিরে বললেনঃ 'হাসানের সংবাদ সঠিক হলে আজ হাতীর দলের সম্মুখীন হতে হবে না আমাদের। তার সংবাদ ভুল হলে আমার বিশ্বাস বনু তমীরের নেযা আর তীরই এ ভয়ংকর জানোয়ারগুলোর মুখ ফিরিয়ে দিতে পারবে।'

ঃ 'বনু তমীম আপনাকে নিরাশ করবে না।' বলল আসেম।

ঃ 'আসেম, ইরানীদের হাতীর চেয়ে আমাদের উট বেশী ভয়ংকর দেখাবে আজ।'

বললেন কা'কা।

ঃ 'উট ময়দানে আনতে চাও তুমি?' আমীরে লশকরের প্রশ্ন।

ঃ 'হ্যাঁ। চাদর দিয়ে ঢেকে ওদের আমরা দুশমনের হাতীর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক বানাতে পারি।'

সার বেঁধে দাঁড়াল দু'দল। হাসানের ধারণাই ঠিক হল, ময়দানে ছিল না ইরানীদের জংগী হাতী। তবু দিগন্তব্যাপী ছড়িয়েছিল রুস্তমের বিরাট লশকর। মূল বাহিনীর মাঝে সোনার কুরসীতে বসে আছে রুস্তম।

আজো লড়াইয়ের সূচনা হল দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে। 'জসর' যুদ্ধের হিরো বাহমান এগিয়ে এল ইরানী লশকর থেকে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন কা'কা বিন ওমর। দিগন্তে ধূলির মেঘ তুলে পৌছলেন তার নিকটে। দুই বীরের মোকাবিলা। আরব আজমের সিপাহী সুলভ সবগুলো গুণের অধিকারী দু'জনই। নেযার আঘাত ঠেকিয়ে পাশ কেটে গেলেন পরস্পর। ঘুরে নেযা ছুড়ে তরবারী বের করলেন কা'কা। চোখের পলক মাত্র, বাহমানের লাশ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইসলামী লশকর থেকে উচ্চকিত হল আল্লাহু আকবারের তাকবীর ধ্বনি। হতবাক হয়ে গেল ইরানী ফৌজ। দুশমনের সামনে চক্কর দিলেন কা'কা। বুলন্দ আওয়াজে বললেনঃ 'তোমাদের মধ্যে আর কার মওতের খায়েশ রয়েছে এগিয়ে আসো।'

পরপর ক'জন নামকরা ইরানী পালোয়ান এল ময়দানে। সবাইকে হত্যা করলেন কা'কা বিন আমর। দক্ষিণ পশ্চিমের পর্বতের আড়াল থেকে ভেসে উঠল সিরিয়ায় প্রথম মুজাহিদ দল। বিরতি দিয়ে দিয়ে ময়দানে পৌছার হুকুম তাদের দিয়েছিলেন কা'কা। উচ্ছসিত তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন মুসলমানরা। ডানপাশে চক্কর দিয়ে ওরা এসে পৌছল প্রথম সারিতে। সাথে সাথেই দুশমনের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কা'কা। জওয়াবী হামলা করল দুশমনের ডানের বাহিনী। শুরু হল প্রচন্ড লড়াই। একটু পরই দেখা গেল কা'কার লশকরের দ্বিতীয় দলকে। বাঁয়ে ঘুরে ওরাও এসে মিশল প্রথম দলের সাথে।

অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে নিস্তেজ ভাব দেখে বাঁয়ের সওয়ায়দেরকে হামলার হুকুম দিল রুস্তম। কিন্তু একটু পরই অভাবিত পরিস্থিতির মুখোমুখী হল ওরা। কাদিসের মহলের দিক থেকে আচানক বেরিয়ে এল উটের বহর। চাদর আর রশি দিয়ে যেগুলো বিকট করে রাখা হয়েছিল। পরস্পর বাঁধা ছিল দশটা করে উট। ওদের মনে হচ্ছিল চলমান প্রাচীর। তীরন্দাজ বসে ছিল তাদের পিঠে। চোখ ছাড়া উটের গোটা দেহই ঢাকা ছিল রশি, আর চাদরের বোরকায়।

উটগুলো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ময়দানে। ইরানী অশ্বারোহীরা যখন হামলা করত, প্রথম উট থেকেই তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হত ওরা।

উটের প্রাচীর দেখে ওদের ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতো।

অশ্বারোহীদের ফেলে পালিয়ে যেত পেছন দিকে। এ কৃত্রিম দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে এগোনো পিছানোর পূর্ণ সুযোগ ছিল মুসলমানদের। দুশমনের হামলার শক্তি খর্ব করার জন্য উটের সারিগুলো সহজেই এদিক ওদিক সরিয়ে দিত তারা। কিন্তু উটের মাঝে মুসলমানদের ব্যূহ ভেদ করার জন্য বিভিন্ন দলে ভাগ হতে হত ইরানী অশ্বারোহীদের। ভাগ হওয়াতে ওদের হামলার প্রচন্ডতা হারিয়ে যেত।

হামলার গতি ফিরিয়ে আনার জন্য পদাতিক ফৌজ এগিয়ে দিল রুস্তম। পুরো শক্তি নিয়ে লড়তে লাগল এরা। কিন্তু পেছনে দেখা দিল কা'কার আরো কতক দল। কাদেসিয়ার প্রান্তর ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। পাহাড় থেকে নেমে আসা মুজাহিদদের ইরানের প্রতিটি সিপাই সমান ভাবে দেখতে পাচ্ছিল। খন্দকের পাশে শেষ উপত্যকার আড়ালে যখন ঢাকা পড়ত একদল, দিগন্তের ধূলি মেঘ ঘোষণা করত আরেক দল কাফেলার আগমন সংবাদ।

প্রতিটি নতুন দলের আগমনে ইরানী ফৌজের বিহ্বলতাকে কাজে লাগাতেন কা'কা। নতুন উচ্ছ্বাস নিয়ে হামলা করতেন তাদের উপর। এ বাহাদুরের তরবারী যে ত্রিশজন দুশমনের খুনে রঙীন হল তার বেশীর ভাগই ছিল ইরানের ফৌজী সর্দার। আত্মনিবেদনের এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে তিনি একাই ছিলেন না। কাদেসিয়ার প্রতিটি মুজাহিদ দেখছিলেন নতুন স্বপ্ন। এমন একজনও ছিল না যার দীলে ছিল না শাহাদাতের তামান্না। এমনও ছিল না কেউ, যার ললাটে ছিল না বিজয়ের স্পন্দন। ধূলিমলিন চেহারা আর খুনরাঙ্গা জুব্বা নিয়েই ছুটছিল তারা বিজয় আর সাহায্যের মালিকের দিকে। পেছনে থাকতে চাইছিল না কেউ। কাদেসিয়ায় তাদের প্রতিটি কদমে জন্ম নিচ্ছিল ইনসানিয়াতের মর্যাদার অনুপম ও শ্বাশত কাহিনী।

মদ পানের অপরাধে বনু সকিফ গোত্রের নামকরা কবি আবু মোহজেনকে বন্দী করা হয়েছিল। কাদিসের মহলের নিচতলার এক কামরায় শৃংখলিত ছিলেন তিনি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ময়দানের অবস্থা।

সীমাহীন বেদনায় তিনি শৃংখলিত পা টেনে বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে। সিঁড়ি বেয়ে পৌছলেন ছাদে। হযরত সা'দের সামনে নতজানু হয়ে বললেনঃ 'ইয়া আমীর! আমার জিঞ্জির খুলে দিন। আমার ভাইদের লাশ জমিনে তড়পাচ্ছে, আমার হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে শিকল দিয়ে। আমার জন্য এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে!'

কিন্তু মদ পানের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশাবলী অত্যন্ত কঠোর। তার আবেদন কবুল করলেন না সিপাহসালার। শাসিয়ে নিচে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। নিরাশ হয়ে কবি মুহজেন সিপাহসালারের কাছে আবেদন জানালেন। কবিকে নিরাশ হতে হল এখানেও। খানিক পর নীচের কামরায় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছিলেন ময়দানে জংগের অবস্থা। যবান থেকে বের হচ্ছিল কবিতার এ চরণঃ

'হাত পা আমার শৃঙ্খলিত, অথচ

শাহ সওয়াররা ময়দানে তুলছে ধূলির ঝড়
খেলছে নেযা আর তলোয়ারের ঝংকারের তালে তালে
কেউবা রক্তলাল নিশান উড়িয়ে লুটে নিচ্ছে
শাহাদাতের তামান্না
আফসোস! আমার হাতে শিকল,
পায়ে শৃঙ্খল– অন্তহীন যাতনায় অনন্ত আঁধার।'

বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতার পংক্তিগুলো শুনছিলেন সালমা। আবু মোহজেনের পেরেশানীতে প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না তিনি। বেড়ি খুলে দিলেন তার। হযরত সা'দের হাতিয়ারে সেজে তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ময়দানে এলেন আবু মোহজেন। সারিগুলোর ডান থেকে বাঁয়ে চক্কর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনদের উপর। যেদিকে যেতেন তিনি উল্টে দিতেন দুশমনের সারি। কখনো ঢুকতেন দুশমনের ডানে, কখনো বাঁয়ে। চেহারা ছিল নেকাবে ঢাকা। মুসলমানরা ভাবল, সিরিয়া থেকে কা'কার মতই কোন আত্মনিবেদিত প্রাণ এসেছেন তাদের সাহায্যে। মহলের ছাদ থেকে এ দৃশ্য দেখে হযরত সা'দ বললেনঃ 'খোদার কসম! আবু মোহজেন বন্দী না হলে বলতাম এ অশ্বারোহীই আবু মোহজেন, আর ঐ ঘোড়া আমার।'

সন্ধ্যায় ফিরে এলেন আবু মোহজেন। ঘামে ভিজে গেছে ঘোড়ার দেহ। কয়েদখানায় ঢুকে বেড়ি পরছিলেন তিনি। হযরত সা'দের অবস্থা ছিল গতকালের চেয়ে কিছুটা ভাল। সালমার সাথে নেমে এলেন নিচে। ঘোড়ার দিকে এক নজর তাকিয়েই আবু মোহজেনের কামরায় প্রবেশ করলেন তিনি। এক বাহাদুর কবি হয়েও ভয়ার্ত চোখ দুটো নামিয়ে নিলেন আবু মোহজেন। সালমার দিকে তাকালেন সা'দ। এগিয়ে বললেনঃ 'আবু মোহজেন, বেড়ি পড়ার প্রয়োজন নেই। খোদার কসম, ইসলামের জন্য যে এত নিবেদিত প্রাণ, তাকে আমি শাস্তি দিতে পারি না।'

বেড়ি একদিকে ছুঁড়ে ফেললেন আবু মোহজেন। উঠে সিপাহসালারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'ইয়া আমীর, প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোন দিন শরাবে হাত দেব না।'

খানিক পর আবার ময়দানে ছুটে গেলেন তিনি।

রাত নেমেছে। কিন্তু লড়াইয়ের প্রচন্ডতা কমেনি মোটেও। ইরানীদের মূল বাহিনীর সারি তখনো অটুট। প্রথম সারির নিহত ও আহত সিপাইদের স্থান পূরণের জন্য পেছন থেকে তাজাদম সিপাই ময়দানে নিয়ে আসছিল ওরা। মুসলমানরা দারুণ শ্রান্ত। তবুও খোদায়ী সাহায্যের অবিচল একীন তাদের হিম্মত কায়েম রেখেছিল। মাঝ রাতে নিজ নিজ ছাউনীর দিকে হটে গেল দু'দল। ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এল ময়দান। দু'হাজার মুসলমান শাহাদাতের জাম পান করেছেন এ লড়াইয়ে, দুশমন নিহত হয়েছে প্রায় দশ হাজার।

রাতের বাকী অংশ পরদিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রইল দু'দলই।

দু'দিনের ক্লান্তিতে দু'দলই বুঝতে পেরেছিল আগামীকালের লড়াই হবে চূড়ান্ত। শেষ পর্যন্ত হিম্মত ধরে রাখতে পারবে যারা, বিজয় হবে তাদের। উৎকৃষ্ট রণসাজ এবং সমগ্র শক্তি জমায়েত করতে লাগল ওরা।

মাদায়েনের মহলে বসে প্রতি মুহূর্তে খবর পেতেন ইয়াজদগির্দ। রুস্তমের সাহায্যে নতুন ফৌজ পাঠাতেন তিনি।

ভোরে লড়াই শুরু হতেই সিরিয়ার বাকী লশকর এসে পৌছবে, এতটা আশা করেননি মুসলমানরা। কা'কার পরামর্শে কতক অশ্বারোহী দলকে ছাউনীর বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হল। তাদের বলা হল ভোরে লড়াই শুরু হতেই ছোট ছোট দলে পাহাড়ের আড়াল থেকে ময়দানে পৌছবে তোমরা। এ সময় হাসিম বিন ওকবার লশকর এসে পৌছলে তিনি এভাবেই আসবেন।

তৃতীয় দিনের প্রভাত। দু'দল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পরের সামনে দাঁড়াল। কা'কার নির্দেশ মত টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল অশ্বারোহী দল।

দৈত্যের মত এক ইরানী নেমে এল ময়দানে। নিহত হল একজন সাধারণ মুসলমানের হাতে।

শুরু হল লড়াই। তকবীর ধ্বনি তুলে হাশিম বিন ওকবার আগমন ঘোষণা করল নকীব। মুজাহিদদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পিছনের পাহাড়ের টিলার উপর। দিগন্তে ধূলি উড়িয়ে প্রথম অশ্বারোহী দলের লশকরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এলেন হাশিম বিন ওকবা। এগিয়ে গেলেন দুশমনের বায়ের সারিগুলোর দিকে। ব্যূহ ভেদ করে পৌছলেন মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে। গগন বিদারী তাকবীর ধ্বনিতে গর্জে উঠল কাদেসিয়ার ময়দান। সিরিয়ার মুজাহিদদের বাকী দলগুলো আসতে লাগল পরপর।

লশকরের মাঝে সোনার আসনে উপবিষ্ট রুস্তম। তার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বার বার ফিরে যাচ্ছিল সে টিলার দিকে, ধূলোর মেঘ যেখানে বার বার নতুন কাফেলার আগমন বার্তা ঘোষণা করছে। আচম্বিত পেরেশান হয়ে উঠল সে। হুকুম দিল 'আম হামলার।' কাড়ানাকাড়ার আওয়াজ বেজে উঠল ইরানী ফৌজে।

হাওদা মেরামত করে সবগুলো হাতী ময়দানে এনেছিল ইরানীরা। অতীত লড়াইয়ের আলোকে প্রতিটি হাতীর সাথে দিয়েছিল পদাতিকের সারি, যাতে হাতীরা বাঁচতে পারে মুসলমানের নেযা থেকে আর এদিক ওদিক হটাতেও না পারে।

কিন্তু ফল দেয়নি ইরানীদের এ পরিকল্পনা। তকবীর ধ্বনি তুলে এগিয়ে গেল মুসলমানরা। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে হামলা করল পদাতিকদের ওপর। এবার আপন পর চিনে নেয়া মুশকিল হল হাতীর জন্য। মাহুতকে পদাতিকদের সাথে থাকার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে কি করবে ভেবে পেল না ওরা।

আমর বিন মাদিকারব ঘোড়া থেকে লাফিয়ে হামলা করলেন একটা হাতী।

ইরানীরা ঝাপিয়ে পড়ল তাঁর উপর। এগিয়ে গেল মুসলমানদের একদল। দুশমনের ঘেরাও ভেংগে তার কাছে পৌছল। ততক্ষণে কয়েকটা আঘাত খেয়েছেন আমর। কিন্তু তার উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ল না একটুও। কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করে দুশমনের সারি পর্যন্ত পৌছলেন। আবার তাঁকে কাবু করার চেষ্টা করল। কিন্তু আমর এবং তার সংগীরা যেদিকে ফিরতেন শূন্য হয়ে যেত ময়দান। আচানক সম্মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক ইরানী। তার ঘোড়ার লেজ আকড়ে ধরলেন আমর। শত চেষ্টা করেও একচুলও নড়তে পারল না ঘোড়া। বাধ্য হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল অশ্বারোহী। লাফ মেরে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন আমর। এসে শামিল হলেন লশকরের সাথে। লড়াইয়ের তান্ডবতা চলছিল বাকী ময়দান জুড়ে। হাতীর সাথের পদাতিকদের দুরবস্থা দেখে ওদের হাতী ছাড়াই এগোনোর হুকুম দিল রুস্তম।

প্রথম দিনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন মুসলমানরা। তীরন্দাজ আর নোযাবাজরা কয়েকটা হাতীকেই আহত করলেন। কিন্তু এ চলমান পাহাড়গুলোর রোখ পাল্টাতে পারলেন না। পদাতিকদের পিছু হটিয়ে বড়ো বড়ো দুটা হাতী এগিয়ে দিল ওরা। একটা সাদা অন্যটা ধূসর। এ দুটো হাতী অতীতের কয়েকটা লড়াইয়েও অংশ নিয়েছিল। লোহার শিকল ছাড়াও এদের গলায় ছিল সোনার জিঞ্জির। বাকী হাতীর দল আসছিল এ দু'টোর পেছনে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছাদে বসে এ দৃশ্য দেখছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। বনু আসাদ এবং বনু তমীমকে তিনি পয়গাম পাঠালেন, এ দুটোকে ময়দান থেকে বের করার চেষ্ট কর।

বনু তমীম থেকে এগিয়ে এলেন কা'কা এবং আসেম বিন আমর। ঘোড়া থেকে নেমে সাদা হাতীর উপর হামলা করলেন। নিমিষে তার নেযা বিঁধল হাতীর চোখে। ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে নিচে ফেলে হাতীটি বন্য আক্রোশে ছুটতে লাগল এদিক ওদিক। কা'কা তকবীর তুলে তলোয়ারের এক ঘায়ে হাতীর মাথা থেকে শুড় আলাদা করে ফেললেন। বনু আসাদের দুই জানবাজ সেহাল এবং জবিল হামলা করলেন অন্য হাতীটাকে। চোখ ফুড়ে শুড় কেটে ফিরিয়ে দিলেন মুখ। মাহুত শূন্য হাতীগুলো এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল। পেছনের হাতীর দল পালিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু। কখনো মুসলিম, কখনো ইরানী সারিগুলো বরবাদ করে দিচ্ছিল ওরা। শেষ পর্যন্ত ইরানী সারিগুলো দলে পিষে ময়দান থেকে বেরিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল নদীতে। অন্য হাতীরাও ওদের পেছনে নদীতে লাফিয়ে পড়ে ওপারে চলে গেল। ওদের আবার ময়দানে আনতে ব্যর্থ হল ইরানীরা। হাতী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রচন্ড উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমানরা। ধূলার আবরণে ছেয়ে গেল কাদেসিয়ার ময়দান।

দ্বিপ্রহর। উপর্যুপরী হামলায় ব্যূহ ভেঙ্গে যাচ্ছিল ইরানীদের। ওদের সাহায্যে মাদায়েন থেকে পৌছে গেল তাজাদম ফৌজ। লড়াই জমে উঠল আবার।

তিনদিনের বিরতিহীন শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ওদের বাহুর শক্তি।

ঘোড়াগুলোও দারুণ ক্লান্ত। কিন্তু কোন দলই লড়াইয়ের ফয়সালা পরদিনের জন্য রেখে দিতে প্রস্তুত ছিল না।

ইরানীদের অগ্রবর্তী বাহিনী এবং ডান ও বাঁয়ের সারি বার বার ভেংগে যাচ্ছিল। কিন্তু মূল বাহিনী তখনো মুসলিম হামলা থেকে নিরাপদ। ত্রিশ হাজার সিপাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল রুস্তমের চারপাশে। তাদের আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা। মুসলিম হামলার উত্তাল প্রচন্ডতা এ লৌহ প্রাচীরের কাছে পৌছেই দুর্বল হয়ে যেতো।

ধূলি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে ডুবে গেছে সূর্য। রাত বিছিয়ে দিয়েছে আঁধারের কালো পর্দা। ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল দু'দল। নিঝুম হয়ে এল কাদেসিয়ার প্রান্তর। কিন্তু এ নিরবতা ছিল নতুন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস। পরিশ্রান্ত সিপাইদের যেমন প্রয়োজন ছিল বিশ্রামের, তেমনি তারা বুঝতেন, আগামী দিনের লড়াই হবে তিন দিনের চেয়ে ভয়াবহ। কাতার ভেংগে ময়দান ছাড়ল না কেউ। ইরানীরা চাইছিল মুসলমানরা আগে ছাউনীতে ফিরে যাক। ইরানীরা যাক আগে এ ছিল মুসলমানদের খাহেশ। সারাদিনের ক্লান্তিতে সিপাইদের চোখ মুদে আসছিল নিদ্রায়। বাহ্যত মনে হচ্ছিল খানিক অপেক্ষা করে দু'দলই ছাউনীতে ফিরে যাবে। লড়াই মুলতবী হয়ে যাবে আগামী দিনের জন্য।

কিন্তু বিজয় আর সাহায্যের মালিক মুসলমানদের জন্য খুলে দিলেন রহমতের দুয়ার। কতক নেতৃবর্গের তাড়াহুড়ায় এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হল, একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন উদ্দীপনা নিয়ে।

হযরত সা'দ জানতেন, প্রতি পলে মাদায়েন থেকে ইরানীদের জন্য সাহায্য আসতেই থাকবে। তিনি আমর বিন মাদিকারব এবং তুলাইহার নেতৃত্বে একদল সিপাই পাঠিয়ে দিলেন ময়দান থেকে একটু দূরে নহরের ঘাটে। নহর পেরিয়ে মুসলমানদের পেছন থেকে দুশমনের আক্রমণের ভয় ছিল সেখানে। বাকী লশকরকে হুশিয়ার থেকে তৃতীয় তকবীরের অপেক্ষা করার হুকুম দিলেন তিনি।

তুলাইহা এবং আমর বাঁয়ে ঘুরে নদীর ঘাটে পৌছলেন। দুশমনের কোন চিহ্নও নেই ওখানে। আমীরে লশকরের নির্দেশ মত বাকী রাত লুকিয়ে পাহারা দেয়া উচিত ছিল তাদের। কিন্তু নির্ভীক তুলাইহা কতক জানবাজকে নিয়ে নহর পেরোলেন। ইরানী ছাউনীর পেছন দিক থেকে হামলা করলেন রুস্তমের সংরক্ষিত ফৌজের উপর।

ঘাট থেকে একটু দূরে নদীর ওপারে বিশ্রাম নিচ্ছিল দুশমন ফৌজ। ইরানীদের প্রথম সারির হাকডাকের সাথে আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে কা'কা ভাবলেন, আমর এবং তুলাইহা দুশমনের আওতায় পড়ে গেছে। আমীরে লশকরের তকবীরের প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে তীর বৃষ্টি। বনু তমীমের জানবাজদের এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন তিনি। সমগ্র ইসলামী লশকর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনের ওপর।

অবস্থা বুঝে নিজের অজ্ঞাতে সিজদায় পড়ে গেলেন হযরত সা'দ। 'আল্লাহ, কা'কাকে ক্ষমা কর। সাহায্য করো তাকে।'

রাতের আঁধার আর ধূলার পর্দার আড়ালে কি হচ্ছে জানতেন না হযরত সা'দ। সিজদায় পড়ে তিনি দোয়া করতে লাগলেন মুসলমানদের বিজয়ের জন্য।

কাদেসিয়ার পূর্ব দিগন্তে ভেসে উঠল প্রভাতের আলো। আওয়াজ শোনা গেল কা'কা বিন আমরের।

ঃ 'মুজাহিদ! বিজয় শুধু তাদের ভাগ্যেই, অবিচল থাকবে যারা শেষ পর্যন্ত। কাতার সামলে নাও। প্রস্তুতি নাও হামলার।'

মাথা তুলে ময়দানের দিকে তাকালেন হযরত সা'দ। শেষ হয়ে গেছে রাতের লড়াই। কিন্তু গোটা ময়দান ধূলি মলিন। নতুন হামলার জন্য ব্যূহ সামলে নিচ্ছেন মুসলমানরা। নিজ নিজ দলের সামনে বাজছিল রণসংগীত। যে ভয়ংকর রাতকে ঐতিহাসিকরা বিষাদের রজনী বলে স্মরণ করেন, বিদায় নিয়েছে সে ভয়ংকর রাত। দুনিয়ায় নেমে এসেছে প্রভাত। এ সেই আলো, যার প্রভায় তামাম মাখলুক অবাক বিস্ময়ে দেখছিল খোদায়ী সাহায্যের অনুপম মোজেযা।

সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেক পর লড়াই শুরু হল আবার। উপর্যুপরী হামলায় ডান, বাম আর সামনের ব্যূহ ভেদ করে মুসলমানরা পৌঁছল ইরানীদের মূল বাহিনীতে। পারস্যবাসী যাদের দিয়ে বিজয় আশা করত, লড়াই শুরু হল ওদের সাথে।

নহরের পাশে তখতে বসে সর্দারদের নির্দেশ দিচ্ছিল রুস্তম। কা'কা বুলন্দ আওয়াজে বললেনঃ 'মুজাহিদ, রুস্তমের দিকে এগিয়ে যাও।'

সর্দাররা নিজ নিজ মুজাহিদদের এ আওয়াজ শুনিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনের ওপর। দুপুর পর্যন্ত চলল প্রচন্ড লড়াই। এর পরই ভাঙতে লাগল ইরানীদের সারি। মূল বাহিনীর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হল ডান বায়ের অশ্বারোহীরা।

একদল মুজাহিদ রুস্তমের মুহাফিজদের ব্যূহ ভেদ করে পৌঁছল তার কাছে। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে এল বাতাসের তীব্র ঝাপটা। রুস্তমের তাবু এবং সোনায় কাজ করা শামিয়ানা উড়িয়ে নিয়ে ফেলল নদীতে। এ ঝড়কে গায়েবী মদদ ভেবে মুসলমানরা আল্লাহু আকবার শ্লোগানে মুখরিত করে তুলল সমগ্র প্রান্তর।

ভীতি ছড়িয়ে গেল ইরানী লশকরে। তখ্‌ত থেকে নেমে কতক্ষণ হামলাকারীদের মোকাবিলা করল রুস্তম। পরিশেষে আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল ধূলি মেঘের ফাঁকে। মুসলমানদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লুকাল নহরের পাশে মাল বোঝাই এক খচ্চরের পেছনে। তখনও সুস্থির হতে পারেনি সে। মুজাহিদ বেলাল বিন আলকামা এসে হাজির।

তাকে দেখেই মাল বোঝাই খচ্চরের নিচে ঢুকে পড়ল রুস্তম। রশি কেটে মাল ফেলে দিলে বেলাল। বোঝা গিয়ে পড়ল রুস্তমের মাথায়। ওখান থেকে বেরিয়ে নহরে

ঝাঁপিয়ে পড়ল রুস্তম। বেলালও ঝাঁপ দিল নদীতে। দুপা ধরে টেনে নিয়ে এলো পাড়ে। তলোয়ারের এক আঘাতেই শেষ হয়ে গেল তার জীবন। তার সোনার তখতে দাঁড়িয়ে সংগীদের আওয়াজ দিয়ে বলল বেলালঃ 'কাবার রবের কসম! ইরানের সিপাহসালারকে আমি কোতল করেছি।'

চারদিক থেকে বিজয় ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল ময়দান। পালাতে লাগল ইরানী লশকর।

নদীর বাঁধের দিকে ছুটল ওরা। কিন্তু ধ্বসে গেছে মাটির বাঁধ। লৌহ বর্মের চাপে নদীতে ডুবে গেল হাজার হাজার ইরানী। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করল মুসলমানরা। পরাজয়ের গ্লানিতে এত কাবু হয়েছিল ওরা, একজন মুসলমান বিশজন কয়েদীকে হাকিয়ে নিয়ে আসছিল ভেড়ার পালের মত। রুস্তমের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হল ইরানের হাজার বছরের ঐতিহ্য। তাদের জাতীয় পতাকা তুলে হযরত সা'দের পায়েব কাছে এনে ফেললেন ফেরার বিন খাত্তাব।

শেষ হয়ে গেল লড়াই। শহীদদের দাফন আর আহতদের চিকিৎসায় লেগে গেলেন পরিশ্রান্ত গাজীরা। এ কাজে অংশ নিতে পেছনের ছাউনী থেকে এগিয়ে এলো নারী এবং শিশুরাও।

থেমে গেছে ঝড়, কেটে যাচ্ছে ধূলিমেঘ। কাদেসিয়ার ময়দানে ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের খুঁজছেন মুজাহিদরা। দুপুরের পর থেকে ভাইয়ের কোন খবর ছিল না হাসানের নিকট। আহত হয়েও বনু বকরের মুজাহিদদের সাথে অনেক দূর পর্যন্ত দুশমনের পিছু ধাওয়া করেছিল হাসান। সূর্য ডোবার খানিক আগে পাঁচশো কয়েদী নিয়ে পৌঁছল ও। মুয়ান্না বিন হারেসা খুলে নিলেন তার রক্তমাখা পোশাক। নিজ হাতে ব্যান্ডেজ করলেন বাহু এবং বুকের যখমে। তাবুতে শুইয়ে দিয়ে বললেনঃ 'এবার তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও। তোমার ভাইকে খুঁজে পেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'না, সোহেলকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। আপনার সাথে আমিও যাব।'

উঠতে চেষ্টা করল হাসান। কিন্তু দুর্বলতার কারণে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ও। শুয়ে পড়ল আবার। একটু পরই শ্রান্ত দেহে নেমে এল রাজ্যের ঘুম। যখন চোখ খুলল, ভোর হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে নয়, ও শুয়ে আছে একটা বড়সড় তাবুতে। আশপাশে শোনা যাচ্ছে আহতদের করুণ কাৎরানি। কয়েকজন নারী এবং কিশোর সেবা করছে তাদের।

ঃ 'আমি কোথায়?' ভয়ার্ত চোখে প্রশ্ন করল একজন মহিলাকে।

ঃ 'বাইরে রোদ। ওরা ভেতরে রেখে গেছে আপনাকে। ডাক্তার ব্যান্ডেজ খুলে আপনার যখম দেখে বলেছেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন। নামাজের পর মুয়ান্না, কা'কা এবং আসেম দেখতে এসেছিলেন আপনাকে। সাথে ছিল কতক ফৌজি

সর্দার।'

ঃ 'কিন্তু আমার ভাই? মুয়ান্না তার ব্যাপারে কিছু বলেন নি?'

ঃ 'ওদিকে দেখুন।' পায়ের দিকে ইশারা করে বলল মহিলা।

ঘাড় তুলে চাইল হাসান। পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সোহেল।

ঃ 'সোহেল, সোহেল।' হামাগুড়ি দিয়ে এগোল হাসান। ঝাঁকুনি দিতে লাগল তার হাত ধরে।

ঃ 'না, না, ওকে জাগাবেন্ না, ও খুব ক্লান্ত।' মহিলা বলল।

কিন্তু পাশ ফিরে চোখ মেললো সোহেল। মিশে গেল হাসানের বুকের সাথে।

ঃ 'সোহেল, তুমি ভাল আছ? আহত হওনি তো?'

ঃ 'ভাইজান আমি বিলকুল ঠিক।'

ঃ 'কোথায় ছিলে তুমি?'

ঃ 'ভাইজান, নদীর কাছে পৌছতেই মরে গেল আমার ঘোড়াটা। এগিয়ে গেলেন আপনি। পিপাসা অনুভব করলাম আমি। হাঁটা দিলাম নদীর দিকে। ওখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুই ইরানী। এক জনকে কোতল করলাম আমি। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যজন। পানি পান করলাম। খানিক বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম ঝোপের মধ্যে। কিন্তু নিদ্রা এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। শেষ রাতে ঘুম ভাঙতেই ফিরে এলাম। মুয়ান্না বিন হারেসা আপনার কাছে পৌছে দিলেন আমায়। বাইরে আপনার পাশে বসেছিলাম ভোর পর্যন্ত। রোদ তীব্র হলে আপনার দোস্তরা আপনাকে এখানে নিয়ে এলেন।'

কাদেসিয়ার মুজাহিদ সা'দ বিন আবি আমিলাকে বিজয়ের সংবাদ শোনাতে আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন হযরত সা'দ। উটে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পথের শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করছিলেন তিনি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই দেখা গেল ইয়াসরিবের খর্জুর বীথি। আনন্দে নাচতে লাগল তার হৃদয়।

অনুমানের দু'দিন আগেই সফর শেষ করলেন সা'দ। সে পবিত্র শহরে দাখিল হতে যাচ্ছিলেন তিনি, আল্লাহর রাসূলের মেহমানদারীর সৌভাগ্য হয়েছিল যার বাসিন্দাদের। কাদেসিয়ার মহান বিজয়ের সংবাদ নিয়ে যেতে পেরে তিনি যেমন খুশী, তেমনি খুশী সে মহান ব্যক্তির সাথে কথা বলার সৌভাগ্য তার হবে, যিনি মাশরিক আর মাগরিবের সমস্ত সম্রাটদের অহংকার ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন।

ফারুকে আজমের সুরতহাল এবং দরবারে খিলাফতের শান শওকতের অগনিত ছবি আঁকা ছিল তার হৃদয়পটে। তার সাথে কথা বলার উপযুক্ত শব্দ খুঁজছিলেন তিনি সারা পথ। মদিনার প্রথম ঝলক দেখে সে কথাগুলোই আওড়াচ্ছিলেন মনে মনে।

রাস্তার পাশে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল একা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। হাতের ইশারায় সা'দকে থামাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু মুহূর্তের দেরীও সইছিল না

তার। তাড়াতাড়ি চূড়া থেকে নেমে এল আগন্তুক। তার পথ আগলে বললঃ 'কোথেকে এসেছ তুমি?'

ঃ 'কাদেসিয়া থেকে।' বেপরোয়া জওয়াব দিলেন সা'দ। কষে চাবুক মারলেন উটের পিঠে।

তার পিছনে ছুটতে ছুটতে আগন্তুক প্রশ্ন করলঃ 'আল্লাহর বান্দা, ওখান থেকে কি খবর নিয়ে এসেছ?'

ঃ 'আল্লাহ কাফিরদের পরাজিত করেছেন।'

ঃ 'সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাস তোমায় পাঠিয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। কয়েক দিন থেকে তোমার পথ চেয়ে আছি। যুদ্ধের অবস্থা আমায় শোনাও।'

না থেমেই আগন্তুকের দিকে তাকালেন দূত। সাদাসিধা পোষাক সত্বেও তার আকর্ষণীয় চেহারায় প্রভাবিত হয়ে কাদেসিয়ার কাহিনী বলতে লাগলেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা আগন্তুক শহরের গলি পর্যন্ত দৌড়ে গেলেন দূতের সাথে। কখনো লড়াই সম্পর্কে উপর্যুপরী প্রশ্নে পেরেশান করে তোললেন আরোহীকে। নিজের মনেই প্রশ্ন করতো ইবনে আমেলাঃ 'এ লোকটি কে হতে পারে?'

শহরে ঢুকতেই মদিনাবাসী 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সালাম দিতে লাগল তাঁকে। লজ্জায় পেরেশান হয়ে ইবন্ আমিলা বললেনঃ 'আমীরুল মোমিনীন, আমায় ক্ষমা করুন। আপনার নাম বললে এ গোস্তাখী করতাম না আমি।'

ঃ 'ভাই আমার।' নিশ্চিন্তে জওয়াব দিলেন খলিফা। 'কোন গোস্তাখী তুমি করনি। কথা চালিয়ে যাও'।

উট থেকে নামতে চাইলেন ইবনে আমিলা। কিন্তু নিষেধ করলেন তিনি। এ ভাবে কথা বলাতে বলাতে নিয়ে গেলেন বাড়ী পর্যন্ত। হযরত সা'দের চিঠি পড়ে, পাশে জমায়েত হওয়া লোকদের শোনালেন বিজয়ের সুসংবাদ।

ত্রিশ

কাদেসিয়ার লড়াইয়ের এক সপ্তাহ পর। যখমের ঘা শুকিয়ে গেছে হাসানের। দু'মাস পর হযরত সা'দও সুস্থ হয়ে উঠলেন। কলদিয়ার দিকে রওনা করলেন তিনি। পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো কব্জা করে ছাউনী ফেললেন হীরায়। ওদিকে বাবেলে জমায়েত হচ্ছিল ইরানের পরাজিত ফৌজ। হীরা থেকে মার্চ করে পথের কয়েক স্থানে ইরানী বাধা অতিক্রম করে পৌছলেন বাবেল। কুসিতে মোকাবেলার চেষ্টা করল ইরানীরা। কিন্তু

ওদের পরাজিত করে কুসিও কজা করে নিলেন তিনি। এবার হীরা এবং বাবেল থেকে মাদায়েন পর্যন্ত বিশাল এলাকা এসে গেল মুসলমানদের কজায়। যেসব আরব কবিলার মন থেকে উঠে গিয়েছিল কিসরার ভয়, ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে লাগল ওরা। শত শত বছর ধরে যারা পিষ্ট হচ্ছিল মজুসী শাসন-শোষণে, এ দ্বীন কবুল করা ছিল তাদের জন্য স্বাভাবিক। যেখানে পরাজিত কওমের একজন সাধারণ ব্যক্তিও বিজয়ী লশকরের বড় বড় সর্দারদের সাথে মিশতে পারত। বিজিত এলাকায় যারা দেখছিল ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফ, ওদের নতুন লশকর জমা হচ্ছিল হযরত সা'দের পতাকার নিচে।

কাদেসিয়ার লড়াইয়ের পূর্বে ইরানী রইস এবং সামন্ত প্রভূরা মুসলিম আক্রমণের আশংকা করলে পালিয়ে যেত মাদায়েন অথবা উত্তরের কোন শহরে। ইরানীদের জওয়াবী হামলায় মুসলমানরা সরে গেলে ফিরে আসত ওরা। কয়েকটি সপ্তাহ বা মাস জুলুম থেকে নাজাত পেয়ে আবার তার চেয়ে বেশী অত্যাচার সইতে হত স্থানীয় কৃষকদের। প্রভূরা পালিয়ে গেলে যেমন খুশী হত কৃষকরা, তেমনি ওদের ফিরে আসায় ভয় পেত। কাদেসিয়ার পরাজয় এবং হীরা-বাবেলের ময়দানে মুসলমানের অগ্রাভিযানের ফলে সে ভয় ওদের অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল।

কিসরার ফৌজ জওয়াবী হামলা করলেই ফিরে আসব, এ ধরণা নিয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের চিন্তাধারায়ও এল পরিবর্তন। ওদের অনেকে জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হল। কারো আবার বাপ দাদার ধর্মের চেয়ে মহান মনে হল ইসলামকে। ওরা ইসলাম প্রচারকদের জন্য খুলে দিল আপন ঘরের দুয়ার।

'ইরানীরা আর ফিরে আসবে না' কোন বস্তি অথবা শহর পেরিয়ে যেতে ইসলামী লশকর এ ধারণা দিত স্থানীয় লোকদের। কয়েকদিন পর হযরত সা'দ যখন মাদায়েনের দিকে যাত্রা করলেন, তিনি অনুভব করলেন, পেছন থেকে ভয়ের সম্ভাবনা নেই আর।

মাদায়েনের শাহী মহল। বিশাল এক কামরায় বসে আছে ইয়াজদগির্দ। সোনার মসনদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন ফৌজি অফিসার। কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইল আদবের সাথে। চঞ্চল হয়ে ইয়াজদগির্দ প্রশ্ন করলেনঃ 'সাবাতের লড়াইয়ে ছিলে তুমি?'

ঃ 'জ্বী।'

ঃ 'কোন ফৌজে ছিলে?'

ঃ 'আলীজাহ! আমি শাহজাদীর অগ্রবর্তী বাহিনীর সালার।'

ঃ 'শাহজাদী পুরান দাবী করেছিল, বহরাশিরের শাহী ফৌজের সালার থাকবে যে ফৌজের সাথে, সে ফৌজ পরাজিত হবে না কখনো। সে আরো বলেছিল, শাহী খান্দানের জানবাজ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ময়দান থেকে পিছু হটে না।'

ঃ 'আমাদের চল্লিশ হাজার সিপাই পাঁচ হাজার লোককে ময়দানে রেখে পালিয়ে এসেছে, একথা কি সত্যি?'

ঃ 'আলীজাহ, নদী পেরিয়ে দুশমনকে বাঁধা দেয়ার হুকুম ছিল আমাদের প্রতি। সাবাতের ময়দানে পাঁচ হাজারের বেশী ক্ষতি হয়নি আমাদের। এর মধ্যে দু'হাজার সিপাইকে ধরে নিয়ে গেছে দুশমন।'

ঃ 'তুমি বলতে পারবে আমাদের অবশিষ্ট ফৌজ দুশমনকে কয়দিন রুখতে পারবে নহরের ওপারে?'

ঃ 'আলীজাহ, সব কটা পুল আমরা ভেঙ্গে দিয়েছি। নতুন সিপাহসালারের নির্দেশ জানতে পাঠানো হয়েছে আমায়। নহরের ওপারে দুশমনকে বাঁধা দেয়ার নির্দেশ যদি দেন তিনি, দেহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত দুশমনকে নদী পেরোতে দেব না আমরা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ইয়াজদগির্দ, কামরায় প্রবেশ করলেন পুরান দখত। গজবের দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন তার দিকে। সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলেন পুরান। মসনদের ডান পাশের আসনে বসলেন তিনি। বললেনঃ 'আলামপনা, আমরা পরাজিত একথা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।'

ঃ 'আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা যখন এ পরাজয়ের কথা শুনবে তাদেরও বিশ্বাস হবে না।'

ঃ 'আলীজাহ! সিপাহসালার এবং শাহী ফৌজের সালারে আলার মৃত্যু একটি বড় দুর্ঘটনা। ফৌজে তাদের স্থান পূরণের মত কেউ থাকলে সাবাতের ফলাফল হতো ভিন্নরূপ।'

ঃ 'অযথা এখানে আসার কষ্ট করেছেন আপনি।' তিক্ত কণ্ঠে বললেন শাহানশাহ। 'লড়াইয়ের সব কাহিনী আমি শুনেছি।'

ঃ 'আলামপনা, শাহী ফৌজের দায়িত্বশীলদের একটা দরখাস্ত নিয়ে আমি এসেছি।'

ঃ 'বহরাশিরের প্রাচীরের আড়ালে আমি নিরাপদ থাকবো, এ জন্যই হয়তো দরখাস্ত পাঠিয়েছে।'

ঃ 'এ কথা নয় জাহাঁপনা, তারা লিখেছে মুহাফিজ ফৌজের সালারে আলা হিসাবে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিতে।'

ঃ 'এ ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শের দরকার ছিল না। এসব ব্যাপারে ফয়সালা করার পুরো এখতিয়ারই আমি আপনাকে দিয়েছি। আমার মনে হয় সালারে আলার নায়েব এখনো জীবিত। ফৌজের নেতৃত্ব সে নিজেই নিতে পারে।'

ঃ 'আলীজাহ, দরখাস্তের শুরুতেই দস্তখত করেছেন সালারে আলার নায়েব। অন্য লোক নিয়োগ করতে সে জন্যই আপনার অনুমতি জরুরী।'

ঃ 'কে সে?'

ঃ 'আলীজাহ্।' সংকোচ জড়ানো কণ্ঠে জওয়াব দিল পুরান। 'সে এক বন্দী।

আগেও বলেছি তার কথা। আপনার হুকুম ছাড়া তাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তার নাম মিয়ানদাদ। শাহী ফৌজের যারা তাকে জানে, সবারই ইচ্ছে তাকেই এ জিম্মা দেওয়া হোক।'

ঃ 'আমার মনে আছে। আপনার সুপারিশের পর রুস্তম সব বলেছে আমায়। এখনো ইরানের অবস্থা এতটা নাজুক হয়নি যে, অপরাধীদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে দায়িত্ব দিতে হবে।'

ঃ 'আলীজাহ, ফররুখ হত্যা ষড়যন্ত্রে মিয়ানদাদ শরীক ছিল না। একথা জানতো রুস্তমও। তবুও তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য জেদ ধরেছিল সে।'

ঃ 'তার শাস্তির ফয়সালায় আপনি শরীক ছিলেন না?'

ঃ 'আলীজাহ্, ইরানের পরিস্থিতি এমন ছিল, রুস্তমকে নাখোশ করার ঝুঁকি আমি নিতে পারিনি। আপনিও বলেছেন, এ ব্যাপারে রুস্তমের রায়ই চূড়ান্ত। কাদেসিয়ার লড়াইয়ের পরও তার মুক্তির কথা বলেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, খোরাসানের সিপাইদের মন থেকে এখনো রুস্তমের নিহত হওয়ার ক্ষত শুকায়নি। এ সময় তার পিতার হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।'

ঃ 'ঠিক আছে।' একটু ভেবে নিয়ে বললেন শাহানশাহ, 'সালার ও সিপাইরা নিশ্চিত হলে তার মুক্তির হুকুম আমি দিচ্ছি। তবে এর পুরো জিম্মা হবে আপনার। শাহী ফৌজের দায়িত্ব দেয়ার পর হঠাৎ একদিন যেন না শুনি, দুশমন প্রবেশ করেছে বহরাশিরের শাহী মহলে, আর ঘরের কোণে মদে মাতাল হয়ে পড়ে আছে মিয়ানদাদ।'

ঃ 'তার ব্যাপারে যে কোন জিম্মা নিতে আমি প্রস্তুত। মিয়ানদাদ মাদায়েনের অস্ত্রাগারের উৎকৃষ্ট তরবারী। এর যথার্থতা প্রমাণ করবে এ নওজোয়ানও।'

অফিসারের দিকে ইশারা করে বলল পুরান।

অফিসারের দিকে তাকালেন শাহানশাহ। সে বললঃ 'আলীজাহ! বহরাশিরের শাহী ফৌজের অফিসাররা শাহজাদী আজমেরী বানুর ব্যাপারে যে দরখাস্ত দিয়েছিল, আমার দস্তখত রয়েছে সেখানেও। আফসোস্ এর পূর্বে এ সমস্যা আপনার সামনে পেশ করার সাহস হয়নি।'

কিছুক্ষণ পর। ইয়াজদগির্দের বিশেষ দূত কড়া নাড়ছিল কয়েদখানার দরজার।

দুপুর খাওয়ার পর ঘন্টা খানেক আরাম করে বিকেলের দিকে বিছানা ছাড়ল মাহবানু। বসল গিয়ে পাইন বাগানের দিকের খোলা জানালার সামনে। ছুটে এসে কামরায় ঢুকল ইয়াসমীন।

ঃ 'মাহবানু, শহর থেকে আমাদের গোলামরা সংবাদ এনেছে, ফিরে আসছে আমাদের লশকর। মুসলমানদের অগ্রাভিযান রুখতে পারেনি ওরা। ওরা নাকি এদিকেই আসছে, কি হবে আমাদের?'

উৎকণ্ঠিত না হয়ে নিরুদ্বেগে প্রশ্ন করল মাহবানুঃ 'কাউস আসেনি?'

ঃ 'না, গোলামরা বলছে, কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের বহরাশির থেকে মাদায়েন পাঠিয়ে দিচ্ছে। একি সম্ভব নয় যে, দুশমন শহর অবরোধ করলে কয়েদীদের মুক্তি দেবে হুকুমত! আর তোমার ভাই....' আচানক রুদ্ধ হয়ে এল ইয়াসমীনের কণ্ঠ। চোখে এসে ভর করলো টলমলে অশ্রুরাশি।

হাত ধরে তাকে কাছে বসাল মাহবানু। মাথায় হাত বুলিয়ে বললঃ 'ইয়াসমীন, কুদরত যদি ভাইয়ের মুক্তি মঞ্জুর করে থাকেন, কয়েদখানার ফটক খুলতে দেরী হবে না। রাতের পরই আসে ভোর। আমার মন বলছে, আমাদের দুঃখের রজনী শেষ হতে যাচ্ছে।'

অশ্রু মুছে ইয়াসমীন বললঃ 'আমি ভাবছি কোন দিন ইরানী লশকর তার প্রয়োজন বুঝবে। শাহানশাহ তাকে ডেকে বলবেন, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।'

ঃ 'আমি দোয়া করি, ভেংগে পড়া প্রাচীর থেকে খোদা আমার ভাইকে দূরে রাখুন। ইয়াসমীন, তুমিও প্রার্থনা কর কয়েদ থেকে বের হওয়ার জন্য শাহানশাহের গোলামীর জিঞ্জির পরতে যেন রাজী না হয় ও। রুস্তমের কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করেছিলাম, এ জন্য আজো শরমে মরে যাচ্ছি। রুস্তমের কাছে নিরাশ হয়ে ভেবেছিলাম শাহানশাহ এবং পুরানের কাছে যাব। কিন্তু এক অন্যায় পদক্ষেপ থেকে কুদরত আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ইয়াসমীন, একথা কেন ভাবছ না, কুদরত হয়ত কয়েদখানায়ই আমার ভাইয়ের জন্য মঙ্গল রেখেছেন।'

ঃ 'মাহবানু, মুসলমানরা জয় লাভ করবে, আর ওরা মুক্ত করবে তোমার ভাইকে, তোমার কি তাই মনে হয়?'

ঃ 'বোন আমার, এ বিশ্বাসইতো আমার জীবনের শেষ আশ্রয়। নিদারুণ অসহায় অবস্থায় যে দোয়া করেছিলাম, আমি দেখছি তা সফল হতে যাচ্ছে। যে তুফানে ভীত তুমি, তার দিকচক্রবালে আমি দেখছি রহমতের মেঘমালা। আমার ভয় শুধু, জুলুম থেকে নাজাত পেয়ে আবার জালেমের সঙ্গী হতে আমার ভাই তৈরী হয়ে না যায়। যদি তার কল্যাণ চাও, গোমরাহী আর মুসীবত থেকে বেরিয়ে আবার সেই একই ফাঁদে আটকে যায় এমনটি কামনা করো না। শুধু কয়েদখানা থেকে মুক্ত হওয়ার সমস্যা হলে সে বিপদ কেটে গেছে রুস্তমের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ফৌজি সরদার, হুকুমতের কর্তা ব্যক্তি এমনকি কিসরাকেও এ আশ্বাস দিতে পারতাম, মিয়ানদাদের খেদমের প্রয়োজন আছে তোমাদের। আমার কথাগুলো না মানার কোন কারণও ছিল না। কিন্তু যখনি মানুষের পরিবর্তে সাহায্য চেয়েছি খোদার কাছে, হৃদয়ে এসেছে অনুপম প্রশান্তি। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি তো গাফেল নন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইয়াসমীন। বাইরে থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দু'জনেই তাকাল দরজার দিকে। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঝুঁকে দেখল কাউস।

মাহবানুর হাতের ইশারা পেয়ে প্রবেশ করল অন্দরে।

ঃ 'চাচা কাউস! এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?' মাহবানুর প্রশ্ন।

ঃ 'বাজার ঘুরে মাদায়েন চলে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'ওরা সাবাত থেকে এগিয়ে আসছে, একি সত্যি?'

ঃ 'হ্যাঁ, সিপাহসালার এবং শাহী ফৌজের সালারে আলা নিহত। ইরানী লশকর সরে আসছে নহর থেকে। মাদায়েনের ছাউনী থেকে নতুন লশকর পাঠানোর কোন ফয়সালা এখনো করা হয়নি। সম্ভবত খোলা ময়দানে না লড়ে কেল্লা বন্ধ করে মোকাবিলা করবে ইরানী লশকর। এ শহর অবরুদ্ধ হলে একে খালি করা হবে হয়ত। পুল পেরোতে দেখলাম কোন কোন ওমরা এখনি নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের।'

কিছুক্ষণ কথা বলল কাউস। ঘর থেকে বেরিয়ে বসে রইল পাইন বাগানের এক বৃক্ষের নিচে।

ঃ 'মাহবানু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। চল একটু বাইরে যাই।'

ঃ 'তুমি যাও, আমি গোসল সেরে আসছি।'

ইয়াসমীন বেরিয়ে এসে বসল বারান্দার এক চেয়ারে। কিন্তু আনচান করছিল তার মনটা। আবার উঠে গিয়ে বসল পাইন বাগানে মর্মর পাথরের তৈরী ছোট্ট ঝর্ণার ধারে। কটা চামেলী ফুল তুলে ঘ্রাণ নিতে নিতে হাঁটতে লাগল। ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, আচম্বিত দেখল ক'জন লোক এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। পা দু'টো যেন মাটিতে সেঁধিয়ে গেল ওর। অফিসার গোছের এক যুবক এক দুর্বল ব্যক্তিকে ঠেক দিয়ে রেখেছিল। দু'জন সিপাই এবং এক গোলাম আসছিল ওদের সাথে।

ইয়াসমীন থেকে প্রায় ত্রিশ কদম দূরে এসে থেমে গেল ওরা। ফৌজি অফিসার এবং সিপাইরা কি কথা যেন বলল দুর্বল ব্যক্তির সাথে। আদবের সাথে সালাম করে ওরা ফিরে গেল। আগন্তুককে ঠেক দিতে চাইল ইয়াসমীনের গোলাম। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল সে। দ্বিতীয়বার এগোনোর হিম্মত হল না গোলামের। ধীরে ধীরে কদম তুলে এগোতে লাগল আগন্তুক। হতভম্বের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল ইয়াসমীন। তার হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক কান্না। অশ্রুতে ছেয়ে গেল চোখ দু'টো। হৃদয় কাঁপছিল তার, দ্রুত হয়ে আসছিল শ্বাস প্রশ্বাস। কিছু বলতে চাইল ও, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। অতীতের সব দুশ্চিন্তা আর বর্তমান ভবিষ্যতের সকল আনন্দ দাপাদাপি করতে লাগল ওর চেতনায়। ও ডুবে যাচ্ছিল চেতনার এক সীমাহীন গভীরতায়। অগণিত স্বপ্ন আর প্রার্থনার জওয়াব তার সামনেই। ওর কম্পিত দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছিল অশ্রুর পর্দায়। কয়েক কদম দূরে এসে থেমে গেল আগন্তুক।

ঃ 'ইয়াসমীন।' দুর্বল কণ্ঠে বলল ও। 'আমায় চিনতে পারনি তুমি? আমি মিয়ানদাদ।'

মাথা তুলল ইয়াসমীন। চোখ থেকে বয়ে যাচ্ছে অশ্রুর ধারা। আচানক পিছন ফিরল ও। কম্পিত, দ্বিধা কুণ্ঠিত আওয়াজে মাহবানুকে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল ঘরের দিকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল মাহবানু। নিজের অজ্ঞাতে তাকে জড়িয়ে ধরল ইয়াসমীন। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলঃ 'মাহবানু, মাহবানু, তোমার ভাই, তোমার ভাই...... ।'

উৎকট পেরেশানী নিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল মাহবানু। বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মিয়ানদাদ। ইয়াসমীনকে একদিকে সরিয়ে 'ভাইজান!' বলে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল মাহবানু।

কতক্ষণ বুকের সাথে ওকে ধরে রাখল মিয়ানদাদ। দুর্বল আওয়াজে বললঃ 'আমায় ভেতরে নিয়ে চলো, মাথা ঘুরছে আমার।'

মিয়ানদাদের বাম হাত কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে এগুলো মাহবানু।

ততক্ষণে কাউস এবং অন্য গোলামরাও এসে পড়েছে ওখানে। দেখতে দেখতে জ্ঞান হারাল মিয়ানদাদ। গোলামরা ছুটে গিয়ে খাটিয়া নিয়ে এল। ওকে তাতে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে গেল অন্দরে। জ্ঞান ফিরলে চোখ খুলল মিয়ানদাদ। প্রদীপের আলোয় শুশ্রূষাকারীদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমি কোথায়?'

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'ইয়াসমীনের নানার ঘরে ভাইজান। এখানে পৌছেই বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন আপনি। ডাক্তারের জন্য লোক পাঠিয়েছি। এখন আপনার কেমন লাগছে?'

ইয়াসমীনের চেহারায় আটকে রইল মিয়ানদাদের দৃষ্টি। পানি চাইল ও। পানি নিয়ে এল গোলাম। ভর দিয়ে তাকে তুলতে চাইল মাহবানু। তার হাত একদিকে সরিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'এতটা অসুস্থ নই আমি মাহবানু। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

কয়েক ঢোক পানি পান করে নিশ্চিন্তে বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললঃ 'ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন ছিল না। শাহী ডাক্তার আজও আমায় দেখেছে। সে বলেছে, কয়েকদিন আপনার বিশ্রামের দরকার। তার অষুধ খেয়ে আমি বেশ সুস্থ বোধ করেছি। কিন্তু শাহানশাহ এবং পুরানের সাথে মোলাকাতের পর আবার মাথা চক্কর দিতে শুরু করেছে। ওরা আমায় পালকীতে করে এখানে আনতে চাচ্ছিল। মোড়ের ওপাশে পালকী ছেড়ে দেয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। আশংকা করছিলাম পেরেশান হবে তোমরা। ইয়াসমীন তো আমায় দেখে ভয়ই পেয়েছিল। ও সম্ভবত আমায় ভুত মনে করেছে।'

ঃ 'খুব দুর্বল হয়ে গেছেন আপনি, অসুস্থ ছিলেন?'

ঃ 'আমি নিরাপরাধ' এক কয়েদীর জন্য এ অনুভূতিই সব বিমারের চেয়ে বেদনাদায়ক। প্রথম দিকে দারোগা খুব ভাল ব্যবহার করত আমার সাথে। তার মাধ্যমেই বাইরের খবর জানতে পেতাম। আশা ছিল, তার প্রচেষ্টায় একদিন মুক্তি পাব আমি। হঠাৎ সে দারোগার পরিবর্তে এল নতুন ব্যক্তি। কঠোর নিয়ম বেঁধে দিল সে

আমার জন্য। কিছুদিন থেকে খাবার প্রতি অনীহা বোধ করছি। বেঁচে থাকার জন্যই ক'লোকমা খেতাম শুধু। সোহেল কোথায়?'

ঃ 'ও ... ও এখানে নেই!'

পেরেশান হয়ে কাউসের দিকে চাইল মাহবানু। কাউস বললঃ 'কয়েক মাস আগে এক অভিযানে গিয়েছিল ও। তারপর থেকে আর কোন খবর পাচ্ছিনা?'

আওয়াজ চিনতে পেরে ফিরে চাইল মিয়ানদাদঃ 'কাউস, তুমি এখানে?'

ঃ 'আপনার হুকুম ছাড়াই এখানে এসেছিলাম আমি। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কাউস। 'শুনলাম আপনি কয়েদখানায়। মাহবানুকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে পারলাম না।'

ঃ 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কাউস।'

ঃ 'আপনি কিছু খাবেন?' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে, কদিন শুধু দুধ খেতে হবে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ইয়াসমীন। কাউসের দিকে ফিরে মিয়ানদাদ বললঃ 'কাউস, শাহানশাহ শাহী ডাক্তারকে আমার চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিদিন ভোরে সে আসবে। গোলাম অন্য কোন ডাক্তার নিয়ে এলে তাকে ফিরিয়ে দিও।'

একত্রিশ

ধীরে ধীরে সুস্থ উঠল মিয়ানদাদ। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই চলাফেরার উপযুক্ত হল সে। ডাক্তারের পরামর্শ ছিল কয়দিন বিশ্রাম করার। তার মুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়েছিল ফৌজে। পুরনো দোস্তরা তাকে দেখতে আসত সকাল সন্ধ্যা। প্রথম প্রথম লড়াই সম্পর্কে আলাপ করতে চাইত না ও। কিন্তু সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে বহরাশির আর মাদায়েনের নতুন পরিস্থিতিতে আগ্রহ বেড়ে গেল তার। আদমান সে যুবকদের একজন, মিয়ানদাদের সাথে ছিল যার সীমাহীন আন্তরিকতা। বন্দীদশা থেকে ও মুক্তি পেয়েছে তার নীরব চেষ্টার ফলেই। প্রত্যেক দিন তাকে দেখতে আসত সে। বহরাশিরের অবরোধের ব্যাপারটা মিয়ানদাদকে দারুণ পেরেশান করছে, বুঝত আদমান। অন্য কোন অফিসার এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে তাড়াতাড়ি তাকে চুপ করিয়ে মিয়ানদাদকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করত সে।

দীর্ঘ অবরোধের ব্যাপারে একদিন উদ্বেগ প্রকাশ করল মিয়ানদাদ। আদমান বললঃ 'আরবদের সাথে আমাদের চূড়ান্ত লড়াই হবে দজলার পাড়ে আগেই তা বুঝেছিলাম। ইয়াজদগির্দ এবং মাদায়েনের রইসরা যদি রুস্তমের কথা শুনতো তবে

কাদেসিয়ায় আমরা বিপর্যের সম্মুখীন হতাম না। এখন দিন দিন আমাদের লশকর বাড়ছে। মুসলমানরা বহরাশিরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পাঁচিলের নিচটা তাদের লাশ দিয়ে ভরে ফেলব। ওরা যদি অবরোধ দীর্ঘ করতে চায়, তরবারী তোলার মত প্রতিটি জওয়ান পৌছবে মাদায়েন এবং বহরাশির।'

পেরেশান হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'আদমান, যে লশকর খোলা ময়দানে দুশমনের মোকাবিলা করতে ভয় পায়, লোহার মজবুত কেল্লায়ও ওরা আশ্রয় পায় না।'

ঃ 'কিন্তু খোলা ময়দানে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমাদের।'

ঃ 'তাহলে আমাদের শাহানশাহ দুশমনকে পাঁচিল ভাংগার ট্রেনিং দিতে চাইছেন? তুমি জান, বহরাশির বিজয়ের পর আসবে মাদায়েনের পালা? মাদায়েনের পর ইরানের কোন শহরের পাঁচিল মুসলমানদের অভিযান রুখতে পারবে না। আমাদের ওমরা এবং ফৌজি অফিসাররা ছেলেমেয়েদের মাদায়েন পাঠিয়ে দিচ্ছে, একথা কি ঠিক নয়?'

ঃ 'আপনাকে বলেছি, পাঁচিলের বাইরে পাথর ছোড়ার যন্ত্র বসিয়েছে মুসলমানরা। এ জন্য আশপাশের বাড়ীগুলোও খালি করা হচ্ছে।'

ঃ 'আমি জানি, লড়াই করতে পারে কেবল সে সিপাই, যাদের তরবারীর উপর ভরসা থাকে। শহর থেকে বেরিয়ে যদি ওদের পালিয়ে যেতে বাধ্য না করতে পারি, অসম্ভব নয়, শহরে প্রবেশ করে ওরাই আমাদের পালাতে বাধ্য করবে।'

ঃ 'মাদায়েন এবং বহরাশির থেকে পালিয়ে যাবার কল্পনাও আমি করতে পারি না।'

ঃ 'কয়েক বছর আগে আমিও ভাবিনি এমনটি। যে আরবরা আমাদের ছায়া দেখলে ভয়ে পালিয়ে যেত, বুইব আর কাদেসিয়ার ময়দান পেরিয়ে ওরা পৌছবে বহরাশির পর্যন্ত এ কথা কে ভাবতে পারতো! আদমান, কয়েদখানা থেকে বেরুবার সময় লড়াই নিয়ে কোন আগ্রহ আমার ছিল না। আমি শুধু বাঁচতে চাইছিলাম উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে। মাদায়েন এবং বহরাশিরের পাঁচিলের চেয়ে অন্য শহরের পাঁচিল অনেক নিরাপদ, আমার ভয় হচ্ছে এমন ফয়সালা করে বসবেন ইয়াজদগির্দ। তখন পালানোর মওকাও পাব না আমরা। ইয়াসমীনকে নিয়ে ইস্পাহান চলে যাওয়ার পরামর্শ বাহমানকে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও ছেড়ে যেতে চাইছে না আমায়।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে আপনি এখান থেকে চলে যাবেন, এ আমি ভাবতেও পারি না।'

ঃ 'কিসরা ছাড়া আর কারো পছন্দ অপছন্দ ইরানের জন্য অর্থহীন। আমাদের লড়াই এক ব্যক্তির জন্য। যে কোন সময় সঠিক অথবা ভুল ফয়সালা তিনি করতে পারেন। তার ইশারায় জীবন দিতে পারি আমরা, কিন্তু সে ফয়সালার পরিবর্তন করতে পারব না।'

চঞ্চল হয়ে আদমান বললঃ 'ইয়াজদগির্দের ব্যাপারে নিরাশ হবেন না। তারও

ইচ্ছা শহরের বাইরে গিয়ে দুশমনের মোকাবিলা করি। কিন্তু একদল ফৌজি অফিসার একমত নন। শাহানশাহও তাদের ইচ্ছার বিপক্ষে যেতে চান না। ফৌজের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে যখন আলাপ করার সুযোগ পাবেন, আমার বিশ্বাস, আপনার চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেয়া হবে।'

ঃ 'আমার জানা মতে ওরা এ অপেক্ষায় আছে, সুস্থ হয়ে বড় কোন জিম্মা নেবেন আপনি। শাহজাদী আমার সামনে গতকাল ডাক্তারকে বলেছেন, লশকরে মিয়ানদাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করছেন শাহানশাহ, এজন্য আপনার তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, লড়াইয়ের ব্যাপারে আপনার প্রতিটি পরামর্শে শাহজাদী পুরানের সমর্থন পাবেন। শহরের বাইরে দুশমনের সাথে মোকাবিলা হলে লশকরের নেতৃত্ব দেয়া হবে আপনাকে।'

হঠাৎ মিয়ানদাদের মনে হল, হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে তার। এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল মাহবানু ও ইয়াসমীন। পেরেশান হয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল ওরা। আদমানের দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'ভাইজানের বিশ্রাম প্রয়োজন, এখনো লড়াই নিয়ে ভাববার সময় হয়নি তাঁর।'

উঠতে উঠতে আদমান বললঃ 'মাফ করুন, আসলেই আমার খেয়াল ছিল না। এমনিতেই তাকে পেরেশান করেছি।'

আদমান চলে গেলে খানিক রুষ্ট স্বরে মিয়ানদাদ বললঃ 'মাহবানু, আদমান আমার দোস্ত। ও আমার কল্যাণই চায়।'

ঃ 'আমি জানি সে আপনার দোস্ত। তাকে ব্যথা দিতে চাইনি আমি। কিন্তু ভাইজান, যদি আমি আপনার বোন হয়ে থাকি, আমার অশ্রুর যদি কোন মূল্য থাকে আপনার কাছে, তবে আমি আশা করবো, আপনি দ্বিতীয়বার লড়াইয়ে শরীক হবেন না। আপনি সুস্থ হলে এক মুহূর্তও এখানে থাকার পরামর্শ আপনাকে দেব না।'

ঃ 'যদি ভেবে থাক, মুসলমানরা কব্জা করবে বহরাশির, তবে আমার কথার ভুল অর্থ নিয়েছ। দুশমনের ভয়ে তোমাদের ইস্পাহান যাবার পরামর্শ দেইনি বরং আবার ফৌজে শামিল হওয়ার পূর্বে তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম। দিনে লড়তে যাব হয়ত ফিরে আসব না রাতে, এ দিকটাও আমার চিন্তার বাইরে নয়। এমন পরিস্থিতিতে ইস্পাহনই তোমাদের জন্য নিরাপদ। কমপক্ষে যতদিন পর্যন্ত এ লড়াইয়ের কোন ফয়সালা না হয়।'

ঃ 'ভাইজান, মনে কিছু নেবেন না। আমার ধারণা নয় বরং আমার বিশ্বাস, মুসলমানরা কব্জা করবে বহরাশির। কিন্তু যদি ইরানের বিজয় নিশ্চিতও হয়, তবুও আপনার পথে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা আমি করব।'

বিরক্তি ভরে মিয়ানদাদ বললঃ 'কি বলছ তুমি?'

ঃ 'আমি বলছি, আমার জীবন থাকতে আমার ভাইকে আর ধ্বংসের পথে যেতে

দেবো না।'

কিছু বলতে চাইল মিয়ানদাদ। অশ্রু মুছতে মুছতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাহবানু।

ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে সে বললঃ 'ইয়াসমীন, কি হয়েছে মাহবানুর? আমি ভাবতেও পারি না, ও আমায় দেখতে চাইবে ভীরু ও কাপুরুষদের দলে।'

বিষন্ন কণ্ঠে ইয়াসমীন বললঃ 'হায়, মাহবানুর কথা যদি আপনি বুঝতেন!'

ঃ 'আমি এদ্দুর বুঝেছি, ইরানের জয়-পরাজয়ে ওর কোন আগ্রহ নেই।'

ঃ 'না, ইরানের নিরাপত্তা ওর কম প্রিয় নয়। কিন্তু তার একীন, কিসরার গোলামরা খোদার বান্দাদের মোকাবিলা করতে পারবে না।'

ঃ 'আমার বোনের কাছে এটা আশা করিনি। কাউস হয়ত তাকে গোমরা করে দিয়েছে। কোথায় সে। কাউস.....'

উষ্ণ স্বরে ডাকল মিয়ানদাদ।

মিনতি মাখা কণ্ঠে ইয়াসমীন বললঃ 'কাউসকে কিছু বলবেন না, ও আপনার খয়েরখাঁ। আপনি যখন বন্দী ছিলেন ও প্রতিটি নিঃশ্বাসেই আপনার মুক্তির জন্য দোয়া করত।'

কামরায় প্রবেশ করল কাউস। মিয়ানদাদ বললঃ 'কাউস, মুসলমানদের গোয়েন্দাকে কি শাস্তি দেয়া হয় তা তুমি জান?'

কাউস নিশ্চিন্তে জওয়াব দিলঃ 'এখানে শাস্তি পেতে অপরাধী হওয়া জরুরী নয়। আপনি জানেন, বহরাশিরের কয়েদখানাগুলো সে লোক দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে, যাদের বাপ দাদারা ইরানের জন্য দিয়েছে অগণিত কুরবানী।'

ঃ 'হুকুমতের বিরুদ্ধে এ ঘরে তুমি বিদ্বেষ ছড়িয়েছ।' বলল মিয়ানদাদ।

কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। এগিয়ে বললঃ 'জুলুমের ওপর যার বুনিয়াদ, সে হুকুমতের বিরুদ্ধে কাউসের বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের দেখতে এসেছিল ও। আমাদের অসহায়ত্বে দয়া হওয়ায় থেকে গেছে। সে না এলেও একই অনুভূতি হত আমার। আমি সে হুকুমতের বিদ্রোহী, অসহায়ত্বের অশ্রু ছাড়া যে কিছুই দেয়নি আমাদের। এ অপরাধের কোন শাস্তি থাকলে, ভোগ করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু খোদার দিকে চেয়ে এ বুড়োকে কিছু বলবেন না। আমাদের খান্দানের খিদমতেই সাদা হয়েছে তার চুলগুলো।'

ঃ 'কাউসকেই যদি দুশমন ভাবেন, দুনিয়ার আপনার দোস্ত নেই কেউ।' বলল ইয়াসমীন।

বোকার মত মিয়ানদাদ চাইল ইয়াসমীনের দিকে। ওর চোখ দু'টোয় চিকচিক করছিল অশ্রু বিন্দু। অনেকক্ষণ কোন কথা বেরোল না তার মুখ থেকে। কাউসের দিকে ফিরে বললঃ 'কাউস, তোমার খেদমতের কথা মনে না থাকলে, মুহূর্ত দেরী না করেই

হুকুমতের হাতে সোপর্দ করে দিতাম। আমার খান্দানের চরম বরবাদী না চাইলে, কথা দাও, এখানে যতদিন থাকবে মুসলমানদের সমর্থনে মুখ খুলবে না।'

ঃ 'এতটুকু ওয়াদা করতে পারি, এখানে যতদিন থাকব, আপনার কল্যাণ ছাড়া এ জবান খুলবে না। যখন বুঝব আমার নেক ইচ্ছার পরও আপনার কোন উপকার করতে পারব না, একদিনও এখানে থাকব না।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। দু'কদম গিয়েই থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে বললঃ 'কোব্বাদের বেটা, আমি তোমার দুশমন নই।'

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে মাহবানু এবং ইয়াসমীনের সাথে লড়াই নিয়ে আর আলোচনা করল না মিয়ানদাদ। এখন অনেকটা সুস্থ ও। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতো।

মিয়ানদাদের মুক্তি পাবার সাত সপ্তাহ পরের কথা। নদীর ওপারে মাদায়েনের ফৌজি ছাউনীতে আবার অনুশীলন শুরু করল ও। এর পর থেকে দিনের অধিকাংশ সময় কাটত তার ঘরের বাইরে।

একদিন ভোরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেই যে সে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে আসল না সে। বারান্দায় তার অপেক্ষায় বসেছিল মাহবানু ও ইয়াসমীন। সূর্য ডোবার একটু পর ফটকের বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। এক গোলাম ছুটে এসে বলল ঃ 'আদমান আসছে।'

পরস্পরের দিকে ওরা তাকাতে লাগলো পেরেশান হয়ে। আদমানকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল দু'জন। কাউসের সাথে এগিয়ে এল আদমান। মাহবানুকে বললঃ 'আপনার ভাই পাঠিয়েছেন আমায়। আজ রাতে তিনি ফিরবেন না।'

ঃ 'কোথায় তিনি?'

ঃ 'বহরাশিরের কেল্লায়। শাহানশাহও হাজির হয়েছেন ওখানে। দরবারের জন্য সিপাহসালার তাকে রেখে দিয়েছেন। বহরাশিরে শাহানশাহ হয়ত আরো দু'একদিন থাকতে পারেন। আপনার ভাই তাহলে বাড়ী আসার সময় পাবেন না।'

ঃ 'আপনি ভাইজানের দোস্ত। আমিও ভাইয়ের মতই মনে করি। আপনার কাছে কি আশা করতে পারি কোন কথা লুকাবেন না।'

ঃ 'কি জিজ্ঞেস করতে চাইছেন?'

ঃ 'ভাইজান ফৌজে শামিল হয়েছেন, একথা কি ঠিক নয়?'

ঃ ' কয়েদ থেকে বেরিয়েই ফৌজে শামিল হয়েছিলেন তিনি। অসুস্থতার কারণেই তখন কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি?'

ঃ 'এখন কি তাকে কোন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে?'

ঃ 'না, নতুন সিপাইদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাকে দিতে চাইছেন সিপাহসালার। শাহী ফৌজের অফিসাররাও তাই চাইছেন। শাহজাদী পুরানের ইচ্ছেও তাই। আমার মনে হয়, আপনার ভাইও পুরানো সঙ্গীদের থেকে আলাদা হতে চাইবেন না। গত দশ দিন যাবত তিনি সিপাহসালারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। সম্ভবত দু'এক দিনের মধ্যেই কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হবে তাকে। আপনার ভাইয়ের এখন ইরানী লশকরে অসম্ভব গুরুত্ব, গত পরশু তার সুপারিশে মুহাফিজ ফৌজের সে অফিসারকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, যাকে বন্দী করেছিলেন রুস্তম। আমার বিশ্বাস, বহরাশির ও মাদায়েনের সম্মানিত মহিলারা খুব শীঘ্রই আপনাদের মোবারকবাদ জানাতে আসবে। এবার আমায় অনুমতি দিন।'

হাঁটা দিল আদমান। ব্যথা ভরা শীতল নিঃশ্বাস ফেলে কাউসের দিকে ফিরল মাহবানু।

ঃ 'চাচা কাউস, কি করব আমি, আমি কিইবা করতে পারি?'

ঃ 'নিরাশ হয়ো না বেটি। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তোমার মদদ করবেন। দোয়া করো ভাইয়ের জন্য।'

বাড়ীর ভেতরে চলে গেল মাহবানু। কতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ইয়াসমীন। কাউসকে বললঃ 'কাউস, আমায় কিন্তু দোয়া করতে বলেননি আপনি?'

পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকাল কাউস।

ঃ 'হ্যাঁ, বেটি, তুমিও দোয়া করোগে। আমার চেয়ে তোমাদের দোয়া মিয়ানদাদের বেশী প্রয়োজন।'

ঃ 'মাহবানুকে আপনি যে দোয়া শিখিয়েছেন, আমায় কেন শিখাননি! আমায় কি মেয়ের মত মনে করেন না।'

ঃ 'বেটি, আমার কাছে কিছু শিখতে চাইবে, এ আমার জানা ছিল না।'

ঃ 'না, আপনার ভয় ছিল, গোপন কথা আমি অন্যকে বলে দেব। কিন্তু মাহবানুর কোন কথাইতো আমার অজানা নয়। ও মুসলমান হয়েছে তাও আমি জানি।'

ঃ 'কিভাবে?'

ঃ 'ও নিজেই বলেছে আমায়।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'যে দিন তার ভাই আপনাকে রাগ করেছিলেন। তার সব কথা আমি বুঝিনি। তবুও আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে, যে পথে চলেছে মাহবানু তা ভুল হতে পারে না। সে বলছিল, মুসলমান যে খোদাকে বিশ্বাস করে, তিনি বড় মেহেরবান। তার কাছে যারা মদদ চায় , তারা নিরাশ হয় না। মুসিবতে আশ্রয় দেন তিনি। এখন আমি অনুভব করছি, মাহবানুরই নয়, আমারও সে আশ্রয়ের প্রয়োজন।'

ঃ 'বেটি, এ দুনিয়ার প্রতিটি মানুষেরই তার আশ্রয় জরুরী।'

ঃ 'আমার কামনা, মিয়ানদাদ নিরাপদ থাকুক। যদি ও ফিরে না আসে বাঁচব না আমি।' কাঁদতে লাগল ইয়াসমীন।

ঃ 'বেটি, মুসলামান হলেই তোমার আর মিয়ানদাদের জীবনের পথ এক হয়ে যাবে, এমন ওয়াদা করতে পারি না আমি। তবে এদ্দুর বলতে পারি, আল্লাহর ওপর ঈমান আনলে নিজকে একা এবং আশ্রয়হীন মনে হবে না। পয়োয়ার দিগারের আনুগত্যে কোন শর্ত আরোপ করতে পারি না। মাহবানু বলতে পারবে, বিপদ মুসীবতে আশ্রয় প্রার্থীদের একমাত্র আশ্রয় তিনি। বেটি, বসো। শান্তভাবে কিছু কথা বলতে চাই।'

মুখোমুখী বসল দু'জন। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বলতে লাগল কাউস। ঘন্টা খানেক পর পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মাহবানু। ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানু, মাহবানু! এদিকে এসো। চাচা কাউস এক খোশ খবর শোনাবেন তোমায়।'

এগিয়ে এল মাহবানু। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে চাইল কাউসের দিকে।

ঃ 'কি ব্যাপার চাচাজান।' প্রশ্ন করল ও।

মৃদু হাসল কাউস।

ঃ 'বেটি, তোমার জন্য খোশ খবর হল, বন্ধ ঘরের আঁড়ালে লুকিয়ে আর নামাজ পড়তে হবে না তোমায়। খোদার দ্বীন কবুল করেছে ইয়াসমীন।'

ইয়াসমীনের দিকে তাকাল মাহবানু। উঠে জড়িয়ে ধরল তাকে।

পরের সন্ধ্যায় ফৌজি লেবাসেই ঘরে এল মিয়ানদাদ। অঙ্গিনায় এসে বসল মাহবানু আর ইয়াসমীনের পাশে। কতকক্ষণ নীবরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ও। মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, লেবাস পাল্টাবেন না।'

ঃ 'না, এখুনি ফিরে যাব, এসেছি তোমাদের শান্তনা দিতে।'

ঃ 'খাবেন তো?'

ঃ 'না, আমায় দাওয়াতে যেতে হবে। তারপর যাব কেল্লায়। ওখানেই থাকব রাতে। কদিন আমি খুব ব্যস্ত থাকব।'

ঃ 'আদমান বলছিল, আপনাকে নাকি কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে?' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'বহরাশিরের হেফাজতের জন্য নতুন লশকর তৈরী করার হুকুম আমায় দিয়েছেন শাহানশাহ। গোটা ফৌজের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের এ লশকরে ভর্তি করার এখতিয়ারও আমায় দিয়েছেন।'

বিষন্ন কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'যখন তৈরী হবে লশকর, তার দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠনো হবে এমন এক অভিযানে, অন্য কোন সালার যা কবুল করেনি।'

ঃ 'মাহবানু, আবার এ তিক্ত প্রসঙ্গ তুলবে না। শাহানশাহ এবং ফৌজের অভিজ্ঞ

লোকেরা কোন জিম্মা বহনের যোগ্য আমায় মনে করেন, সে তো আমার সৌভাগ্য। তাদের নিরাশ করব না আমি। রুস্তমের মত আমি রাশিচক্র বিশ্বাস করি না। বাহাদুরের মত মরার পরিবর্তে আমার বোন আমাকে কাপুরুষের মত মরার পরামর্শ দেবে তাও আমি পছন্দ করিনা। আমাদের পরাজয়ের ভয় হলে আজই তোমাদের ইস্পাহান পাঠিয়ে দিতে আমি প্রস্তুত।'

কিছু বলতে চাইল মাহবানু, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল মিয়ানদাদ।

ঃ 'আপনি যাচ্ছেন?' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'হ্যাঁ, আমার অনেক কাজ।'

ঃ 'মাহবানুর উপর রাগ করেছেন?'

এগিয়ে মাহবানুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিয়ানদাদ বললঃ 'মাহবানু জানে তার সাথে আমি রাগ করতে পারি না। ঠিক না মাহবানু?'

মাথা তুলল ও। বিষন্ন হেসে তাকাল ভাইয়ের দিকে। চোখে টলমলে অশ্রু।

ঃ 'ইয়াসমীন।' কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বলল মিয়ানদাদ। 'অতীত দুর্ঘটনা আমার বোনের দীল খুব কমজোর করে দিয়েছে। তুমি ওকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করো।'

আর দাঁড়াল না মিয়ানদাদ, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এর পরই ব্যস্ততা বেড়ে গেল মিয়ানদাদের। কখনো কখনো বাড়ীতে আসার সুযোগ হয়তো মিলত কিন্তু সাধারণ ভাবে ঘরের বাইরেই কাটাতে হত রাত। হঠাৎ এক রাতে ঘরে ফিরে এল মিয়ানদাদ। খাবারের পর পরই শুয়ে পড়ল সে।

ঃ 'ভাইজান, আপনার শরীর খারাপ?' প্রশ্ন করল মাহবানু।

ঃ 'আমি বিলকুল ঠিক। কেবল একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

খানিক পরই গভীর নিদ্রা এসে জেঁকে ধরল তাকে।

রাতের শেষ প্রহর। চোখ খুলতেই ইয়াসমীনের মনে হল কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। বিছানা থেকে উঠে ও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কতকক্ষণ। আস্তে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ঃ 'ইয়াসমীন, ইয়াসমীন।'

পরিচিত ডাক শুনে হৃদয় ধুকপুক করতে লাগল ইয়াসমীনের। দরজা খুলতে চাইল, কিন্তু জিঞ্জির পর্যন্ত পৌছেই থেমে গেল হাত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ও কখনো একা আলাপ করার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি, রাতে দরজার কড়া নাড়ার তো প্রশ্নই উঠে না। কতকক্ষণ কোন ফয়সালা করতে পারল না ও। ওর মনে হল সে ফিরে যাচ্ছে।

ভয়, সংকোচ আর ভালবাসার মিলিত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ইয়াসমীন কাঁপা হাতে দরজা খুলল। বাইরে কেউ নেই। অলিন্দের এক কোণে মিয়ানদাদের কামরা। আলো জ্বলছে ভিতরে। আলতো পায়ে এগিয়ে গেল ও। আলোকিত দরজার কাছে পৌছেই

থমকে দাঁড়াল। দীলের স্পন্দন বেড়ে গেল তার। অকস্মাৎ ভয় পেরেশানী আর সংকোচ ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে উঁকি মারল দরজা দিয়ে। বর্ম পরে মিয়ানদাদ ফিতা বাঁধছিল তরবারীর। বসে গেল ইয়াসমীনের দীল।

ঃ 'আপনি আমায় ডেকেছিলেন?'

ফিরে চাইল মিয়ানদাদ। গম্ভীর কণ্ঠে বললঃ 'ইয়াসমীন, আমি যাচ্ছি। নীরবে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু হিম্মত হল না। তোমার দরজার কড়া নেড়ে মনে করেছি, তুমি গভীর ঘুমে। মাহবানুকে না জাগিয়ে তোমার কাছে বিদায় নিতে পারব না, অথচ তার সামনে যেতে আমার ভয় করছে।'

ঃ 'হামলা করার জন্য যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, যে দায়িত্ব আমায় দেয়া হয়েছে তা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঝুকি বহুল। ইরানের লশকর থেকে বাছাই করা বার হাজার জানবাজ শহর থেকে বেরিয়ে হামলা করবে আজ। এদের অধিকাংশই মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিক লড়াইতে অংশ নিয়েছে। অনেকে লড়েছিল রোমানদের বিরুদ্ধেও।'

ঃ 'রুস্তমের বিশাল লশকরকে যারা পরাজিত করেছে, তাদের হামলা করার জন্য এ বার হাজার সৈনিককেই কি আপনি যথেষ্ট মনে করছেন?'

ঃ 'দুশমন যেন অবরোধ তুলে নেয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই এ হামলার উদ্দেশ্য, অথবা খন্দকের পেছনে পরিখা থেকে বেরিয়ে যেন শহরে হামলা করে। অবরুদ্ধ হয়ে বহরাশিরের মজবুত পাঁচিলে কোন উপকার হয়নি আমাদের। কারণ, পাঁচিলে ওরা কোন জোরদার হামলা করেনি। ওদের ছাউনীর চারদিকে পরিখা। ওদের পরিখাগুলো আমাদের তীর থেকে নিরাপদ। আমাদের সামনে পরিখা। পাঁচিলের দিকে আসার জন্য রয়েছে তিনটি সংকীর্ণ পথ। কিছুক্ষণের জন্য এ পথগুলো কব্জা করে নিতে পারলে মাদায়েনের গোটা লশকর এসে যাবে আমাদের পেছনে। মুহূর্তে পরিখার কয়েক স্থানে পথ করে নেব। সফল হলে ওদের পেছন পর্যন্ত আমাদের লশকর যেতে পারবে। ওদের বাধা দূর্লঙ্ঘ হলে পিছিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হবে না আমাদের।

ওদের দু'চার হাজার লোক শেষ করে দিতে পারলে হিম্মত টিকিয়ে রাখার জন্য জওয়াবী হামলা করতে বাধ্য হবে ওরা। আমরাও তাই চাই। ওদের আরামে বসতে দিলে অবরোধ দীর্ঘ হবে। এতে ওদের কোন অসুবিধা হবে না। ইরাকের ফসলি জমিন ওদের দখলে। কৃষক আর জমিদারদের মাধ্যমে রসদের সকল ঘাটতি ওরা পুষিয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া অতীতের ধারাবাহিক বিজয়ের কারণেও অটুট থাকবে ওদের হিম্মত। চূড়ান্ত লড়াই যত শীঘ্র হবে ততই আমাদের মঙ্গল। পরিখা থেকে কয়েকটা ব্যর্থ হামলার পর যখন ওরা দেখবে, বহরাশিরের পাঁচিল অত্যন্ত মজবুত, অবরোধ তুলে নেয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না।

ইয়াসমীন, কথাগুলো এ জন্য বলছি, আমার বোনের মত তুমিও আমায় আহাম্মক

অথবা পাগল ভেবো না। আমি জানি কত বিপজ্জনক এ অভিযান। পরিখার ধারে পৌছতেই সম্মুখীন হব তীর বৃষ্টির। কিন্তু দুশমনের হিম্মত ভেংগে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করার এই একটা পথই বাকী। কোরবানী ছাড়া বিজয় আসে না। ভোরে যে সব আত্মনিবেদিত সৈনিক বেরোবে বহরাশির থেকে ওদের অনেকেই হয়ত আর ফিরে আসবে না। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা। কিন্তু যদি ফিরে আসি, তোমায় এ পয়গাম দিতে পারব, বহরাশির আর মাদায়েনকে আমরা বাঁচিয়েছি। আমার বিশ্বাস, তখন আমাদের হাতে তলোয়ার দেখে অশ্রু ঝরানোর প্রয়োজন অনুভব করবে না মাহবানু।'

কোন রকমে কান্নার আবেগ দমন করে ইয়াসমীন বললঃ 'জানিনা, আপনার পরিকল্পনা সফল হবে কদ্দুর। আমি শুধু এদ্দুর জানি, যদি আমার শক্তি থাকতো, যদি আমি আশা করতে পারতাম আমার কথা আপনার মনকে প্রভাবিত করতে পারবে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি চিৎকার করে বলতাম, আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আপনি, ভোরের সূর্যোদয়কে কেউ ঠেকাতে পারে না।'

কেঁপে উঠল মিয়ানদাদের সমগ্র অস্তিত্ব।

ঃ 'ইয়াসমীন, এ তোমার কথা হতে পারে না।'

ঃ 'এর চেয়ে বেশীই বলতে চাই আমি, কিন্তু সে ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। আর পেলেই বা কি, আপনি তো আমার কথা শোনবেন না।'

গোলামের আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে।

ঃ 'দু'জন সিপাই আপনাকে ডাকছে, ঘোড়াও নিয়ে এসেছে আপনার জন্য।'

ঃ 'ওদের বল আমি আসছি।'

ফিরে গেল গোলাম।

মিয়ানদাদ ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'এখন তর্ক করার সময় নেই। আমি যাচ্ছি এই আশা নিয়ে, এই আমাদের শেষ দেখা নয়। যখন ফিরে আসব, কোন সংকোচ, ভয় অথবা লজ্জা ছাড়াই সে কথা বলতে পারব, যে কথা এখনও তোমায় বলিনি, যে কথা বলার স্বপ্ন দেখেছি বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনার মাঝেও, যে কথা বলার জন্য বেঁচে আছি আমি। ইয়াসমীন, ফোরাতের ওপারে এক গ্রাম, সে গ্রামের এক পুরনো বাড়ী, তোমার এ মহলের চেয়ে সুন্দর নয়, তবুও তার নকশা থাকে আমার দৃষ্টির সামনে। যখন বন্দী ছিলাম, ভাবতাম, আবার আবাদ হবে সে বিরান বাড়ী। ওখানে আমি যাব। আমার বোন হয়ত পথ চেয়ে আছে আমার। তার সাথে থাকবে আমার স্বপ্নের শাহজাদী। কিসরার মহলের চাইতে বেশী সুন্দর মনে হবে সেই পুরনো বাড়ীটা। ইয়াসমীন, তুমি জান, কে সেই শাহজাদী?'

জওয়াব দিল না ইয়াসমীন। নত হয়ে এল তার দৃষ্টি।

ঃ 'ইয়াসমীন, কোনদিন তোমায় সে বিরান ঘর আবাদ করার দাওয়াত দেব, এ আশাই আমার শেষ আশ্রয়। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। বিদায় বেলা কথা দাও, ফিরিয়ে

দেবে না আমার দাওয়াত। আর যদি ফিরে না আসি, আমার বোনকে বুঝতে দিওনা ও একা।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস এটাই আমাদের শেষ মোলাকাত নয়। আপনার জন্য মাহবানুর দোয়া বিফলে যাবে না। তার সাথে দেখা করে যাবেন না?'

ঃ 'না, কিন্তু ওকে বোল তার ওপর আমি রাগ করিনি।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মিয়ানদাদ।

বত্রিশ

পরদিন। মাহবানু ও ইয়াসমীন অধীর আগ্রহে বাড়ীর বাইরে মিয়ানদাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল ভয়ার্ত জনগণ এদিক ওদিক পাগলের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটাছুটি করছে। ওদের ডাক চিৎকার এবং আশপাশের বাড়ী থেকে আসা মাতমের শব্দে বুঝা গেল মুসলমানদের উপর হামলাকারী লশকর পরাজিত হয়ে ফিরে আসছে। পেরেশান হয়ে মিয়ানদাদের খবর নেয়ার জন্য ওরা কাউসকে বড় রাস্তায় পাঠিয়ে দিল। ঘন্টা খানেক তার অপেক্ষা করে পাঠাল অন্য আরেক গোলামকে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছিল ওদের উৎকণ্ঠা। মাহবানু সড়কের ছুটে যাওয়া লোকদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল কয়েকবার। কিন্তু ফিরেও তাকাল না কেউ।

কয়েকজন অশ্বারোহীকে হঠাৎ দেখা গেল রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। ছুটে ওদিকে গেল মাহবানু। দু'হাত উপরে তুলে সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল সে। কিন্তু বিমূঢ় অশ্বারোহীরা মাহবানুর কাছে এসেও ঘোড়ার গতি কমালো না।

প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে ওরা। চটজলদি ছুটে একদিকে সরে গেল মাহবানু। ইয়াসমীনের সাথে ধাক্কা লেগে দু'জনই পড়ে গলে সড়কের পাশে। উঠে কাপড়ের বালি ঝাড়ছিল ওরা, এক অশ্বারোহী ফিরে এসে বলল ঃ 'আপনাদের আরেকটু সাবধান হওয়া উচিৎ। সড়কে সিপাইদের পথ রোধ করা অন্যায়। খুব লাগেনি তো?'

বিরক্ত কণ্ঠে মাহবানু বললঃ 'সড়ককেও তোমরা লড়াইয়ের ময়দান মনে কর জানতাম না। আমি আমার ভাইয়ের খবর জানতে চাচ্ছি।'

আর কিছু না বলেই ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিল অশ্বারোহী। তাড়াতাড়ি এগিয়ে মাহবানু বললঃ 'দাঁড়াও, আমি মিয়ানদাদের বোন।'

পিছনে না তাকিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল অশ্বারোহী।

সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েক ব্যক্তি ওদের দেখছিল। ওদের মধ্য থেকে দৈত্যের মত এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। তার চোখ থেকে ঝরছিল উন্মত্ত পাশবতা।

মাহবানুর কাছে এসে বললঃ 'আপনি কি পারভেজের নাতনী?'

পোশাক ও চেহারায় সন্দেহ হল মাহবানুর। ও বলল ঃ 'না।'

ঃ 'তাহলে আপনি তার নাতনী?' প্রশ্ন করল ইয়াসমীনকে।

জওয়াব না দিয়ে মাহবানুর দিকে চাইল ইয়াসমীন। ততোক্ষণে সড়ক পেরিয়ে বাকীরাও চলে এসেছে ওদের পাশে। ভয় পেয়ে ফটকের দিকে সরে এল ওরা। লোকগুলোও সরে এল ওদের সাথে। গেট থেকে তিনজন সশস্ত্র গোলাম ছুটে এল।

ঃ 'তোমরা কে? এখানে কি করছ?' তেড়ে উঠে বলল এক গোলাম।

ঃ 'আমরা কুলি মজুর। ভেবেছিলাম আপনারা কাজ করাবেন। শহর খালি হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের মালপত্র নদীর ঘাটে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমি বিশজন কুলি যোগাড় করে দিতে পারি।'

মাহবানু গর্জে বললঃ 'যাও এখান থেকে, আমাদের কোন কুলি মজুরের দরকার নেই।'

সাথীদের ইশারা করল কালো ব্যক্তি। হাঁটা দিল ওরা। এক গোলাম মাহবানু এবং ইয়াসমীনের দিকে ফিরে বললঃ 'আপনাদের এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়, ভেতরে চলে যান।'

ঃ 'কিন্তু ওরা কারা?'

ঃ 'জানিনা, আগে কখনো ওদের দেখিনি।'

ঃ 'কালো লোকটি দেখতে কি ভয়ংকর। আমার মনে হচ্ছিল পাগল। কিন্তু ইয়াসমীনের নানার ঘরও চেনে সে।'

ঃ 'কাউস আসছে।' অন্য গোলাম বলল।

সড়কের দিকে চলে গেল ওদের দৃষ্টি। হাঁপাতে হাঁপাতে নিকটে এসে কাউস বললঃ 'মিয়ানদাদের কোন খবর নেই। শহরের ফটক বন্ধ। ছাউনী খালি হয়ে যাচ্ছে। মাদায়েনের দিকে যাত্রা করছে ফৌজ। আমি যখন ছাউনীতে পৌছলাম অল্প কয়জন যখমী মাত্র সেখানে ছিল। অন্যদের পৌছে দেয়া হয়েছে নদীর ওপারে। এক অফিসার আমাকে বলল, আহত সিপাইদের ছাউনীতে আনা হয়েছে, অফিসারদের নেয়া হয়েছে কেল্লায়। কেল্লায় যাব এমন সময় শাহানশাহের অশ্বারোহীদের চলাচলের জন্য আটকে দেয়া হল পথ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। শাহানশাহ, শাহজাদী পুরান এবং ফৌজি অফিসারদের রথ, তাদের পেছনে অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী। মনে হয় আদমানকেও দেখলাম অশ্বারোহীদের সাথে। কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারছিনা। তারা খুব দ্রুত ছুটছিল, এ জন্য ভাল করে দেখতে পাইনি। রাস্তা পরিষ্কার হলে কেল্লার কাছে পৌছলাম। ফটক বন্ধ। এক পাহারাদার বলল, কেল্লা এবং শাহী মহল শূন্য। আহতদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মাদায়েনে। বেটি, এখন সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়, মিয়ানদাদ আহত হয়েছে এবং তাকেও মাদায়েনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

অশ্রু মুছে মাহবানু বললঃ 'কিন্তু কেউ আমাদের সংবাদ দেয়নি কেন?'

ঃ 'বেটি, শহর খালি হয়ে যাচ্ছে। চলে গেছে ফৌজ। এ ভীতিজনক অবস্থায় কেউ কারো খেয়াল রাখতে পারে না। নদীর পুলে এত ভীড়, কয়েকজন বুড়ো আর শিশু পায়ের নীচে পিষে গেছে। কেউ কেউ নৌকা দিয়ে পার হচ্ছে নদী। সরকারী ঘোষক ঢেড়া পিটিয়ে ফিরছে বাজারে বাজারে, 'শাহনশাহের হুকুম, সূর্য ডোবার পূর্বেই শহর খালি করে দিতে হবে।' এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, পুলে পৌঁছাও তোমাদের জন্য মুশকিল হবে। বিকেলের দিকে জটলা কিছুটা কমতে পারে। মিয়ানদাদের সংবাদ তখন হয়ত পাওয়া যাবে।'

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কান্না রোধ করে মাহবানু বললঃ 'এমনটি হতে পারে না, অবশিষ্ট লশকরের মত তিনিও চলে গেছেন শাহানশাহের সাথে? খুব শীঘ্র ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন বলে আমাদের সংবাদ দেননি। তুমি না বলছ তীব্র গতিতে লশকর চলে গেছে! হাজারো মানুষের ভিড়ে তোমার দৃষ্টি হয়তো তার উপর পড়েনি।'

অব্যক্ত আশা নিয়ে ইয়াসমীনের দিকে চাইল মাহবানু। কাউস বললঃ 'হ্যাঁ বেটি, এমনটি হতে পারে। হাজার হাজার অশ্বারোহী, ভালভাবে আমি দেখতেও পারিনি। মুহাফিজ ফৌজের কতক দল তো চলে গেছে শাহানশাহের রথেরও আগে। তখনো ওখানে পৌঁছিনি আমি।'

ঃ 'নিশ্চয়ই ও তাদের সাথেই ছিল। অবশ্যই আসবে সে। কিছুক্ষণের মধ্যে না এলে মাদায়েন গিয়ে তাকে আমরা খুঁজব।'

ঃ 'আমার ভাই যদি বেঁচে থাকেন আর আহত না হন তবে না আসার প্রশ্নই উঠে না।' বলল মাহবানু।

ঃ 'বেটি, অন্দরে গিয়ে তার জন্য দোয়া করো। আমি মাদায়েন যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে থাকলে খুঁজে নিতে আমার অসুবিধা হবে না। পুলে বেশী ভিড় হলে সাঁতরেও নদী পার হতে পারব আমি।'

ঃ 'ঠিক আছে চাচা, আপনি ঘোড়া নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন।' বলল মাহবানু।

ঃ 'না বেটি, রাস্তায় এত ভীড়, ঘোড়া কাজে আসবে না।'

ঘন্টা খানেক পর। ছাদে বসে সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল ইয়াসমীন ও মাহবানু। নিচে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক গোলাম। দ্রুতগতি ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল সড়ক থেকে। চিৎকার করে গোলাম বললঃ 'আদমান এসে গেছে।'

ছুটে নেমে এল ওরা। ফটক পার হয়ে ছুটে গেল সড়কে। দ্রুত তাদের পাশে এসে ঘোড়া থামিয়ে আদমান বললঃ 'আপনার ভাই নদীর ওপারে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ও আহত, নিজের ঘোড়ায় করে কেল্লা থেকে তাকে ওখানে রেখে

এসেছি আমি। আহতদের দ্রুত মাদায়েন পৌছানোর হুকুম হয়েছে। ঘাবড়াবেন না, ডাক্তার বলেছে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে, ও যখন তীর বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঘোড়া পড়ে গেল আহত হয়ে। আঘাত লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল সেও। নইলে কি যে হতো!'

ঃ 'কেল্লায় না নিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসেননি কেন?' অনুযোগের স্বরে বলল মাহবানু।

ঃ 'কেল্লায় ভাল ডাক্তার ছিল। শাহানশাহের সামনে একথা প্রমাণ করাও প্রয়োজন ছিল যে, ও পালিয়ে যায়নি, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে তুলে আনা হয়েছে।'

ঃ 'আমাদের সংবাদ দেননি কেন?'

ঃ 'সুযোগ পেলেই আপনাদের কাছে আসব ভাবছিলাম, কিন্তু ব্যস্ততার জন্য আসতে পারিনি। আহতদের মাদায়েন পৌছানোর হুকুম দিয়েই শাহানশাহ ফৌজি দায়িত্বশীলদের বৈঠক ডাকলেন। হামলার ফলাফলে শাহাশাহ ভয়ে বহরাশির খালি করার হুকুম দিয়েছেন। আপনার ভাইয়ের পরিবর্তে আমায় থাকতে হয়েছে সে বৈঠকে। তা ছাড়া সে সময় আপনাদের পেরেশানও করতে চাইনি। ও ছিল অজ্ঞান, সংবাদ দেয়ায় পূর্বে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। আর খবর দিয়েই বা কি হতো! বাইরের লোকদের জন্য রুদ্ধ ছিল কেল্লার ফটক। কোন যখমীর আত্মীয় স্বজনের ভেতরে যাবার অনুমতি ছিল না সে সময়।'

ঃ 'তার জ্ঞান কি ফিরেছে?'

ঃ 'কিছু সময়ের জন্য হুশ ফিরে ছিল ওর। জ্ঞান ফিরতেই ও অবিলম্বে আপনাদের সেখানে পাঠাতে বলল। কিন্তু যখমে ব্যান্ডেজ করার সময় আবার সে জ্ঞান হারাল। তাকে পাল্কীতে বসিয়ে যখন ছাউনী থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, পথে দেখা হল আপনার গোলামের সাথে। আমি নিশ্চিন্তে আপনাকে বলতে পারি, আপনার ভাইয়ের অবস্থা খুব ভাল। তার হেফাজতের জন্য রেখে এসেছি দু'জন সিপাই। আপনারা জলদি ওখানে পৌঁছে যান। আমি দারুণ ব্যস্ত, নয়তো আমিও আপনাদের সাথে যেতাম।

সূর্য ডোবার পর পুল ভেংগে ফেলা হবে। এরপর কোন নৌকাও আপনারা পাবেন না। দেরী করবেন না। শাহানশাহ বেরিয়ে যেতেই পাঁচিলের উপর শাদা ঝান্ডা উড়ানোর চেষ্টা করেছিল কেউ কেউ। ফৌজ শহরের হেফাজতে না থাকলে এতক্ষণে শহরের ফটক খুলে দেয়া হত। তাহলে এখানেও আসতে পারতাম না আমি। সমগ্র ফৌজ এখান থেকে বেরিয়ে যাবে সন্ধ্যা নাগাদ। এব পর শহরের অবস্থা কি হবে বুঝতেই পারছেন। দয়া করে দেরী করবেন না, এখুনি বেরিয়ে যান।'

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' মাহবানুর প্রশ্ন।

ঃ 'আমার কয়েকজন সাথী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেকে। তাদের পরিবারবর্গকে বহরাশির থেকে বের করতে হবে সন্ধ্যার পূর্বেই। এবার আমায়

অনুমতি দিন।'

ঘোড়ায় চাবুক কষল আদমান। কিছুদূর গিয়েই বলগা টেনে ধরল। ফিরে এসে বললঃ 'দেখুন, সময় খুবই অল্প আপনাদের হাতে। সন্ধ্যার আগে পুল পেরোতে না পারলে বেকায়দায় পড়বেন। নিচু স্তরের লোকগুলো থেকে যাবে শুধু লুটপাট করার জন্যই। আপনাদের জন্য মুসলমানদের চেয়ে ওরা হবে বেশী বিপজ্জনক। ইতিমধ্যেই সংবাদ পেয়েছি, কোন কোন এলাকায় ওরা লুটপাট শুরু করে দিয়েছে। ওমরাদের গোলমরাও রয়েছে ওদের সাথে। কয়েকজনকে ধরে হত্যাও করেছে। ফৌজ বেশী সময় থাকবে না এখানে। সন্ধ্যার পর যারা থাকবে, তারা থাকবে চোর ডাকাতদের দয়ার উপর। আপনারা জলদি করুন।'

দু'জন সশস্ত্র গোলামের সাথে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এল ইয়াসমীন ও মাহবানু। মালপত্র নিয়ে কয়েক মিনিট আগে রওয়ানা হয়ে গেছে দু'জন গোলাম।

ফটকে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন পাহারাদার। মাহবানু ওদের শান্তনা দিতে দিতে বললঃ 'ভয়ের কারণ নেই। তাড়াতাড়িই আমরা ফিরে আসব। আমার ভাই আহত না হলে ঘর খালি করে যেতাম না। মাদায়েন পৌঁছেই তোমাদের সঙ্গীদের পাঠিয়ে দেব। মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। ওরা এলে ওদের প্রথম জিম্মা হবে বহরাশিরের প্রতিটি ঘরের হেফাজত করা। প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই করে ওরা, হাতিয়ার যারা ছেড়ে দেয় ওদের গায়ে হাত তোলে না।'

ঃ 'মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই না। আস্থা রাখবেন, ওরা আমাদের হত্যা করতে পারবে না।'

ঃ 'না না, ওরা তোমাদের কোতল করবে না, এ জিম্মা আমি নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, যে মুসলমান প্রথম এ দরজার কড়া নাড়বে, সে তোমাদের অপরিচিত হবে না।'

ঃ 'কে সে?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করল পাহারাদার।

ঃ 'তার নাম সোহেল। আরো কেউ থাকতে পারে তার সাথে। ওরা এখানে থাকতে চাইলে ওদের বুঝতে দিওনা, মেজবান নেই এখানে।'

চঞ্চল হয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল পাহারাদাররা। ওরা নেমে এল রাস্তায়। সামনে সশস্ত্র অশ্বারোহী। এখনো এক ঘন্টা বাকী সূর্য ডোবার, নিশ্চিন্তে নদীর দিকে এগিয়ে চলল ওরা। মাত্র শ'খানেক কদম এগিয়েছে, সড়কের মোড়ে দেখা গেল বোঝা সহ তাদের দু'জন গোলাম উর্ধশ্বাসে ফিরে আসছে। ওদের ধাওয়া করছে পনর বিশজন লোক। হাত শূন্য এক গোলামের। পেছনের গোলামের বোঝা মাথা থেকে নেমে এসেছে ঘাড়ে। ঘোড়া থামাল ওরা। সামনের গোলাম ওদের দেখেই চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ডাকাত আসছে। আমার ঘোড়া নিয়ে গেছে। আপনারা ফিরে চলুন।'

ধাওয়াকারীরা পেছনের গোলামের কাছে চলে এসেছে ততোক্ষণে। হঠাৎ একজন

ছিনিয়ে নিল তার বোঝা। লাঠির আঘাতে তাকে ফেলে দিল আরেকজন।

ঃ 'তোমরা কি দেখছ? ওকে বাঁচাও।' চিৎকার দিয়ে বলল মাহবানু।

নেযা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল গোলামরা। ডাকাতরা হটতে লাগল পেছন দিকে। লুটিয়ে পড়া সঙ্গীর কাছে এসেই থেমে গেল এক গোলাম। আহত গোলাম উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'জলদি এদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

অশ্বারোহী গোলাম ফিরে চাইল মাহবানু আর ইয়াসমীনের দিকে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল তাদের কাছে। যে ডাকাতরা ভয়ে পিছু হটেছিল, প্রায় ত্রিশ কদম দূরে সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছিল ওদের পথ আটকে দেয়ার জন্য। দুপুরের দেখা সেই বিশাল বপুধারী বর্শা হাতে ডাকাতদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানু, এই সেই ব্যক্তি। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত।'

ঃ 'আপনারা সামনে যেতে পারবেন না।' আবেদনের স্বরে বলল আহত গোলাম। 'ওরা সংখ্যায় অনেক। লুটপাট চালাচ্ছে সামনের সবটা সড়ক জুড়ে। মোড় থেকে অন্য পথে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।'

ঃ 'তুমি বাড়ী পৌঁছার চেষ্টা কর। কোন ফৌজ পেলে আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিও।'

ঃ 'পুলের দিকে পালাচ্ছে ফৌজ। কারো সাহায্যে পৌঁছার অবস্থা নেই ওদের।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে তুমি যাও। জলদি কর।' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মাহবানু।

ইয়াসমীনের অন্য গোলাম হাত ধরল আহত গোলামের। বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল ওরা। ভয় আর পেরেশানী নিয়ে ডাকাতদের দিকে তাকিয়ে রইল মাহবানু ও ইয়াসমীন। বাকী গোলামরা ডানে বায়ে অথবা পিছু হটার জন্য তাদের ইশারার অপেক্ষায়। ডাকাত সর্দার এগিয়ে এল কয়েক কদম। বললঃ 'নদীর দিকের পথ রুদ্ধ। ফৌজ আসবে না তোমাদের সাহায্যে। আমরা তোমাদের বাঁচাতে পারি। ইজ্জত বাঁচাতে চাইলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়। আমরা যদি জানতে পারি পারভেজের ধনসম্পদ কোথায়, এখানে দাঁড়াতে তোমাদের বাধ্য করব না। তোমাদের সঙ্গীদের হাতিয়ার ফেলে দিতে বল, নয়তো ওদের হত্যা করবে আমার লোকেরা।'

জওয়াব না দিয়ে অশ্বারোহীদের ইশারা করল মাহবানু। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওরা। তাদের পেছনে ছুটল ডাকাতরা।

মোড়ে পৌঁছে ডানের এক সংকীর্ণ গলি পথে বেরোনোর চেষ্টা করল ওরা। সেখানেও ডাকাতদের আরেকটা দল। চিৎকার দিয়ে মাহবানু বললঃ 'ফিরে চলো। এদিকের সব পথ ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।'

গলি থেকে ওরা বেরিয়ে এল। সামনে পড়ল আগের ডাকাত দল। ওদের একজন এসে ধরে ফেলল ইয়াসমীনের ঘোড়ার লাগাম। এক গোলাম নেযা মেরে রক্ষা করল তাকে। ঘোড়া ছুটিয়ে আবার ওরা এসে পৌঁছল বাড়ীর কাছে। ডাকাতদের পেছনে

ফেলে আসায় সামনের পথ নির্বিঘ্ন ভাবল ওরা। ফটক পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, এক গোলাম ছুটে গিয়ে ওদের বাঁধা দিয়ে বললঃ 'আপনারা সামনে যাবেন না। ওখানেও রয়েছে ডাকাত দল। সামনের মোড়ে শোনা যাচ্ছে নারীদের চিৎকার। সমস্ত এলাকা অবরোধ করে ফেলেছে ওরা।'

তাড়াতাড়ি দেউড়িতে প্রবেশ করল ওরা। ফটক বন্ধ করে দিল গোলাম। দেউড়ির সামনে যখন ডাকাত দল জটলা করছিল হঠাৎ ছাদ থেকে তীর মারতে লাগল পাহারাদার। আহত হয়ে পড়ে গেল তিনজন ডাকাত। হুলুস্থুল পড়ে গেল ডানে বাঁয়ে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানু, কি হবে এখন?'

ঃ 'আমাদের এখানে থাকটাই হয়ত আল্লাহর ইচ্ছে।'

ঃ 'কিন্তু ফৌজ শহর খালি করে দিলে এরা জিন্দা রাখবে না আমাদের।'

ঃ 'আল্লাহ আমাদের মদদ করবেন।' বলল মাহাবানু।

একটু পরে গোলামের সাথে ছাদে দাঁড়িয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা। তীরের আওয়তার বাইরে তখন ডাকাতরা। ডান দিক থেকে অকস্মাৎ ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

ঃ 'মাহবানু, ফৌজ আসছে। পালাচ্ছে ডাকাতরা। হয়ত শহরে লুটপাট হচ্ছে দেখে আমাদের কথা মনে হয়েছে আদমানের। আমাদের নিতে আসছে ও।' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'কিন্তু, সেইতো বলেছিল, সূর্য ডুবলেই পুল ভেংগে দেয়া হবে। সূর্যও ডুবে যাচ্ছে প্রায়।'

ঃ 'ও যদি আমাদের সাহায্যেই আসে, আমার মনে হয় তার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করবে পুলের মুহাফিজ।'

আশান্বিতা হয়ে সড়কের দিকে চাইতে লাগল মাহবানু। গলি ঘুচির মধ্যে আত্মগোপন করেছে ডাকাতরা। বাদিকে ইশারা করে ইয়াসমীন বললঃ 'সিপাই আসছে। নিচে চলো, আমাদের জন্য বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারবে না ওরা।'

ওরা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। পঞ্চাশ ষাট জন সিপাই পৌঁছল দেউড়ির কাছে। কিন্তু থামার বা ওদের দিকে ফিরে চাইবার প্রয়োজনও মনে করল না কেউ। দৌড়ে বেরিয়ে এল মাহবানু। ডাকতে লাগলঃ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সাথে নিয়ে চলো আমাদের। আমি মিয়ানদাদের বোন। তোমাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। ডাকাতের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।'

কিন্তু ব্যর্থ হল তার সকল চেষ্টা। চলে গেল অশ্বারোহীরা, ফাঁকা হয়ে গেল সড়ক।

ঘোড়ার লাগাম ধরে চিৎকার দিয়ে মাহবানু বললঃ 'ইয়াসমীন, জলদি কর।

ওদের সাথে শামিল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

দু'জন সশস্ত্র গোলাম নিয়ে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হল ওরা। সিপাইরা তখন সড়কের মোড় পেরিয়ে গেছে। ওরা খানিকটা এগিয়ে যেতেই আশ পাশ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ডাকাত দল। না থেমে ওরা দ্রুত ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। হঠাৎ মোড়ের কাছে এক বাড়ীর ছাদ থেকে শুরু হল পাথর বৃষ্টি। আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এক গোলাম। গলি থেকে লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে বেরিয়ে এল কয়েক ব্যক্তি। দাঁড়াল ওদের পথে।

ঃ 'ইয়াসমীন, ফিরে চলো।' চিৎকার দিয়ে বলল মাহবানু। 'নয়তো ওরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে।'

উল্টো দিকে ছুটল ওরা আবার। ডাকাতদের আরো দু'দল তাদের সামনে। প্রথম দলকে হামলা করে একজনকে ফেলে দিল গোলাম। ডানে বাঁয়ে সরে গেল অন্যরা। ততক্ষণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্য গোলামরা। তীর মেরে ওরা হটিয়ে দিল ডাকাতদের। ঘোড়া থেকে নেমেই ফটক বন্ধ করার হুকুম দিল মাহবানু। দৌড়ে উঠে এল ছাদে। তীর থেকে গা বাঁচিয়ে ডানে বাঁয়ে অবস্থান নিল ডাকাতরা।

সূর্য ডুবে গেছে। এ বাড়ীর অবরোধে সময় ব্যয় না করে লুটপাট করার জন্য বাঁধামুক্ত বাড়ীর রোখ করল ওরা। ফাঁকা সড়কে নজর বুলিয়ে মাহবানু বললঃ 'এ বাড়ী এখন আমাদের কেল্লা। এ পশুগুলো যেমন জালিম তেমনি ভীতু। তোমাদের তূনীরে যতক্ষণ তীর থাকবে, কাছেও ঘেঁষবে না ওরা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তীর ছুড় না।'

ঃ 'তীরের অভাব নেই আমাদের।' বলল গোলাম। 'আমরা দরজার কাছেই আসতে দেব না ওদের। কিন্তু পেছনের পাঁচিল ভেংগে যদি বাড়ীতে ঢোকে তা হলে?'

ঃ 'তখন বাড়ীর ভেতর মহলে আশ্রয় নিতে হবে আমাদের। বালাখানার জানালা অথবা দোতালার ছাদ থেকে তীর ছুঁড়ে ওদের আমরা দূরে রাখতে পারব। রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই আমরা বিপদমুক্ত। ভাইজান নিশ্চয়ই আমাদের বের করে নেবেন।'

ঃ 'কিন্তু রাতেই যদি মুসলমানরা বহরাশির কব্জা করে নেয়?'

ঃ 'ওরা বহরাশির কব্জা করলে আমি জিম্মা নিচ্ছি তোমাদের। মুসলমানদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

ঃ 'পেছনের পাঁচিল ভেংগে যে কোন সময় ডাকাতরা বাড়ীতে ঢুকতে পারে। আপনারা সবাই অন্দরে চলে যান। আমি এখানেই থাকছি। রাতে এদিক থেকে হামলা করলে বুঝতে দেব না আমি একা। জলদি করুন। এ স্থানও আপনাদের জন্য বিপজ্জনক।'

পেরেশান হয়ে বিমূঢ়ের মত তার দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'কিন্তু তুমি .... ?'

ঃ 'আমার জন্য ভাববেন না। আপনাদের হুশিয়ার করতে একটু পরপর আওয়াজ দেব আমি। যদি ওরা দরজায় ভীড় করে, আমি বাঁধা দিতে না পারি, আপনাদের কাছে পৌঁছে অথবা বাগানে লুকিয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করব। খোদার দিয়ে চেয়ে যান আপনারা।'

অন্য চাকরদের নিয়ে নিচে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল ওরা দু'জন। দ্বিতীয় গেট পেরিয়ে প্রবেশ করল বাগানে। আচানক গাছের আড়াল থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। এই সে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া গোলাম। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। মাহবানু প্রশ্ন করল ঃ 'পেছনের দেয়াল ভেংগে এসেছ?'

ঃ 'একটা কাঠের সিঁড়ি পেলাম পেছনের গলির এক খালি বাড়ীতে। পেরেশান হবেন না। দেয়াল টপকাতে কেউ দেখেনি আমাকে। সিঁড়িও নিয়ে এসেছি। ওদের কথাবার্তায় যা বুঝেছি, ওরা রাতেই হামলা করবে।'

ঃ 'চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বলব, এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়। তোমার খুব চোট লাগেনি তো?'

ঃ 'জ্বী না, পাথর লেগেছিল পায়ে, সাথে সাথে ঘোড়াটা লাফ মারতেই পড়ে গেলাম। বাঁচার জন্য নিঃসাড় পড়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। আমার ঘোড়াটা ধরে নিয়ে গেল ওরা। কিন্তু কেউ ফিরেও চাইল না আমার দিকে। আমি .... ।'

ঃ 'এখন কথা বলার সময় নেই, চলো।' কথার মাঝখানে বলল মাহবানু।

কতক্ষণ পর। ওরা গিয়ে দাঁড়াল বালাখানায় আঙ্গিনার দিকে খোলা জানালার পাশে। গোলাম শোনাতে লাগল তার কাহিনী।

সে বললঃ 'ঘোড়া থেকে পড়ে নিঃসাড় শুয়ে রইলাম। মৃত ভেবে সরে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পর কানে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে সরে গেলাম। দেখি সিপাই যাচ্ছে। উঠে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার ডাক-চিৎকারে কোন আমলই দিল না ওরা। আমিও ছুটতে লাগলাম ওদের সাথে। ডাকাতরা গলি থেকে বেরিয়ে আবার জমা হতে লাগল সড়কে। আগে পিছে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। পাশেই দেখলাম এক বাড়ীর খোলা গেট। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঢুকেই বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। কিন্তু আমার দিকে খেয়াল দিল না কেউ। হয়ত আমায়ও মনে করছিল ওদের সংগী। ডাকাত দল ফটকের কাছে পৌঁছে কথা বলতে লাগল। ওরা বলছিল রাতে দেউড়িতে হামলা না করে পেছন থেকে পাঁচিল ভাঙবো আমরা। কেউ ডেকে বললঃ 'বেকুব! কি করছ এখানে? মহল্লায় হাজার হাজার আমীরের ঘর খালি পড়ে আছে। এসো আমার সাথে। এমন ঘর দেখিয়ে দেব, যে ঘরের গোপন কক্ষে আমীরজাদারা লুকিয়ে।'

ছড়িয়ে গেল ওরা। সড়ক পথে আসতে চাইলাম দেউড়ির দিকে। কিন্তু সন্দেহ হল আপনারা অন্দরে পৌছে থাকলে তো ফটক বন্ধ থাকবে। এগিয়ে গেলাম চকের দিকে। পথে দেখা হল কয়েকটা দলের সাথে। লুটের মাল নিয়ে পালাচ্ছে ওরা। আমার দিকে নজর দিল না কেউ। ঘোড়া থেকে পড়ার সময় হারিয়ে ছিলাম নেযা। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় ফেলে দিলাম তরবারী। কেউ সন্দেহ করল না আমায়। এক বাড়ী থেকে নারীর চিৎকারের সাথে ভেসে এল ডাকাতদের অট্টহাসি। কিন্তু কোন মদদ তাদের করতে পারিনি। একটা লম্বা চক্কর দিয়ে পেছনের গলিতে ঢুকলাম। কেউ নেই। এক বাড়ীতে পেলাম মই। যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, মানুষের আওয়াজ ভেসে এল কানে। তাড়াতাড়ি উঠে মই টেনে ভিতরে নিয়ে এলাম।'

নিশুতি রাত। ডাকাতরা হয়ত এ বাড়ীতে হামলার করার ইচ্ছা পাল্টে ফেলেছে, এ আশা জাগল মাহবানুর দীলে। দু'জন যখমী গোলাম সহ তিনজন পাহারা দিচ্ছিল ছাদে। ইয়াসমীন এবং মাহবানু দোতালার কামরায় বাগানের দিকের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করার পূর্বে বাড়ীর ছাদে এবং কামরায়, ইট ও পাথর জমা করেছে গোলামরা।

মাহবানু এবং ইয়াসমীনের হাতে তীর ধনু। তীরে ভরা তূনীর। আশপাশের বাড়ীতে শোনা যাচ্ছিল লুটেরাদের হাকডাক। আচানক দেউড়ির দিক থেকে আওয়াজ দিয়ে গোলাম বললঃ 'হেই হুশিয়ার! ওরা আসছে। এগিয়ে আসছে দেউড়ির দিকে।'

মানুষের হৈ হুল্লোড়ের মধ্য থেকে আবার শোনা গেল গোলামের আওয়াজঃ 'ওরা ফিরে যাচ্ছে। পালাচ্ছে ওরা।'

আবার নীরব হয়ে গেল সড়ক। বাগানের দিকে কারো পায়ের শব্দ হল। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল ওরা। ছাদ থেকে ছুটে এসে এক গোলাম বললঃ 'আপনারা হুশিয়ার থাকবেন। হয়ত পেছনের পাঁচিল ভেংগে ওরা অন্দরে এসে গেছে। এগিয়ে এলেই তীর চালাবেন।'

ঃ 'আমরা জানি। তুমি গিয়ে দেউড়ির মুহাফিজকে সাবধান কর।'

ফিরে গেল গোলাম। ধুনতে তীর চড়াল মাহবানু। চাঁদের আলোয় তাকিয়ে রইল আঙ্গিনায় দিকে।

আচম্বিত বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন পনের লুটেরা। তীর চালাল মাহবানু। তিন ব্যক্তি পড়ে গেল তীরের আঘাতে। চিৎকার দিয়ে বাকীরা ফিরে গেল বৃক্ষের আড়ালে। সাথে সাথে দেউড়ি থেকে শোনা গেল রক্ষীদের আওয়াজঃ 'ওরা বাহির দেয়াল পার হয়ে চলে এসেছে ভেতরে। সংখ্যায় অনেক বেশী, দরজা বন্ধ রেখো।'

হামলাকারীদের হৈ হুল্লোড়ে হারিয়ে গেল গোলামের আওয়াজ। ছাদে শোরগোল করতে লাগল পাহারাদাররা।

ঃ 'ভিতরে জমা হচ্ছে ওরা। এদিকেই আসছে।'

ইয়াসমীনের দিকে তাকাল মাহবানু। ধনুতে তীর গেঁথে দাঁড়িয়ে ছিল ও। কিন্তু তার হাত কাঁপছিল।

ঃ 'আমার বোন।' মাহবানু বলল 'হিম্মত নিয়ে কাজ কর। সোহেল বলত, ইস্পাহানে তুমি তীরন্দাজীর অনুশীলন করতে। তোমার নিশানাও খুব ভাল।'

ঃ 'দেউড়ি কব্জা করে নিয়েছে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহরাশিরের সব ডাকাতরা জমা হবে এখানে। আমরা বাঁচতে পারব এখনো আশা করো?'

ঃ 'আল্লাহ সবই করতে পারেন। তিনি যদি আমাদের বাঁচাতে চান, সব পশুরা একত্রিত হলেও আমাদের কিছুই করতে পারবে না। হিম্মত হারালে চলবে না আমাদের।'

বৃক্ষের আড়াল থেকে কেউ বললঃ 'এখন আর তোমরা বাঁচতে পারবে না। হাতিয়ার ফেলে দেয়ার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল। আত্মসমর্পন কর, গোলামদের গায়ে আমরা হাত তুলব না। দু'টো মেয়ের জন্য নিজেদের বিপদে জড়িয়ো না। দরজা খুলে দিলে দৌলতের অর্ধেক ভাগ তোমাদের।'

পাথর ছুঁড়ল এক গোলাম। খামোশ হয়ে গেল কণ্ঠ। বাগানে তীরের আঘাতে পড়ে গেল কয়েক জন। কয়েক জন পৌঁছে গেল করিডোরে। পিছিয়ে গেল বাকীরা। বারান্দায় উঠে আসা ডাকাতরা ধাক্কাতে লাগল সিঁড়ির দরজা। এর পরই এক দঙ্গল মানুষ উঠে এল বারান্দায়।

এলাপাথাড়ি তীর ছুড়ছিল মুহাফিজ। কিন্তু ডাকাতের জটলা তীরের আওতার বাইরে।

ঃ 'মাহবানু, দরজা ভাঙছে ওরা।' চিৎকার দিয়ে বলল ইয়াসমীন।

মাহবানু গোলামকে বললঃ 'সংগীদের ডেকে কামরার দরজা বন্ধ করে থাকো। এ দরজা ভেঙ্গে ফেললে পেছনের কামরায় চলে যাবে। অন্তিম সময় পর্যন্ত আশা ছাড়ব না। এ ছাড়া কোন পথ নেই আমাদের।'

একটু পর সব গোলাম এসে জমা হল সেখানে। হঠাৎ সিঁড়ি ভাংগার শব্দ হল। উপর দিকে উঠতে লাগল লোকেরা।

হামলাকারীরা কামরার দরজা ঠেলছিল ভিতর দিকে, গোলামরা ঠেলছিল বাইরে। আচানক নিচ থেকে ভেসে এল কারো ভয়ার্ত আওয়াজঃ 'ফৌজ এসে গেছে, ভাগো সবাই।'

ক'জন দ্রুতগামী অশ্বারোহী আঙ্গিনায় প্রবেশ করেই ডাকাত দলের উপর হামলা করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগল ডাকাতরা। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো মাহবানু। ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পনর বিশটা

লাশ। একপাশে দাঁড়ানো কয়েকজন সশস্ত্র অশ্বারোহী।

ঃ 'মাহবানু, মাহবানু,।' পরিচিত শব্দে চমকে উঠল ও।

ঃ 'হাসান!'

আবার ডাকল হাসান।

ঃ 'জওয়াব দাও মাহবানু, ও ডাকছে তোমায়।'

ঃ 'আমি জীবিত, এখানে আমি।' অতি কষ্ঠে বলল মাহবানু।

ঃ 'ইয়াসমীন আপা কোথায়?' সোহেলের কণ্ঠ।

ঃ 'ও আমার সাথে।'

ঃ 'মিয়ানদাদ?' প্রশ্ন করল হাসান।

ঃ 'এখানে নেই।' অশ্রু মুছে জওয়াব দিল মাহবানু।

ইয়াসমীন বলল ঃ 'মাহবানু আমি নিচে যাচ্ছি।'

ইশারা পেয়ে কবাট খুলে দিল গোলাম। নিচে নেমে এল ও। তাকে দেখে ঘোড়া থেকে নামল হাসান ও সোহেল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সোহেলের দিকে চাইল ও। হাসানের দিকে ফিরে বললঃ 'আমি ইয়াসমীন।'

ঃ 'আমি জানি।' বলল হাসান। 'মাহবানু তো আহত নয়?'

ঘোড়া ছুটিয়ে এক অশ্বারোহী এসে বললঃ 'ত্রিশ চল্লিশ ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করেছি। তাদের ব্যাপারে আপনার হুকুম?'

ঃ 'লাশ তুলে নিতে বল ওদের। এর পর ওদের কেল্লায় নিয়ে যেও।'

খানিক পর বালাখানায় বসে ইয়াসমীন ও মাহবানুকে হাসান বলছিলঃ 'আমার ধারণা ছিল আপনারা এখানে নেই। কিন্তু বাইরে থেকে ফটক খোলা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আপনাদের গোলামকে চিনে ফেলল সোহেল। দেউড়িতে সিঁড়ির সামনে পড়েছিল ও! সে শুধু এদ্দুর বলতে পেরেছে, আপনারা এখানে। বাড়ীতে হামলা হয়েছে। কোন খবর নেই মিয়ানদাদের।'

ঃ 'তিনি আহত হয়ে মাদায়েন চলে গেছেন।' বলল মাহবানু।

ঃ 'তার মানে ও মুক্তি পেয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'কাউস কোথায়?'

ঃ 'তাঁর কাছে গিয়েছে।'

ঃ 'যদি জানতাম এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, তবে রাতের শুরুতেই চলে আসতাম। দুপুরেই আমরা জেনেছি শহর খালি। ফৌজ নেই। মিয়ানদাদ তো বেশী আহত নয়?'

ঃ 'জানিনা। শুনেছি তত বিপজ্জনক নয়।'

ঃ 'তাকে নিয়ে ভাবনেন না। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই মাদায়েন পৌছব।

এবার আমায় অনুমতি দিন।'

ঃ 'আপনি যাচ্ছেন?' উদাসীনতায় ছেয়ে গেল মাহবানুর চেহারা।

ঃ 'হ্যাঁ, বাইরে অনেক কাজ। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন কোন বিপদ নেই আপনাদের।'

ঘোড়ায় সওয়ার হল হাসান। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল মাহবানু ও ইয়াসমীন।

তেত্রিশ

নিদারুণ অসহায় অবস্থায় নদীর পারে এক পুরনো বাড়ীতে বসেছিল মিয়ানদাদ। মাহবানু ও ইয়াসমীনের ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছিল তার। এ ঘরে আদমান এনে পৌছে দিয়েছিল তাকে। ফৌজি ডাক্তারের পরামর্শ মতো খাইয়ে দিয়েছিল ঘুমের বড়ি। কিন্তু সন্ধ্যায়ই চোখ খুলে গিয়েছিল তার। বার বার চিৎকার দিয়ে সে বলছিলঃ 'কাউস, আদমানকে খোঁজ। এখনো কেন এল না সে? কি হচ্ছে বহরাশিরে? কোন সংবাদ ও আমায় পাঠায়নি কেন?'

উৎকণ্ঠায় পেরেশান হয়ে কাউস তাকে আরেকটা ঘুমের বড়ি খাওয়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ও বললঃ 'আমার বোন আর ইয়াসমীনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি শুতে পারি না।'

কয়েকবারই আদমানের বাড়ীতে খোঁজ নেয়া হল। কিন্তু তার বাড়ী শূন্য। আশপাশের ফৌজি সর্দারদের বাড়ীগুলোতেও কেউ নেই। নদীর পারে যে সব সিপাই টহল দিচ্ছিল, তারা শুধু বললঃ 'বহরাশির খালি। অল্প যে কজন রয়ে গেছে, ওদের বাড়ীতে চলছে লুটপাট।'

মাঝ রাতে কাউসকে মিয়ানদাদ বললঃ 'পাহারাদারের কাছে যাও তুমি। আমার পক্ষ থেকে কোন অফিসারকে বলবে, তোমাকে নদীর ওপারে পৌছে দিতে। তোমার কথা না মানলে, আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সামান্য সময়ের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছিল না কাউস। চিৎকার দিয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমার কথাটা শোন। এখানে আমার কোন সাহায্যই তুমি করতে পারবে না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল কাউস। ফিরে এল খানিক পর। সাথে এক যুবক। পানি ঝরছিল তার পোশাক থেকে।

ঃ 'কোন পাহারাদার নিজের স্থান থেকে সরতে প্রস্তুত নয়।' বলল কাউস।

'এইমাত্র সাঁতরে নদী পেরিয়েছে ও। বহরাশিরের অবস্থা ওর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

শুয়ে শুয়েই নওজোয়ানের দিকে ফিরল মিয়ানদাদ। সে বললঃ 'আমার মুনীব থাকেন বহরাশির। তিনি কিছু জিনিস দিয়ে মাদায়েনে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন আমায়। তিনি বলেছিলেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি শীঘ্রই পৌছে যাব। মাদায়েনে পৌছে তার অপেক্ষা করতে থাকলাম। তাকে এগিয়ে নেয়ার আশায় গিয়ে দাঁড়ালাম পুলের ওপর। লোকেরা বলছিল, পুল জ্বালিয়ে দেয়া হবে সূর্য ডুবতেই। সূর্যাস্তের সময় দৌড়ে পুল পেরিয়ে ওপারে গেলাম। কিন্তু ওপারেও তাকে দেখতে পেলাম না। ছুটলাম বাড়ীর দিকে। বাড়ীর একটু আগে পেয়ে গেলাম মুনীবকে। চকে লোকের ভীড়ে হারিয়ে গিয়েছিল তার ছোট ছেলেটি। অনেক করে তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এ জন্যই দেরী হয়েছে, বললেন তিনি। আবার দৌড়ে ফিরে এলাম নদীর তীরে। পুল জ্বলছে তখন। তামাম কিশতি চলে গেছে অপর পারে। নিরাশ হয়ে বাড়ীর পথ ধরলাম আবার। রাস্তায় চলছিল লুটপাট। ওরা আমার মুনীবের বিবি এবং মেয়ের সাথে যে ব্যবহার করেছে তা বলার মত নয়। তাদের ছাড়াতে চাইলাম। কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক। আমাদের পিটিয়ে বেঁধে রাখল। অল্প বয়সী মেয়ে আর তার মায়ের চিৎকার ভেসে আসছিল আঙ্গিনা থেকে। এক সময় ওরা চলে গেলে কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে দেখি দুজনই অজ্ঞান। তাদের তুলে নিয়ে গেলাম অন্দরে। মুনীবের কাছে অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। তিনি আমায় বললেন, নদীর ওপারে গিয়ে আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা কর। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ডাকাতরা পালাচ্ছে আর বলছে, মুসলমানরা এসে গেছে। কিন্তু তাদের আমি দেখিনি। নদীর পারে এসেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এপারে পৌছতেই সিপাইরা আমায় ধরে ফেলল। আপনার গোলাম না গেলে হয়ত ভোর পর্যন্ত ধরে রাখত। ভেবেছিলাম আমার মুনীবের সাহায্যের জন্য কিশতি দিয়ে ক'জনকে পাঠিয়ে দেবে ওরা। কিন্তু আমার কথাও শুনতে ওরা তৈরী নয়। এখন আমি বুঝতে পারছি না কি করব।'

কোন জওয়াব না দিয়ে কাউসের দিকে বিষন্ন চোখে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। তাকে শান্তনা দিতে কাউস বললঃ 'এবার তুমি যাও। সত্যিই মুসলমানরা বহরাশিরে প্রবেশ করে থাকলে সেখানে এখন লুটপাট হচ্ছে না।'

সহসা উঠে বসল মিয়ানদাদ। বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'বেকুব, ডাকাতদের পর এখন মুসলমানরা বহরাশিরে দাখিল হয়েছে এজন্য নিশ্চিন্তে বসে আছ তুমি? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।' এটুকু বলেই মাথা চেপে ধরে একদিকে পড়ে গেল সে।

মিনিট পনের পরে জ্ঞান ফিরল মিয়ানদাদের। ইতিমধ্যে চলে গেছে নওজোয়ান। কাউস তাকে পানি পান করাচ্ছিল। গজবের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঝটকা মেরে পানপাত্র ফেলে দিল সে কয়েক কদম দূরে। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'কোথায় আমার

তরবারী, আমার ঘোড়া নিয়ে এস, আমি যাব সেখানে।'

এগিয়ে তার হাত ধরল কাউস।

ঃ'মিয়ানদাদ, একটু বুদ্ধি রেখো। তুমি আহত, তোমার গায়ে জ্বর।'

তার হাত ছুড়ে ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। দুতিন কদম গিয়েই আবার পড়ে গেল উপুড় হয়ে। আদমানের গোলামের সাহায্যে তাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল কাউস।

কতকক্ষণ নিঃসাড় পড়ে রইল মিয়ানদাদ। একটু একটু নড়তে লাগল তার ঠোঁট। অর্ধচেতন অবস্থায় ধীরে ধীরে মাহবানু ও ইয়াসমীনকে ডাকতে ডাকতে চোখ খুলল ও।

আবদারের সুরে কাউস বললঃ 'মিয়ানদাদ, খোদার দিকে চেয়ে ঔষুধটা খেয়ে নাও। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। জেদ করোনা বেটা।'

কথার চেয়ে বুড়োর দৃষ্টিতে বেশী প্রভাবিত হল মিয়ানদাদ। জওয়াব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিল ও । গোলাম পানি নিয়ে এল কাউসের ইশারা পেয়ে। এক হাতে মাথা তুলে অন্য হাতে ঔষধ মিয়ানদাদের মুখে ঢেলে দিল সে। গোলাম তুলে ধরল পানির গ্লাস।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল মিয়ানদাদ। স্নেহ ভরে তার কপালে হাত বুলিয়ে কাউস বললঃ 'আমায় বিশ্বাস কর বেটা, আমি তোমার দুশমন নই। এখন কিছুই করার নেই আমাদের। আগামীকাল হয়ত কোন সুযোগ বের করা যেতেও পারে।'

খানিকটা আশান্বিত হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'তোমার কি মনে হয়, মুসলমানরা বহরাশিরে ঢুকলে ওদের কোন ভয় নেই?'

ঃ 'এ ব্যাপারে আমি পূর্ণ আস্থাশীল। মুসলমানদের তুমি দেখনি, আমি দেখেছি। মাহবানু আমার মেয়ে হলে এ মুহূর্তে এ দোয়াই করতাম, চোর ডাকাতদের হামলার পূর্বে মুসলমানরা যেন ওদের সাহায্যে পৌঁছে যায়।'

পেরেশান হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'না, না, তুমি মিথ্যে শান্তনা দিচ্ছ আমায়। বিজয়ী কওমকে বিজিত কওমের বস্তিতে প্রবেশ করতে তুমি দেখনি। প্রার্থনা করছি, মাহবানু ও ইয়াসমীনের অসহায়ত্বের কাহিনী শুনতে আমি যেন বেঁচে না থাকি।'

কাউস তাকে বলতে চাইছিল, সে বিজয়ী লশকরের সাথে আমি ছিলাম, বিজয়ী আর বিজিত সম্পর্কে অতীতের সব ধারণা যারা বদলে দিয়েছে। কিন্তু আবার চোখ বন্ধ করল মিয়ানদাদ। তাকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতে দেখে চুপ হয়ে গেল কাউস।

ঘন্টা খানিক পর। নদীর দিক থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সাথে ভেসে এল মানুষের শোরগোল। ছুটে বেরিয়ে গেল আদমানের গোলাম। কয়েক মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললঃ 'কাউস, কাউস। নদীর পারে জমায়েত হচ্ছে আমাদের লশকর।

দুশমন দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে।'

ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে কাউস বললঃ 'আমি জানি, আস্তে বলো।'

গোলাম অনুচ্চ কণ্ঠে বললঃ 'ওরা যদি নদী পেরিয়ে আসে?'

ঃ 'নিশ্চিন্তে বসো, ওরা কিছুই বলবে না তোমায়।'

ঃ 'না, আদমানকে আমি খুঁজব।'

ঃ 'আদমানের ঘর খালি তা তুমি দেখেছ। ও মাদায়েন থাকলে অবশ্যই আসত এখানে। এখন শোরগোল করো না।'

বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দরজার কড়া নাড়ল কে যেন। বেরিয়ে গেল কাউস।

ঃ 'কে?' ফটকের কাছে পৌছে প্রশ্ন করল ও।

ঃ 'দরজা খোল, আমি আদমান।'

ফটক খুলে দিল কাউস।

ঃ 'তার অবস্থা কেমন?' প্রশ্ন করল আদমান।

ঃ 'ও আপনার ব্যাপারে খুব পেরেশান ছিল। এখন ঘুমিয়ে আছে।'

ঃ 'নদীর ওপারে জমায়েত হচ্ছে মুসলমানরা, এ মুহূর্তে বিপদের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও সাবধান হওয়া উচিত। তার বোন এবং অন্য মেয়েটাকে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে চাই। নদী পারের এলাকাগুলো থেকে সরিয়ে নিতে হবে ফৌজ।'

ঃ 'মাহবানু এবং ইয়াসমীন এখানে আসেনি।'

ঃ 'কি বলছ তুমি?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল আদমান।

ঃ 'মিথ্যে বলছি না। ওরা এখানে আসেনি। ওদের কথা জিজ্ঞেস করতেই আপনার তালাশ করছিলাম। আপনার গোলামকে কয়েকবার আপনার বাড়ীতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আপনি ছিলেন না।'

ঃ 'ঘরে আসার সুযোগ পাইনি আমি। কিন্তু মাহবানু বলেছিল, সন্ধ্যার পূর্বেই নদী পার হতে পারবে ওরা। ইস! যদি তখন তাদের নিয়ে আসতাম! মিয়ানদাদকে সারা জীবন মুখ দেখাতে পারব না। ও কোনদিন ক্ষমা করবে না আমায়। তার কোন গোলামও এখানে আসেনি?'

ঃ 'না।'

ঃ 'সবার আগে তার ঘরেই গিয়েছি আমি এখন হয়ত একথাও বিশ্বাস করবে না মিয়ানদাদ। ইস্! যদি সাথে নিয়ে আসতাম ওদের! কিন্তু এখন যে আমি খুবই ব্যস্ত! আচ্ছা .....না থাক। এখনি আবার আসছি আমি। মিয়ানদাদকে অন্য কোথাও পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

ঘোড়ার রেকাবে পা রাখল আদমান। গোলাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে বললঃ 'আমি কি করব?'

ঃ 'এ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো। কোন সিপাই অথবা অফিসার এদিকে এলে বলবে, এ মিয়ানদাদের ঘর। সিপাহসালারের হুকুম, তার বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না ঘটানো হয়।'

দজলার তীরে ফজর পড়লেন মুজাহিদরা। দোয়া করলেন ইসলামের বিজয়ের জন্য। তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন কাতারবন্দী হয়ে। এদের অনেকেই এই প্রথম সেই সাম্রাজ্য দেখছিল, যার প্রতিটি ইটে খোদিত রয়েছে সাসানী সম্রাটদের ঐতিহ্যের কাহিনী। ওরা দেখছিল কিসরার শ্বেত মর্মরে সজ্জিত সেই মহল– যার মিনার ছুঁয়েছে আকাশের নীল। মনে হয়, মানুষ নয়, এ মহলে বাস করে স্বপ্নের জ্বিন-পরী।

পবিত্র জুমা বার। জুমার নামাজ পড়া হবে কিসরার প্রাসাদে সবাইকে এ সুসংবাদ শুনালেন হযরত সা'দ। অবিশ্বাস করল না কেউ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং দুর্দম হিম্মত নিয়ে কসরে আবইয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। সামনে দজলার উন্মত্ত তরঙ্গ। ওপারে ইরানী তীরন্দাজ আর অশ্বারোহীদের সারি। পুল মেরামত না করে, অথবা কিশতি না এলে এ প্রমত্ত নদী মুসলমানরা পেরোতে পারবে, প্রকাশ্যে এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যই যাদের ভরসা, পার্থিব সরঞ্জামে তাদের কি এসে যায়? অপর দিকে, অসংখ্য লশকর, দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল, মজবুত কেল্লা আর নদীর উত্তাল তরঙ্গের ব্যবধানকে যারা বিজয়ের কারণ মনে করত, ওরা ভাবছিল, হায়, নদীর পরিবর্তে যদি সাগরের ব্যবধান হত আমাদের মাঝে!

বহরাশির খালি করার পর ইয়াজদগির্দের ভয় এতটা বেড়ে গিয়ে ছিল যে, রাতেই পরিবার পরিজন, হারেমের গোলাম-বাঁদী, মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম এবং শাহী খাদেমদের রওয়ানা করিয়ে দিয়েছিলেন হলওয়ালের দিকে। মাদায়েনের জনতার মত এ জন্য মুহাফিজরাও ছিল নিরাশ। কয়দিন অথবা কয়েকটা সপ্তাহেও মাদায়েন হামলা করতে পারবে না মুসলমানরা, এ স্বস্তি পেত নদীর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু যখনই ওদের দৃষ্টি চলে যেত নদীর ওপারে, দেখতো, মাদায়েনের প্রাচীরে হামলা করার জন্য নদীর তরঙ্গের উপর লাফিয়ে পড়তে কারো ইশারার প্রতীক্ষা করছে ওরা।

শ্বেত প্রাসাদের গম্বুজ ঝলমলিয়ে উঠল উষার সূর্য কিরণে। মুসলিম সারিগুলোতে চক্কর দিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।

হযরত মুসান্নার সাথে মাদায়েনের পথের কঠিন মঞ্জিলগুলো পেরিয়ে এসেছিলেন যে আসেম, ষাটজন জানবাজ নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। আল্লাহু আকবার বলে ঘোড়া সহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। এ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করলেন কা'কা। তিনিও নদীতে ঝাঁপ দিলেন দু'শো অশ্বারোহী নিয়ে। ইরানীরা ওপারে দাঁড়িয়ে দেখছিল খোদায়ী সাহায্যের এক অবিশ্বাস্য মোজেযা। মাঝ নদীতে পৌছল প্রথম দল। ততোক্ষণে

অশ্বারোহীদের সবগুলো সারি নেমে পড়েছে নদীতে।

এগিয়ে যাচ্ছিল তারা রেকাবে রেকাব মিলিয়ে। লড়াইয়ের ময়দানে যেভাবে সাজানো হয় সিপাইদের, উন্মত্ত তরঙ্গেও ছিল ডান বাম আর মূল বাহিনীর সে শৃংখলা। অসম উপত্যকা, পানিহীন রুক্ষ মরুভূমি আর সতমল ময়দানে যারা ঘোড়া ছুটিয়েছে, পানির উত্তাল তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে যুদ্ধ ইতিহাসের নতুন ভূমিকা লিখছিল তারা। নদী তরঙ্গ মাথা তুলে এ বাহাদুরদের দেখে সসম্মানে শির ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিল। ইরানীদের জন্য এ ছিল এক ভয়ংকর দুস্বপ্নের মত। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা। আসেম যখন কিনারে পৌছলেন ওরা চিৎকার করে বললঃ 'দৈত্য আসছে, দৈত্য আসছে।'

পালাতে লাগল ইরানী অশ্বারোহীরা। ভীতি ছড়িয়ে গেল গোটা লশকরে। পদাতিকরা তীর ছুড়ল কিছুক্ষণ। নদীতে নেমে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল কেউ কেউ। কিন্তু রুখতে পারল না সয়লাবের গতি। তীরের জওয়াবে তীর ছুড়ে এগিয়ে গেল মুজাহিদরা। অবশিষ্ট ফৌজও পালিয়ে গেল ইরানীদের।

পদাতিক লশকর নিয়ে আসার জন্য নৌকাগুলো নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন হযরত সা'দ। সমগ্র লশকর এপারে পৌছল জুমার পূর্বেই, অজু সেরে সবাই চললেন কসরে আবইয়াজের দিকে।

মাদায়েনের গলি আর বাজারগুলো হয়ে পড়েছিল জনশূন্য। বন্ধ ঘরের ছিদ্র আর ঘুলঘুলি দিয়ে বিজয়ী লশকরের মিছিল দেখছিল মাদায়েনবাসী। বিজয়ী কওম হামেশাই জুলুম করে বিজেতাদের উপর, অতীত ইতিহাস তা বলছিল ওদের। ওদের মুর্ছিত চেহারা আর ভয়ার্ত দৃষ্টি পরস্পরকে প্রশ্ন করছিলঃ 'এখন কি হবে?'

বিজয়ী বীরদের চেহারাই ছিল এর জওয়াব। বিজয়কে যারা মনে করতো খোদায়ী এনাম– তাদের দৃষ্টিরা অহংকারে উর্ধে না উঠে, স্রষ্টার আনুগত্যে লুটাচ্ছিল মাটিতে। আল্লাহু আকবার ছাড়া তাদের জবানে ছিল না কোন শ্লোগান। পুল এবং কিশতি ছাড়া নদী পেরিয়ে তাদের বিশাল ফৌজকে পরাজিত করেছে মুসলমানরা, এ শুধু বিষ্ময়করই ছিল না পারস্যবাসীর কাছে বরং যে মরুচারীদের ওরা মনে করত পশুত্ব বর্বরতা আর পাশবতার প্রতিভূ, অতীত ইতিহাসের এ লিখনকেও মিথ্যা প্রমাণ করে দিল ওরা। বিজয়ের পর কোন লশকরকে এতটা উচ্ছ্বাসহীন ওরা দেখেনি। বিরাট বিজয়ের পর এমন ধৈর্য আর প্রশান্তির সাথে কাজ করে যেতেও দেখেনি কোন লশকরকে।

কিসরার 'শ্বেত প্রাসাদে' জুমা আদায় করলেন মুসলমানরা। এরপরই হযরত সা'দের সামনে স্তুপ হয়ে উঠল সে দূর্লভ সম্পদ সাইরাসের স্থলাভিষিক্তরা যা জমা করেছে শত শত বছর ধরে। পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেক সম্পদ সাথে নিয়েছিলেন ইয়াজদগির্দ। তবুও অজস্র সম্পদ এল মুসলমানদের হাতে। দূর্লভ সামগ্রীর মধ্যে ছিল

ইরানের অতীত সম্রাটদের তরবারী, খঞ্জর এবং মূল্যবান পোশাক। এ ছাড়াও ছিল মাশরিক ও মাগরিবের করদ রাজাদের নামের তালিকা, হিরা, মুক্তা, সোনা এবং রূপার তৈজষপত্র। মূল্যবান কার্পেট ও পর্দা। কোষাগার থেকে পাওয়া গেল স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ। দূর্লভ সামগ্রীর মধ্যে আরো পাওয়া গেল ষাটগজ লম্বা এক আশ্চর্য ফরাশ। দেখলে মনে হয় একটা বাগান। সোনা এবং সবুজ যমরুদ পাথরে কাজ করা জমিন। গাছগুলি সোনা রূপার। পাতা, কলি এবং ফুল রেশম, জওহর এবং হিরক খচিত। ঝর্ণাগুলো বহুরংগা মূল্যবান পাথরে তৈরী।

পরাজিত ফৌজের পিছু ধাওয়া করেছিলেন কা'কা। তিনি এনেছেন নওশেরওয়ার তাজ, জরির কাজ করা জুব্বা, কিসরা, পারভেজ, খাকান, এবং নোমার বিন মোনজিরের তলোয়ার। স্বর্ণ বোঝাই ঘোড়া এবং রৌপ্য বোঝাই উট। রূপোর তৈরী ঘোড়ার জিন। গলায় ইয়াকুত আর যমরুদের মালা। পিঠের গদিতে সোনার কারুকাজ। দু'পাশে হিরা এবং মুক্তার ঝালর।

এ সম্পদ জমা করার জন্যে ইরানী শাসকবর্গ পূর্ব পশ্চিমে প্রলয় ঘটিয়েছিল অতীত শতকগুলোতে। সোনা চান্দি আর ঝলমলে হিরা মুক্তার প্রতিটি টুকরায় লিখা ছিল অগণিত শহর ও বস্তির বরবাদী আর ধ্বংসের কাহিনী। কিন্তু এ সব মরুচারীরা এর একটা টুকরাও লুকানোর চেষ্টা করেননি। যা পেয়েছেন, পেশ করেছেন আমীরে লশকরের সামনে।

পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুল মালের জন্য রেখে দিলেন হযরত সা'দ। বাকী সম্পদ ভাগ করে দিলেন মুজাহিদদের মধ্যে।

গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল মিয়ানদাদ। দরজা খোলা। গরম হয়ে উঠেছে রোদ। ব্যথা অনেকটা কম অনুভব করছে ও। কাউসকে ডাকতে লাগল মিয়ানদাদ।

আদমানের গোলাম প্রবেশ করল কামরায়।

ঃ 'জনাব, কাউস এখানে নেই।'

ঃ 'কোথায় সে?' চঞ্চল হয়ে জানতে চাইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'জনাব, ও আপনার বোনের খোঁজ নিতে গেছে।'

ঃ 'কখন গেছে?'

ঃ 'অনেকক্ষণ আগে। ভোরে আরবরা যখন নদী পার হয়ে আসছিল।'

ঃ 'নদী পার হয়ে চলে এসেছে মুসলমানরা?'

ভয়ে উঠে বসল মিয়ানদাদ।

ঃ 'জী, আমাদের ফৌজ পালিয়ে গেছে। আপনাকে আমি জাগাতে চাইছিলাম, কিন্তু নিষেধ করল কাউস। সে বলল, আমাদের নাকি কোন ভয় নেই।'

ঃ 'তার মানে দুশমন এখানে চলে এসেছে?'

ঃ 'জ্বী, অনেক ঘুমিয়েছেন আপনি। নদী পারে লড়াই খতম হতেই ও বেরিয়ে গেছে। সে বার বার আমায় তাগিদ দিয়েছে, আপনাকে যেন না জাগাই। আপনি রাতে যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন আদমান এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নদীর ওপারে দুশমন ফৌজ জমায়েত হচ্ছে, এ এলাকা নিরাপদ নয়। তার ইচ্ছে ছিল খানিক পর এসে আপনাকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাউস বার বার আমায় বলেছে, এখানে আপনার কোন ভয় নেই। মুসলমানদের ব্যাপারে ও দারুণ নিশ্চিন্ত। আপনার কি ধারণা, এখানে আমাদের কোন বিপদ নেই?'

ঃ 'কাউস আমার দুশমন নয়। তবে শত্রুর ব্যাপারে তার কিছু ভুল বুঝাবুঝি আছে।'

ঃ 'আমার ভয় হয়, দুশমনের এনামের লোভে....।'

ঃ 'না, এ হতেই পারে না।'

ঃ 'দু'জন দুশমন সিপাই আমাদের বাইরে পাহারা দিচ্ছে, কাউস যাবার একটু পরই ওরা এসেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। আপনি এখানে, সম্ভবত ওরা জেনে ফেলেছে।'

ঃ 'ওরা ভেতরে আসেনি?'

ঃ 'না, ফটক বন্ধ। খোলার চেষ্টাও করেনি ওরা। হয়ত আশংকা করছে, ভেতরে অনেক লোক, অপেক্ষা করছে সংগীদের।'

ঃ 'ওদের ভাল করে দেখেছ?'

ঃ 'ফটকের ছিদ্র দিয়ে ভালভাবেই দেখা যায় ওদের।'

ঃ 'ওদের চেহারার বর্ণনা দাও তো?'

ঃ 'একজন আমার সমান, আরেকজন সামান্য খাটো। একজন উজ্জল শ্যাম বর্ণ, অন্যজন কালো। দুজনের বয়েসই আমার চেয়ে সামান্য বেশী।'

ঃ 'আশপাশে দুশমন ফৌজে দেখেছ?'

ঃ 'না, সড়কে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ ওরা শহর কব্জা করে নিয়েছে। আমাদের ফৌজ পালিয়ে যাবার পর মোকাবিলা হয়নি কোথাও। কেউ যেন পালাতে না পারে এ জন্য শহর অবরোধ করে রেখেছে ওরা। কাউসকে হয়ত ওরা গ্রেফতার করেছে। জানের ভয়ে বলে দিয়েছে আপনার সংবাদ।'

বিষন্ন দৃষ্টিতে মিয়ানদাদ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল গোলামের দিকে। পানি চাইল। ক'ঢোক পান করে বন্ধ করে নিল চোখের পাতা।

একটু পর চোখ খুলে চাইল গোলামের দিকে।

ঃ 'আমার ঘোড়া এখানে থাকলে যখমের পরোয়া করতাম না। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম এখান থেকে। কিন্তু তুমি তো থাকতে বাধ্য ছিলে না। ফৌজের সাথে পালিয়ে যাওনি কেন?'

ঃ 'আমি আদমানের গোলাম। তাঁর হুকুম ছিল আপনার পাশে থাকার। তাছাড়া মাদায়েনের বাইরে আমার কোন আশ্রয়ও নেই। আমাকে মেরে ওরা কি পাবে? কিন্তু আপনাকে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।'

ঃ'আমার বোন আসেনি কেন আদমান বলেছে কিছু?'

ঃ 'জনাব, ওরা কেন আসেনি, এজন্য তিনিও ছিলেন পেরেশান। তিনি সন্ধ্যার পূর্বেই পুল পার হবার তাগিদ করেছিলেন তাদের। আপনার শরীর এখন কেমন? কাউস বলেছিল আপনার কষ্ট হলে আরেকটা বড়ি খাইয়ে দিতে।'

ঃ 'না, এখন ঔষধের প্রয়োজন নেই।'

বাইরের ফটকে করাঘাত করল কে যেন। চমকে উঠে গোলাম বলল ঃ 'জনাব, ওরা দরজার কড়া নাড়ছে।'

মিয়ানদাদের দীল ধুকপুক করতে লাগল। পেরেশান হয়ে গোলাম বললঃ 'জনাব, আমরা ওদের অন্দরে আসা রোধ করতে পারবো না। দেয়াল ভেংগে সহজেই ওরা ঢুকতে পারবে।'

ঃ 'যাও, ফটক খুলে দাও।' ধরা আওয়াজ বলল মিয়ানদাদ।

ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে এগোল গোলাম। থমকে দাঁড়াল আবার। ফিরে চাইল মিয়ানদাদের দিকে।

ঃ 'যাও।' বেদনা ভরা কণ্ঠে বলল মিয়ানদাদ। 'তুমি আমার কোন মদদ করতে পারবে না। এক সিপাইয়ের মত আমি জীবন দিতে পারি।'

বেরিয়ে গেল গোলাম। অসহায়ত্বের আঁধারে ছেয়ে গেল তার হৃদয়-মন। অপলক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে চোখ মুদল সে।

ঃ 'মিয়ানদাদ!' তার কপালে হাত রেখে বলল কেউ।

চোখ খুলল মিয়ানদাদ। হাসানের সাথে এক অপরিচিতকে দেখে চেহারা ঢেকে ফেলল আস্তিনে।

ঃ 'মিয়ানদাদ, আমি হাসান। তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি।'

কোন জওয়াব দিল না মিয়ানদাদ। কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল হাসান। সংগীকে বললঃ 'আপনি ওকে ভাল করে দেখবেন। হয়ত ক'দিন তার খবরও নিতে পারব না। তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যা দেখতে আসবেন।'

দরজার দিকে ফিরল হাসান। উৎকণ্ঠা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। শত ঘৃণার পরও মাহবানু এবং ইয়াসমীনের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে চাইল ও। কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। কণ্ঠ পর্যন্ত এসে থেমে গেল মিয়ানদাদের আওয়াজ। এরপর মনে মনে ভাবল, 'ওদের কথা জিজ্ঞেস করিনি ভালই হয়েছে। সম্ভবতঃ মাহবানুর ব্যাপারে ও এখনো কিছুই জানে না। যদি বলতাম মাহবানু বহরাশির, সোজা চলে যেত ওখানে। দুশমনের মারপিট থেকে নিরাপদে থাকলে ইয়াসমীনের সাথে

ইস্পাহান যাবার মওকা পেয়ে যেতে পারে। হাসান নিশ্চয়ই মাহবানুকে খুঁজতে এসেছে।' তাড়াহুড়া করে চলে যাওয়ার কারণ, মাহবানু এখানে নেই। কিন্তু ও ডাক্তার নিয়ে এসেছে। আমার ডাক্তারের প্রয়োজন জানল কিভাবে? বহরাশির যাবার পূর্বে কাউস হয়ত তাকে বলে দিয়েছে সব।'

যখমের ব্যান্ডেজ খুলে দেখল ডাক্তার। ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল নতুন ভাবে। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে সেদিকে খেয়াল করল না মিয়ানদাদ। ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম গোলামকে বলে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। চঞ্চল হয়ে ও প্রশ্ন করলঃ 'আমি আহত হাসান কি ভাবে জেনেছে?'

ঃ 'আমি জানিনা, আমায় শুধু বলেছে, তার এক দোস্ত আহত।'

ঃ 'আমি এক ইরানী তা তুমি জান?'

ঃ 'হ্যাঁ, তিনি আমায় রাস্তায় বলেছেন, ইরানী ফৌজের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের চিকিৎসার জন্য আমি যাচ্ছি।'

ঃ 'এরপরও চাও আমি বেঁচে থাকি?'

ঃ 'সকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় বিশজন ইরানীর ব্যান্ডেজ আমি করেছি। আমি চাই, সবাই বেঁচে থাকুক।'

ঃ 'তুমি কি মনে করেছ, তোমাদের বিরুদ্ধে ইরানের লড়াই খতম হয়ে গেছে। আর আমরা চিরদিনের জন্য হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছি?'

নিশ্চিন্তে ডাক্তার জওয়াব দিলঃ 'আমাদের লড়াই ইরানের বিরুদ্ধে নয় বরং সে সব শাসকদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের খোদা হয়ে বসেছে। আমরা মাদায়েনবাসীর দুশমন নই। তাদের জন্য নিয়ে এসেছি শান্তি ও মুক্তির পয়গাম। আমার একীন, ইরানে যারা মানবতার বিজয় চায়, আমাদের বিজয়কে ওরা নিজেরই বিজয় মনে করবে। তুমি জান না, আল্লাহর দ্বীনের যে সিপাই আজ প্রবেশ করেছে কিসরার মহলে, ক'বছর আগেও এদের অনেকে ইসলামকে আরবের বড় বিপদের কারণ মনে করত। কে বলতে পারে, দজলার পাড়ে যে নিশান আমরা বুলন্দ করলাম, কাল তুমিই মহান কাজ ভেবে তাকে জিহুন নদীর পাড়ে নিয়ে যাবে না? বদর ও হোনাইনের ময়দানে কাফিরদের পরাজয়কে আজ আমরা আরববাসীর বিজয় মনে করি। কাদেসিয়ায় কিসরার পরাজয়কে কাল তোমরা নিজের বিজয় ভাববে না কে বলতে পারে? তুমি যদি চাও মানবতার কল্যাণ, সে বদনসীব লোকগুলোর দলে ভিড়বে না নিশ্চয়ই, যারা ভোরের আলো দেখেও চোখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি যখন সুস্থ হবে, দূর করতে পারব তোমার সন্দেহ। নিশ্চিন্তে কথা বলব তখন। এবার যাবার অনুমতি চাইছি।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

ঃ 'জনাব, বাইরের দরজা বন্ধ করে দেব?' গোলাম বলল।

ঃ 'না।'

ঃ 'এখন আপনার অবস্থা কেমন?'

ঃ 'আমি ভাল। তুমি ক্লান্ত, যাও আরাম করোগে।'

বেরিয়ে গেল গোলাম। অস্থির দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। হঠাৎ আঙ্গিনায় শোনা গেল কারো পায়ের আওয়াজ। আচানক হতাশার আঁধার গুটিয়ে নিল তার পর্দা। মাহবানু ও ইসয়ামীন তার সামনে দাঁড়িয়ে। ছলছল করছিল ওদের আঁখীগুলো। ভয়শূন্য চেহারা। উঠে দেয়ালে ঠেক দিয়ে হাত প্রসারিত করল মিয়ানদাদ। মাহবানু এগিয়ে তার বুকে মুখ লুকালো।

ঃ 'ভাইজান, ভাইজান।' শিশুর মত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল ও। তার মাথায় হাত বুলিয়ে মিয়ানদাদ তাকাল ইয়াসমীনের দিকে। সংকোচ জড়ানো পায়ে এগিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ও।

ঃ 'আপিন কেমন আছেন?' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'আমি ভাল।' মিয়ানদাদ জওয়াব দিল।

সহসা সামনের দরজায় লৌহ বর্মে থমকে গেল তার দৃষ্টি। ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে মাহবানু বললঃ 'ভাইজান, ওকে চিনতে পারেননি? ও সোহেল।'

ঃ 'কিভাবে ওকে আমি ভুলব?' বিষন্ন কণ্ঠে জওয়াব দিল মিয়ানদাদ।

এগিয়ে এল সোহেল। একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। হাত এগিয়ে দিল মিয়ানদাদ। মিয়ানদাদের হাত নিজের হাতে তুলে সোহেল বললঃ 'ভাইজান, আপনার শরীর কেমন?'

মিয়ানদাদের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো করুণ হাসি।

ঃ 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এখনো বেঁচে আছো।'

ঃ 'ডাক্তার আসেনি?'

ঃ 'এইমাত্র আমায় দেখে গেল। আমি তোমার ভাইয়ের শোকর গোজারী করছি।'

ঃ 'ওর ভাই আপনাকে দেখে গেছেন?' ইয়াসমীনের প্রশ্ন।

ঃ 'হ্যাঁ, ডাক্তারের সাথে এসেছিল।'

নীরবে ওরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদের দিকে। বিছানার পাশে চেয়ার পেতে দিল কাউস এবং গোলাম। বসে পড়ল ওরা।

চৌত্রিশ

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল মিয়ানদাদ। ডাক্তার মাহবানুকে শান্তনা দিয়ে বললঃ 'আপনার ভাই খুব শীঘ্রই চলাফেরা করতে পারবেন।'

তাকে দেখার জন্য প্রতিদিন আসতো সোহেল। কিন্তু হাসানের সাথে আর

সাক্ষাত হয়নি। প্রথম সাক্ষাতের পর তার মনে হয়েছিল হাসান ভাবছে, সে হাসানের অনুকম্পার ভিখারী। ফিরে গেছে অসুস্থ দেখে। সুস্থ হলেই বিজয়ীর বেশে এসে বলবেঃ 'মিয়ানদাদ! এক সাধারণ কয়েদীর চেয়ে ভাল ব্যবহার তুমি পেতে না। তোমার জীবন আর তোমার বোনের ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা আমি করেছি। আমার পায়ে পড়া ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই। জীবিত থাকার জন্য তোমার আশ্রয়ের প্রয়োজন। আমি দিতে পারি সে আশ্রয়।'

মাহবানু আর ইয়াসমীনের মুখে বহরাশিরের বাড়ীতে হামলার বিস্তারিত ঘটনা শুনেছে ও। হাসান এবং তার মাঝে বিজয়ী আর বিজিতের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কও যে সৃষ্টি হতে পারে, এ বিশ্বাসই ছিল না তার। এমন এক দুনিয়ায় সে চোখ মেলেছিল, যেখানে বিজয়ী হামেশাই জালেম আর বিজিতরা হত মজলুম। কখনো ভাবতো, হাসান হয়ত তার ধারণার চেয়ে ভাল হবে। সে অপেক্ষা করছিল পরবর্তী সাক্ষাতের। কিন্তু এল না হাসান। একদিকে সে অপেক্ষায় ছিল হাসানের, অপর দিকে মাহবানু, ইয়াসমীন ও সোহেলের সামনে তার প্রসঙ্গ তুলতে সংকোচ বোধ করত। ওরাও হাসানের প্রসংগ তুলত না তার সামনে। মন খুলে সে কোন দিন সোহেলের সাথে কথা বলেনি। সোহেল এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করত তার অবস্থা। ফিরে যেত আবার। মাদায়েন আর বহরাশিরের পরিস্থিতি বুড়ো ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পেত ও।

ঃ 'তোমার ব্যাপারে ও খুব পেরেশান।' হাসানের ব্যাপারে বলত ডাক্তার। 'যখনি ওর সাথে দেখা হয় তার প্রথম প্রশ্ন থাকে তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে।'

মাহবানুর কাজে মিয়ানদাদের মনে হত তার সুস্থ থাকাই যেন ওর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কিন্তু বুঝতে পারত না ইয়াসমীনকে। প্রথম দু'দিন যখন তার অবস্থা আশংকাজনক ছিল, দিন রাত খেদমত করতো মাহবানুর সাথে। চোখে থাকত ক্লান্তিময় নিদ্রার ছাপ। কিন্তু দূরে দূরে থাকতে লাগল অবস্থা একটু ভাল হতেই। কথাও বলত না খুব একটা। কখনো অভিমানে ভরে উঠত মিয়ানদাদের হৃদয়। কিন্তু পরাজয় আর অসহায়ত্বের অনুভূতিতে হারিয়ে যেত তার পিপাসার্ত আত্মার চিৎকার।

একদিন দুপুরে মিয়ানদাদের বিছানার পাশে বসে আছে মাহবানু। পাশ ফিরে চোখ খুলল মিয়ানদাদ। নীবরে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল মাহবানুর দিকে। হঠাৎ উঠে বসে বললঃ 'আমি অবাক হচ্ছি, হাসান আর আসেনি কেন। কাল ভেবেছিলাম সোহেলকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু সেও কাল আসেনি।'

ভাইয়ের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করল মাহবানু।

ঃ 'সোহেল এই মাত্র এসেছিল। আপনার কথা জিজ্ঞেস করে ফিরে গেছে। আমি আপনাকে জাগাতে চাইছিলাম, কিন্তু নিষেধ করল ও। খুব তাড়া ছিল তার। সোহেল বলল, তার ভাই কোথাও যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ সেও যাবে তার সাথে। তার কথায় মনে

হল ওরা অনেকদিন মাদায়েনের বাইরে থাকবে।'

ঃ 'মাহবানু।' একটু ভেবে নিয়ে বলল মিয়ানদাদ। 'এ অবস্থায় তার কথা জিজ্ঞেস করতে আমি সংকোচ বোধ করছিলাম। কিন্তু যদি কোথাও সে যাবার থাকে, কমপক্ষে আমাদের ভবিষ্যত কি, তা জেনে নেয়া জরুরী।'

ঃ 'সোহেল বলেছে, তাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না। আপনি চলাফেরার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার নিয়মিত আসবে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে মিয়ানদাদ বললঃ 'মাহবানু, নিজের ভবিষ্যত নিয়ে পেরেশান নই আমি। আমি একজন সিপাই। পরাজয়ের ফল ভুগতে প্রস্তুত। অনুকম্পা ভিক্ষা করব না দুশমনের কাছে। গোলামীর জিঞ্জিরের বোঝা তুলতে পারব আমি। বন্দী জীবনের দুঃখ কষ্ট নতুন নয় আমার জন্য। তোমাকে আর ইয়াসমীনকে নিয়েই শুধু আমার দুর্ভাবনা। আমি জানি, দ্বিতীয়বার কেন আসেনি হাসান। মুসলিম লশকর আমাদের ব্যাপারে তার কোন কথা শুনলে নিশ্চয়ই ও আসতো।'

মাহবানুর ঠোঁটে ভেসে উঠল এক টুকরো বিষন্ন হাসি। মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'ভাইজান, বরাবরই উনি আপনার খবর নিয়েছেন। আপনি ডাকেননি বলে ও আর আপনাকে বিরক্ত করতে চায়নি।'

ঃ 'সে এক বিজয়ী। সে জানে তার জন্য আমার ঘরের দুয়ার আমি বন্ধ করতে পারবো না।'

ঃ 'সে এও জানে, আপনি কোব্বাদের বেটা। আপনি আহত না হলে সেদিনও সে আসত না। সে জানে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার সাথে কথা বলতে চান না আপনি।'

ঃ 'তোমার কি মনে হয়, সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে?'

ঃ'ভাইজান, আমাদের হিফাজতের জিম্মা নিয়েছে ও।'

ঃ 'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে মুসলমানরা আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার তাকে দিয়ে দিয়েছে?'

ঃ 'জানিনা। শুধু জানি, মুসলিম লশকরের নামকরা সালারদের সেও একজন। সাধারণ সিপাই হয়েও যদি আমাদের হিফাজতের জিম্মা ও নিত, সিপাহসালার তার ফয়সালা বাতিল করবেন এ আশংকা হতো না আমার। যদি মনে করেন আপনি তার কয়েদী, এ সন্দেহের কোন ঔষধ আমার কাছে নেই। আপনি এখনো হাসানকে চিনতে পারলেন না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে আমাদের জন্য।'

ঃ 'ও যদি আমাদের হিফাজতের জিম্মা নিয়ে থাকে, আর তুমিও এতটা আশ্বস্ত, তবে জিজ্ঞেস করলেই পার তার শর্ত গুলি কি?'

বিরক্তি ফুটে উঠল মাহবানুর চেহারায়। দাঁড়িয়ে গেল ও।

ঃ 'বসো মাহবানু। আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। তোমাকে ব্যথা দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

বসো পড়ল মাহবানু। দু'চোখে তার ছলছল অশ্রু। মিয়ানদাদ মাথা তুলে ডাকল কাউসকে। কামরায় প্রবেশ করল কাউস।

ঃ 'কাউস, ইয়াসমীনকে ডাকো। একটা দরকারী কথা বলতে চাই।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল কাউস।

ঃ 'আপনি কি বলতে চাইছেন?' জানতে চাইল মাহবানু।

ঃ 'এক্ষুণি বুঝবে?'

কামরায় প্রবেশ করল ইয়াসমীন। বসল মাহবানুর পেছনে। ফিরে যেতে উদ্যত হল কাউস। হাতের ইশরায় তাকে থামিয়ে বললঃ 'কাউস, দাঁড়াও।'

কামরার একপাশে দাঁড়াল কাউস। ইয়াসমীনের দিকে ফিরে মিয়ানদাদ বললঃ 'ইয়াসমীন, বহরাশির থেকে তোমার ঘোড়া আনিয়ে নাও। সুযোগ পেলেই ইস্পাহান যাবার চেষ্টা করবে। কাউস আর মাহবানু থাকবে তোমার সাথে। মুসলমানরা তোমাদের পথে বাঁধা দিলে কমপক্ষে আমার বোনের সু ধারণা দূর হয়ে যাবে। আমায় নিয়ে ভেবোনা। নিজে ইস্পাহান পৌছতে না পারলেও এ প্রশান্তি হবে আমার, দুশমনের আওতা থেকে তোমরা দূরে।'

ঃ 'আপনাকে আমি এটুকু অন্ততঃ বলতে পারি, ইস্পাহান যেতে চাইলে মুসলমানরা আমাদের পথে কোন বাঁধা সৃষ্টি করবে না।' বলল ইয়াসমীন। 'তবে ইস্পাহানের পরিবর্তে বহরাশিরের আমার বাড়ীই বেশী নিরাপদ। কাল ভোরেই ওখানে ফিরে যেতে চাই আমি।'

বিমূঢ়ের মত কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'পারভেজের নাতনীও ইরানের ভষ্যিতের ব্যাপারে এতটা নিরাশ জানতাম না।'

ঃ 'ইরানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি নিরাশ নই। সে লোকগুলোর দুরবস্থায় আমার আফসোস হয়, ভোরের আলোতে যারা চোখ খুলতে চায়না। আপনি যদি নিজে অন্ধকারের সাথে ছুটতে চান, বাঁধা দেব না। সে সময়ের অপেক্ষা করব, আঁধারের সাথে টক্কর খেয়ে খেয়ে যখন আপনার চোখ খুলবে।'

কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করল না, ছুটে সামনের কামরায় চলে গেল ইয়াসমীন। হতভম্বের মত কাউসের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। বলল ঃ 'কাউস, খোদার দিকে চেয়ে ওদের বোঝাও। নিজের জন্য কিছুই আমি চাই না। আমি চাই ওরা কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে যাক।'

নিশ্চিন্তে জওয়াব দিল কাউস ঃ 'ওদের ব্যাপারেই যদি আপনার দুর্ভাবনা হয়ে থাকে, কথা দিচ্ছি মাদায়েনে কোন ভয় নেই ওদের।'

ক্ষেপে গেল মিয়ানদাদঃ 'তুমি মাহবানু আর ইয়াসমীনের হিফাজতের জিম্মা নিচ্ছ?'

ঃ 'না, এখন মুসলমানদের সিপাহসালারের জিম্মা হচ্ছে ওদের হিফাজত করা।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল মিয়ানদাদের চেহারা। কাঁপতে লাগল তার গোটা দেহ। নিজকে কিছুটা সংযত করে বললঃ 'আমি জানতাম না, ওদের ভাগিয়ে নিতেই তুমি এসেছে।'

ঃ 'না মিয়ানদাদ, ধ্বংসের পথ থেকে তোমাকে বাঁচাতে আমি এখানে এসেছি। আমাকে এখানে পাঠিয়েছে এমন ব্যক্তি, যে তোমার উৎকৃষ্ট দোস্ত।'

ঃ 'তুমি মুসলমান হয়েছ?'

ঃ 'হ্যাঁ। অহংকার, ঘৃণা অথবা ভয় শান্তির পথ গ্রহণ করতে আমায় বাঁধা দিতে পারেনি, এ জন্য গর্ব করছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল মাহবানু। মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'সত্য স্বীকার করা যদি কোন অপরাধ হয়, শাস্তির জন্য নিজকে আপনার সামনে পেশ করছি আমি।'

ঃ 'তুমি...............?'

ক্লান্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল মিয়ানদাদ।

দরজার দিকে এগোল মাহবানু। থমকে দাঁড়াল কি ভেবে। ফিরে চাইল মিয়ানদাদের দিকে।

ঃ 'ভাইজান।'

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ডাকলও। তার কম্পিত হাত স্পর্শ করল মিয়ানদাদের কপাল। জওয়াব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল ও।

ঃ 'ভাইজান, ভাইজান!' ধরে এল মাহবানুর কণ্ঠ।

তার হাত ধরল মিয়ানদাদ। ছল ছল অশ্রুতে ছেয়ে গেল চোখ।

ঃ 'আমার বোন, আঁধারের সাথে আর ছুটব না আমি।' উঠে বসল ও।

কাউসের দিকে ফিরে বললঃ 'কাউস, যদি পরাজয় মেনে নিই, মেনে নিই হাসানের সব শর্ত, তবে কি আমাদের মাঝের ঘৃণার প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে বলে বিশ্বাস কর তুমি?'

ঃ 'হাসান আপনাকে ঘৃণা করে না। আপনি যদি সত্যকে গ্রহণ করেন, তিনি খুশী হবেন। আর যদি নাও করেন, জাহাদাদ আর মাহবানুর ভাইকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারেননি বলে দুঃখ হয়তো পাবেন কিন্তু এক ভাই হিসাবে আপনার প্রতি তার যে মমতা তাতে কোন পার্থক্য হবে না।'

ঃ 'না না, কথা দাও, তার সামনে আমার প্রসঙ্গ তুলবে না। অসহায় আর হতাশ হয়ে পথ পরিবর্তন করেছি একথা তাকে বলবে না। আমি যখন সুস্থ হবো, যদি সত্যি হয় তোমাদের কথা আর আমি বুঝতে পারি এটাই মুক্তির রাজপথ, মাদায়েনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা আমি করব। তার সামনে যেতেও তখন লজ্জা পাব না আমি। কিন্তু এখন নয়।'

ঃ 'কোব্বাদের বেটা। তোমার মোয়ামেলা হাসানের সাথে নয়, বরং তার স্রষ্টার সাথে। যার দরবারে অনুতাপের কোন অশ্রুই নিস্ফল হয় না, যিনি বান্দার আনুগত্যকে পুরস্কৃত করতে চান। হাসান, মনে করে আগামী দিনের সৌভাগ্য তোমার পথ চেয়ে আছে। জাহাদাদের ভাই হেদায়াতের রাস্তায় তার চেয়ে পিছিয়ে ছিল না, এজন্য গর্ব বোধ করবে হাসান।'

মাহবানু ব্যাকুল চোখে তাকিয়েছিল ভাইয়ের দিকে। ওদের কথাবার্তা শুনে বারবার ওর চেহারার রং বদলে যাচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, তার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে নতুন আলোর প্রভা বিকশিত হচ্ছে।

ঘন্টা খানেক পর। কাউস কালিমা তাওহীদ পড়াচ্ছিল মিয়ানদাদকে। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে উঠল মাহবানুর নয়ন যুগল। আচানক বসা থেকে উঠে অশ্রু মুছতে মুছতে ছুটে গেল পাশের কামরায়। নিজের অজান্তে জড়িয়ে ধরল ইয়াসমীনকে।

ঃ 'ইয়াসমীন, আমার ভাই আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছেন।'

ইয়াসমীন জড়িয়ে ধরল ওকে। চোখে তারও আনন্দাশ্রু।

বাড়ীর বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটু পর দরজায় এসে দাঁড়াল সোহেল।

ঃ 'ভাইজান এসেছেন।'

খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল মাহবানুর চেহারা।

ঃ 'তাকে ভিতরে নিয়ে এসো। ভাইজানকে জাগিয়ে দিচ্ছি আমি।'

ঃ 'না, তাঁর বিশ্রাম নষ্ট করবেন না। ভাইজানের সঙ্গী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। যাবার আগে কাউসকে কিছু বলতে চাচ্ছেন তিনি। সে তো নেই। আপনিই বরং তার কথা শুনে নিন।'

ঃ 'কুরআনের দারস শুনতে গেছে কাউস। এখুনি ফিরে আসবে, তাকে নিয়ে এসো।'

ঃ 'না আপনি আসুন। তার খুব তাড়াহুড়া।'

ঃ 'যাও মাহবানু।' বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'তুমিও এসো আমার সাথে।'

তার হাত ধরে হাঁটা দিল মাহবানু। কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে হাসান। ওদের দেখে দু'কদম এগিয়ে এসে বললঃ 'মাফ করুন। আপনাদের অসময়ে কষ্ট দিচ্ছি। মিয়ানদাদ কেমন আছে?'

ঃ 'তিনি ভাল। কাল বিছানা থেকে উঠে আঙ্গিনায় পায়চারী করেছিলেন।'

ঃ 'মিয়ানদাদের অনুমতি ছাড়াই ভেতরে চলে এসেছি। কাউস নেই, তাকে জরুরী এক পয়গাম দিতে চাচ্ছিলাম।'

আনন্দ আর পেরেশানী নিয়ে ইয়াসমীনের দিকে চাইল মাহবানু।

ঃ 'এ ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না আপনার জন্য। ' বলল ইয়াসমীন। 'মাহবানুর অনুযোগ, আপনি হয়ত পথই ভুলে গেছেন।'

ঃ 'মাহবানু এমন অভিযোগ আমায় করতে পারে না। মিয়ানদাদের মানসিক অবস্থা সে জানে, নইলে অবশ্যই আসতাম আমি।'

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' মাহবানুর প্রশ্ন।

ঃ 'হীরা যাচ্ছি। আমাকে ইরানের বিজিত এলাকা পরিদর্শনের হুকুম দিয়েছেন আমীরের লশকর। এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিতে হবে। ফৌজের আরো কয়েকজন যাচ্ছে আমার সাথে।'

ঃ' তাহলে এক দীর্ঘ সফরে যাচ্ছেন আপনি?'

ঃ 'হ্যাঁ, ইরানের পর মোসোপটেমিয়ার এলাকাগুলোও ঘুরে দেখার প্রয়োজন হতে পারে। রাতে আকস্মিকভাবে আমীরে লশকরের এ হুকুম পেয়েছি। যাবার আগে মিয়ানদাদের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। জানি না সুস্থ হওয়ার পর মুসলমানদের ব্যাপারে তার মনোভাব কি হবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু আমি করতে পারিনি ওর জন্য, নিন্ এ হচ্ছে আমীরে লশকরের হুকুমনামা।'

ভাঁজ করা এক খন্ড কাগজ মাহবানুর দিকে এগিয়ে দিল হাসান।

ঃ 'এ হুকুমনামা যদি আমার ভাইয়ের জন্য হয় তবে তার সাথে দেখা করে যাওয়া উচিৎ আপনার। দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।'

মিয়ানদাদের কামরার দিকে হাঁটা দিল মাহবানু।

ঃ 'না, না, মাহবানু। বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়ত আমার সাথে সে কথাও বলবে না।'

চকিতে পিছন ফিরে চাইল মাহবানু। আবার দ্রুত পায়ে চলে গেল কামরার ভেতরে। ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাসান। তাকাল ইয়াসমীনের দিকে।

স্মিত হেসে ও বলল ঃ 'পেরেশান হবেন না। আমার বিশ্বাস, তলোয়ার বের করতে হবে না আপনাকে। আপনার প্রতীক্ষাতেই ছিল মাহবানুর ভাই।'

ঃ 'মিয়ানদাদ আমার প্রতীক্ষায় ছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ, এতদিন কেন তার খবর নেননি, আজও একথা বলে আফসোস করেছে সে। আপনার কিছুটা দেরী হবে সঙ্গীদেরকে একথা বলে আসুন।'

কিছু বলতে চাচ্ছিল হাসান, কিন্তু দেখল মাহবানুর সাথে কামরা থেকে বেরোচ্ছে মিয়ানদাদ। ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় এসে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল। এগিয়ে এল হাসান। হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল দু'জন।

ঃ 'মিয়ানদাদ, বাইরে আসা ঠিক হয়নি তোমার। ভেতরে চলো।'

কামরায় প্রবেশ করল ওরা। হাসান সোহেলের দিকে ফিরে বললঃ 'সোহেল,

ওদের গিয়ে বলবে, সামনের মঞ্জিলে তাদের সাথে মিলিত হব আমি। আমার ঘোড়া দারোয়ানের কাছে রেখে যাও।'

মিয়ানদাদকে বিছানায় শুইয়ে দেয়ার চেষ্টা করল হাসান।

ঃ 'না, শোব না আমি। তোমার সামনে বসেই আলাপ করতে চাই।' বলল মিয়ানদাদ।

মুখোমুখী বসল দু'জন। দরজায় দাঁড়িয়ে রইল মাহবানু ও ইয়াসমীন।

মিয়ানদাদ বললঃ 'মাহবানু, এসো, বসো এখানে। তুমিও এসো ইয়াসমীন। আমার আর হাসানের লড়াই খতম হয়ে গেছে। তোমাদের সামনে মেনে নেব আমার পরাজয়।'

লাজনম্র ভাবে এগিয়ে এল ইয়াসমীন। গুটিশুটি মেরে বসল বিছানার একপাশে।

ঃ 'মিয়ানদাদ।' হাসান বলল, 'জুলুমের পক্ষে তরবারী ধারণ করা থেকে তোমায় ফেরাতে পারিনি এ আমার চরম ব্যর্থতা। যে রাতের গভীর অন্ধকার পৃথক করে দিয়েছিল আমাদের দু'জনার পথ, তা শেষ হয়ে গেছে। এবার যদি তুমি বল, প্রভাতের ঝলমলে আলোয় দোস্ত ও দুশমনকে চিনতে পেরেছি আমি, তবে বুঝব, আমার এক বড় আশা পূর্ণ হয়েছে।'

ঃ 'হাসান, আজ আমি এতটা দুর্বল না হলে, মাদায়েনের বাজারে আর অলিতে গলিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতাম, আমি মুসলমান।'

খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাসানের চেহারা।

ঃ 'মিয়ানদাদ, আমার আনন্দের অনুমান করতে পারবে না তুমি। কিন্তু এ খুশীর খবর আমার জন্য অপ্রত্যাশিত নয়। সব সময়ই আমার এ বিশ্বাস ছিল, কোন দিন এক হয়ে মিশে যাবে আমাদের দু'জনার পথ। এর প্রমাণ পাবে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের চিঠিতে। বিশ্বাস ছিল, তাদের সামনে তুমি আমায় লজ্জিত করবে না।'

ঃ 'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের চিঠি! আমার জন্য! কি লিখেছেন?' চিঠি নিতে নিতে বলল মিয়ানদাদ।

ঃ 'তিনি হুকুম দিয়েছেন, সুস্থ হয়েই তুমি তোমার এলাকার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।'

ঃ 'আমার মন মানসিকতা না বুঝেই এ হুকুম দিলেন?'

ঃ 'কৃষকরা তোমার পথ চেয়ে আছে। তাদের কল্যাণের জন্য তুমি এ হুকুম তামীল করবে, এ জিম্মা আমি নিয়েছি। আমি জানতাম, তুমি যখন নিজের গ্রামে যাবে, নতুন বিপ্লবের প্রভাব দেখে তোমার বুঝতে কষ্ট হবে না যে, ন্যায় ও ইনসাফের প্রত্যাশীদের প্রথম প্রয়োজন দ্বীনে ইসলাম।'

ঃ 'ইসলাম কবুল না করলে অথবা হুকুম না মানলেও কি এ আচরণ পেতাম?'

ঃ 'হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে তোমার ব্যাপারে আমীরে লশকরের সামনে একজন সাধারণ

মুসলমানের এদ্দুর বলাই যথেষ্ট হতো যে, তোমার ঘর ছিল অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল। যখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে, তোমার পিতার জন্যও এমন হুকুমই নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ আমি পাইনি।'

নিঃশব্দে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'কাউস, ইয়াসমীন এবং আমার বোন সাক্ষী, কোন ভয় অথবা লোভে আমি মত বদলাইনি। আমার অতীত দেখে যদি কোন ভাল কাজের আশা আমার কাছে কর, নিরাশ করব না। দোয়া করো যেন অতীতের ভুলের কাফফারা আদায় করতে পারি।'

মৃদু হাসল হাসান।

ঃ 'মনে হয় তোমার জন্য আমার দোয়া কবুল হয়েছে।'

সংকোচ জড়ানো কণ্ঠে ইয়াসমীন বললঃ 'আপনার দোয়া আমাদের সবার জন্য কবুল হয়েছে। কিন্তু মাহবানুর জন্য কি হুকুম নিয়ে এসেছেন বলেন নি।'

পেরেশান হয়ে মিয়ানদাদের দিকে চাইল হাসান।

খানিক থেমে ইয়াসমীন বলল ঃ 'ভাইজান, মাহবানু আর আমি, দু'জনই মুসলমান হয়েছি।'

মুচকি হেসে হাসান বললঃ 'আমি জানি তোমরা দু'জনই মুসলমান হয়েছ। মিয়ানদাদের ব্যাপারে এও ছিল আমার নিরুদ্বেগের কারণ।'

ঃ 'আপনি জানতেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ইয়াসমীন।

ঃ 'হ্যাঁ, এ খোশ খবর কাউস শুনিয়েছে সোহেলকে, সোহেল বলেছে আমায়।'

ঃ 'কিন্তু আমার প্রশ্নের জওয়াব আপনি দেননি। আমি জানতে চাচ্ছি, মাহবানুর ব্যাপারে আপনার কি হুকুম?'

ইয়াসমীনের দিকে তেড়ে এল মাহবানু। ওর হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

মিয়ানদাদের দিকে তাকিয়ে হাসান বললঃ 'মিয়ানদাদ, তুমি বিশ্রাম কর। আমায় এবার যেতে দাও।'

ঃ 'না, বসো।' তার হাত ধরে বসিয়ে দিল মিয়ানদাদ।

নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ঃ 'হাসান!' মিয়ানদাদ বলল, 'ইয়াসমীন তোমার সাথে ঠাট্টা করেনি বরং আমার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে গেল। মাহবানুর ব্যাপারে কি ভেবেছ, এ প্রশ্ন ছিল আমারও।'

হাসান তার হৃদয়ের ভাষা হারিয়ে ফেলল। আবেগ ভরে বললঃ 'আমার কি কিছু বলা প্রয়োজন?'

ঃ 'না হাসান, এখন আর তা বলার প্রয়োজন নেই। তবে তুমি কবে ফিরছো?'

ঃ 'জানিনা। পরবর্তী অভিযানের জন্য আমীরুল মুমিনীনের হুকুমের অপেক্ষা

করছেন সিপাহসালার। হুকুম পেলেই রওনা দেবে ফৌজ। আমিও শামিল হবো ওদের সাথে। তবে নতুন ক্ষেত্রে লড়াই শুরু হওয়া পর্যন্ত ইরানে আমার কাজ চালিয়ে যাব। এর মধ্যে তোমরা গাঁয়ে পৌছে গেলে কোন একদিন এসে দেখে যাব তোমাদের।'

ঃ 'এখন সোজা হীরা যাচ্ছ?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'ডাক্তার বলেছে, আগামী মাসেই ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারব আমি। তুমি ভেবোনা, আমি খুব তাড়াতাড়িই গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করব। মাহবানুর ভবিষ্যতের ব্যাপারে যদি তার ভাইয়ের ফয়সালা তোমার মঞ্জুর হয়, তবে আগামী চাঁদের দশ তারিখে ওখানে এসো। বল হাসান, আমাদের গাঁয়ের পথ ভুলে যাবে নাতো?'

ঃ 'না দোস্ত। তখনই দেখেছিলাম তোমাদের গাঁয়ের পথ, ভয়ংকর অন্ধকার ছাড়া যখন আমার সামনে কিছুই ছিল না।'

মোসাফেহার জন্য হাত এগিয়ে দিল হাসান। মিয়ানদাদ দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করল তাকে।

ঃ 'দোস্ত আমার! আমার ভাই! খোদা হাফেজ।'

ঃ 'খোদা হাফেজ।' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল হাসান।

মাহবানু এবং ইয়াসমীন আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল হাসান। পিছন ফিরে বললঃ 'ইয়াসমীন, এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেল ও।

ঃ 'ইয়াসমীন।' হাসান বলল, 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। মাহবানুকে এ পয়গাম দিও, তার গাঁয়ের পথ আমি ভুলব না।'

বেরিয়ে গেল হাসান। মুচকি হেসে মাহবানুর দিকে ফিরল ইয়াসমীন। ও এগিয়ে প্রশ্ন করলঃ 'ইয়াসমীন, ও কি বলল?'

ঃ 'আমি বলব না।' গম্ভীর হয়ে বলল ইয়াসমীন।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে বল।'

মাহবানু তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভেতরে। দুষ্টুমী ভরা হাসিতে তার দিকে তাকাল ইয়াসমীন। বললঃ 'ও বলছিল মাহবানুর গাঁয়ের পথ আমি ভুলব না। এর মানে কি জান? তার মানে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে গ্রামে যাচ্ছ। সেও যাবে ওখানে। আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ও। এবার বুঝেছ কি জন্য সে এত খুশী? মাহবানু, তোমার ভবিষ্যতের ফয়সালা হয়ে গেছে, এখন আর আমার ওকালতির দরকার নেই।'

পাশের কামরা থেকে ভেসে এল মিয়ানদাদের কণ্ঠঃ 'মাহবানু, মাহাবানু।'

ঃ 'আসছি ভাইজান।'

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসেছিল মিয়ানদাদ। আলতো পায়ে কামরায় প্রবেশ করল মাহবানু। মিয়ানদাদের হাতের ইশারায় বসে পড়ল। নিঃশব্দে ওর দিকে কতকক্ষণ তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ।

ঃ 'মাহবানু।' বলল সে, 'জীবন চলার পথে কখনো এমন মোড়ও আসে, মাস অথবা বছরের সফর পার হতে হয় কয়েক মুহূর্তে। হাসান যাচ্ছে, সহসা অনুভব করলাম, জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে আমার। আগামী চাঁদের দশ তারিখ তোমাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। বল, এতে তোমার আপত্তি নেইতো?'

মৃদু মৃদু হাসছিল মিয়ানদাদ। মাটিতে মিশে যাচ্ছিল মাহবানুর দৃষ্টি।

ঃ 'আগামী মাসের শুরুতে আমি গাঁয়ে ফিরে যেতে চাই। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন জওয়াব দাওনি। ঠিক হয়েছে তো আমার ফয়সালা?'

মাথা তুলল মাহবানু। ছলছল চোখে তাকাল ভাইয়ের দিকে। সামনে নুয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিয়ানদাদ বললঃ 'বোন আমার! হামেশা তোমার ঠোঁটে দেখেছি মুচকি হাসি। তোমার জন্য খুঁজছিলাম মর্মরের প্রাসাদ। কিন্তু আমি আগুনের হলকাকেই ফুল ভেবেছিলাম। এ আমার ব্যর্থতা, আমার পরাজয়। হায়, যদি বুঝতাম আমার আত্মা প্রবঞ্চনার কাঁটায় ভরে দিয়েছে তোমার পথও। আমায় ক্ষমা করে দাও মাহবানু। দুর্ভাগ্যের আঁধারে তোমাকে ঠেলে দেয়ার অধিকার ছিল না আমার।'

মিয়ানদাদের হাত নিজের চোখে লাগিয়ে মাহবানু বললঃ 'আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ভাইকে আবার ফিরে পেয়েছি, একি আমার পরম সৌভাগ্য নয়?'

ঃ 'তুমি এর চেয়ে ভাগ্যবতী মাহবানু। এমন এক বাহাদুর আর শরীফ ব্যক্তির জীবন সংগিনী তুমি হতে যাচ্ছে, যার বিবেকের আলো ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছে আমায়।'

উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মাহবানু। কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। ফিরে বলল ঃ 'ভাইজান, ইয়াসমীনের ব্যাপারে কি ভাবছেন?'

কতকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল মিয়ানদাদ। চেহারায় ফুটে উঠল এক টুকরো বিষন্ন হাসি।

ঃ 'তোমাকে হয়ত বোঝাতে হবে না মাহবানু, ইয়াসমীনকে আমি প্রতিনিয়ত দেখেছি আমার কল্পনার আকাশে। গোমরাহীর অন্ধকারে যখন ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, ইয়াসমীনের স্মরণ ছাড়া কাটেনি একটি মুহূর্তে। ভেবেছিলাম, সফলতার শেষ ধাপে পা রেখে পারভেজের নাতনীকে বলবো, 'এখন কোন লজ্জা ছাড়াই তোমার আশা করতে পারি আমি।' ভেঙ্গে গেল আমার সে সিঁড়ি। আমি অনুভব করছি, আমাদের মাঝে এখন দুস্তর পারাবার, যা পাড়ি দেয়ার সাধ্য আমার নেই। বন্দীত্ব থেকে যখন ছাড়া পেলাম, দুনিয়া বদলে গেছে তখন। ইয়াসমীনের সামনে নিঃস্বের মত হাত প্রসারিত করতে চাইনি। মনে করেছি, কুদরত হয়ত দুর্ভাগ্যের কাল মেঘ সরিয়ে দেয়ার আরেকটা সুযোগ

আমায় দিচ্ছে। আবার ফৌজে শামিল হলাম। চাইলাম অতীতের সে দুর্বলতা দূর করতে– আমার আশা, আমার স্বপ্ন যার ভয়ংকর আঁধারে ধুকে ধুকে মরছিল। কিন্তু আবারো ছুটছি নিশ্ছিদ্র আঁধারের সাথে, বুঝতে পারিনি। বলতে দ্বিধা নেই, আমার পথের শেষ প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছি আমি। মাহবানু, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ও যদি আমায় ঘৃণার পাত্র মনে না করে, যদি ভুলে যেতে পারে এক প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অতীতের দুর্বলতা, তাহলে ভাববো সব হারিয়েও আবার সব কিছুই আমি ফিরে পেয়েছি।'

ঃ 'ইয়াসমীন জানে না এমন কোন কথা আপনি বলেননি। কিন্তু এখনো আমি আমার প্রশ্নের জওয়াব পাইনি।'

ঃ 'ইয়াসমীন আমায় বিশ্বাস করলে তাকে নিরাশ করব না, এর চেয়ে বেশী আর কি বলতে পারি?'

ঃ 'ভাইজান, আপনাদের শাদী কবে হচ্ছে তাই আমি জানতে চাচ্ছি।'

হাসি চেপে মিয়ানদাদ বললঃ 'তুমি না বলছিলে ও বহরাশির যাচ্ছে।'

ঃ 'ও গেলে একা যাবে এ খেয়াল আপনার হল কিভাবে?'

ঃ 'তুমি কিভাবে বুঝলে, আমরা গ্রামে গেলে ও আমাদের সাথে থাকবে না। তাকে গিয়ে বল, তার ভবিষ্যতের ফয়সালার ভার আমায় দিলে, এ মাসের শেষের দিকে আমাদের শাদীর দিন ধার্য করার এখতিয়ার আমি আমার বোনকে দিচ্ছি।'

মাহবানু বললঃ 'তাহলে আমার ফয়সালা হচ্ছে, কাউসের সাথে বহরাশির ফিরে যাবে ইয়াসমীন। বিয়ের রসম পুরো করবো আপনি সুস্থ হতেই। এক সপ্তাহের ভেতর সুস্থ হবেন এ আশা কি করতে পারি?'

হেসে মিয়ানদাদ জওয়াব দিলঃ 'এক সপ্তাহ পর আমি সাঁতরে নদীও পার হতে পারব।'

পঁয়ত্রিশ

'মিয়ানদাদ এসে গেছে! মুসলমান হয়েছে মিয়ানদাদ, সাথে এসেছে তার বোন ও স্ত্রী!' একদিন ভোরে গ্রামের লোকেরা একে অপরকে শোনাচ্ছিল এ খোশখবর। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সব লোক এসে জমা হল তার আঙ্গিনায়। তার সাথে আলিঙ্গন করছিল জওয়ান বুড়ো। অন্দরে মাহবানু ও ইয়ামীনের কাছে বসেছিল মহিলাদের মেলা। কোব্বাদের বেটার আগমন সংবাদ পৌছল আশপাশের গ্রামেও। এ ঘর মুখো হচ্ছিল সেখানকার নারী পুরুষের কাফেলা। ইরানী প্রভূদের দূর থেকে সালাম করে নিজেদের

ধন্য মনে করত যে সব রাখাল আর কৃষকরা; নতুন ছাঁচে গড়ে উঠেছিল ওরা। তাদের চেহারা জুড়ে খেলা করছিল এক অনাবিল প্রশান্তি। মিয়ানদাদ অনুভব করল, স্বয়ং ইয়াজদগির্দ এলেও এরা তার পাশে বসতে কুণ্ঠিত হবে না ওরা। ওদের সাথে বসে আলাপ করে তার নিজেরও আনন্দ হচ্ছিল। নিজের এ মানসিক পরিবর্তনে অবাক হচ্ছিল ও নিজেই।

দুপুরে এক বুড়ো হাবেলীতে প্রবেশ করলেন। গাঁয়ের লোকেরা বললঃ 'এ বুজর্গ থাকেন বাহরাইন। গত আট মাস থেকে তালীম দিচ্ছেন আমাদের।'

তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াল মিয়ানদাদ। বুড়ো দ্বিধাহীন ভাবে মোসাফেহা করে তার পাশে বসলেন।

ঃ 'আমার নাম আদী।' বললেন তিনি। 'গাঁয়ের লোকদের মত আমিও আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। খোদার শোকর, হেদায়েতের আলোয় স্নান করেছেন আপনি। আপনার ব্যাপারে হাসানের আশা পূর্ণ হয়েছে। সে বলতো, কোব্বাদের বেটা বেশী দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারবে না। আপনার এলাকার প্রতিটি লোকই বলত, একদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন আপনি।'

ঃ 'দীর্ঘদিন আঁধারে হোচট খেয়ে ফিরে এসেছি। আপনি দোয়া করবেন আমার জন্য।'

পঞ্চম দিনের সন্ধ্যা। বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়েছিল মাহবানু। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে গেল দিকচক্রবালের ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে। মুচকি মুচকি হাসছে প্রথম রাতের চাঁদ। দোয়ার জন্য হাত তুলল ও।

খানিক পরই সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে এল ইয়াসমীন। বললঃ 'চাঁদ যথেষ্ট বড় মনে হচ্ছে। কাল আকাশে মেঘ না থাকলে অবশ্যই দেখা যেত। সব স্থানে তো আর মেঘ থাকে না! হয়ত হাসান দেখেছে একদিন পূর্বেই, তাহলে কমে যাবে তোমার প্রতীক্ষার সময়। একটু বুদ্ধি থাকলে দু'তিন দিন আগেই পৌছবে। ভোরে কাউস তোমার ভাইজানকে বলছিল, পাশের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে হীরার এক লোক। সে বলেছে, মাদায়েনের সামনে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মুসলমানরা। নও মুসলিমদের জিহাদে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন ইসলাম প্রচারকগণ। কাউসের ধারণা, মাদায়েনের লশকর এগিয়ে গেলে, হাসানের সাথের একজনও লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে থাকবে না। হয়ত তাকে একাই আসতে হবে। তাতে অসুবিধা নেই। তোমার ভাইজান বলছিলেন, হাসানের গ্রামের সব লোকদের আমি এখানে নিয়ে আসব।'

ঃ 'যুদ্ধ শুরু হলে সাথীদের ছেড়ে ও চলে আসবে, তুমি এ ধারণা করলে কি ভাবে?'

স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত রেখে ইয়াসমীন বললঃ 'বোনটি আমার, পেরেশান

হয়োনা। ও অবশ্যই আসবে।'

ঃ 'ইয়াসমীন, জিহাদের জন্যই ও যাচ্ছে, তার জন্য অপেক্ষা করতে আমার কষ্ট হবে না।' মাহবানুর উদ্বেগহীন জওয়াব। 'দোয়া করব তার বিজয় এবং নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু আমার জন্য ও জিহাদের পথ ছেড়ে দেবে এমনটি কামনা করতে পারি না।'

কথার মোড় পাল্টে ইয়াসমীন বললঃ 'মাহবানু, তোমাদের শাদীতে আমি কি উপহার দেব জান?'

ঃ 'তোমার দোয়ার চেয়ে বেশী কিছু, আমি চাইনা।'

ঃ 'দোয়া ছাড়াও কিছু দিতে চাইলে ফিরিয়ে দেবে না তো?'

ঃ 'বলই না দেখি কি দেবে?'

ঃ 'কথা দাও ফিরিয়ে দেবে না।'

ঃ 'আচ্ছা কথা দিলাম।' হাসছিল মাহবানু।

ঃ 'আমার মাদায়েনের বাড়ীটা তোমাদের দেব।'

ঃ 'সে বাড়ীতো আমার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী। জানিনা, এমন দামী তোহফা হাসান গ্রহণ করবে কিনা?'

ঃ 'তাকে মানানো আমার কাজ।'

ঃ 'কিন্তু ও বহরাশিরই থাকবে এমনতো কোন কথা নেই।'

ঃ 'আমার তোহফা কবুল করলে তোমাদের বহরাশির থাকতে হবে, এমন তো বলিনি। সে বাড়ী তোমাদের। তোমরা বিক্রি কর অথবা রেখে দাও, আমার কোন দাবী নেই। তোমার ভাইয়ের ঘরে তোমাদের স্থান হবে না, তার মানে কিন্তু এ নয়। এর এক অংশ সব সময় তোমাদের জন্য খালি থাকবে। ইস্পাহানের কাছের বাড়ীটাও আমার খুব প্রিয়। ওখানে পর্বত ঢাকা থাকে তুষারে। পাহাড় থেকে নেমে আসে শীতল ও স্বচ্ছ পানির ঝরণা। শীতের পর যখন বসন্ত আসে, বাগানগুলো মৌ মৌ করে সুবাসে। কত সুমিষ্ট আমাদের বাগানের নাশপাতি আর আঙ্গুর। মাহবানু, ইস্পাহান বিজয় হলে আমি যাব ওখানে। তুমি হবে আমার সংগী। গরমের দিনে নাশপাতি গাছের শীতল ছায়ায় বসে হারানো দিনের গল্প করব আমরা।'

ঃ 'ইয়াসমীন, ইস্পাহান তো অনেক দূর।'

ঃ 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছ তুমি, ইস্পাহান এখান থেকে অনেক দূর কিন্তু প্রথম রাতের চাঁদ পূর্ণ হতে বেশী সময় লাগে না। এ মুহূর্তে আমাদের কেবল দশমীর চাঁদেরই প্রতীক্ষা করা উচিৎ।' হাসতে লাগল ও।

আকাশের দিকে তাকাল মাহবানু। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে চাঁদ।

ঃ 'এবার চলো।' তার হাত ধরে বলল ইয়াসমীন।

চান্দ্র মাসের দশ তারিখ। মিয়ানদাদের ঘরে শুরু হল মেহমানদের আনাগোনা।

কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোন সংবাদ এলনা হাসানের। মিয়ানদাদের উদ্বেগ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছিল। ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের পথ পানে তাকিয়েছিল গাঁয়ের বালিকারা। বয়স্ক নারীরা প্রশস্ত কামরায় বসে দোয়া করছিল বরের নিরাপত্তার জন্য।

ইয়াসমীন কখনো শান্তনা দিত মাহবানুকে, আবার কখনো মহিলাদের ভীড় থেকে বেরিয়ে ছুটে যেত ছাদে। তার মনে হচ্ছিল, আজকের সূর্য যেন দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। চতুর্থবার ও যখন ছাদে যেতে চাইল, ওর আঁচল ধরে মাহবানু বললঃ 'ইয়াসমীন, খোদার দিকে চেয়ে বস।'

ঃ 'কিন্তু, আমি বড় পেরেশান মাহবানু।'

ঃ 'আমি জানি তুমি পেরেশান।'

চাপা আওয়াজে ইয়াসমীন শুধালঃ 'সত্যি বল তো মাহবানু, তুমি পেরেশান নও?'

ঃ 'না।' নিশ্চিন্তে জওয়াব দিল ও।

ঃ 'আজ যদি ও না আসে?'

ঃ 'আজ ও না এলেও ভাবব এ খোদারই ইশারা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইয়াসমীন। এক বালক ছুটে এসে বললঃ 'তিনি আসছেন। গাঁয়ের কাছে পৌছে গেছেন তারা।'

নারী এবং বালিকারা ছাদে অথবা বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে হাবেলীতে প্রবেশ হতে দেখছে ক্ষুদ্র বরযাত্রী। নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল ওরা। বরের রূপ নিয়ে আলোচানা করছিল কেউ কেউ। বরের সাথে এসেছে মাত্র পনর ব্যাক্তি, এ জন্য হয়রান ছিল অনেকে। লশকরের কয়জন নামকরা সর্দার সাথে ছিলেন বলে খুশী হয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু এসব খেয়াল নেই মাহবানুর। কোন এক সুদূরে স্বপ্নের মনোরম উদ্যানে পৌছে গেছে ও। ক্লান্ত শ্রান্ত পথহারা মুসাফির গন্তব্যে পৌঁছে যে তৃপ্তির আবেশ পায় তেমনি অনাবিল প্রশান্তি খেলা করছিল তার চেহারায়।

ইজাব কবুলের রসম পালিত হল। মহিলারা বর-কনেকে মোবারকবাদ জানিয়ে বিদায় হয়ে গেছে। ইয়াসমীন ছাড়া কেউ নেই কামরায়। মিয়ানদাদ ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে দরজায় মাথা লাগিয়ে ফিরে গেল এক নজর দেখে। কামরায় ঢুকল হাসান।

ঃ 'ভাইজান, আমার মোবারকবাদ কবুল করুন।' বলেই উঠে বেরিয়ে গেল ইয়াসমীন।

আনত নয়নে বসে আছে মাহবানু। আলতো পায়ে এগিয়ে গেল হাসান। ডাকলঃ 'মাহবানু!'

আরক্ত লজ্জায় আধবোঁজা চোখে হাসানের দিকে তাকাল মাহবানু। মাথা নুয়ে এল আবার।

ঃ 'মাহবানু, আমার সাথীরা চলে যাচ্ছে।'

ঃ 'কোথায়?' চমকে উঠল মাহবানু।

ঃ 'অবিলম্বে হীরা থেকে মাদায়েন পৌছার হুকুম দেয়া হয়েছে আমাদের?'

ঃ 'আর আপনি ....?' এর বেশী বলতে পারল না মাহবানু।

ঃ 'চারদিন এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি। মাদায়েনের পরিবর্তে সোজা জলুলার রোখ করব। ওদের বিদায় দিতে নদীর ঘাট পর্যন্ত যাচ্ছি আমি ও তোমার ভাই। অনুমতি দেবে?'

মিষ্টি হাসির ঢেউ খেলে গেল মাহবানুর চেহারায়।

ঃ 'সোহেল কোথায়?'

ঃ 'আমার সাথেই এসেছে। তুমি বসো, আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঃ 'ও থাকবে না?'

ঃ 'না, সেও যাচ্ছে।'

আসরের নামাজ পড়ে কিশতিতে সওয়ার হল হাসানের সংগীরা। নৌকা চলে গেছে ওপারে। বালির উপর বসতে বসেত হাসান বললঃ 'মিয়ানদাদ, ঘোড়া পাঠিয়ে দাও। হেঁটে যাব আমরা।'

ফিরে গেল কাউস আর গাঁয়ের আর সাবাই। বিকেলের নির্মল প্রকৃতিতে বালিতে বসে রইল হাসান ও মিয়ানদাদ। নদী পেরিয়ে ধূলিময় দিকচক্রবালে গভীর ভাবে তাকিয়ে ছিল হাসান। মিয়ানদাদ মাথা ঝুকিয়ে আঙ্গুল দিয়ে রেখা টান ছিল নরম বালিতে।

ঃ 'মিয়ানদাদ।' হাসান বলল। 'কত ইনকিলাব দেখেছে এ নদী। গত কয়েক বছর ধরে কতো মর্দে মুজাহিদ এ উপকুলের বালিতে রেখে গেছে তাদের পদচিহ্ন। যদি কোন দিন ফুরসত পাই, মেসোপটেমিয়া থেকে ফোরাতের উপকুল পর্যন্ত সফর করব। নদীর কুলে কুলে সে পবিত্র স্থানগুলো দেখাব তোমায়, যেখানে সংগঠিত হয়েছে ইসলাম আর কুফরের লড়াই। নাজার, বুইব, কাদেসিয়া এবং আরো কত ময়দানের নকশা ভাসছে আমার চোখে। কুদরতের কোন মোজেযা যদি ফোরাতের তরঙ্গকে বাকশক্তি দান করত, বারবার ওরা বলত সে সব বাহাদুর মানুষগুলোর কথা, এসব ময়দানে যারা উড়িয়েছেন ইসলামের বিজয় নিশান। তাদের সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলাম, হতাশার আঁধার ছাড়া কিছুই ছিল না আমার সামনে। ইরাকের সীমা পেরিয়ে এতটুকু প্রশান্তি শুধু হয়েছিল আমার, এবার হরমুজের হাত পৌছবে না আমার শাহরগ পর্যন্ত। দেশের বাইরে নিঃস্ব অবস্থায় কাটাতে পারব জীবনের বাকী দিনগুলো। কিন্তু যখনি দেখা পেলাম মুসান্না বিন হারেসার, প্রত্যাশা আর উদ্দীপনায় ভরে গেল আমার দুনিয়া। সে কাফেলায় শামিল হলাম, যার নকীবের দৃষ্টি দেখছিল দজলা ফোরাতের আরো সামনে।

কিসরার বিশাল সালতানাতের সাথে ক্ষুদ্র একটা দলের টক্কর বাঁধানো বিদ্রূপ বৈ ছিল না। আমি যদি ভাবতাম এক সৈনিকের দৃষ্টিতে, বিচার করতাম বৈষয়িক উপকরণ দিয়ে, আমিও বলতাম, এ এক পাগলামী। কিন্তু দৃঢ়তা আর একীনের সে প্রতিচ্ছবি পাল্টে দিলেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি। শেষ রাতের জ্বলজ্বলে সিতারা যেমনি সুর্যোদয়ের আভাস দেয় রাতের মুসাফিরকে। আমি দেখছিলাম মুসান্নার চোখের আলোয় তেমনি পালিয়ে যাচ্ছে জুলুম আর বর্বরতার অন্ধকার। হেজাযের কাফেলাকে ইরাকের পথ দেখিয়েছিলেন যে মহান নেতা, আজ দুনিয়ায় নেই তিনি। কিন্তু তার আলো মুছে যায়নি আমার দৃষ্টি থেকে। মাদায়েনে কিসরার লশকর দেখে আমরা যখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ঘোড়া নিয়ে, আমার মনে হয়েছিল, মুসান্না এবং তার দৃঢ়চেতা সঙ্গীদের আত্মা 'কসরে আবইয়াজে' আমাদের অপেক্ষা করছে।'

ঃ 'তার বাহাদুরীর কাহিনী আমি শুনেছি কাউসের মুখে। আমার কেবলই মনে হয়, হায়! আমিও যদি থাকতাম তোমাদের সাথে। বাহরাইনের এক রইস ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, এ সংবাদ মাদায়েনে পৌছতেই আশ্চর্য হয়েছিলাম আমরা। আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কিসরার বিশাল সালতানাতের সাথে মুসলমানরা টক্কর দিতে পারে। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন এর নেতৃত্ব নিলেন, তখন এর প্রতি গভীর নজর দিলাম আমরা। এ মুজাহিদের খ্যাতি পৌছেছিল কিসরার দরবার পর্যন্ত। তবুও এ স্বল্প লশকর ইরানের জন্য কোন বিপদের কারণ হতে পারে, মানতে চাইল না ফৌজি সর্দাররা। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই তাঁরা আমাদের চক্ষু খুলে দিলেন। পরপর আমাদের লশকরকে পরাজিত করে ওরা যখন চলে গেল সিরিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, মুসান্নার অবশিষ্ট ফৌজ কোন ময়দানে টিকতে পারবে না। কিন্তু কয়েকটা লড়াইতেই আমাদের তিনি সচেতন করে দিলেন। বুইবে ইরানী লশকরের পরাজয়ের খবর কয়েদখানায় বসেই আমি পেয়েছি। মুসান্নার বিজয় আমার কাছে মোজেযার মত মনে হয়েছে। কয়েদখানা থেকে বেরিয়েই শুনলাম কাদেসিয়ার খবর। ওদের মাঝে আছে কত খালেদ, কত মুসান্না? কোথায় ট্রেনিং নিয়ে রোম ও ইরানের বিখ্যাত সালারদের ছাড়িয়ে গেছে এই মরুচারীরা? এ প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিল আমার সামনে।'

মৃদু হাসল হাসান।

ঃ 'মিয়ানদাদ, এ সেই দ্বীনের ফল, যে দ্বীন আপন সন্তানদের মানসিক ও দৈহিক স্বাধীনতায় ধন্য করেছে। যদি তুমি থাকতে কাদেসিয়ায়, প্রতিটি মুজাহিদদের হৃদয়ে দেখতে অপরাজিত হিম্মত। মুসান্নার দৃঢ়তা আর একীনের রোশনী দেখতে প্রতিটি সিপাইয়ের চোখে।

রোম ইরানের লড়াইয়ে কাইজার ও কিসরার গোলামদের তৎপরতা আমি দেখেছি। কিন্তু কাদেসিয়ায় দেখেছি মুজাহিদদের শৌর্য, যাদের উপর ছিল আল্লাহর

সাহায্য। মিয়ানদাদ, নিজের চোখে সে মহান কাফেলা দেখেছি, যাদের পথের ধূলোয় অনাগত বংশধরেরা নিজেদের জন্য খুঁজবে মর্যাদা। এ আমাদের খোশ কিসমত।'

ঃ 'তুমি খোশ নসীব হাসান।' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মিয়ানদাদ বলল। 'কিন্তু আমি তখন আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম।'

স্নেহ ভরে তার কাঁধে হাত রেখে হাসান বললঃ 'আঁধারে ঘুর পাক খাওয়া মুসাফির ভোরের রোশনীকে বেশী দাম দেয়। একদিন মুসান্নাকে নিজের অতীত শুনাতে গিয়ে তোমাদের খান্দানের প্রসংগ তুলেছিলাম। তিনি দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এমন লোক বেশী দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে না।'

ঃ 'হাসান, দোয়া করো, যেন অতীত দূর্বলতার কাফফারা আদায় করতে পারি। আমার নেক কামনা পূর্ণ করার একটাই পথ আছে, আমি জিহাদে শরীক হবো। একটা ক্ষুদ্র বাহিনী তৈরী করতে বেশী সময় লাগবে না। এ এলাকার জিম্মা দিতে পারি কাউস এবং আদীকে। আমীরে লশকর যদি আমার দরখাস্ত কবুল করেন, তোমাদের সঙ্গে আমায় পাবে ইরানের পরবর্তী প্রতিটি মঞ্জিলে।'

আনন্দের চারটে দিন কেটে গেল মধুময় স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। পঞ্চম দিন। ভোরেই সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল হাসান। চেহারার বিষন্নতা মুচকি হাসির আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছিল মাহবানু।

বর্ম পরে তলোয়ার কোমরে বেঁধে নিল হাসান। শিরস্ত্রাণ পরতে পরতে তাকাল জীবন সঙ্গীনির দিকে।

ঃ 'মাহবানু, খোদা হাফেজ!'

ঃ 'খোদা হাফেজ।' কাঁপা আওয়াজে জওয়াব দিল ও।

খানিক পর। ছাদে দাঁড়িয়ে হাসানের বিদায় দৃশ্য দেখছিল মাহবানু ও ইয়াসমীন।

ছত্রিশ

খলিফা ওমরের নির্দেশ পেয়ে বার হাজার জানবাজ নিয়ে মাদায়েন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে জলুলায় ছাউনী ফেললেন হাশিম বিন ওতবা। ওখানে জমায়েত হচ্ছিল ইরানের পরাজিত ফৌজ। ইয়াজদর্গিদ আশ্রয় নিয়েছিলেন হলওয়ান। তিনি নিয়মিত রসদ যোগান দিচ্ছিলেন ইরানী ফৌজকে। মুসলমানদের পৌছার পূর্বেই বিশাল ফৌজ আর অসংখ্য যুদ্ধ সম্ভার ওরা জলুলায় জমা করেছিল। শহরের চারপাশটা ছিল গভীর

খন্দকে ঘেরা। খন্দকের পেছনে পাঁচিল পর্যন্ত খোলা ময়দান। গোটা ময়দান জুড়ে পরিখা। শহরে আসা যাওয়ার পথের হিফাজতের জন্য গর্ত খোড়া হয়েছিল তীরন্দাজদের জন্য। খন্দক পেরিয়ে পাঁচিল পর্যন্ত পৌছতেই নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দুশমনের মোকাবিলা করতে হত মুসলমানদের। তা ছাড়া পাঁচিলের উপরটা ছিল তীরন্দাজে ঠাসা।

কাদেসিয়ার বীরশ্রেষ্ঠ কা'কাকে দেয়া হয়েছিল মুসলমানদের অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব। মুসলমানরা তাকে খালিদ আর মুসান্নার স্থলাভিষিক্ত ভাবতেন। ছিদ্দিকে আকবর এবং তারপর খলিফা ওমর কখনো সিরিয়া কখনো ইরাকের ময়দানে তার তলোয়ারের উপর ভরসা করতেন। কা'কা জলুলার স্থানীয় অবস্থা জেনে নিলেন প্রথম। লড়াইয়ের স্থানগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে।

লড়াই শুরু হল। দু'দলের মধ্যে হামলা, পাল্টা হামলা চলতে লাগল কয়েক সপ্তাহ ধরে। তীরন্দাজদের পরিখা হয়ে খন্দক পেরিয়ে হামলা করত ইরানীরা। মুসলমানদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পিছিয়ে যেতে হলে পথে বিছিয়ে দিত কাঁটা। মুসলমানদের ঘোড়াগুলো যখমী হত এতে। শুরু হত ইরানী তীরন্দাজদের তীর বৃষ্টি। কখনো খন্দকের আশপাশে কয়েক ঘন্টা ধরে চলত এ লড়াই।

মুসলমানদের উপর্যুপরী আক্রমণে পিছু সরে যেত ইরানীরা। ওদের ক্লান্ত সিপাইদের জন্য খুলে যেত দূর্গের কবাট। ময়দানে আসত তাজাদম সিপাই।

ইরানীদের মত মুসলমানদেরও রসদ সামানের অভাব ছিল না। মাদায়েন থেকে কিছুটা সাহায্য পেত ওরাও। তবুও অবরোধের দ্বিতীয় মাসেও প্রথম দিনের মতই ছিল যুদ্ধের অবস্থা।

একদিন প্রচন্ড লড়াই শেষে দুশমনকে খন্দকের দিকে ঠেলে দিল মুসলমানরা। আসরের নামাজ শেষে দক্ষিণ দিকে দেখা দিল একদল অশ্বারোহী। মাদায়েন থেকে নতুন লশকর আসছে , এমন কোন সংবাদ সেনাপতি পাননি। মুজাহিদদের প্রস্তুতি নেয়ার হুকুম দিলেন তিনি।

ছাউনী থেকে খানিকটা দূরে থেমে গেল নবাগত লশকর। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল এক অশ্বারোহী। সিপাহসালারের পাশে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ছিল হাসান ও সোহেল। আগন্তুক সোজা এগিয়ে এল হাশিম বিন ওতবার দিকে। হঠাৎ সোহেল চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ভাইজান, মিয়ানদাদ ভাইয়া।'

খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল হাসানের চেহারা।

ঃ 'জনাব আমি জানি ও কে।' সিপাহসালারকে বলল হাসান। 'ও আমার ভাই সমতুল্য।'

কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল মিয়ানদাদ। হাসানের সাথে মোসাফেহা করে নজর ফেরাল সিপাহসালার এবং অন্যদের দিকে।

ঃ 'তুমি মাদায়েন থেকে এসেছ?' প্রশ্ন করলেন হাশিম।

ঃ 'না জনাব, সোজা আমার গ্রাম থেকে এসেছি। আমীরের কাছ থেকে লড়াইয়ে অংশ নেয়ার অনুমতি আগেই নিয়েছিলাম।'

ঃ 'তোমরা কতজন এসেছ?'

ঃ 'আটশ অশ্বারোহী। গাঁয়ের আরো অনেক নওজোয়ান জিহাদে শরীক হতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল সময়ের।'

ঃ 'আটশ সওয়ারের সবাই প্রশিক্ষণ নিয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমার একীন, ওরা আপনাকে নিরাশ করবে না।'

পরদিন ভোর বেলা মুজাহিদরা খন্দকের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। অগ্রবর্তী বাহিনীতে থাকতে চাইল মিয়ানদাদের সংগীরা, কিন্তু সিপাহসালার তাদের পেছনে থাকার হুকুম দিয়ে বললেনঃ 'বীরত্ব দেখাতে পারিনি, চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিন তোমাদের কারো এ অভিযোগ থাকবে না। এখনো অনেক কিছু দেখার এবং শেখার বাকী আছে তোমাদের। তোমরা এ লড়াইয়ের তরিকা পদ্ধতি পুরোপুরি রপ্ত করেছ, এ ব্যাপারে আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের তীরের আওতা থেকে দূরে রাখতে চাই।'

সেদিন খন্দকের ওপারে তীর ছোড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল ইরানী লশকরের তৎপরতা। কিন্তু মুসলমানদের সারিগুলো ছিল নিরাপদ দূরত্বে। তীরন্দাজদের পরিখার পেছনে দুশমনের সব তৎপরতাই দেখতে পেত মুসলমানরা।

সন্ধ্যায় হাসানের সাথে দেখা হলে মিয়ানদাদ প্রথম প্রশ্ন করলঃ 'জলুলায় চূড়ান্ত লড়াই কবে হবে?'

ঃ 'বেশী সময় প্রতীক্ষা করতে হবে না তোমায়।' হাসানের নিরুত্তাপ জওয়াব।

এভাবে কেটে গেল দুদিন। তৃতীয় দিন ভোরে দেখা গেল খন্দকের পেছনে শহরের চার দেয়াল পর্যন্ত গোটা ময়দানই ইরানী লশকরে ছাওয়া। সূর্যের আলোর প্রথম ঝলকের সাথে অসংখ্য লশকর এগিয়ে আসতে লাগল খন্দকের দিকে। কা'কার অগ্রবাহিনী শান্তভাবে পিছু সরতে লাগল। ইরানীরা তিন দিক থেকে সরে এসে জমা হল পশ্চিম দিকে। মুসলমানদের সামনের সারিগুলো সরতে লাগল ডানে বাঁয়ে। খন্দক পারাপারের রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়াল ইরানী তীরন্দাজরা। আচম্বিত ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সাথে ধূলিঝড় উঠল দিগন্তে। ওদের দিকে তীর ছুড়তে ছুড়তে দ্রুত পিছু সরতে লাগল মুসলমানরা।

কয়েক মিনিটে খন্দকের এপারটা ভরে গেল ইরানী লশকরে। মুসলিম তীরন্দাজরা পিছিয়ে গেল আরো। এবার মূল বাহিনী এগিয়ে বল্লমের প্রাচীর দাঁড় করাল ইরানীদের সামনে। কা'কার লশকর ডানে বাঁয়ে সরে এগিয়ে আসার সুযোগ দিল ইরানীদের। ঘুরে হামলা করল তারা। শুরু হল প্রচন্ড লড়াই।

প্রথম ধাওয়াতেই খন্দকের এপারটা দখলে এসেছে ভেবে ইরানীদের জোশ বেড়ে

গেল। প্রতিটি মুসলমানের পালাবার দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় ছিল তারা। বন্যার মত পদাতিকরা আসছিল অশ্বারোহীদের পিছনে পিছনে। কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসলমানদের মূল বাহিনী। ডানে বাঁয়েও সংগঠিত হয়ে গেল তারা। ফলে খন্দকের এপারে স্বাভাবিক নড়াচড়া কঠিন হয়ে পড়ল ইরানীদের জন্য। মুসলমানদের অবরোধ ভেংগে বেরোনোর চেষ্টা করল ওরা। বারবার আক্রমণ করল ডানে বাঁয়ে, কিন্তু সফল হলনা। ইরানীদের প্রবল চাপে কয় কদম পিছিয়ে আসত মুসলমানরা। আবার আল্লাহু আকবার শ্লোগানে গর্জে উঠত সমগ্র ময়দান। তলোয়ারগুলো সংকীর্ণ করে দিত ইরানীদের।

শহরের পাঁচিল পর্যন্ত ইরানীদের জন্য ছিল প্রশস্ত ময়দান। কিন্তু শুরুতেই এতবড় বিজয়, পিছিয়ে আসতে চাইল না কেউ। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে খন্দকের এপারের জমিটুকু ধরে রাখতে চাইছিল ওরা, যেখানে প্রতিটি কদমে বাড়ছিল লাশের পর লাশ।

ইরানী পদাতিক বাহিনীর বিরাট অংশ তখনও খন্দকের ওপারে। উত্তর, পূর্ব অথবা দক্ষিণ দিক দিয়ে খন্দক পেরিয়ে যে কোন সময় ওরা মুসলমানদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু ওদের সিপাহসালারের পতাকা তখন উড়ছিল পশ্চিম দিগন্তে। আর কোন দিকে তাকাতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

আবহাওয়া ছিল প্রচন্ড গরম। সকাল থেকে বাতাস বন্ধ। পশ্চিম আকাশে ওড়াউড়ি করছিল খন্ডখন্ড মেঘ।

দুপুরে শুরু হল প্রবল বাতাস। কা'কা তাকালেন আসমানের দিকে। দরাজ কণ্ঠে বললেনঃ 'মুজাহিদ! এ মেঘমালা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিজয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছে। ইনশাআল্লাহ, আমরা জলুলায় মাগরিবের নামাজ আদায় করব।'

মুহূর্তে প্রতিটি সিপাইর কানে পৌছে গেল সালারের এ আওয়াজ। মেঘের ঘনায়মান আঁধারের সাথে প্রচন্ডতর হতে লাগল মুসলমানদের হামলা। তীব্র বাতাসের ঝাপটায় দিগন্তের ধূলি আস্তরণ ভেদ করে কয়েক কদম সামনে দেখাটাই মুশকিল হয়ে উঠল ইরানীদের জন্য। ওরা জড়ো হচ্ছিল খন্দকের দিকে। পেছনের সারিগুলোকে খন্দক পার হওয়ার সুযোগ দিতে আগের সারির সিপাইরা ফিরে হামলা করছিল মুসলমানদের উপর। কিন্তু ধূলিঝড় আঁধারের পর্দা টেনে দিল ওদের দৃষ্টির সামনে। উল্টো হাওয়ায় চোখ বন্ধ করে এলোপাথাড়ি তলোয়ার ঘুরাচ্ছিল ওরা। উদ্দেশ্যহীন আক্রমণ। অপরদিকে অনুকূল বাতাসে মুসলমানদের তীর তরবারী আর বল্লমের প্রতিটি আঘাতে ধরাশায়ী হচ্ছিল ইরানীরা।

একদল জানবাজ নিয়ে আচানক ডান দিক থেকে হামলা করলেন কা'কা। খন্দকের পশ্চিম পাশে জমায়েত হওয়া ইরানীদের দলে পিষে বেরিয়ে গেলেন বাম দিকে। এলোমেলো সারির মাঝে আল্লাহু আকবারের শ্লোগান শুনে ভড়কে গেল

ইরানীরা। যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। অন্ধকারে খন্দকে পড়ে গেল অনেকে। খন্দকের কিনার ঘেঁষে কয়েক হাজার সিপাই বেরিয়ে গেল বায়ে। খন্দক পেরুতে পারল যারা, মুসলমানদের সয়লাব রুখতে আসা যাওয়ার পথে বিছিয়ে দিল কাঁটা।

খন্দক পার হওয়ার জন্য কা'কার সংগীরা ছিল বেকারার। কিন্তু পারাপারের রাস্তায় কাঁটা, ওপারে তীরন্দাজদের সারি। ইরানী লশকর থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু সিপাই উত্তর এবং দক্ষিণে খন্দকের উপর দিয়ে পথ তৈরী করছে শুনে দক্ষিণ দিকে ছুটলেন কা'কা। ইরানীদের হটিয়ে ওপারে পৌঁছে গেলেন তিনি।

খানিক পর তার অধীনস্থ সবাই এসে শামিল হল তার সাথে। লড়াইয়ের হাঙ্গামা ছাপিয়ে শোনা গেল তার কণ্ঠ, কাদেসিয়া আর বুইবের সিংহ সেনাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি। যার দৃষ্টিতে ছিল খালিদ আর মুসান্নার একীন, মেঘপুঞ্জের আঁধারে যিনি দেখছিলেন বিজয়ের মনজিল।

দুর্গের ফটকের দিকে ছিল কা'কার রোখ। সঙ্গীরা পাগলের মত ছুটছিল তার পিছনে। মুহূর্তের মধ্যে পশ্চিম ফটকের মুহাফিজদের উপর হামলা করলেন তারা। জলুলার সংঘাত তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। হাশিম বিন ওতবার নেতৃত্বে ফৌজের বড় অংশ তখনো পেছনে। যারা খন্দক পেরিয়েছিল, তাদের সামনে সারি বাঁধছিল ইরানীরা। কিন্তু মুসলমানদের উপর্যুপরী হামলায় সফল হল না ওরা। ততক্ষণে হাশিমের অবশিষ্ট ফৌজ খন্দক পেরিয়ে এল। আবার বিচ্ছিন্ন হতে লাগল ইরানী দলগুলো। সিপাই অথবা সালাররা এগিয়ে যাবার জন্য অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। হামলা করত ইরানীদের ডাক চিৎকার শুনলেই। দোস্ত দুশমন চিনত আওয়াজে। পরস্পরের শব্দে বুঝা যেত সঙ্গী থেকে কে কত দূরে। মুজাহিদদের মনে হতে লাগল 'আঁধার রাতের' সেই ভয়ংকর যুদ্ধের কথা।

শহরের পশ্চিম ফটকে দুশমনের লাশের স্তূপ বানাচ্ছিলেন কা'কা। বাকী ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কা'কার হুকুমে নকীব ঘোষণা করলঃ 'শহরের ফটকে পৌঁছেছেন সিপাহসালার। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তিনি লড়ছেন।'

মুহূর্তে সমগ্র ফৌজে ছড়িয়ে পড়ল এ ঘোষণা। সিপাই অথবা সালারদের কেউ তলিয়ে দেখেনি এর হাকিকত। পাহাড় থেকে তীব্র বেগে নেমে আসা বানের মত এগিয়ে চলল মুজাহিদরা। ভীত ইরানীরা পালাতে লাগল এদিক ওদিক। কিছুক্ষণের মধ্যে শূন্য হয়ে গেল পশ্চিম ফটকের সামনের খোলা ময়দান। নিঃশেষ হয়ে গেল ইরানীদের প্রতিরোধ শক্তি।

শহরের চার দেয়াল আর খন্দকের মাঝে অবরুদ্ধ শিকারের মত দিক বিদিক ছুটছিল ওরা। কেউ গিয়ে পড়ল খন্দকে, আবার কেউ আটকে রইল নিজেদের বিছানো কাঁটার জালে। ঝড় থেমে গেল। ধূসর সূর্য উঁকি মারল মেঘের আড়াল থেকে। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ময়দানে দেখা যাচ্ছিল ইরানীদের লাশ আর লাশ।

রাতের শেষ প্রহরে পাঁচ হাজার মুজাহিদ নিয়ে হলওয়ানের পথ ধরলেন কা'কা বিন আমর। এদের অগ্রবাহিনীর সালার ছিল হাসান। মিয়ানদাদের সংগে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের পঞ্চাশজন ছিল তার সাথে। অন্যরা ছিল জলুলা। এ অভিযানের জন্য অভিজ্ঞ সিপাইদের বাছাই করেছিলেন কা'কা। নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের আরো অভিজ্ঞতা হাসিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মিয়ানদাদের আগ্রহে তার স্বেচ্ছাসেবকদের পঞ্চাশজনকে সাথে নেয়ার অনুমতি নিয়েছিল হাসান। জলুলার রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে মাত্র তিন ঘন্টা বিশ্রাম নিতে পেরেছিল মিয়ানদাদ। কিন্তু কা'কার সান্নিধ্যে এ অভিযানে অংশ নেয়ার লোভ সব ক্লান্তি দূর করে দিয়েছিল তার।

পরদিন দুপুরে ছোট এক ঝরণার পাশে বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিল মুজাহিদরা। আচম্বিত গভীর নিদ্রা থেকে উঠে বসল মিয়ানদাদ।

কাছেই এক বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসেছিল হাসান।

ঃ 'কি হয়েছে মিয়ানদাদ?' প্রশ্ন করল ও।

ঃ 'না কিছুই না।' স্বস্তির শ্বাস টেনে বলল মিয়ানদাদ। 'স্বপ্নে দেখলাম লশকর চলে গেছে। একাকী আমি কেবল ঘুরছি। আপনি ঘুমাননি?'

ঃ 'না, মিয়ানদাদ। মনজিল নিকটে এলে ঘুম হয়না আমার। হলওয়ানে প্রাণ ভরে বিশ্রাম নিতে পারব ইনশাআল্লাহ।'

ঃ 'আপনার ধারণায় হলওয়ান বিজয়ের জন্য এ লশকর কি যথেষ্ট? জলুলায় দেখেছি কুদরতের সীমাহীন মোজেযা। তবু কখনো কখনো মনে হয়, হলওয়ানে ইয়াজদগির্দের সম্মুখীন হতে আমাদের আরো লশকর জরুরী।'

ঃ 'কা'কার বিশ্বাস হলওয়ানে ইয়াজদগির্দের সম্মুখীন হব না আমরা। ওখানে পৌঁছে দেখব তিনি পালিয়ে গেছেন শত মাইল দূরে।'

ঃ 'কিন্তু তার ফৌজ?'

ঃ 'হয়ত দেখানোর জন্য লড়াই করবে খানিক। এরপর সিপাইরাও সম্রাটের মত জান বাঁচানোর ফিকির করবে। যদি দুঃসাহসিকতা দেখায়ও, সাহায্য পেতে দেরী হবে না আমাদের। কিন্তু কা'কার অনুমান মিথ্যা হতে পারে না। আমার বিশ্বাস, জলুলার পরাজিত সিপাইরা সেখানে পৌঁছলে সবাই ভড়কে যাবে।'

কিছুক্ষণ ভেবে মিয়ানদাদ বললঃ 'গাঁয়ে ইরাকের অতীত লড়াইগুলোর কাহিনী আদী আমাদের শোনাতেন। আমি প্রায়ই ভাবতাম, কোন কওমের উত্থানের যুগে এমন দু'চার জন ব্যক্তিত্ব থাকেন, যারা বিজয় আর আজাদীর জামিন। একজন বিখ্যাত সালার সরে গেলে কখনো সিংহের দল ভেড়া হয়ে যায়।

প্রথম দিকে ইরানীরা মুসলমানদের শক্তির কারণ মনে করত খালিদ আর মুসন্না বিন হারিসাকে। কিন্তু জলুলার লড়াইয়ের পর যদি এক ইরানীর মন নিয়ে চিন্তা করি,

প্রশ্ন জাগে ইসলামী লশকরে কত খালিদ, কত মুসান্না আর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রয়েছেন? একজন মুসলমান হিসাবে জলুলার লড়াই আমি দেখেছি। আমার মনে হয়েছে, মানুষের সব সৌভাগ্য, সব শ্রেষ্ঠত্ব জলুলার মুজাহিদদের চেহারায় এসে জমা হয়েছে। হাসান, আমি তোমার শোকর গোজারী করছি, এসব লোকদের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ আমায় দিয়েছ।'

ঃ 'মিয়ানদাদ, এ খোদার রহমত। তোমার ব্যাপারে আমার দোয়া ব্যর্থ হয়নি।'

আসরের নামাজ শেষে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইসলামী লশকর। ঠিক হল কা'কার অনুমান। জলুলার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে হলওয়ান ছেড়ে পালিয়ে গেছেন ইয়াজদর্গিদ। হলওয়ানের হিফাজতের জিম্মা দেয়া হয়েছে জেনারেল খসরু শনুমকে। হলওয়ানের তিন মাইল দূরে কসরে শিরীতে মুসলমানদের বাঁধা দিল খসরু। কিন্তু প্রথম হামলায়ই কা'কা তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। শহরের ফটক খুলে দিল স্থানীয় অধিবাসীরা। সূর্যাস্তের পূর্বেই হলওয়ানের কেল্লায় উড়তে লাগল ইসলামী ঝান্ডা।

সাইত্রিশ

জলুলা ও হলওয়ানের বিজয়ের সময় মেসেল থেকে তকরিতে এসে ছাউনী ফেলেছিল রোমান ফৌজ। রোম সীমান্তে মেসোপটেমিয়ার খৃষ্টান কবিলাগুলিও এগিয়ে এসেছিল তাদের সাহায্যে।

দরবারে খেলাফত থেকে পাঁচ হাজার মুজাহিদ নিয়ে এগিয়ে যাবার হুকুম পেলেন আবদুল্লা বিন মুনীম। তকরিত অবরোধ করলেন তিনি। শহর বিজয় হল চল্লিশ দিন পর। রবি বিন আয়কানকে একদল মুজাহিদের সাথে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন আবদুল্লাহ বিন মুনীম। ক'দিনের মধ্যেই তারা মেসেল এবং নিনুয়ার আশপাশের কেল্লাগুলো কব্জা করে নিলেন। মেসোপটেমিয়ার পরাজিত লশকর চারদিক থেকে এসে জমা হল ফোরাত পারের 'হায়বতে'। জলুলা আর হলওয়ানের যুদ্ধের পর ওমর বিন মালেকের নেতৃত্বে আর এক দল ফৌজ রওয়ানা করিয়ে দিলেন হযরত সা'দ। পরপর 'করকিসা' এবং 'হায়েবত' কব্জা করে নিলেন তিনি। আয়াজ বিন গনম এগিয়ে 'রেহায়' ছাউনী ফেললেন। জয় করে নিলেন মেসোপটেমিয়ার সমগ্র এলাকা। ওতবা বিন গজওয়ানের নেতৃত্বে একদল ফৌজ 'এবলা' জয় করলেন। তিনি 'বসরার' আশপাশের বিশাল এলাকা কব্জা করে এগোচ্ছিলেন খুজিস্তানের দিকে। এ এলাকার গভর্নর নিযুক্ত হলেন ওতবা বিন মুগীরা বিন শো'বা। খুজিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর আহওয়াজ আক্রমণ

করলেন তিনি। জিজিয়া দিয়ে সন্ধি করল আহওয়াজের শাসক।

হিজরী সতের সালে মুগীরার স্থলে গভর্নর নিযুক্ত হলেন আবু মুসা (রাঃ)। জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করল আহওয়াজের রইস। আহওয়াজের রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেল মুসলমানরা। এখানে ছাউনী ফেলেছিল কিসরার বিখ্যাত জেনারেল হরমুজান। শহর থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের বাঁধা দিল হরমুজান। কিন্তু কুফা থেকে আম্মার বিন ইয়াসির এবং জলুলা থেকে জরীরের নেতৃত্বে দু'টো ফৌজ পৌছল আবু মুসার সাহায্যে। প্রচন্ড লড়াই শেষে পরাজিত হল হরমুজান। কেল্লায় ঢুকে বন্ধ করে দিল কেল্লার ফটক। বাঁচার কোন পথ রইল না তার। 'নিরাপদে আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে পৌছে দিতে হবে' এ শর্তে হাতিয়ার ছেড়ে দিল সে। মদিনা পৌছে ইসলাম কবুল করল। খুজিস্তান থেকে পারস্য পর্যন্ত সমগ্র এলাকা এল মুসলমানদের কব্জায়।

পাহাড় থেকে নেমে যে নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সমগ্র এলাকা কোলে টেনে নেয়– ইসলামী লশকরের অবস্থাও হল তাই। খোদার পথের মুসাফিররা আল বুরুজ থেকে মাকরান পর্বত পর্যন্ত কিসরার বিশাল সালতানাতে দেখছিলেন নতুন মঞ্জিল আর নতুন পথ।

আবহাওয়ার আনুকুল্যে বসরা এবং কুফায় কায়েম করা হয়েছিল ইসলামী লশকরের মজবুত ঘাটি। কুফা ছিল রাজধানী শহর। ইরাকের অন্য শহরের চাইতে এর গুরুত্ব ছিল অনেক। রাজ্য বিস্তারের চাইতে তার ব্যবস্থাপনা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অবস্থা পরিবর্তনের প্রতি খলিফা ওমরের নজর ছিল বেশী। এলাকায় ন্যায়-ইনসাফ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে ইরানের অন্য সুবায় এগিয়ে যেতে চাইলেন না তিনি। মেসোপটেমিয়া এবং খুজিস্থানের লড়াইগুলোর পর তারা মনযোগ দিলেন বিজিত এলাকার শাসন সংস্কারের প্রতি।

'রায়'তে ছাউনী ফেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল ইয়াজদর্গিদ। তারপর রওনা করল ইস্পাহানের দিকে। ওমরাদের আশ্বাস পেয়ে 'কেরমান' হয়ে পৌছল খোরাসান। সেখানে ছাউনী ফেলে দূতের মাধ্যমে সমগ্র সালতানাতে সংবাদ পাঠিয়ে দিল। খোরাসান থেকে শুরু করে সিন্ধু পর্যন্ত ঢল আসতে লাগল মানুষের। 'কোম' নগরীতে জমায়েত হল ইরানের দেড়লাখ ফৌজ। ইয়াজদর্গিদ শাহী খান্দানের ফিরুজানের হাতে দিলেন এ লশকরের নেতৃত্ব। নাহাওন্দের দিকে এগিয়ে চলল ফিরোজান।

কুফার গভর্নর আম্মার বিন ইয়াসীর ইরানীদের জংগী প্রস্তুতির খবর জানালেন খলিফাকে। মসজিদে নববীতে মদিনাবাসীর সামনে আম্মারের চিঠি পড়ে শোনালেন হযরত ওমর। পরামর্শ চাইলেন সবার কাছে। হযরত ওসমান (রাঃ) পরামর্শ দিলেন সিরিয়া, ইয়ামেন এবং ইরাক সীমান্তের সালারদের নিজ নিজ লশকর নিয়ে ওখানে

পৌছার হুকুম দিন। আপনি নিজে গিয়ে হাতে নিন লশকরের নেতৃত্ব। অন্যান্য বুযর্গরা এর সাথে একমত হলেন। হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যে এলাকা থেকে ফৌজ বের করা হবে, নিরাপত্তার অভাব হবে সেখানে। আর আপনি মদিনা ছেড়ে গেলে প্রলয় ঘটে যাবে গোটা দেশে। আমার পরামর্শ হল, আপনি মদিনায় থাকুন। সিরিয়া, ইয়েমেন, বসরা এবং বিভিন্ন এলাকার এক তৃতীয়াংশ ফৌজকে হুকুম দিন নাহাওন্দ রওয়ানা হতে। এ পরামর্শের সাথে একমত হলেন হযরত ওমর। সামনে এল সিপাহসালারের প্রশ্ন, সবার দৃষ্টি পড়ল নোমান বিন মোকরিনের উপর।

জলুলা এবং হলওয়ানের পর মেসোপটেমিয়া ও খুজিস্থানের লড়াইতে ব্যস্ত রইল হাসান, সোহেল ও মিয়ানদাদ। এ দিনগুলোতে বাড়ী যাওয়ার সুযোগ ওদের হয়নি। জলুলা বিজয়ের এক বছর পর হাসানের ঘরে জন্ম নিল এক শিশু। নাম রাখা হল সালমান।

মেসোপটেমিয়া ও খুজিস্থানের রণক্ষেত্রে যাবার পূর্বে কয়েক দিনের জন্য বাড়ী গেল ওরা। প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে বসেছিল ইয়াসমীন। মিয়ানদাদ ছেলের নাম রাখল সা'দ।

খুজিস্তান অভিযানের পর হাসান ও মিয়ানদাদ চলে গেল কুফার ফৌজি ছাউনীতে। সোহেল গেল বসরা। সালমানের জন্মের তৃতীয় বছর হজ্জে গেল হাসান। হজ্জ এবং মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত শেষে ও যখন ফিরে এল, কোমে ইরানী লশকরের জমায়েত হওয়ার খবর তখন ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের বাঁধা দিতে যে ফৌজ নাহাওন্দের রোখ করছিল, প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই এদের অগ্রবাহিনীতে শামিল হল এ তিন জন।

ফিরোজানের নেতৃত্বে হামদানের পথে এগিয়ে গেল ইরানের দেড় লাখ ফৌজ। আলউন্দ পর্বতের দক্ষিণে নাহাওন্দে ছাউনী ফেলল ওরা। কয়দিন পর এ বিশাল লশকর সে মরুচারীদের সম্মুখীন হল, ত্রিশ হাজারের বেশী ছিল না যাদের সংখ্যা। শুরু হল ইসলাম ও অগ্নিপুজারীদের আরেক সংঘর্ষ। দু'দিনের কঠিন হামলার পর ভেতরের পরিখার দিকে সরে যেতে বাধ্য হল ইরানীরা। হামলা ও পাল্টা হামলা চলল আরো কয়দিন। শহরের চারপাশের খন্দক আর পরিখা থেকে বেরিয়ে হামলা শুরু হলেই পিছিয়ে ওরা পরিখায় ফিরে যেত।

যেখানে ঘটেছিল বুইব আর কাদেসিয়ার লড়াই, যার নরম মাটিতে বেড়ে যেত আরবদের ঘোড়ার গতি- এসব পার্বত্য এলাকা ইরাকের সে সমতল ময়দানের মত ছিল না। এখানে শহরে চড়াও হবার পূর্বে পরিখা আর খন্দকের মাঝের পথগুলো কব্জা করতে হত, যার হিফাজতে মোতায়েন থাকতো অসংখ্য তীরন্দাজ। এ খন্দকের পরে ছিল শহরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

বন্ধ কিল্লা থেকে বেরিয়ে হামলা করত ইরানীরা। সময় মত পিছিয়ে যাবারও পূর্ণ সুযোগ ছিল তাদের। লশকর আর সরঞ্জামের প্রাচুর্যের কারণে লড়াইকে দীর্ঘায়িত করা ওদের জন্য কষ্টকর ছিল না, কিন্তু তা হতো মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক। লশকরের অভিজ্ঞ সালারদের সাথে পরামর্শ করলেন নোমান বিন মুকরিন।

তুলাইহার পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়া হল, কা'কার নেতৃত্বে কতক ফৌজ ভোরে ইরানীদের উপর হামলা করবে। লড়াই প্রচন্ড হয়ে উঠলে পিছিয়ে পাহাড়ের ঢালুতে পৌছবেন তিনি। বাকী লশকর সূর্যোদয়ের পূর্বেই চলে যাবে কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের টিলায়। লুকিয়ে আমীরে লশকরের হুকুমের অপেক্ষা করবে ওরা।

জুমার দিন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই হামলা করলেন কা'কা। প্রথম আঘাতেই লন্ডভন্ড করে দিলেন দুশমন ফৌজ। চকিতে ব্যূহ ঠিক করে নিল ওরা। শুরু হল ঘোরতর লড়াই। তুলাইহা বিন খুয়াইলেদের পরামর্শ অনুযায়ী পিছিয়ে যাচ্ছিলেন কা'কা। নতুন জোশ নিয়ে হামলা করতে লাগল ইরানীরা। যুদ্ধের প্রথম দিককার ক্ষতিতে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য ময়দানে নেমে এসেছিল ফিরোজানের তামাম ফৌজ। তাবু থেকে বেরিয়ে ওরা ধাওয়া করছিল মুসলমানদের। যে ঘাটিতে নোমান বিন মুকরিন তাদের অপেক্ষায় ছিলেন, এগিয়ে চলছিল সেদিকে। মুজাহিদরা পাল্টা হামলা করে আবার দ্রুত করে দিতেন পিছিয়ে যাওয়ার গতি। ইরানীদের ধাওয়া থেমে যেত কিছু সময়ের জন্য। আবার তীব্র উচ্ছাস নিয়ে ধাওয়া করত ওরা। এবার সেসব টিলা আর পাহাড় কুচি ওরা অতিক্রম করছিল, যার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে ছিল মুসলিম তীরন্দাজ। ওরা তখন মুজাহিদদের আওতার মধ্যে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল, তাদের প্রতিটি কদম উঠছে বিজয়ের দিকে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। পাহাড়ের সংকীর্ণ উপত্যকায় চরম বিপর্যয় আর বরবাদীর সম্মুখীন হচ্ছিল সে বিশাল বাহিনী। আচানক দুভাগ হয়ে ডানে বায়ে সরে গেল ক্বা'কার লশকর। ধাওয়াকারীরা তাদের সামনে দেখল সে সওয়ারদের- যারা ছিল সিপাহসালারের ইশারার অপেক্ষায়। তিনবার তকবীর উচ্চারণ করলেন নোমান। হামলা করল অশ্বারোহী দল। এর সাথে আশপাশের পাহাড় থেকে ইরানীদের উপর আসতে লাগল তীর বৃষ্টি।

প্রথম আঘাতেই ভীতি ছড়িয়ে গেল ইরানী লশকরে। ওরা ফিরে উপত্যকা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু পেছনের ঘাটি সমূহের তীর বৃষ্টি ওদের উপত্যকার দিকে হাকিয়ে দিল আবার। পাথুরে জমিনে দেখা গেল খুনের দরিয়া। কখনো সামনে আবার কখনো ডানে বাঁয়ে হামলা করতেন নোমান। তছনছ হয়ে যেত দুশমন সারি। সহসা এক রক্তাক্ত পাথরে হোঁচট খেল তার ঘোড়া। এক ইরানীর নেযার আঘাতে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। লশকরের পতাকা তুলে নিলেন তার ভাই নঈম। সিপাহসালার যখমী

টের পেল না সিপাইরা। এক মুজাহিদ ঘোড়া থেকে নেমে বীর নেতাকে তোলার চেষ্টা করল। তিনি ধমকের সুরে বললেনঃ 'আমার ভাই, দায়িত্বে অবহেলা করছ। আমার হুকুম মনে নেই?'

মুহূর্ত দেরী না করে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল নওজোয়ান। বিজয়ের আশা বাদ দিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য লড়ছিল ইরানীরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের অসংখ্য লাশে ভরে গেল ময়দান। মুসলমানদের ঘেরাও ভেংগে পাশেই এক পাহাড়ে ওরা কদম জমাতে চাইছিল। কিন্তু এখানেও ধাওয়া খেল মুসলমানদের। আশপাশের টিলা থেকে বৃষ্টির মত আসছিল তীর। পালাবার সব পথই ওদের জন্য রুদ্ধ।

রাতের আঁধারের ফায়দা নিল ফিরোজানের অবশিষ্ট ফৌজ। একদল নাহাওন্দের দিকে পালাল। কঠিন পার্বত্য পথে আরেক দলের রোখ ছিল হামাদানের দিকে। মুসলমানরা দুদিকেই ওদের ধাওয়া করল।

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিজয়ের খোশখবর শোনার অপেক্ষা করছিলেন নোমান বিন মুকরিন। ফৌজ ফিরে আসার আগেই শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিলেন তিনি।

সে উপত্যকায়ই দাফন করা হল তাঁকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন হোজাইফা বিন ইয়ামান। নাহাওন্দ শহরে বিজয়ের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন তিনি। নঈম বিন মুকরিন এবং কা'কা পার্বত্য পথে ফিরোজানের পিছু ধাওয়া করলেন।

হামাদান সীমান্তের কাছে ছোট্ট ঘাটি। মাল বোঝাই গাধা আর খচ্চরে বন্ধ হয়ে গেল ফিরোজানের পথ। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পাহাড়ে লুকানোর চেষ্টা করল সে। তার পিছু ধাওয়া করে কোতল করে দিলেন নঈম বিন মুকরিন। বাকী লশকরকে হামাদানের প্রাচীর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন কা'কা। ফিরোজানের পরিণতি শুনে সন্ধির দরখাস্ত করলেন শহরের হাকিম। কা'কার কাছ থেকে শহরবাসীর জানমাল হিফাজতের ওয়াদা নিয়ে খুলে দিল ফটক। এক লক্ষেরও বেশী ইরানী নিহত হয়েছিল এ লড়াইয়ে। এ বিজয়ে কিসরা সালতানাতের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পথ সাফ হয়ে গেল মুসলমানদের জন্য।

খলিফা ওমরের খেলাফতের শেষের দু'বছরের একটি দিনও এমন ছিল না, বিজয়ের কাফেলা যেদিন অনারবে কোন নতুন মঞ্জিলে পা ফেলেনি। এমন কোন সপ্তাহ ছিল না, দুর মঞ্জিল থেকে বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত আসেনি মদিনায়। মুসান্না বিন হারিসার পতাকাতলে সমবেত মুসাফির দল এগিয়েছিল ইরাকের দিকে। আজ ওরা পেরিয়ে যাচ্ছিল ইরানের সীমানা। পারস্যের জমিনে শোনা যাচ্ছিল আজানের সুমধুর সুর। শীতল হয়ে গিয়েছিল আজারবাইজানের অগ্নিকুন্ড। সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল তবরিস্তান, আরমেনিয়া, সিস্তান, কিরমান, খোরাসান এবং মাকরানের বিশালতা। পূর্ব ও পশ্চিমের নিরন্ত্র আঁধারে জ্বলছিল মানবিকতার নতুন প্রদীপ।

উপর্যুপরী ব্যর্থতার পর কিরমানে কদম জমানোর চেষ্টা করলেন ইয়াজদগির্দ। 'মরুরুদ' চড়াও হলেন তিনি। শাহানশাহ পালালেন 'বলখে'। ততক্ষণে কুফা থেকে নতুন ফৌজ পৌছল আহনাফের সাহায্যে। বলখ হামলা করলেন তিনি। লন্ডভন্ড হয়ে গেল ইরানী লশকর। উত্তর দিকে ছুটলেন ইয়াজদগির্দ। জিহুন পেরিয়ে চলে গেলেন তুর্কের খাকানের আশ্রয়ে। নিশাপুর থেকে তাখারিস্তান পর্যন্ত খোরাসানের উত্তর সীমান্তের সমগ্র এলাকা জয় করে নিলেন আহনাফ। মুরুরুদকে করলেন রাজধানী। ইয়াজদগির্দের সাহায্যে বিশাল ফৌজ প্রস্তুত করলেন খাকান। আক্রমণ করলেন খোরাসান।

তুর্কের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধের সম্ভাবনায় বলখ এবং অন্যান্য স্থান থেকে 'মরুরুদ' জমায়েত হল আহনাফের অধিকাংশ ফৌজ। নদী পার হল খাকান। বলখ হয়ে এগিয়ে এল মরুরুদের দিকে।

খোলা ময়দানে খাকানের অসংখ্য ফৌজের মোকাবিলা না করে তিনি খানিকটা সরিয়ে নিলেন ফৌজ। তাদের পেছনে উঁচু শৃংগ। সামনে নদী। শুধু তর্জন গর্জন করে বিজয় হাসিল করতে চাইলেন খাকান। নদীর ওপারে ছাউনী ফেললেন তিনি। প্রত্যুষে তুর্কের অশ্বারোহীরা নদীর ওপারে ব্যূহ রচনা করত। কিছু তর্জন গর্জন এবং দু'একটা তীর ছুড়ে ফিরে যেত সন্ধ্যায়। কয়েক দিন কাটল এভাবে।

একদিন তিন বীর এগিয়ে এল তুর্কীদের সারি থেকে। মল্ল যুদ্ধের জন্য আহবান করল মুসলমানদের। আহ্নাফ বিন কায়েস নিজেই নেমে এলেন ময়দানে। হত্যা করলেন তিনজনকেই। এদের পরিণাম দেখে আর কারো এগিয়ে আসার হিম্মত হল না। এক মুসলমানের হাতে তিন জন বিখ্যাত বাহাদুরের অপমৃত্যুকে কুলক্ষণ মনে করলেন খাকান। ছাউনী খালি করে দিলেন পরদিন।

জিহুন নদীর পারে পৌছে তাড়াতাড়ি ওপারে চলে যেতে চাইলেন ইয়াজদর্গিদ। কিন্তু লশকরের অধিকাংশ সর্দার খাকানের সাহায্যের আশায় সঙ্গ দিয়েছিল তাকে। নদী পার হতে চাইল না তারা। কঠোর হলেন ইয়াজদগির্দ। ওরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করল। ছিনিয়ে নিল কোষাগার এবং সাজ সরঞ্জাম। সাসানি খান্দানের শেষ প্রদীপের কাছে রইল স্ত্রী পরিজন, নিজস্ব কয়জন গোলাম এবং গুটিকয় মুহাফিজ ফৌজ। নদী পেরিয়ে ফরগনার পথ ধরলেন তিনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের পথ ধরল খোরাসানীরা। কিন্তু ফৌজের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ ইরানের বাসিন্দা। ওরা ভবিষ্যতের কোন ফায়সালা করতে পারল না। বর্তমান নিয়ে ওরা ছিল পেরেশান। ভবিষ্যত নিয়ে এতটা নিরাশ ছিল যে, পরস্পরকে প্রশ্ন করত, আমরা কি আবার দেশের মাটি দেখতে পাব? আমাদের কি ক্ষমার যোগ্য মনে করবে মুসলমানরা?

শীতের মওসুম। দূরের পর্বত শৃঙ্গে শুরু হয়েছে বরফপাত। জিহুনের কনকনে

ঠান্ডা বাতাস। খোলা ময়দানে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য কয়েক ক্রোশ দূরে এক সংকীর্ণ উপত্যকায় ছাউনী ফেলল ওরা। তুরস্কের লশকর ফিরে যাবার পর তাদের পিছু নিলেন না আহনাফ বরং খাকানের আগমনে যেসব কিল্লা এবং শহর ছেড়ে দিতে হয়েছিল পুনরায় তা কজা করতে চাইলেন। অমিরুল মুমিনীনেরও নির্দেশ ছিল বিজিত এলাকায় সর্বাগ্রে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করার। হঠাৎ জিহুন পাড়ি দিতে হবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়। সে দিকেই মনোযোগ দিলেন তিনি।

আটত্রিশ

বলখ এবং মরুরুদের মাঝের গুরুত্বপূর্ণ চৌকিগুলোর হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল হাসানকে। ও থাকত এক পুরোনো কেল্লায়। তার অধীনে দু'হাজার সিপাই। চৌকির হেফাজত ছাড়াও জিহুনের উপকূল পর্যন্ত উত্তরের রাস্তাগুলোও পর্যবেক্ষণ করত ও। খাকানের ফিরে যাবার পর তুর্কীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সীমান্তের সব সালারদের প্রতি আমীরে লশকরের নির্দেশ ছিল, ইরানীদের অবশিষ্ট ফৌজ নদী পারে থাকা পর্যন্ত তুর্কীদের তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

দিনের তৃতীয় প্রহর। বিশাল এক কামরায় গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে বরফপাতের দৃশ্য দেখছিল হাসান। শুকনো ঘাস বিছানো কামরায়। এক কোণে চুলোয় আগুন জ্বলছে। তার পাশে দুটো কম্বল ও একটা চামড়ার ওভারকোট। কামরার সামনে এসে দাঁড়াল মিয়ানদাদ। বরফে ছেয়ে যাওয়া ওভারকোট খুলে ঝেড়েমুছে প্রবেশ করল কামরায়। জানালা বন্ধ করতে করতে হাসান বললঃ 'এ মওসুমে বেশী দূরে যাওয়ার দরকার ছিল না।'

ওভারকোট একদিকে রেখে আগুনের উপর হাত বাড়িয়ে ও বললঃ 'এতোক্ষণ সোহেলের অপেক্ষায় ছিলাম। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিয়ে ভোরে টহলে বেরিয়েছে ও, এখনো ফেরেনি। ওখানে বলে এসেছি, ও এলে সাথে সাথে আমাদের সংবাদ দিতে।'

চুলোর কাছে বসতে বসতে হাসান বললঃ 'তুষারপাতের কারণে কোন বস্তিতে ও হয়ত থেমে গেছে। তুমি বস।'

তার পাশে বসল মিয়ানদাদ। বললঃ 'আমার ভয় হয়, ইয়াজদগির্দ স্বস্তিতে বসতে দেবে না আমাদের। তার চেষ্টায় চীনা ও তাতারীরা আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যেতে পারে।'

নিশ্চিন্তে হাসান জওয়াব দিলঃ 'সে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রথম

কাজ হচ্ছে, বিজিত এলাকায় শত শত বছর ধরে চলে আসা রাজতন্ত্রের নাম নিশানা মুছে ইসলামী সালতানাতের ভিত্তি কায়েম করতে হবে। ইরান, সিরিয়া ও মিশরে যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি, অনারবেও আরবের মত মাটি ফুঁড়ে ইসলামী শক্তির ঝরণা বেরিয়ে আসবে। প্রভু ভৃত্যের দুনিয়ায় আরবদের শৌর্য বীর্য প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্য খোদার জমীনে তার দ্বীনের মশাল জ্বালিয়ে দেয়া।

আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে কে বলতে পারত, কাদেসিয়া, জলুলা আর নাহাওন্দের ময়দানে পরাজিত হবে কিসরার বিশাল ফৌজ। কে বলতে পারত পারস্য, আরমিয়া, খোরাসানের ময়দানে তার জানবাজরাই হবে আমাদের সঙ্গী। এখন কে বলতে পারে, তুর্কীদের সাথে সংঘর্ষ হলে সমগ্র ইরান আমাদের পক্ষে থাকবে না?

আজ যদি আমীরুল মুমিনীনের সামনে পূর্ব পশ্চিমের দেশ জয়ের সমস্যাই মূল সমস্যা হত তবে আমাদের পরের চৌকি হত ফারগানা ও সমরকন্দে। কিন্তু সীমান্ত বিস্তারের চেয়ে বিজিত এলাকায় শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করাকেই অধিক জরুরী মনে করেন তিনি। তিনি অনুভব করছেন, বিজিত এলাকায় রাজতন্ত্রের ফিতনা দমে আছে, খতম হয়নি। অনারবকে অতীতের অন্ধকার থেকে বের করতে হলে আমাদের সময়ের প্রয়োজন।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, ওমর ফারুকের (রাঃ) খেলাফতে কোন ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না। মানব সভ্যতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে যতই ভাবছি, ততই অনুভব করছি, এ দুনিয়ায় তার তীব্র প্রয়োজন। হাসান, পর্বতের বোঝা শুধু পর্বতই নিতে পারে। মানুষ যদি অপরকে তার বয়স দিতে পারত, আর আমাকে কেউ বলত তুমি এক হাজার বছর বাঁচবে– নির্দ্বিধায় আমার বয়সের সবটাই দিয়ে দিতাম খলিফা ওমরকে।'

ঃ 'আমার দোস্ত, এ দুনিয়ায় হামেশাই তার প্রয়োজন থাকবে। চিরদিন বেঁচে থাকবেন তিনি। যার জীবনের প্রতিটি শ্বাস চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি, যার অতীত হওয়া প্রতিটি কাজ ভবিষ্যতের সৌভাগ্য জন্ম দেয়, মৃত্যু তার জন্য নয়। এমন সময় আসে, নিজের ঘাড়ের বোঝা যখন ছেড়ে যেতে হয় অপরের জন্য। খলিফা ওমর তো কুদরতের এ নিয়মের বাইরে নন। কিন্তু তার পদচিহ্ন জীবন চলার পথের মুসাফিরদের জন্য হবে আলোকবর্তিকা। অতীত ইতিহাসের পাতায় যারা খুঁজবে এক মুমিনের দৃঢ়তা ও একীন, এক উচ্চমনা বিজয়ীর কর্ম তৎপরতা, এক মহান শাসকের ন্যায়-ইনসাফ, সততা আর সংযম, এক উপমাহীন মানুষের অনন্ত বিশলতার হৃদয়গ্রাহী কাহিনী, এ মুবারক যুগ সব সময়ই বেঁচে থাকবে ওদের মনে।'

আসরের খানিক পর মৃদু হেসে কামরায় প্রবেশ করল সোহেল। হাসান বললঃ 'চৌকির কাছে থেকেও তুষারপাতের দৃশ্য দেখতে পেতে। আমরা তো ভেবেছিলাম,

দুশমনের ছাউনীতে হামলা করে দিয়েছ।'

ঃ 'এখন আর দুশমনের ছাউনীতে হামলা করতে হবে না। হাতিয়ার সমর্পন করার ফয়সালা করেছে ইয়াজদগির্দের সঙ্গীরা। ওদের দশ জনের এক প্রতিনিধি দল সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সিপাহসালারের কাছে আসছে?'

ঃ 'তার মানে এখানে আসছে প্রতিনিধিদল?'

ঃ 'জ্বী হ্যাঁ। তাদের নেতাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। সাথীরা রয়ে গেছে আমাদের চৌকিতে। ঠান্ডা আর ক্লান্তিতে ওরা নেতিয়ে পড়েছে।'

ঃ 'তাদের নেতা কোথায়?'

ঃ 'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার খিদমতে হাজির হতে চাইছে।'

ঃ 'তার নাম জিজ্ঞেস করেছ?' মিয়ানদাদের প্রশ্ন।

ঃ 'নাম জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়নি। আমি দেখেই চিনেছি, আপনার দোস্ত আদমান।'

ঃ 'আদমান?' চঞ্চল হয়ে উঠল মিয়ানদাদ।

ঃ 'কিন্তু আপনি এখানে, আমি তাকে বলিনি।'

ঃ 'আমি নিয়ে আসছি তাকে।' বেরিয়ে গেল মিয়ানদাদ।

মোজা খুলে চুল্লীর সামনে বসে পড়ল সোহেল। হাসান পায়চারী শুরু করল কামরায়। একটু পর সোহেলের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'এইমাত্র মিয়ানদাদকে বলছিলাম, কোন ফয়সালা করতে দেরী হবে না ওদের। ভোর হলেই ওদের এখানে ডেকে পাঠাব।'

আদমানকে সাথে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল মিয়ানদাদ। তার শীর্ণ ও দুর্বল চেহারা অতীতের দুঃখ মুসীবতের প্রমাণ দিচ্ছিল। হাসানের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলও। এগিয়ে গেল হাসান। মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললঃ 'তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার ব্যাপারে মিয়ানদাদের কাছে এতটা শুনেছি, এখন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তোমার অন্যান্য সংগীরা এখানে পৌছলেও বিশ্রামের ভাল বন্দোবস্ত হতো।'

ঃ 'আমাদের ঘোড়াগুলোর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি জানতাম মিয়ানদাদ এখানে, পথে থামত না আমার সংগীরা। আপনাদের সংগীরা আমাদের দেখে ফেলেছে এ নিছক দুর্ঘটনা। নয়তো 'মরু'র দিকে যাচ্ছিলাম আমরা।'

ঃ 'মরু' যেতে হবেনা তোমাদের। বলখ গেছেন আমাদের সিপাহসালার। এ চৌকি হয়েই ফিরবেন। মওসুম খুব খারাপ না হলে পৌছে যাবেন আট দশ দিনের মধ্যেই। তাঁর খিদমতে আমি দূত পাঠাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস, তোমাদের কথা শুনলে পথে তিনি থামবেন না। এখন নিশ্চিন্তে কথা বল। সিপাহসালার আসা পর্যন্ত তুমি আমাদের মেহমান। কাল সকালেই তোমার সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে আসব ইন্‌শাআল্লাহ।'

আগুনের পাশে বসল আদমান। মিয়ানদাদ বসল আদমানের পাশে। নিঃশব্দে

কাটল কতক্ষণ। একটু আগে দোস্তের চেহারায় মিয়ানদাদ দেখছিল যে প্রশান্তি, সেখানে ফুটে উঠছিল পরাজয়ের গ্লানি।

ঃ 'আদমান।' তার হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল ও। 'ক্লান্তি অনুভব করলে শুয়ে বিশ্রাম কর।'

ঃ 'না, ক্লান্ত নই। অতীত ঘটনাবলী আমায় কঠিন করে দিয়েছে।'

ঃ 'সন্ধির পয়গাম নিয়ে তুমি এসেছ। আমার কোন কথায় যদি তোমার হৃদয়ের বোঝা হালকা হয়, সিপাহসালার, আমীর এবং তামাম মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দিতে পারি যে, আমরা তোমাদের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতের জামিন।' বলল হাসান।

ঃ 'আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার আগেও এমন কথা শুনেছি সোহেল ও মিয়ানদাদের মুখে। কিন্তু ফোরাত থেকে জিহুন পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ে অংশ নেয়ার পর, আমার আর সঙ্গীদের ধারণা নেই, কি শাস্তি আমাদের হবে। এ আশংকা নিয়ে 'মরু'র দিকে রওনা করেছিলাম, আমাদের হাতে পায়ে বেড়ী পড়বে আপনাদের প্রথম চৌকিতে পৌছতেই। কিছু মনে না করলে প্রশ্ন করব, এদের জানমালের হেফাজতের কদ্দুর এখতিয়ার রয়েছে আপনাদের, যারা উপর্যুপরী পরাজয়ে হতাশ হয়ে হাতিয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে?'

ঃ 'আমাদের একজন সিপাইও এ হেফাজতের জামিন হতে পারে।'

ঃ 'তার মানে আমাদের সাথে কয়েদীদের মত ব্যবহার করা হবে না?'

ঃ 'তোমাদের গোলাম বানানো আমাদের লক্ষ্য নয় বরং তোমাদেরকে মুক্তি ও স্বাধীনতার নেয়ামতে অভিষিক্ত করতে চাই আমরা।'

ঃ 'যদি আমরা মুসলমান না হই, তবে?'

ঃ 'তবুও কোন ষড়যন্ত্রে জড়াবে না, এ শর্তে ফিরে যেতে পারবে।'

ঃ 'আমাদের ছেলে মেয়ে?'

ঃ 'ওদের হেফাজত আমাদের জিম্মায়।'

ঃ 'ইয়াজদগির্দকে যদি ধরে নিয়ে আসতাম?'

ঃ 'তাহলে স্বস্তি পেতাম, সে আর চক্রান্ত করতে পারবে না।'

ঃ 'চিরদিনের জন্য ইরান পরাজিত হয়েছে আপনারা কি তাই মনে করেন?'

ঃ 'না, আমরা মনে করি, কিসরার গোলামী থেকে ইরানবাসী নাজাত পেয়েছে। তুর্কের খাকান অথবা চীনের শাহানশাহের সহযোগিতায় আবার যদি ওরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, তাহলে ইসলামের নিশানকে নিজের পতাকা মনে করবে ইরানীরা, শতশত বছর পর যারা পেয়েছে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ। কয়েকজন ইরানী স্বেচ্ছাকর্মী রয়েছে আমাদের কেল্লায়। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পার, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কি ওদের ধারণা।'

ঃ 'মিয়ানদাদকে এখানে দেখার পর তার আর প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'আদমান।' মিয়ানদাদ বলল। 'নতুন পরিবেশ দেখে তোমার বুঝতে কষ্ট হবে না, শত শত বছরের আঁধারের পর যখন ফুটে উঠছে উষার আলো, তা কতো সুন্দর, কতো হৃদয়গ্রাহী। নিশ্ছিদ্র আঁধারের সাথে ঘুরছি, কয়েক বছর আগেই তা বুঝেছি আমি। দীর্ঘ সময় ঘুরপাক খাওয়ার পর ফিরে এসেছ তুমি।'

ঃ 'ফিরে না এসে আমাদের উপায় ছিল না।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আদমান। 'জিহুনে ডুবে গেছে আমাদের স্বপ্ন আর সাহসের তরী। ফারগানার পথে ইয়াজদগির্দের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এসেছে আমাদের একদল সংগী। তাদের কথায় অনুভব করেছি, বাকীরাও বেশী দিন তার সাথে থাকবে না।'

সন্ধ্যায় মেজবানদের সাথে খানা খাচ্ছিল আদমান। আরো কয়েকজন লোক থাকায় মিয়ানদাদের সাথে ও মন খুলে কথা বলাতে পারছিল না। 'সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে আসা আরো ক'জন রয়ে গেছে পেছনের চৌকিতে' এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে কেল্লায়। চেহারা দেখে মুসলমানদের আনন্দ অনুমান করা আদমানের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অথচ আত্ম অহংকারের পরিবর্তে ওদের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল শোকর গোজারী। আশ্চর্য হল আদমান।

এশার নামাজের পর আলতো পায়ে কামরায় প্রবেশ করল মিয়ানদাদ। পাশ ফিরে উঠে বসল আদমান। তার পাশে বসতে বসতে মিয়ানদাদ বললঃ 'ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছ।'

ঃ 'আমি তোমার প্রতীক্ষাই করছিলাম। ও আসবে না?'

ঃ 'কে? হাসান। না, অন্য কামরায় চলে গেছে ও।'

ঃ 'তোমাকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল। তুমি না এলে সারারাত আমার ঘুম হতো না। কিসরার সাথে মাদায়েন থেকে ফেরার হওয়ার সময় সংবাদ নিতে পারিনি বলে আফসোস হচ্ছিল। তখন পরিস্থিতি এমন ছিল, জীবন বাজি রেখেও তোমার কোন উপকার করতে পারতাম না!'

ঃ 'তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। তোমার স্থানে আমি হলেও সম্ভবত এমনটিই করতাম।'

ঃ 'কথাবার্তায় তোমাদের সালারকে ইরানী মনে হচ্ছিল!'

ঃ 'না, ও ইরাকের আরব বংশোদ্ভোত। কিসরার সিপাই হিসেবে গত লড়াইয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমার বড় ভাই জাহাদাদের সাথে ও ছিল রোমানদের কয়েদখানায়। যে সালতানাতের হেফাজতে জীবন বাজী রেখেছিল ও, তারা অত্যাচার আর অশ্রু ছাড়া ওকে আর কিছুই দিতে পারেনি। জুলুম আর বর্বরতার অন্ধকার ওকে যখন বাহরাইনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তখন ও ছিল একা। ফিরে এল সত্য সঙ্গীদের

কাফেলার সাথে। আদমান, হাসানের অতীত শুনলে এ বিপ্লবের সঠিক রূপ বুঝতে তুমি। এরা প্রভু ভৃত্যের দুনিয়ায় তুলে ধরেছে মানবতার বিজয় নিশান।'

ঃ 'তার অতীত আমার কাছে কম আকর্ষণীয় নয়, যে বদলে দিয়েছে তোমার জিন্দেগীর পথ। কিন্তু মাহবানু এবং ইয়াসমীনের ব্যাপারে তো কিছু বললে না?'

ঃ 'ইয়াসমীন আমার জীবন সংগিনী আর মাহবানুর শাদী হয়েছে হাসানের সাথে। তোমার খবর কি?'

ঃ 'কিসরার সাথে আমরা হলওয়ান গিয়েছিলাম। অল্প বয়েসী দু'বোন ও একটা ভাইকে মামার কাছে রেখে যেতে হয়েছে জালুলা। আহত হলাম লড়াইয়ে। হলওয়ানের পথে এক বস্তিতে আশ্রয় নিলাম। কৃষকের ঝুপড়িতে লুকিয়ে রইলাম চারদিন। এর মধ্যে হলওয়ান কব্জা করল মুসলমানরা, এ জন্য ওখানে যেতে পারিনি। এখন আমি জানি না ওরা কোথায়, কেমন আছে? যে মেয়ের সাথে আমার শাদীর কথা ছিল, তার পিতা-মাতা মাদায়েন ছেড়ে আসেনি। এরপর আমার সব আশা ভরসা জুড়ে দিলাম শাহানশাহের বিজয়ের সাথে। কিন্তু ইরানের সাসানীদের পতাকা সম্ভবত ধূলায় মিশে গেছে চিরদিনের জন্য।'

ঃ 'তোমাকে এ আশ্বাস দিতে পারি, তোমার প্রিয়জন অথবা আত্মীয় হলওয়ান অথবা মাদায়েনের যেখানেই থাকুক খুব শীঘ্র পেয়ে যাবে।'

ঃ 'তোমার কি মনে কর, ওদের দাসদাসী বানানো হয়নি?'

ঃ 'না, ওদের জানমালের হেফাজত করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।'

ঃ 'আমি কি হলওয়ান এবং মাদায়েন যাবার অনুমতি পাব?'

ঃ 'হ্যাঁ?'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'তুমি যখন যেতে চাও। আদমান, ইরান তোমার জন্মভূমি। এ পরিবর্তিত দুনিয়ায় যখন তুমি আমার আর হাসানের দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে, তুমি অনুভব করবে, ইরানের মত সিরিয়া এবং মিসরও তোমার নিজেরই দেশ। দুনিয়ায় ইসলাম শুধু প্রভু ভৃত্যের ভেদাভেদই ঘুচায়নি বরং চুরমার করে দিয়েছে বংশ কৌলিন্যের ঘৃণার দেয়াল। আদমান, প্রতিটি নতুন মঞ্জিলে তোমার প্রতীক্ষা করেছি আমি। হায়, সেদিন যদি মাদায়েন থেকে যেতে। নিরন্ধ্র আঁধারের সাথে ছুটে চলা থেকে আর ভেংগে পড়া প্রাচীরের আশ্রয় থেকে বাঁচাতে পারতাম তোমায়। এবার শুয়ে পড়, কাল না হয় সারা দিন কথা বলব।'

ঃ 'না, এখন আমার ঘুম আসবে না। তোমার সে অতীত কাহিনী শুনতে চাই, যে কারণে পৃথক হয়ে গেছে আমাদের জীবনের পথ। আমি জানতে চাই, সে কোন মোজেযা যা আরবের মরুচারীদের রোম ইরান সালতানাতের সাথে টক্কর লাগানোর শক্তি দিয়েছে। প্রভু ভৃত্যের ভেদাভেদ যদি তোমরা না চাও, বিজিত এলাকার বাসিন্দাদের

জানমাল এবং আজাদীর হেফাজতই যদি তোমাদের জিম্মা হয়ে থাকে, তাহলে ময়দানে খুন ঝরিয়ে কি মজা পাও তোমরা?'

ঃ 'আমার আর হাসানের কাহিনী সে সব হাজার হাজার মানুষের কাহিনী, ভয়ংকর আঁধারে ঘুরপাক খাওয়ার পর যারা দেখেছে আলোর ঝলক। আমার মনে হয়, এর মাঝেই সব প্রশ্নের জওয়াব খুঁজে পাবে তুমি।'

গভীর মনযোগ দিয়ে মিয়ানদাদের দিকে তাকাল আদমান। মিয়ানদাদ শুরু করল নিজের অতীত কাহিনী।

ভোরে চোখ খুলল আদমান। মিয়ানদাদের বিছানা শূন্য। বিছানায় নিঃসাড় হয়ে ও পড়ে রইল কতক্ষণ। দরজার দিক থেকে এল কারো পায়ের আওয়াজ। উঠে বসল ও। হাসান প্রবেশ করল কামরায়। জানালা খুলে এসে বসল আদমানের পাশে। বলল ঃ 'দেখুন, কুয়াশার আস্তরণ কেটে সূর্য বেরিয়ে এসেছে।'

ঃ 'মনে হয় অনেক ঘুমিয়েছি।' বলল আদমান।

ঃ 'সকালে এসেছিলাম। আপনাকে জাগানো ঠিক মনে করিনি। মিয়ানদাদ বলেছে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কথা বলেছেন।'

নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল আদমান। বললঃ 'আশ্চর্য! কাল পর্যন্ত আমার কাছে আপনি অপরিচিত ছিলেন, এখন মনে হয়, কত বছর ধরে আপনাকে আমি জানি। খলিফা ওমর সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।'

ঃ 'আমরা তাকে বলি আমীরুল মুমিনীন। কিন্তু তাকে কাইজার ও কিসরার মত মনে করলে ভুল হবে। বাদশাদের প্রতিটি হুকুমই জনগণের জন্য আইন। কিন্তু খলিফা ওমর ইসলামের বাইরে কোন নির্দেশ আমাদের দিতে পারেন না।'

ঃ 'কোন মুসলমান কি তার সামনে এ দুঃসাহস দেখাতে পারে যে, আপনার এ কাজ ইসলামের পক্ষে আর একাজ বিপক্ষে?'

ঃ 'ওমর ফারুকের কোন কাজ ইসলামের পরিপন্থী এমনটি কোন মুসলমান ভাবতেই পারে না। খোদা না করুন এমন হুকুম দিয়ে ফেললে, এক বেদুইনও তার প্রতিবাদ করতে পারে। আমি তাঁকে দেখেছি। মদিনার সেসব লোকদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যারা তাঁকে জনতার অভিযোগের জওয়াব দিয়ে তাদের শান্ত করতে দেখেছেন।'

ঃ 'বুঝলাম, কাইজার ও কিসরার অহংকার তিনি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। তার শক্তি এবং বিশালত্বও অনুমান করতে পারি। দুনিয়ার কোন বিজয়ী তার সমকক্ষ হওয়ার দাবী করতে পারবে না, একথাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছিনা কি করে কোন মুসলমান তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে অথবা তার সাথে কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে।'

মৃদু হাসল হাসান।

ঃ 'এক ইরানী হিসাবে ভাবলে তার অনেক কথাই তুমি বুঝবে না। তুমি দেখেছ কিসরার মহল আর দুর্ভেদ্য কেল্লা। মানুষের উপর খোদায়ী দাবীদারদের তখত তাজের দাপট দেখেছ। যদি কোনদিন মদিনায় যাওয়ার সৌভাগ্য তোমার হয়, দেখবে সেই সম্রাটকে, যার মোটা লেবাসে শত তালি। প্রজাদের মধ্যে কেউ আজ ভূখা কিনা এক টুকরো শুকনো রুটি মুখে তুলতে এ ভাবনা যাকে চঞ্চল করে তোলে। ঘর থেকে বের হন যিনি কোন পাহারাদার ছাড়া। শহরের বাইরে বিশ্রাম নেন গাছের ছায়ায়। নিজের আরামের জন্য যিনি তৈরী করেননি কোন মহল। দূর্গ গড়েননি আত্মরক্ষার জন্য। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নেই কোন গোয়েন্দা বাহিনী। যাকে দেখে মদিনার দীনহীন ব্যক্তিরাও গর্ব ভরে বলতে পারে তিনি আমাদেরই একজন।

বাদশাদের ধর্ম এবং রাজনীতির সবগুলো বিধান জুলুমের শামিল। জবরদস্তি অধিকার বঞ্চিত করত খোদার বান্দাদের। কিন্তু ইসলাম চায়, খোদার বান্দার উপর তার দ্বীনের শাসন জারী করতে। দ্বীনের বিপরীত কোন হুকুম দিতে পারেন না আমীরুল মুমেনীন। ইসলামের আইন কোন শাহানশার গোলামীর জিঞ্জির পরায় না আমাদের, বরং প্রতিটি মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ঘরে আশ্রয় পায় দুনিয়ার প্রতিটি মজলুম, সে ঘরের মুহাফিজ হচ্ছেন খলিফা। যে সালতানাতের ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের উপর তিনি তার পরিচালক। ইয়ারমুক, আজনাদাইন, কাদেসিয়া এবং নাহাওন্দের বিজয়ের জন্য আগামী দিনের ঐতিহাসিকগণ তাকে দেবে বিজয় মাল্য। কিন্তু আমার কাছে তার বড় বিজয় হচ্ছে, যা তিনি নিজের প্রচন্ড কুওতের মাধ্যমে লাভ করেছেন। আর তা হয়েছে, লোভ লালসা, ক্ষমতার দম্ভ আর অহংকার থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

আরবের মরুচারীরা ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে পূর্ব পশ্চিমের শাহানশাদের তখত ও তাজ– ইসলামের মোজেযা শুধু এই নয়, বরং যে বিজয় ও সফলতা মানুষকে খোদার আসনে বসায় খলিফা ওমরকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি বিন্দুমাত্র। রাজা প্রজার মাঝের শত বছরের প্রাচীর উপরে ফেলেছেন তিনি। দুস্থ বঞ্চিত মানবতাকে আল্লাহর ভয় ছাড়া সব ভয় থেকে দিয়েছেন মুক্তি।'

ঃ 'ইরানের প্রান্ত সীমায় বিজয় পতাকা উড়িয়ে কি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে, আর আঘাত করবে না ইয়াজদগির্দ?'

ঃ 'ফেরারী বাদশাহর কোন গুরুত্ব নেই খলিফার কাছে। খাকান শান্তি চান, এ প্রমাণ দিতে পারলে জিহুনের সামনে যাবার অনুমতি আমাদের দেয়া হবে না। তিনি মনে করেন, যত তাড়াতাড়ি প্রসারিত হচ্ছে ইসলামী সালতানাতের সীমা, তত শীঘ্র এর আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা কায়েম করা জরুরী। শত শত বছরের রাজতন্ত্র খতম হয়ে গেলে আরবের মত এ এলাকাও হবে ইসলামের অনুকূলে। আমিরুল মুমিনীনও তা

জানেন। অনারবের উপর আরবের মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত করা তার উদ্দেশ্য হলে, কঠিন ছিল না মোটেও। সম্রাটদের মত তিনিও মুনীব গোলামের মাঝে তুলে দিতে পারতেন লৌহ প্রাচীর। কিন্তু প্রভু ভৃত্যের ভেদাভেদ মিটিয়ে দেয়াই তার প্রথম উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থা জোর করে কারো সহযোগিতা আদায় করে না, চায় স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা।

আরবে প্রথম যখন বিকশিত হয়েছিল ইসলামের আলো– সংঘর্ষ বেঁধেছে তাদের সাথে– ক্ষমতার জন্য যাদের ভরসা ছিল ভেদাভেদ। ব্যক্তি সত্বাকে খোদার দ্বীনে লীন করতে ওরা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ইসলামের নৈতিক, আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে ওরা হারিয়ে গেছে। আজ ওরাই দ্বীনের পতাকা বহন করে গৌরব বোধ করছে। আরবের বাইরে ইসলামের সংঘর্ষ কিছু কবিলাগুলোর সাথে ছিল না। বরং এ সংঘর্ষ ছিল পূর্ব পশ্চিমের সে বিশাল সালতানাতের সাথে, যাদের রয়েছে হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য। কাইজার ও কিসরাকে পরাজিত করেছি আমরা। কিন্তু শত বছরের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের চিন্তাধারা পাল্টে তাদেরকে ইসলামের ছাঁচে গড়ার জন্য প্রয়োজন আরবের মত এখানেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সত্যিকার রূপ ফুটিয়ে তোলা।

আমাদের বিজয়গুলোতে খলিফা আনন্দিত। কিন্তু তার আশংকা, জুলুম আর মূর্খতার ভাংগা প্রাচীরের স্থানে ইসলামের মজবুত বুনিয়াদ যদি না গড়া হয়, কোন দিন অনারবের বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আমাদের জীবনের এবং আদর্শের ঝলমলে ফোয়ারাও ধূলো-মলিন করে দেবে। তিনি জানেন, আরবের মত এখানেও যদি প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন, সে দুর্দমনীয় শক্তি সৃষ্টি হবে এখানেও, যে শক্তি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে কাইজার ও কিসরার গর্বিত সিংহাসন। এরপর নতুন কাফেলার সালাররা খালিদ এবং মুসান্নার দৃষ্টি নিয়ে ইরান, সিরিয়া এবং মিসরের আরো সামনে দেখবে। মিয়ানদাদের কাহিনী শুনে থাকলে আমার কথাগুলো তোমার বুঝতে কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। কিসরার জন্য নিজের জীবন কোরবানী করার জন্য ও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমার মন বলত, বেশী দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকবে না এ নওজোয়ান। তোমার ব্যাপারেও বলতে পারি, সারা জীবন অন্ধকারে ঘুরে মরার জন্য তুমি পয়দা হওনি। ক'বছর আগে মিয়ানদাদ যে আলো দেখেছে, সে আলো দেখার তীব্র পিপাসা দেখছি তোমার চোখেও।'

থেমে গেল হাসান। আদমান নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'মিয়ানদাদ বলেছে, ইচ্ছে করলেই আমি ঘরে ফিরে যেতে পারি। এ ব্যাপারে আপনার শর্তগুলো জানতে চাই।'

ঃ 'তুমি এখন আমাদের আশ্রয়ে। তুমি জিম্মি হয়ে থাকবে না এদ্দুর জানাই আশা করি যথেষ্ট। আর যদি জীবনের পথ পরিবর্তন করতে চাও, সব সময় খোলা পাবে ইসলামের দুয়ার।'

ঃ 'আমার সংগীরাও কি ফিরে যেতে পারবে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'মিয়ানদাদের দোস্ত হিসাবে আমায় না হয় বিশ্বাস করলেন, কিন্তু ওদের কিভাবে বিশ্বাস করবেন, নিজের বিশ্বস্ততার কোন জামানত যারা দিতে পারছে না?'

ঃ 'নিজের দেশে বসন্তের নতুন দোলা দেখার সুযোগ ওদের দেব। ভবিষ্যতের ব্যাপারে ফয়সালা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে ওদের। তোমার সাথীরা আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওরা যখন ঘরে ফিরে যাবে, তাদের পাশে থাকবে তারা, যারা ইসলামের ন্যায়, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের বাস্তবতা দেখেছে। ওরা নতুন কোন ফেতনা সৃষ্টি করতে চাইলে তাদের প্রিয়জনদের সাহায্য পাব আমরা। অনেকদিন থেকে আমাদের লশকর তোমাদের প্রতীক্ষা করছিল। মুজাহিদদের অনেকের বাড়ী শত মাইল দূরে। এদিকে লড়াইয়ের আশংকা না থাকলে দেশে ফিরে যেতে পারবে ওরা। তোমাদের আগমনে ওদের খুশী হওয়ার এও এক কারণ।'

ঃ 'কোন সংকোচ ছাড়াই এখন স্বীকার করছি, হাতিয়ার সমর্পণ ছাড়া কোন উপায় আমাদের ছিল না। গত ক'সপ্তাহ ধরে না খেয়ে মরছে আমাদের লশকর। কনকনে শীতেও অনেককে দিতে পারিনি উপযুক্ত পোশাক। প্রথম দিকে স্থানীয় লোকেরা অভ্যর্থনা জানাত আমাদের, সাহায্য করতো। কিন্তু ইয়াজদগির্দের উপর্যুপরী ব্যর্থতায় ওরা হতাশ। রোগ-ক্ষুধায় আমাদের বেশীর ভাগ লোক সফরের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নারী আর শিশুদের দেখলে মায়া হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, বরফপাতের কয়েক দিন আগে আপনাদের আশ্রয় নেয়ার ফয়সালা করতে পারিনি।'

ঃ 'মিয়ানদাদকে একথা বলনি?'

ঃ 'না, আমায় বলা হয়েছে, সিপাহসালারের কথায় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। লশকরের সর্দারদের আশংকা ছিল, আমাদের ছাউনীর অবস্থা টের পেলেই মুসলমানরা হামলা করবে।'

ঃ 'দোস্তকে কমপক্ষে বিশ্বাস করা উচিৎ ছিল।'

ঃ 'এ বিশ্বাস ছিল যে, মিয়ানদাদ আমাদের বরবাদীর হাত থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার ক্ষমতা কদ্দুর জানা ছিল না। দোস্তকে চরম পরীক্ষায় ফেলতে চাইনি। তবে তার কথায় এ একীন পেয়েছি, পতিত দুশমনের উপর আপনারা তলোয়ার তোলেন না। কিন্তু তাদের ক্ষুধাও আপনাদের পেরেশান করবে, এতটা ভাবিনি।'

ঃ 'আমরা মুসলমান' বলে দরজার দিকে এগোল হাসান। 'ইউসুফ ইউসুফ, এদিকে এসো।' আওয়াজ দিল দরজায় দাঁড়িয়ে।

ছুটে এল এক নওজোয়ান। বিশের মত বয়স।

ঃ 'ইউসুফ।' হাসান বলল। 'আমাদের সবকটা খচ্চরের পিঠে আটা বোঝাই কর। ভেড়া বকরী কেনার জন্য কয়জনকে পাঠিয়ে দাও পাশের বস্তিতে। এ রসদ বাইরে

যাবে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য পয়গাম পাঠাও পেছনের চৌকিগুলোতে। ভেড়া বকরী যেন একশোর কম না হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্য থেকে ক'জন শক্তসামর্থ্য রাখালও নিয়ে আসবে। ত্রিশ চল্লিশজন যাবে রসদের সাথে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হবে ওদের।'

ঃ 'কোথায় যাবে রসদ?' প্রশ্ন করল নওজোয়ান।

খানিক রেগে হাসান বললঃ 'মানুষের জীবন বাঁচানোর সমস্যা আমাদের সামনে। আর তুমি সময় নষ্ট করছ? রসদের কাফেলা প্রস্তুত, দুপুর নাগাদ এ কথা শুনতে চাই।'

বেরিয়ে গেল নওজোয়ান। ফিরে আদমানের দিকে তাকিয়ে হাসান বললঃ 'কাল এসেই আমায় বলে দিলে এতক্ষণে এ কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত।'

ঃ 'আমি লজ্জিত। সিপাহসালারের অনুমতি ছাড়া এত বড় পদক্ষেপ নিলেন, এতে আপনাকে জওয়াবদিহী করতে হবে না।'

ঃ 'আদমান, আমাদের সিপাহসালারও মুসলমান। ক্ষুধা কি তা তাকে বোঝাতে হবে না। কাফেলার সাথে তোমাকে যেতে হবে। তোমাদের লশকরকেও আসতে হবে না সিপাহসালারের সামনে। তুমি যদি লশকরকে শান্ত রাখার জিম্মা নিতে পার, তোমাদের নিরস্ত্রও করব না। ইয়াজদগির্দের সাথে আমাদের লড়াই খতম হয়ে গেছে। ইরানে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তোমাদের অংশের কাজ এখনো বাকী। আমি জানি তোমাদের মুসিবতের কথা। তোমাদের হেফাজত করা আমাদের দায়িত্ব।'

ঃ 'আমার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে বলছি, ইরানে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আপনার ইচ্ছে আমরা পূর্ণ করব।'

ঃ 'আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে তোমাদের নিজের বাড়ী পৌছে দেয়ার জিম্মা নিচ্ছি। আমি শুনেছি তোমরা অনেকে সফরের যোগ্য নও। শীতের মওসুমে এ স্থান থাকারও উপযুক্ত নয় ওদের জন্য। মরুরুদে ওরা বেশী আরাম পাবে। যারা বেশী অসুস্থ, মরুর পথে ভাল আশ্রয় পাবে ওরা। আবার বরফপাত শুরু হলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে।'

আনন্দে আবেগে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল আদমান। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে উঠল তার চোখ। হাসান বললঃ 'আদমান, তোমার দীলে কোন অস্বস্তি থাকলে আমি দূর করে দিতে পারি।'

ঃ 'সব অস্বস্তি, সব দুশ্চিন্তা আমার দূর হয়ে গেছে। আমরা যে পথ ধরেছিলাম, তার শেষ মঞ্জিল তো এই হওয়া উচিত।'

ঃ 'না, আমার দোস্ত! এ তোমাদের নতুন পথের প্রথম মঞ্জিল। অতীতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বর্তমানের আলোয় তোমরা এসে পড়েছ।'

পাঁচদিন পর। ইরানী লশকরের সর্দাররা ছাউনীর বাইরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল মুসলিম সিপাহসালারকে। আহনাফ বিন কায়েস, হাসান, সোহেল এবং আরো চারজন

সালার ঘোড়া থেকে নামলেন। তাদের পেছনে সারি বেধে দাঁড়াল পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী। আদমান ও মিয়ানদাদ রসদ নিয়ে পৌছে ছিল দুদিন পূর্বে। ওরা চাইতে লাগল ইরানী সর্দারদের দিকে। মুসলমানদের সামনে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছিল আদমান। ও এগিয়ে তরবারী পেশ করল সিপাহসালারকে। সিপাহসালার ফিরে চাইলেন হাসানের দিকে। বললেনঃ 'আমি চাই, কালই তোমরা রওয়ানা কর। মরুতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব আমি।'

সঙ্গীদের দিকে তাকাল আদমান। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে গেছে ওদের আঁখীগুলো। এক বুড়ো এগিয়ে বললঃ 'আপনি আমাদের দাওয়াত কবুল করুন। ছাউনীতে আমাদের সংগীরা আপনার প্রতীক্ষা করছে।'

ঃ 'আমায় এক্ষুণি মরু পৌছতে হবে। আপনার সংগীদের সাথে মোলাকাত হবে ওখানেই। হাসান, ওদের 'মরু' পর্যন্ত পৌছানো তোমার দায়িত্ব। এদের যেন কোন কষ্ট না হয় পথের সব চৌকিতে এ হুকুম পাঠাচ্ছি। মিয়ানদাদ, সোহেল এবং আরো চল্লিশ ব্যক্তি যাবে তোমাদের সাথে। তোমার অনুপস্থিতিতে কেল্লা থাকবে ইউসুফের জিম্মায়।'

স্মিত হেসে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলেন আহনাফ। খানিক থেমে আদমানকে বললেন ঃ'তুমি কিছু বলবে?'

ঃ 'আমি শুধু বলতে চাই, পূণ্য যদি পূণ্যের জন্ম দেয় আমরা আপনাকে নিরাশ করব না।'

ঃ 'আল্লাহ সঠিক পথ চেনার হিম্মত দিন তোমাদের।'

ঘোড়ায় সওয়ার হলেন আহনাফ। সাথীরা অনুসরণ করল তার। কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেলেন তারা। আদমান সঙ্গীদের বললঃ 'আমার বন্ধুরা। আঁধার আর উষার ঝলমলে আলোর মাঝে পার্থক্য করতে ফোরাত থেকে জিহুন পর্যন্ত ঘুরে মরার প্রয়োজন ছিল না।'

দুই মাস পর হাসান, মিয়ানদাদ এবং সোহেল বাড়ী যাওয়ার ছুটি পেল। রাস্তা থেকে এলাকার আটজন মুজাহিদ শামিল হল তাদের সাথে।

সন্ধ্যা। দিগন্তের প্রান্ত ছুই ছুই করছিল সূর্যের লাল কপাল। বাতাসে দোল খাওয়া গমের ক্ষেত পেরিয়ে ফোরাতের তীরে দাঁড়িয়ে ছিল এ কাফেলা। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছিল দুটো কিশতি। কিশতিতে মাল্লা নেই।

মিয়ানদাদকে এক নওজোয়ান বললঃ 'মাল্লারা হয়ত গাঁয়ে ফিরে গেছে। আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঘোড়া নিয়ে পানিতে নেমে পড়ল নওজোয়ান। অন্যরা বৃক্ষের সাথে বেঁধে রাখল ঘোড়াগুলো। মাগরিবের নামাজ শেষে সবুজ ঘাসের গালিচায় বসল ওরা।

বসন্তের মওশুম। শীতের পর সাঁঝের আলতো হাওয়া মধুর লাগছিল ওদের। দ্বাদশীর চাঁদ আলোর ঝরণা ছড়াচ্ছিল নীরব আকাশে। দীর্ঘ সফর শেষে প্রিয় মিলনের

সুবাস পাচ্ছিল হাসান সে বাতাসে। ক্লান্ত মুসাফিরের সামনে ভেসে উঠছিল সবুজ মরুদ্যান। কল্পনার পাখায় উড়াল দিল হাসান। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ফেলে আসা দিনগুলো আর ভবিষ্যত স্বপ্নের সোনালী সড়ক।

কখনো তার আত্মা ছুটে যেতো সে বিরান ভূমিতে, যেখানে ভয়ংকর আঁধারের মাঝে আকাশের জ্বলজ্বলে তারার মতই ঝলমল করছিল সত্য পথের মুসাফিরদের পদচিহ্ন। যাদের সাথে বাহরাইন থেকে খোরাসান পর্যন্ত সফর করেছে ও। ও শুনছিল লড়াইয়ের ময়দানে মুজাহিদদের তাকবীর, ঘোড়ার খুরধ্বনি, তীরের শনশন আওয়াজ আর তলোয়ারের ঝংকার। যে সব সালারদের তরবারীর অগ্রভাগে দুনিয়ার মানচিত্রে আঁকা হয়েছিল নতুন রেখা– যাঁদের যশ, দৃঢ়তা, একীন, হিম্মত আর সাহস হয়েছে অগণিত কাহিনীর শিরোনাম– ও দেখছিল তাদের, যাঁদের শহীদি খুনে আঁধার পাড়ায় জ্বলে উঠেছে তৌহিদের সহস্র আলোক মালা।

অশ্রুরা এসে পর্দা টেনে দিচ্ছিল ওর চোখের সামনে। জীবন কাফেলার এক জীবন্ত নকীব, এক দৃঢ়চেতা নেতার সে কথাগুলি গুঞ্জরিত হচ্ছিল তার কানেঃ 'আমি জানিনা কোথায় শেষ হয়েছে খোদার জমিনের সীমানা। আল্লাহর সিপাইরা যখন এদিকে আসবে, জানিনা কদ্দুর পর্যন্ত সঙ্গ দিতে পারব ওদের। হয়ত দিগন্তের প্রথম রেখাও পেরোতে পারব না। কিন্তু হেজাযের কাফেলা যতদিন জারী রাখবে তাদের সফর, যতদিন পর্যন্ত শেষ না হবে খোদার জমিনের সীমানা, আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়া বন্ধুদের আনন্দের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে আমার আত্মা। কিয়ামত পর্যন্ত মুজাহিদদের বিজয় হবে আমার বিজয়। আমি শুধু এতটুকু প্রশান্তি চাই, বদর ও হোনাইনের যে কাফেলা মাড়িয়েছে মাদায়েনের পথ, এ পথের প্রথম মঞ্জিলের চেরাগ আলোকিত হয়েছে আমার খুনে।'

হাসানের অশ্রু এর জওয়াব দিচ্ছিলঃ 'আমার নেতা, আমার দোস্ত, আমার বন্ধু, হোনাইনের কাফেলা মাদায়েন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। যে পতাকা তুমি তুলেছিলে একদিন, আল বুরজের চূড়া পেরিয়ে গেছে তার ছায়া। যে কাফেলাকে তুমি আহবান করেছিলে, তার মুসাফিররা পেরিয়ে গেছে কত নদী, দরিয়া আর কত পর্বতমালা।'

আচানক পেছন থেকে সোহেলের আওয়াজ ভেসে এলঃ 'উঠুন ভাইজান।'

ফিরে চাইল হাসান। তাকাল ঘাটের দিকে। কয়েক কদম দূরে মিয়ানদাদ ও কাউসের সাথে দাঁড়িয়ে আছে মাহবানু ও ইয়াসমীন। মাহবানু ছেলেকে জড়িয়ে রেখেছে বুকের সাথে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে হাসান বললঃ 'মাহবানু, এ সময় তোমাদের এখানে আসার দরকার ছিল না।'

ঢেউ উঠল মাহবানুর ভালবাসা ও আনুগত্যের সাগরে। নত হয়ে এল দৃষ্টি। জওয়াব না দিয়ে ঘুমন্ত শিশুকে এগিয়ে দিল মাহবানু। কোলে নিয়ে চুমু খেল হাসান।

চাঁদের আলোয় তাকিয়ে রইল তার মায়াময় চেহারার দিকে। ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আর আমার বোন কেমন আছে?'

ঃ 'ছোট বোনের অভিযোগ, ভাই কোন খোঁজ খবর নেন না।'

মৃদু হাসল হাসান।

ঃ 'এখন আর ছোটবোনের কোন অনুযোগ থাকবে না। ছুটি শেষ হলেই কুফা চলে আসব। প্রতি সপ্তাহে সংবাদ পাবে তখন। আর মিয়ানদাদও ছুটি শেষ হতেই ইস্পাহানে বদলীর নির্দেশ পেয়ে যাবে। এবার খুশী তো?'

ঃ 'এক শর্তে খুশী হতে পারি, গরমের সময় আপনি আসবেন।'

ঃ 'ইস্পাহান অনেক দূরে ইয়াসমীন। তবুও যখনই ছুটি পাব ইস্পাহান ছাড়া আর কোথাও যাব না।'

ঃ 'আমিও যাব ওখানে।' বলল সালমান।

ঃ 'হ্যাঁ, বেটা তুমিও যাবে।'

ঃ 'আম্মীও যাবে, আমরা সবাই যাব।'

ঃ 'সোহেল, নিজের কথা কিছুই তুমি বলনি।' মাহবানু বলল।

ঃ 'খোরাসানের আবহাওয়া আমার ভাল লেগেছে।'

ঃ 'খোরাসান যদি শান্ত থাকে, আগামী বছর ইরাকের কোন ছাউনীতে ওকে বদলী করে দেয়া যাবে। কিন্তু কিশতি কোথায়?'

মিয়ানদাদ বললঃ 'মাত্র একটা কিশতি এসেছিল। ঘোড়া আর সঙ্গীদের নিয়ে ওপারে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে।'

ঃ 'কিশতি এসে ফিরে গেল অথচ আমি টেরই পেলাম না?'

ঃ 'তখন আপনি হয়ত অন্য পৃথিবীতে ছিলেন।'

একটু পর। কিশতিতে সওয়ার হল ওরা। নদীর ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল হাসান। দেখছিল অফুরন্ত তরঙ্গের খেলা। আদিগন্ত সীমাহীন সে তরঙ্গের দোলায় দুলে উঠল তাঁর স্মৃতির পর্দা। পর্দা সরিয়ে হাসান তাকিয়েছিল অতীতের সে বর্ণময় প্রচ্ছদে, যেখানে লুকিয়ে ছিল তার জিন্দেগী ও স্বপ্নের তামান্নারা। ফোরাতের যে তরঙ্গমালা উছলে উছলে অভ্যর্থনা জানাত মুসান্না বিন হারেসা, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে তরঙ্গের প্রতি দোলায় সে দেখছিল সেই অক্ষয় মুহূর্তের ছবি। আনন্দের সেই গুলিস্তানে বিচরণ করছিল তার হৃদয়– একমাত্র খোদার পথের মুসাফিররাই যেখানে পৌঁছতে পারে।

সমাপ্ত

আমাদের আরো কিছু বই

গল্প/উপন্যাস/বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ

১. সুন্দর তুমি পবিত্রতম/ আতা সরকার
২. পনরই আগস্টের গল্প/ আসাদ বিন হাফিজ
৩. অথচ নিত্য পাপী/ কাজী এনায়েত হোসেন
৪. তিন তলার সিঁড়ি/ খাদিজা আখতার রেজায়ী
৫. মরু মুষিকের উপত্যকা/ আল মাহমুদ
৬. যুদ্ধ ও ভালবাসা/রাজিয়া মজিদ (প্রকাশিতব্য)
৭. তিতুর লেঠেল/ আতা সরকার
৮. আপন লড়াই/ আতা সরকার
৯. দি সোর্ড অব টিপু সুলতান/ভগওয়ান এস গিদওয়ানি (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১০. সীমান্ত ঈগল/ নসীম হিজাযী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১১. হেজাযের কাফেলা/ নসীম হিজাযী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১২. আঁধার রাতের মুসাফির/নসীম হিজাযী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৩. কায়সার ও কিসরা/ নসীম হিজাযী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৪. শেষ বিকেলের কান্না / নসীম হিজাযী

কবিতা/ছড়া ও শিশু সাহিত্য/জীবনী

১৫ কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর/আসাদ বিন হাফিজ
১৬. অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার/ আসাদ বিন হাফিজ (প্রকাশিতব্য)
১৭. রাসূলের শানে কবিতা/ (সম্পাদিত) (প্রকাশিতব্য)
১৮. আলোর হাসি ফুলের গান/ আসাদ বিন হাফিজ
১৯. নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন/ আসাদ বিন হাফিজ
২০. কুক কুরু কু / আসাদ বিন হাফিজ
২১. ইয়াগো মিয়াগো/ আসাদ বিন হাফিজ
২২. পোষহীন এক সংগ্রামী নেতা/ আসাদ বিন হাফিজ
২৩. SWEET RHYMES/ NURUL ALAM RAISI
২৪. গাছ গাছালি পাখ পাখালি/ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন
২৫. হরফ নিয়ে ছড়া/ আসাদ বিন হাফিজ
২৬. মিথ্যেবাদীর প্রতিজ্ঞা/ সরদার জয়নুল আবেদীন

ইতিহাস/ভ্রমণ/রম্যরচনা/সমালোচনা ও অন্যান্য

২৭. বিয়ে নিয়ে ইয়ে / মুনির উদ্দীন আহমদ
২৮. ইরান তুরান কাবার পথে/ নসীম হিজাযী
৩৮. মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য/ খাদিজা আখতার রেজায়ী
৩৯. ইসলামী সংস্কৃতি/ আসাদ বিন হাফিজ
৪৩. বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা পদ্ধতি/খোন্দকার এ, এস, এম, শাহ আলম
৪৪. রমযানের তিরিশ শিক্ষা/ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
৪৫. শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর অমর সৃষ্টি ফী যিলালিল কোরআন
৪৬. নির্বাচিত ইসলামী গান/ আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত
৪৭. দজ্জালের পা / মুনির উদ্দীন আহমদ
৪৮. ফরাজি মুনশির হপ্তানামা/ ফরাজি মুনশি (ওসমান গনি)
৪৯. নির্বাচিতার কলম/ খাদিজা আখতার রেজায়ী
৫২. নষ্ট মেয়ের নষ্টামী/ মুনির উদ্দীন আহমদ
৫৩. তালাকনামা / মুনির উদ্দীন আহমদ
৫৪. ভাষা আন্দোলন ও ডান বাম রাজনীতি/আসাদ বিন হাফিজ